২য় সংস্করণ

রথযাত্রা ১৩৬২

প্রকাশক : শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৩৮, বিধান সরণী। কলিকাতা-৬। অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সীতারাম প্রেস। ৩৮/এ, হরিতকী বাগান লেন। কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী।

প্রথম খণ্ড (বৈদিক)।

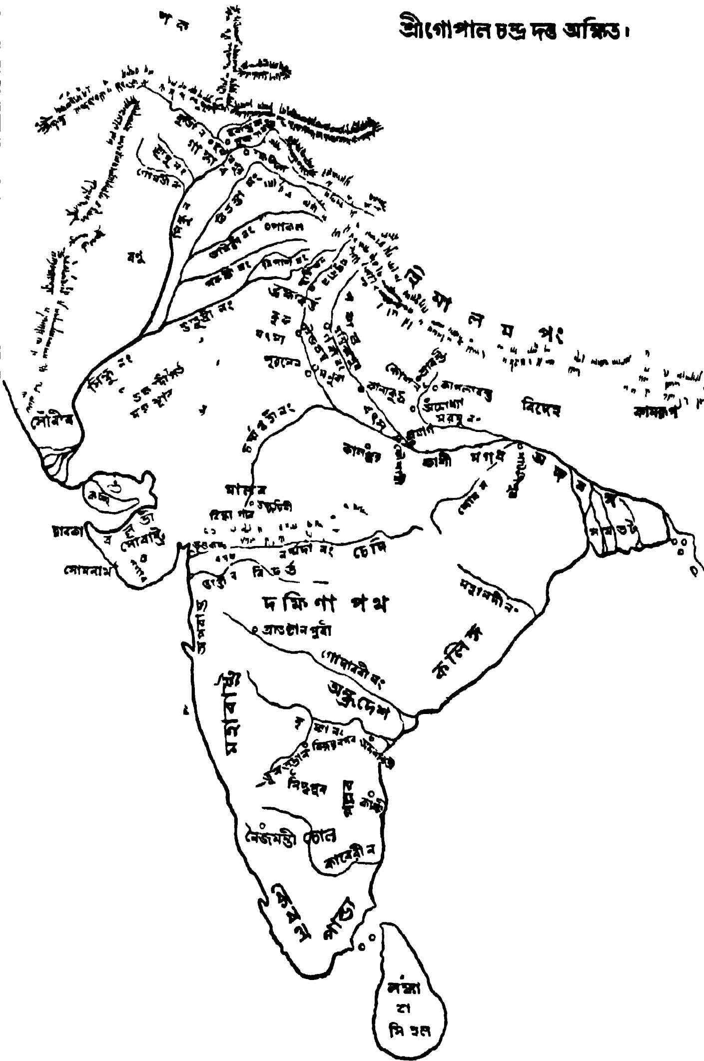
দ্বিতীয় খণ্ড (লৌকিক)।

তৃতীয় খণ্ড (লৌকিক)।

সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস।

প্রাচীন ভারত।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দত্ত অঙ্কিত।



সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

বৈদিক সাহিত্য

প্রথম অধ্যায়

(পূর্বাভাস)

(আর্যসভ্যতার প্রথম অরুণোদয়ে যে এক বিপুল মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা আজও জগতে অতুলনীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত। উহাই আর্যসভ্যতার অনাদি অক্ষয় উৎস—বেদ নামে আখ্যাত।) কোন্ সুদূর অতীতের তমসাচ্ছন্ন নিভৃত কন্দরে সামসঙ্গীত প্রথম ঝঙ্কারিত হইয়াছিল এবং ধরণীর কোন্ গগনেই বা বিরামবিহীন মহাওঙ্কারধ্বনি রণরণিয়া উঠিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত উপাদান কেহই এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং ঐ উপাদান কোনও কালে সংগৃহীত হইবে এরূপ আশাও অতি বিরল।) (বেদই ভারতীয় সভ্যতার মূল মন্দাকিনী উৎস। ঐ নিরবচ্ছিন্ন পূত-ধারা ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় রীতিনীতি, ভারতীয় ধর্ম কর্ম ও ভারতীয় জীবন এবং ভারতীয় কাব্যকে স্নেহ বরিষণে শ্যামল ও উজ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। কোনও জাতির সভ্যতা ও সাহিত্যের বিচার করিতে হইলে ঐ জাতির বিশিষ্টতা, ঐ জাতির প্রকৃতি ও তাহার নিদানভূত মূল উৎসের অনুসন্ধান করিতে হয়। ঐ মূল উৎস হইতে কোন্ ধারা কোন্ পথে চলিয়াছে তাহাই লক্ষ্য করা ঐতিহাসিকের প্রধান কর্তব্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা জাতীয় জীবনের ও প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে কিন্তু তদ্দারা জাতীয় বিশিষ্টতা কোনও কালেই ধ্বংস বা বিনষ্ট হইতে পারে না। নানা আগন্তুক কারণে অয়স্কান্ত মণির ক্ষণিক চঞ্চলতা উপস্থিত হইলেও ঐ চঞ্চলতার অবসানে উহা ধ্রুব তারকাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। ভাষা ও সভ্যতা, জীব ও উদ্ভিজ্জ জগতের ন্যায় বৃদ্ধি ও ক্ষয়শীল; বনস্পতির ন্যায়

ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া দিগ্‌বিদিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে এবং বহু প্রাচীন হইয়া গেলে উহার বিবৃদ্ধির হ্রাস হয়, কোটরাদি জন্মিতে থাকে। আর্যজাতির সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও ঐ সকল লক্ষণ ও পরিবর্তন লক্ষিত হইবে।

গভীর চিন্তাশীলতা, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা, নিষ্পাপতা, সত্য ও ঋত, আত্মত্যাগ এবং বিসর্জ্জনই আর্যসভ্যতার মূলমন্ত্র। যুগে যুগে নানা বিপ্লবে, নানাসংঘর্ষে উহা ম্লান হইতে পারে নাই। বৈদিকধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মের অভ্যুত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া ঐ সত্যের অনুসন্ধান, ঋতের অনুসরণ, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বাধীন চিন্তা সমভাবে চলিয়াছে, উৎসর্গই প্রাচীনপন্থা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ উহার প্রকারভেদ মাত্র।

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য মনীষিগণ বৈদিক সাহিত্যের চর্চা করিয়া প্রথমতঃ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বৈদিক সূক্তগুলি আর্য কৃষকজীবনের সঙ্গীতলহরী মাত্র। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের চর্চা ইউরোপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ মত পরিবর্তিত হইতেছে।

হিন্দুদিগের মতে বেদ অপৌরুষেয়। উহা মনুষ্যরচিত নহে। বেদ ভগবানের নিঃশ্বসিত, উহা চিরন্তন ও শাশ্বত। হিন্দুর চক্ষে বেদের অভিব্যক্তি মানবজগতে আংশিক; ঋষিগণ সূক্তগুলির আংশিক দ্রষ্টা মাত্র; মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি যেরূপ চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু কোনও মনীষী তাহা কেবল আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র। কলম্বস্ আমেরিকার আবিষ্কারক মাত্র। তেমনি সূক্তগুলি ঋষিগণ কর্তৃক "দৃষ্ট" হইয়াছে। সেগুলি গ্রন্থাদির ন্যায় ঋষিগণকর্তৃক "কৃত" হয় নাই। "ঋষিণা দৃষ্টম্ নতু কৃতম্"। বেদ দৃষ্টই হউক বা রচিতই হউক কোন্ যুগে উহা দৃষ্ট বা রচিত হইয়াছিল তাহাই বিবেচ্য বিষয়। পাশ্চাত্ত্য আচার্য্যেরা সাধারণতঃ মনে করেন যে ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি ঋষিগণ কর্তৃক ১২০০—১০০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে রচিত হইয়াছে। আচার্য্য ম্যাক্‌স্‌মুলারই এই মতের প্রবর্ত্তক। ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলির ভাষা, ব্রাহ্মণভাগের ভাষা ও উপনিষদের ভাষার ক্রমিক পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। ঐ পরিবর্ত্তনের আনুমানিককাল পাশ্চাত্ত্য আচার্য্যেরা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন

এবং কোনও কোনও সূক্তে নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান বর্ণিত আছে, তাহার সাহায্যে বেদের ঐ ঐ সূক্তের রচনাকাল নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের বর্ত্তমান অবস্থান দ্বারাই তাঁহারা ঐ প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ ১২০০—১০০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বে ঋগ্‌বেদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার "ওরায়ণ" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়া বেদের বহু প্রাচীনতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অন্যান্য ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও উহার প্রাচীনতা প্রমাণ করিয়াছেন।* কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই বেদবিভাগ হইয়াছে, ইহা মহাভারত ও পুরাণ দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়। মহাভারত ও পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি জনমেজয়ের যজ্ঞকালেই শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে। বেদের শাখাগুলি প্রবর্তিত হইতেও বহু যুগ গত হইয়াছে।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ বেদের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াই রচিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের প্রাচীন অংশ অপেক্ষা উহার ভাষা অর্বাচীন কিন্তু ব্রাহ্মণাংশও বেদের ন্যায় উদাত্তাদি স্বরক্রমে উচ্চারিত হয়। এই ব্রাহ্মণাংশ রচিত হইতেও বহুকাল অতীত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণভাগে যজ্ঞকাণ্ডের ব্যাখ্যা, প্রক্রিয়া, যজ্ঞের তত্ত্ব ও বৈদিক আখ্যানাদি বর্ণিত আছে।

ব্রাহ্মণভাগের পর "আরণ্যক" ভাগ রচিত হইয়াছে এবং আরণ্যকের শেষভাগ উপনিষৎ নামে অভিহিত। বেদের প্রত্যেক শাখারই একখানি ব্রাহ্মণ ছিল এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই শেষভাগ "আরণ্যক" এবং প্রত্যেক আরণ্যকেরই শেষভাগ "উপনিষৎ"। বেদগুলির বহুশাখা ও তত্তৎ ব্রাহ্মণগুলি অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি তাহার আরণ্যকের শেষাংশ উপনিষদ্‌গুলি বিদ্যমান আছে। যে সকল উপনিষৎ বিদ্যমান আছে তাহাদেরও পৃথক্ পৃথক্ স্তর দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্‌গুলি পরমব্রহ্মের তত্ত্বান্বেষণে গভীর চিন্তায় মগ্ন। পরবর্তী ঋষিগণ পূর্ব ঋষিগণের চিন্তাপথে আরও

*বেদের কাল অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অগ্রসর হইয়াছেন। ঐ সকল উপনিষদে চিন্তাগুলি পরিস্ফুট হইতেও বহু যুগ অতীত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণভাগ কালক্রমে বহুবিস্তীর্ণ ও শ্রমসাধ্য হইবার পর বৈদিক যজ্ঞাদির ক্রিয়াপ্রণালী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। ঐগুলি সূত্রাকারে নিবদ্ধ। বৈদিক সাহিত্যে উহাই শেষ স্তর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ঐ গুলি কল্পসূত্র নামে অভিহিত। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বিশ্বাস করেন যে আর্যগণ তাঁহাদিগের আদিম নিবাস পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন মুখে গমন করিয়াছিলেন। গ্রীক, ইটালীয়, প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিগণও একই আর্য জাতির বংশধর। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব দ্বারাও ঐ মত সমর্থিত হয়। ঐ আর্যগণের যে শাখা ইউরোপ অভিমুখে গমন করিয়াছিল তাহারা ভারতীয় ও ইরাণিক আর্যগণ হইতে বহু পূর্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। সর্বশেষে ভারতীয় আর্যগণ ইরাণিক আর্যগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতীয় শাখা পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং ইরাণিকগণ পারস্যদেশে বাস করিতে থাকেন। ওল্ডেনবার্গ বলেন ২০০০—১৮০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে আর্যগণ পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করেন। ভারতীয় শাখা প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশে বাস করিতে থাকেন। তথা হইতে পরে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী "ব্রহ্মাবর্ত" ভূমিতে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। ঐ ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশ হইতেই কালক্রমে "বেদাগ্নি" পূর্বাভিমুখ হইয়া প্রসন্নসলিলা গঙ্গা ও যমুনার উপকূল প্রদেশে ও পরিশেষে "বিদেঘ" অর্থাৎ বিদেহ রাজ্যে গমন করিয়াছিল। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে বেদাগ্নির ঐ প্রকার পূর্বাভিমুখে গমনের উক্তি আছে। বেদের শাখাগুলির বিস্তার আলোচনা করিলেও উহা সত্য বলিয়া অনুমিত হয়।* অধ্যাপক পরম্পরা-ক্রমেই বেদাধ্যয়ন আর্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উহা কখনই লিখিত হইত না। তজ্জন্যই সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্য "শ্রুতি" নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মানবস্মৃতির সাহায্যেই ঐ বিপুল "শ্রুতি" এরূপ বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হইয়াছে যে তাহা জগতে অতি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। আচার্য-

* শাখা বিস্তার অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যাস্কের সময় হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ঋগ্‌বেদের একটি স্বর বা মাত্রারও পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

কিন্তু কালক্রমে আর্যগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করায় এবং ভিন্ন ভিন্ন আচার্য ঐ বেদসমূহের পাঠের তারতম্য অবলম্বন করায় এবং যজ্ঞপ্রণালীর কোনও কোনও পরিবর্তন করায় বেদপাঠের কিঞ্চিৎ তারতম্য ও যজ্ঞপ্রণালীর তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণাংশেও কিঞ্চিৎ তারতম্য হইয়াছিল। বেদের পাঠের তারতম্য অনুসারে বেদের শাখাভেদ ও তদনুসারে ব্রাহ্মণের ভেদ হইয়াছিল। বেদের প্রত্যেক শাখাধ্যায়ী আর্যগণের একটি পৃথক ব্রাহ্মণ ছিল। বেদরক্ষার জন্য বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বেদের পাঠ সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে পদপাঠ, ঘনপাঠ, জটাপাঠ প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যার নিমিত্ত নিরুক্ত ও বেদের ভাষার জন্য ব্যাকরণ এবং বেদের বিশেষ বিশেষ শাখার জন্য প্রাতিশাখ্য (অর্থাৎ বিশেষ ব্যাকরণ) প্রণীত হইয়াছিল। প্রত্যেক সূক্তের দ্রষ্টা ও দেবতার নাম ও ছন্দঃগুলি স্থির রাখিবার জন্য অনুক্রমণিকা রচিত হইয়াছিল। বৎসরের বিশেষ বিশেষ কাল ও তিথি প্রভৃতির নির্দ্দেশের জন্য "জ্যোতিষ" শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণের উচ্চারণ স্থির রাখিবার জন্য "শিক্ষা" নামক শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। এই শাস্ত্রগুলি বেদাধ্যয়নের সহায় বলিয়া বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয়।

"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্" এই ছয়খানি বেদাঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পরবর্তী অধ্যায় কয়েকটিতে ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদের সংহিতা, শাখাভেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌গুলির স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইবে। ঐ সকল সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের পৌর্বাপর্য ও কাল এবং বৈদিক সভ্যতা কিরূপ ছিল তাহার ক্ষীণাভাস যথাসাধ্য প্রদত্ত হইবে। সর্বশেষে বেদপাঠের সহায় বেদাঙ্গ ও পরিশিষ্টগুলি বিবেচিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋগ্‌বেদ

বেদগুলির মধ্যে ঋগ্‌বেদই প্রাচীনতম। ঋগ্‌বেদই সাম যজুঃ ও অথর্ববেদের উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রথমে বেদত্রয়ই (ঋক্, যজুঃ, সাম) বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তজ্জন্যই ঋক্, সাম, যজুর্বেদ "ত্রয়ী" নামে আখ্যাত। অতি প্রাচীন কালে অথর্ববেদ বেদসংজ্ঞাভুক্ত থাকা দৃষ্ট হয় না। উহা "অথর্বন্" বা "অথর্বাঙ্গিরস" নামে কথিত হইত। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ও আর্যজীবনের নিত্য কর্তব্যের মধ্যে অথর্ববেদের কোনও স্থান ছিল না এবং কোনও বিহিত যজ্ঞেই অথর্ববেদের কোনও প্রয়োগ ছিল না। তজ্জন্যই অতি প্রাচীনকালে উহা বেদরূপে পরিগণিত হইত না। কিন্তু পরবর্তী কালে উহা বেদসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরবর্তী কালে বেদ—ব্যূহে প্রবেশ করা হেতুতেই অথর্ববেদের সকল অংশ অর্বাচীন, একথা বলা যায় না। ইহার অনেক অংশ ঋগ্‌বেদের ভাষার ন্যায় প্রাচীন।

প্রাচীন আর্যসমাজে ও প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে বেদ সমূহের মধ্যে ঋগ্‌বেদ সংহিতার প্রাচীনত্ব ও প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তাহার প্রথম কারণ এই যে ঋগ্‌বেদ সংহিতাপাঠের পূর্বে উহার কিরূপ পাঠ ছিল তাহা **পদপাঠ** ও প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলির ধৃত পাঠ হইতে নির্ণয় করা যায় এবং অন্যান্য বেদের সূক্তগুলির অধিকাংশ ঋগ্‌বেদ হইতে সংগৃহীত হওয়ায় সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদের পাঠ হইতে তৎকালে ঋগ্‌বেদের প্রচলিত পাঠগুলি উদ্ধার করা যায়। উদারভাবে বিবেচনা করিলে সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদ ঋগ্‌বেদের প্রাচীন পাঠের নূতন সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যে আকারে আমরা "ঋগ্‌বেদ সংহিতা" প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা মহর্ষি যাস্কের কালের পূর্বেই দৃঢ়ভাবে অপরিবর্তনীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণযুগের অবসানের পূর্বেই ঋগ্‌বেদের পাঠ এরূপ সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে শতপথব্রাহ্মণ স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছে যে যজুর্বেদের যজুঃগুলির ও বিধান বাক্যগুলির কোনও পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে

কিন্তু ঋগ্‌বেদ সংহিতার একটি বর্ণেরও পরিবর্তন সম্ভবপর নহে। পরন্তু যে অধ্যাপকেরা ঐরূপ কোনও পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল তাহারা বাতুল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কোন্ প্রাচীনযুগে বর্তমান সংহিতা-পাঠ এরূপ দৃঢ় আকার ধারণ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রাচীন ব্রাহ্মণে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রাদি যে আকারে উদ্ধৃত হইয়া বিচারিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে ঋগ্‌বেদের সংহিতা-কলেবরের পূর্বে উহার আর একটি প্রাচীনতর মূর্তি ছিল। সংহিতা-কলেবরের কোনও কোনও ঋকের কথাগুলি প্রাচীন পাঠে ঠিক ঐরূপ পর্য্যায়-ক্রমে নিবদ্ধ ছিল না। পরন্তু ব্রাহ্মণভাগে কোনও কোনও ঋক্‌পাদের যে স্বরসংখ্যার উল্লেখ আছে বর্তমান সংহিতাকারে ঐ ঋক্‌পাদের উহা অপেক্ষা কম স্বরসংখ্যা দৃষ্ট হয়। কিন্তু শাকল্য মুনির পদপাঠক্রমে স্বর গণনা করিলে প্রাচীন ব্রাহ্মণোল্লিখিত স্বরসংখ্যার সহিত ঐক্য হয়। সংহিতা পাঠে পদগুলি সন্ধিবদ্ধ হওয়ায় স্বরসংখ্যা ন্যূন হওয়ায় কোনও কোনও ঋকে ছন্দঃপতন অনুভূত হয়। সামগানে ঐ ঋক্ থাকিলে গানের সময় সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া উহা গীত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, ঋগ্‌বেদ-সংহিতাপাঠ প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি রচিত হইবার পর বর্তমান কলেবর গ্রহণ করিয়াছে। সংহিতা শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারাও তাহাই লক্ষিত হয়। পাণিনি সংহিতাশব্দ-দ্বারা "পরঃ সন্নিকর্ষঃ" বুঝিয়াছেন। (পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা)। যেরূপ সান্নিধ্যবশতঃ সন্ধি অর্থাৎ স্বর বা ব্যঞ্জনের বিকার হয় তাহাকে সংহিতা বলে। সম্ভবতঃ ঋগ্‌বেদের সংহিতা পাঠে সন্নিকৃষ্ট পদগুলি সন্ধিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে "ত্বু অম্ হি অগ্নে", সংহিতা পাঠে আছে "ত্বং হ্যগ্নে"। শাকল্য মুনি তাঁহার পদপাঠে সন্ধিবন্ধের পূর্বে প্রত্যেক কথা কিরূপ ছিল তাহা দেখাইয়াছেন। ঐ গ্রন্থই শাকল্যের **পদপাঠ** নামে প্রসিদ্ধ। শাকল্যমুনি তাঁহার পদপাঠে সন্ধিবিচ্ছেদ সমর্থন করিতে গিয়া বহু বৈয়াকরণের মতের বিরুদ্ধে যে সকল নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পরবর্তী বৈয়াকরণেরা সসম্মানে উল্লেখ করিয়াছেন।

ঋগ্‌বেদের সংহিতাপাঠ সুদৃঢ় হইবার পর তাহার ঐ পাঠে রেখামাত্রও পরিবর্তন না হইতে পারে তজ্জন্য শাস্ত্রকারেরা কঠোর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। শাকল্য মুনির পদপাঠে ঋগ্‌বেদ সংহিতার প্রত্যেকটি পদ

সন্ধিবিচ্ছিন্নভাবে নিবদ্ধ আছে। যথা "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্"="অগ্নিম্। ঈলে। পুরঃ। হিতম্"। সংহিতাপাঠ অবধারিত হইবার কিছুকাল পরেই শাকল্য মুনির পদপাঠ রচিত হয়। ঐতরেয় আরণ্যকে এই পদপাঠের উল্লেখ আছে। শাকল্য মুনি যাস্কাচার্য্য অপেক্ষা প্রাচীন, কারণ যাস্কের নিরুক্তে শাকল্যের উল্লেখ আছে। শৌনক শাকল্যের পরবর্তী, কারণ শাকল্যের ভিত্তির উপর শৌনকের ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্য প্রতিষ্ঠিত। শাকল্যের পদপাঠে ঋক্‌বেদ-সংহিতার ৬টী ঋকের পদপাঠ প্রদত্ত হয় নাই। সেগুলি এই ৭।৫৯।১২, ১০।২০।১, ১০।১২১।১০, ১০।১৯০।১, ১০।১৯০।২, ১০।১৯০।৩। শাকল্য ঐ সকল ঋকের পদপাঠ না দিয়া পুনরায় সংহিতাপাঠ দিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে শাকল্য ঐ ছয়টী ঋক্ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তৎকালে উহা সংহিতাপাঠে গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তীকালের "খিল" সূক্তগুলি ঋগ্‌বেদের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয় নাই, তবে শাখাবিশেষে উহা গৃহীত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের সূক্তের ঋকের প্রত্যেকটী পদ যদি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করা যায়, পদপাঠে পদগুলি ১।২।৩।৪।৫।৬ ইত্যাদি ক্রমে সন্নিবেশিত হয়। ঋগ্‌বেদের পাঠ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার প্রকৃতিপাঠ ও বিকৃতি পাঠ প্রবর্তিত হইয়াছিল। সংহিতা, পদপাঠ ও ক্রমপাঠকে প্রকৃতিপাঠ বলে। আর—

জটা মালা শিখা রেখা ধ্বজো দণ্ডো রথোঘনঃ
অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রম-পূর্বামহর্ষিভিঃ ॥

পদ পাঠের পর **ক্রমপাঠ** রচিত হয়। ঐতরেয় আরণ্যকে ক্রমপাঠের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রত্যেক পদটি দুইবার আছে। পূর্বপদের সহিত পরপদ এবং পরপদের সহিত পরবর্তীপদ-সম্বন্ধ আছে। যথা "অগ্নিং। ঈলে। ঈলে। পুরঃ। পুরঃ। হিতম্" সংখ্যাদ্বারা বুঝাইতে হইলে ১।২; ২।৩; ৩।৪; ৪।৫ ইত্যাদি।

এই ক্রম-পাঠের উপরই **জটাপাঠ** নামক গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত।* উহাতে প্রত্যেক পদ ক্রমপাঠের ন্যায় ২ বারও ক্রম পাঠের বিপরীতক্রমে ন্যস্ত হইয়াছে।

* অনুক্রমশ্চোৎক্রমশ্চ ব্যুৎপত্তিক্রমো ভিক্রমগুপ্তা
সংক্রমশ্চেতি পঞ্চৈতে জটায়াং কথিতাঃ ক্রমাঃ ॥

উহাতে কুন্তলবেণীর ন্যায় পদযুগল অনুক্রমে ও বিপরীত ক্রমে গ্রথিত হইয়াছে। সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ করিতে হইলে ১।২, ২।১ ; ২।৩, ৩।২ ইত্যাদি। যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন তাহারা ঐ সকল পদপাঠ ও ক্রম পাঠাদি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। ঐ সকল সুদৃঢ় ও কঠোর প্রণালীর সাহায্যে ঋগ্‌বেদ সংহিতার পাঠ কণ্ঠে কণ্ঠে এরূপ সযত্নে সুরক্ষিত হইয়াছে যে বহু যুগান্তেও তাহার একটি স্বর বা একটি কণিকাও গলিত বা স্খলিত হয় নাই। জগতে সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রকার রক্ষণশীলতা অতি বিস্ময়কর ও অসামান্য ব্যাপার।

শৌনকঋষি ঋগ্‌বেদের একখানি **অনুক্রমণী** রচনা করিয়াছেন। ঐ অনুক্রমণীতে প্রত্যেক সূক্তের ছন্দঃ দ্রষ্টা ঋষি ও উদ্দিষ্ট দেবতার নাম উল্লিখিত আছে। অতি প্রাচীন ঐতরেয় আরণ্যকে ঋগ্‌বেদ সংহিতার দশটী মণ্ডলের ও সূক্তের ঋষিগণের নাম আছে। ঐ সকল দ্বারা ও অন্যান্য অনুক্রমণিকা দ্বারা সূক্তগুলির ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ, পদসংখ্যা ও স্বরসংখ্যাও সুরক্ষিত হইয়াছে।

শাখা।

আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে বেদসংহিতা আর্যগণের কণ্ঠস্থ থাকিত। কালক্রমে যখন আর্যেরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতে লাগিলেন ঐ বিচ্ছিন্ন আর্যগণের পঠিত বেদে কোনও কোনও স্থানের উচ্চারণ পার্থক্য ও কোনও কোনও সূক্তে পদবিন্যাসের সামান্য পার্থক্য ঘটিতে লাগিল। যে সম্প্রদায় যে ঋষির প্রবর্তিত বা অধ্যাপিত পাঠ গ্রহণ করিলেন তাহাদিগকে সেই শাখাবলম্বী বলা হইত। এইপ্রকারে একই বেদের বিভিন্ন শাখা উদ্ভূত হইয়াছিল। ঐ সকল শাখার পাঠমধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

পাতঞ্জল মহাভাষ্যে ঋগ্‌বেদের শাখা সম্বন্ধে যে উক্তি আছে তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে ঋগ্‌বেদের একুশখানি শাখা ছিল। "একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যম্"* মুক্তিকোপনিষদেও একবিংশতি শাখার কথা আছে।

* মহাভাষ্য কাশী সংস্করণ, ২৮ পৃঃ।

"ঋগ্‌বেদস্য তু শাখাঃ স্যুরেকবিংশতিসংখ্যকঃ"। বিষ্ণুপুরাণে ৯টী শাখারও বেশী নাম উল্লিখিত আছে। চরণব্যূহগ্রন্থে ৫টী প্রধান শাখা থাকা দৃষ্ট হয়। ঐ পাঁচটি শাখার নাম যথাক্রমে :—১। **শাকল**, ২। **বাষ্কল**, ৩। **আশ্বলায়ন**, ৪। **সাংখ্যায়ন** ও ৫। **মাণ্ডূকেয়**। অন্যান্য পুরাণে শাকল, বাষ্কল ও মাণ্ডূকেয় এই তিনটি শাখার নাম দৃষ্ট হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে ঐ সকল লুপ্ত শাখার পাঠের সহিত প্রধান শাখাগুলির পাঠের বিশেষ অনৈক্য না থাকায় অপ্রধান শাখাগুলি কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদের যে সাহিত্য বর্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শাকল শাখার পাঠ। ঋগ্‌বেদ দশটি "মণ্ডলে" বিভক্ত, তন্মধ্যে ৮ম মণ্ডলে ১১টি অতিরিক্ত সূক্ত আছে; ঐ গুলিকে "বালখিল্য সূক্ত" বলে। আশ্বলায়ন শাখা এই ১১টি সূক্ত ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। শাঙ্খায়নশাখাও তাহার কয়েকটি গ্রহণ করিয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর সায়নাচার্য্য ঐ ১১টি সূক্তের ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই। শাকলশাখা ঐ বালখিল্য সূক্তগুলি গ্রহণ করে নাই। শাকল ও বাষ্কল শাখার মধ্যে পাঠের কোনও বিশেষ পার্থক্য অবগত হওয়া যায় না। কেবল অনুবাকানুক্রমণীতে উল্লিখিত আছে যে শাকল শাখার সূক্ত সংখ্যা ১০১৭ ও বাষ্কল শাখার সূক্ত সংখ্যা ১০২৫। শাকল শাখার পাঠ সর্বোৎকৃষ্ট বোধে ও সর্বমান্য হওয়ায় উহাই সযত্নে রক্ষিত হইয়া বর্তমান যুগে পৌঁছিয়াছে।

ঋগ্‌বেদ সংহিতার অধ্যায় বিভাগ দুই প্রকারে আছে, "অষ্টক" ও "মণ্ডল" ক্রমে। অষ্টকে প্রায় তুল্য ৮টী খণ্ড আছে। প্রত্যেক অষ্টক কয়েকটী অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে ৩৩টী বর্গ আছে। মণ্ডল বিভাগে দশটী মণ্ডল, ৮৫টী অনুবাক্ ও ১০১৭ সূক্ত। মোট ১০৫৮০ ঋক্। মণ্ডল ক্রমে বিভাগই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ প্রাচীন ঐতরেয় আরণ্যকে মণ্ডলক্রমে বিভাগ দৃষ্ট হয়। ঋগ্‌বেদের শাকল শাখায় ১০১৭টী সূক্ত আছে। উহার সহিত ১১টি বালখিল্য সূক্ত যোগ করিলে সূক্ত সংখ্যা ১০২৮ হয়। ঋগ্‌বেদে মোট ঋক্ সংখ্যা ১০,১৮৫২, পদ সংখ্যা ১০৫৩,৮২৬ ও স্বর সংখ্যা ৪,৩২,০০০। ১ম মণ্ডলে ১৯১টি সূক্ত আছে—তাহা ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। ১ম মণ্ডলে দীর্ঘতমা ও তৎপুত্র অঙ্গিরা, কাণ্ব, অগস্ত্য, গোতম, গোতমবংশীয়, দিবোদাসপুত্র পরুচ্ছেপ, বিশ্বামিত্রপুত্র

মধুচ্ছন্দা, শক্তি-পুত্র পরাশর, আজীগর্ত্তপুত্র শুনঃশেপের ও অন্যান্য কয়েকটি ঋষির দৃষ্ট সূক্ত আছে। দ্বিতীয় হইতে নবম মণ্ডল পর্য্যন্ত প্রত্যেক মণ্ডলেই একই বংশীয় ঋষিগণ-দৃষ্ট সূক্ত আছে। ঐ কয়েকটি মণ্ডল দ্রষ্টা ঋষিগণক্রমে সংগৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৩টি সূক্ত আছে। ঐ মণ্ডলের ঋষি ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ ও তাহার বংশীয়গণ।

তৃতীয় মণ্ডলে ৬২টি সূক্ত; বিশ্বামিত্র ও তাহার বংশধরগণ উহাদের দ্রষ্টা।

চতুর্থ মণ্ডলে ৫৮টি সূক্ত আছে; ঐ মণ্ডলের ঋষি বামদেব ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ।

পঞ্চম মণ্ডলে ৮৭টি সূক্ত; অত্রি ও তদ্‌বংশীয় ঋষিগণ ঐ গুলির দ্রষ্টা।

ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫টি সূক্ত; ভরদ্বাজ ও তাহার বংশধরগণ উহার ঋষি।

সপ্তম মণ্ডলে মোট ১০৪টি সূক্ত আছে। বশিষ্ঠ ও তাহার বংশধরগণ ঐ মণ্ডলের ঋষি।

অষ্টম মণ্ডলে মোট ১০৩টি সূক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত উহাতে ১১টি বালখিল্য সূক্ত আছে। ঐ ১১টি সূক্ত ঋগ্‌বেদের শাকল সংহিতা ভুক্ত নহে। সায়নাচার্য্যও উহার ভাষ্যরচনা করেন নাই। ঐ ১১টি সূক্ত অর্বাচীন মনে করিবার কারণ আছে। কণ্ব ও তাহার বংশীয় ঋষিগণ অষ্টম মণ্ডলের ঋষি।

নবম মণ্ডলে ১১৪টি সূক্ত আছে। সকলগুলি সূক্তেরই দেবতা সোম। এই মণ্ডলের বিশিষ্টতা এই যে অন্যান্য মণ্ডলে বহু দেবতা আছেন কিন্তু এই মণ্ডলে সোমই একমাত্র দেবতা। সামবেদে সোমদেবতারই প্রাধান্য, তজ্জন্য নবম মণ্ডলের সহিত সামবেদের সৌসাদৃশ্য আছে।

দশম মণ্ডলে প্রথম মণ্ডলের ন্যায় বহু পৃথক্ পৃথক্ দ্রষ্টা ঋষি আছেন। এই মণ্ডলে ১৯১টি সূক্ত আছে। সকল সূক্তের ঋষিগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ সকল সূক্তের দেবতাকেই ঋষি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদের নারীঋষিগণ

ঋগ্‌বেদের ঋষিগণের মধ্যে বহু নারীঋষি ছিলেন তন্মধ্যে ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, অদিতি, ইন্দ্রাণী, সরমা, রোমশা, লোপমুদ্রা, সর্পরাজ্ঞী, বাচ্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, সূর্য্যা ও সাবিত্রীর নাম প্রসিদ্ধ।

দশম মণ্ডলের ভাষা ও দার্শনিক চিন্তা, দেবতাতত্ত্ব ও দেবতাগোষ্ঠীর সাধারণ নাম দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে দশম মণ্ডলের সূক্তগুলি অন্যান্য মণ্ডলের সূক্ত অপেক্ষা পরে রচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কয়েকটি সূক্তের প্রারম্ভে ১ম মণ্ডলের ১ম সূক্তের ১ম ঋক্ (অগ্নিমীলে পুরোহিতম্) ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্যাকরণের দিক্ হইতে দেখিলেও দেখা যায় যে প্রাচীন সূক্তগুলিতে পুংলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের বহুবচনে যে "অসস্" (দেবাসঃ) ব্যবহার তাহা কমিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রাচীন কালের শব্দের পরিবর্তে অর্বাচীন কালের শব্দের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দশম মণ্ডলের বহু সূক্তের ভাষা উপনিষদের শ্লোকগুলির ভাষার তুল্য। দশম মণ্ডলে প্রাচীন তুমর্থ প্রত্যয়গুলির বিরল প্রয়োগ দৃষ্টেও তাহাই সমর্থিত হয়।

ঋগ্‌বেদ সংহিতার দুইটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদই পদ্যে রচিত এবং ইহার স্বরগুলি উদাত্তাদি ভেদে উচ্চারিত হয়। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যেও পদ্যের আধিক্য আছে কিন্তু উদাত্তাদি স্বরভেদ নাই; ঐ উদাত্তাদি স্বরভেদে বেদমন্ত্র উচ্চারিত না হইলে তাহা যে কেবল নিষ্ফল হয় তাহাই নহে, তাহাতে যজমানের অকল্যাণ সাধিত হয়।

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥"

মহাভাষ্য (কাশী সং, ৯ পৃষ্ঠা।)

কথিত আছে বৃত্রাসুরের পিতা ইন্দ্রকে নাশ করিবার জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞের আহুতি প্রদান কালে "ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধস্ব" এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপুরুষ সমাসে অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয় কিন্তু বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের স্বর অব্যাহত থাকে। উচ্চারণের ত্রুটিতে কর্মধারয়ের (তৎপুরুষ ভেদ) ন্যায় স্বর উচ্চারিত হওয়ায় ইন্দ্রের শত্রুর (বৃত্রে) জয় না হইয়া ইন্দ্ররূপ শত্রুর জয় হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদের উচ্চারণে

সাধারণতঃ "উদাত্ত", "অনুদাত্ত" ও "স্বরিত" তিনটী স্বরবিভাগ আছে। "উচ্চৈরুদাত্তঃ" পাঃ ১।২।২৯, "নীচৈরনুদাত্তঃ" পাঃ ১।২।৩০, "সমাহারঃ স্বরিতঃ" পাঃ ১।২।৩১। যাঁহারা বৈদিক স্বর প্রক্রিয়ার চর্চা করেন নাই তাঁহাদিগের স্বতঃই মনে হইতে পারে শব্দের উচ্চ উচ্চারণ, মৃদু উচ্চারণ ও মধ্যম উচ্চারণ ঐ বিভাগের কারণ। কিন্তু ঐ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। প্রত্যেক শব্দই উচ্চ, মধ্যম ও মৃদুভাবে উচ্চারণ করা যাইতে পারে; উহা দ্বারা শব্দের নাদ বা ধ্বনি মাত্রই পরিবর্তিত হয়। প্রকৃত পক্ষে কোনও শব্দ উচ্চারণ করিতে গেলেই ঐ শব্দের কোনও স্বরের উপর বেগ (stress বা accent) দিতে হয়। ঐ স্বরে বেগ দিতে হইলে উহার উচ্চারণ কণ্ঠ যন্ত্রেব ঊর্দ্ধভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ শব্দের যে স্বরের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক বেগ স্থাপিত হয় তাহাকে "উদাত্ত" স্বর বলে; ঐ শব্দের যে স্বরেব উপর কোনও বেগই থাকে না তাহাকে "অনুদাত্ত" বলে। যে স্বরের উপর উদাত্ত অপেক্ষা ন্যূন অথচ অনুদাত্ত অপেক্ষা কিয়দধিক বেগ স্থাপিত হয় তাহাকে "স্বরিত" বলে। স্বরিত, উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যবর্তী। আমাদিগের বাগ্‌যন্ত্রের গঠন, ক্রিয়া, ও মানবশক্তির ব্যবহার এইরূপ যে একটী শব্দ উচ্চারণ করিতে গেলে সাধারণতঃ তাহার একটী স্বরের উপর বেগ দিলে প্রকৃতি বশতঃ ঐ বেগ তাহার অব্যবহিত পরবর্তী স্বরে মন্দীভূত হইয়া তৎপরবর্তী স্বরে উহা বেগশূন্য হইয়া দাঁড়ায়। তাহার ফলে উদাত্ত স্বরে বেগ দিবার পূর্বে যে অবস্থা ছিল তদ্রূপ হয়। উহা হইতে সহজেই বোধগম্য হয় যে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে একটি শব্দের উদাত্তের পূর্বস্বর "অনুদাত্ত", উদাত্তের অব্যবহিত পর স্বর "স্বরিত" এবং স্বরিতের পরবর্তী স্বর অনুদাত্ত হইয়া দাঁড়ায়। বেদেও ইহাই সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই নিয়মের বহু ব্যত্যয় আছে। ব্যাকরণ শাস্ত্রে স্বরপ্রক্রিয়া অতীব দুরূহ। ইংরাজী শব্দের স্বরপ্রক্রিয়া অভিধানেই দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহার নিয়মাবলি অদ্যাপি সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। সংস্কৃত স্বরপ্রক্রিয়ার অতিসূক্ষ্ম নিয়ম ব্যাকরণে ও প্রাতশাখ্যে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। স্বরপ্রক্রিয়ার একটী উদাহরণ পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—

অগ্নিমীলে পুরোহিতম্

এই ঋক্‌পাদে "গ্নি" স্বরটি উদাত্ত। ঋগ্‌বেদীয় প্রথা অনুসারে উহাতে কোনও চিহ্নই দেওয়া হয় না। "মী" স্বরটি স্বরিত উহার মস্তকে একটী দণ্ডায়মান রেখাচিহ্ন প্রদত্ত হয়। "লে" এই স্বরটি অনুদাত্ত উহার নিম্নে একটি সমান্তরাল রেখা চিহ্ন প্রদত্ত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদ

ঐতিহাসিকভাবে দেখিতে গেলে ঋগ্‌বেদের পরেই সামবেদের প্রাধান্য। বেদবিভাগের পূর্বে ঋক্, সাম ও যজুঃ মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান ছিল।

"একো বেদশ্চতুর্ধা তু যৈঃ কৃতো দ্বাপরাদিষু"

বিষ্ণু পুঃ ৩।৩।২০

ঐ মিশ্রিত সূক্তগুলি হইতে বেদব্যাস ঋক্, সামন্ ও যজুঃ এবং অথর্ব পৃথক করিয়াছিলেন।

ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্‌বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজ্ঞস্ত্বথর্ববেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥

বিষ্ণু পুঃ ৩।৪।১৩—১৪।

হোতার জন্য ঋগ্‌বেদ, অধ্বর্য্যুর জন্য যজুর্বেদ ও উদ্‌গাতৃর জন্য সামবেদ ও ব্রহ্মার জন্য অথর্ববেদ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। একই বেদ চতুর্হোত্র হইয়াছিল। বৈদিক যজ্ঞনিষ্পাদনে কোনও অংশ হোতাকে সম্পাদন করিতে হয়; গেয় সামগুলি উদ্‌গাতাকে গান করিতে হয়; এবং কোন্ কার্য কোন্ সময়ে কিরূপভাবে সম্পাদন করিতে হয় তাহা অধ্বর্য্যু নির্দেশ করিয়া দেন। প্রাচীন রীতি অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কোনও কোনও ঋক্ কেবল উচ্চারিত না হইয়া গীত হইত। ঐ গেয় ঋক্‌সমষ্টিই সামবেদ সংহিতা। সোমযজ্ঞেই সামগানগুলি গেয়। ঋগ্‌বেদের নবম মণ্ডলের দেবতার নাম সোম। তজ্জন্য সামবেদের অধিকাংশই ঋগ্‌বেদের নবমমণ্ডল হইতে গৃহীত। কতকগুলি অষ্টম ও অন্যান্য মণ্ডল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কেবল ৭৫টি মাত্র সূক্ত ঋগ্‌বেদ বহির্ভূত; সামগানগুলি উদ্‌গাতৃ কর্তৃক গীত হইয়া থাকে, তজ্জন্যই উহাতে ঋগ্‌বেদের পাঠ কিছু কিছু পরিবর্তিত, পরিবর্জ্জিত এবং পুনরুক্ত হইয়াছে। সুর ও লয়যোগে গান করিবার সুবিধার্থে কোনও কোনও স্থানে

মাত্রা রক্ষার জন্য একই পদের পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য দুই-একটি নূতন শব্দ যোজিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঋকৃসমূহের যেগুলি সোমযজ্ঞে গেয় তাহাই সামবেদে উদ্‌গাতৃর উপযোগী করিয়া একত্রে সংগৃহীত হইয়াছে। গানের উপযোগী করিবার জন্য স্বরের পরিবর্তন ও কথার পুনরাবৃত্তি ও নূতন শব্দের সংযোগ হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের ঋকৃগুলি প্রায় অবিকলভাবে গৃহীত হওয়ায় সামবেদকে প্রাচীন ঋগ্‌বেদের আংশিক দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। গেয় বলিয়া সামগুলি গানের আকার ধারণ করিয়াছে এবং মাত্রা রক্ষার্থে তাহাতে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করা হইয়াছে মাত্র। ধরিতে গেলে সামগানগুলি স্বরলিপিবিশিষ্ট গেয় ঋক্‌সমূহ।

অধ্যাপক ভেদে, উচ্চারণ ভেদে ও দেশকাল ভেদেই বেদ সংহিতায় যে পাঠের পার্থক্য জন্মে তাহাই শাখাভেদের কারণ। সামবেদ গেয় জন্য উহার ভেদ বহুধা হওয়া সম্ভব। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে লিখিত আছে "সহস্রবর্ত্মা সামন্"* কিন্তু "সহস্র" শব্দের অর্থ "বহু" কিনা তাহা বিবেচ্য। বিষ্ণু-পুরাণেও সামবেদের সহস্র শাখার কথা আছে :—

"সাহস্রং সংহিতাভেদং সুকর্মা তৎসুতস্ততঃ" ৩।৬।৩। সুকর্মার শিষ্যেরা কতকগুলি শাখা প্রচলন করেন। ঐ শাখাগুলির নাম "উদীচ্য সামগ" ও "প্রাচ্য সামগ"। এতদ্ব্যতীত তাহার অপর শিষ্যের শিষ্যেরা লোকাক্ষী, কুথুমি, কুসীদি, ও লাঙ্গলি ইহারাও পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রণয়ন করেন। "কৃতি" আরও সংহিতা প্রচলন করেন।

"তৈশ্চাপি সামবেদোসৌ শাখাভির্বহুলীকৃতঃ।" ঐ সকল বহুশাখা কালক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে। সামগাচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন সামবেদের মাত্র ১৩টি শাখার নাম অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৩টি শাখা প্রচলিত আছে। **কৌথুমী** শাখা বঙ্গদেশে, কান্যকুব্জে, কাশী ও গুর্জ্জর প্রদেশে প্রচলিত আছে। **রাণায়নী** শাখা দ্রাবিড়ে প্রচলিত। অপরটি **জৈমিনীয়**। পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য কৌথুমী শাখারই ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

* মহাভাষ্য কাশী সংস্করণ, ৮ পৃষ্ঠা।

সামবেদের কৌথুমী শাখার সংহিতাতে মোট ১৫৪৯টি ঋক্ আছে, তন্মধ্যে ৭৫টি মাত্র ঋক্ ঋগ্‌বেদের বহির্ভূত আর সবগুলি ঋক্‌ই ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কৌথুমীশাখার সংহিতা দুইভাগে বিভক্ত, "আর্চিক" ও "গান"। "আর্চিক" কথার অর্থ ঋক্‌সংগ্রহ। ঋঙ্‌মূলক গীতগুলি "গান" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আর্চিক অংশে ঋক্‌গুলি প্রদত্ত হইয়াছে এবং "গান" অংশে উহা গীতরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। আর্চিকগুলি তিন খণ্ডে বিভক্ত, "ছন্দঃ" আর্চিক, "আরণ্যক" আর্চিক ও "উত্তর" আর্চিক। "গান"গুলিও তদনুসারে তিন খণ্ডে বিভক্ত,—"গেয়"গান, "অরণ্য"গান ও "উহ্য"গান। "ছন্দঃ" আর্চিকে যে ঋক্‌গুলি আছে তাহা "গেয়"গানে ক্রমানুসারে নিবদ্ধ আছে। "আরণ্যক" আর্চিকে যে ঋক্‌গুলি আছে তন্মূলক গীতগুলি "অরণ্য" গানে আছে কিন্তু ক্রম অনুসারে সন্নিবেশিত নহে। কিন্তু অরণ্যগানে কতকগুলি অতিরিক্ত গীত আছে যাহার কোনও মূল ঋক্ "আরণ্যক" আর্চিকে নাই। "উত্তরা" আর্চিকে যে ঋক্‌গুলি আছে, তন্মূলক গানগুলি "উহ" বা "উহ্য" গানে আছে কিন্তু ক্রম অনুসারে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

আর্চিকগুলি ৬টি প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রপাঠকে দশটি ("দশৎ") করিয়া সূক্ত। কেবল ষষ্ঠ প্রপাঠকে ৯টি, সর্বশুদ্ধ ৫৯টি। প্রথম ১২টি অগ্নি দেবতার, মধ্যের ৩৬টি ইন্দ্রদেবতার ও শেষ ১১টি সোমদেবতার স্তুতিগান।

শতপথব্রাহ্মণ হইতে জানা যায় যে সামবেদের "আর্চিক" ভাগ ঐ ব্রাহ্মণের শেষভাগ রচিত হওয়ার পূর্বেই আর্চিক আকারে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বাজসনেয়ী সংহিতার পূর্বেই সামবেদ-সংহিতা গ্রথিত হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

সামবেদের কৌথুমী শাখার "নৈগেয়" নামে একটি উপশাখা ছিল। তাহার প্রথম আর্চিকে সপ্তম প্রপাঠক নামে একটি অতিরিক্ত প্রপাঠক ছিল।

যজুর্বেদ

পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞানুষ্ঠানে যে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রগুলির আবশ্যক হয়, এবং যে বিধি ও নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে হয় তাহাদিগের সমষ্টিই

যজুর্বেদ-সংহিতা নামে আখ্যাত। যজুর্বেদে যজ্ঞসম্পাদনের বিধানগুলি অর্থাৎ কোন্ মন্ত্র কোন্ সময়ে অধ্বর্য্যুকে উচ্চারণ করিতে হইবে এবং তৎকালে যজ্ঞের অঙ্গীয় কোন্ কার্য কিরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে তাহাই সংগৃহীত আছে। যজুর্বেদের ঐ সংগ্রহপ্রণালী যজ্ঞক্রিয়ামূলক। যজুর্বেদের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের প্রণালী ও তাহার বিধানগুলি ক্রম-অনুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যজুর্বেদ গদ্যময়, ঋগ্ বেদ পদ্যময়।

যজুর্বেদে যে সকল নদীর ও যে সকল রাষ্ট্র ও জনপদের নাম দৃষ্ট হয় তাহাতে তৎকালে আর্যেরা "সপ্তসিন্ধু" বা "পঞ্চনদ" প্রদেশ হইতে পূর্ব-দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তৎকালে কুরুক্ষেত্রই যজুর্বেদের পবিত্র ভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং উহাতে "কুরু" ও "পঞ্চাল"গণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মাবর্তের প্রান্তদেশ হইতে পশ্চিমে শতদ্রু ও পূর্বে যমুনা এই উভয় নদীর মধ্যস্থ প্রদেশই "কুরুক্ষেত্র" নামে অভিহিত হইত। কুরুক্ষেত্রের পূর্বদিকেই পঞ্চাল দেশ ছিল। ঐ পঞ্চাল দেশ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দেশে অবস্থিত ছিল। মনু ঐ প্রদেশকে "ব্রহ্মর্ষি" দেশ বলিয়াছেন।

যজুর্বেদের বহু শাখা ছিল। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে যজুর্বেদের ২৭টি শাখা দৃষ্ট হয় :—

যজুর্বেদতরোঃ শাখাঃ সপ্তবিংশন্ মহামতিঃ।
বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাসশিষ্যশ্চকার বৈ॥

যজুর্বেদের প্রধানতঃ দুই শাখা—কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদ। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অপর নাম তৈত্তিরীয়সংহিতা ও শুক্লযজুর্বেদের নামান্তর বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণযজুর্বেদ শুক্লযজুর্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাংশ মিশ্রিত অবস্থায় আছে। শুক্লযজুর্বেদে মন্ত্রভাগ হইতে ব্রাহ্মণাংশ পৃথকীকৃত হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের ৬টি শাখা প্রসিদ্ধ ছিল। তাহাদের নাম চরকাধ্বর্য্যু বা চরক, কঠ, কপিষ্ঠল, মৈত্রায়ণীয় বা কলাপ, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশী। কৃষ্ণযজুর্বেদে সপ্তকাণ্ড, ৪৪ প্রশ্ন, ৬৫১ অনুবাক্ ২১১০৯ মন্ত্র এবং ১৯১২৯০ পদ। শুক্লযজুর্বেদ বৈশম্পায়ন শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক প্রচলিত হয়।* শুক্লযজুর্বেদের পঞ্চদশ

* বেদবিভাগ দ্রষ্টব্য।

শাখার নাম বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিনী শাখাই প্রধান। উবট, মহীধর প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা ঐ মাধ্যন্দিনী শাখারই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদেব মৈত্রায়ণীয় শাখার ৪টি কাণ্ড। ঐ কাণ্ডগুলি ৫৪ প্রপাঠকে বিভক্ত। তৈত্তিরীয় শাখা ৭ অধ্যায় এবং ৪৪টি প্রপাঠকে বিভক্ত। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের সকল শাখাগুলিই একই নিয়মে গ্রথিত, তাহাতে মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণ-ভাগ অবিচ্ছিন্ন ও ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। শুক্লযজুর্বেদে ৪০টি অধ্যায় আছে। উহার প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ই প্রাচীনতম অংশ। পরবর্তী অধ্যায়গুলি পরে সংযোজিত হইয়াছে এরূপ অনুমান হয়। প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি ও তাহার প্রয়োগবিধিগুলি তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রত্যেক কথাই বাজসনেয় সংহিতার ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরবর্তী ৭ অধ্যায়ের কতকটি মন্ত্র মাত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শুক্লযজুর্বেদের কাত্যায়নের অনুক্রমণিকায় ২৬ হইতে ৩৫ অধ্যায় "খিল" বলিয়া উল্লেখ আছে। উনবিংশ অধ্যায় হইতে পরিশিষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। ষড়বিংশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায় খিল নামে প্রসিদ্ধ এবং অর্বাচীন বলিয়া পরিগণিত।

শুক্ল যজুর্বেদে ৪০ অধ্যায় অষ্টোত্তর শত যজুঃ ও ৯৭৫ ঋক্। শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনীয়শাখার ১ম অধ্যায়ে "দর্শপূর্ণমাস" অর্থাৎ দর্শ যাগের বিধান আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে পিণ্ডাদি "পিতৃযজ্ঞে"র কথা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে "অগ্নিহোত্র" যাগেব ও "চাতুর্মাস্য" যাগের নিয়ম আছে এবং ঐ অগ্নিহোত্র যাগেব বিবরণেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র(ওঁম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি) সন্নিবিষ্ট আছে। চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ ও নবম অধ্যায়ে "রাজসূয়" যজ্ঞ ও দশম অধ্যায়ে সৌত্রামণীযজ্ঞের প্রক্রিয়া এবং ১১শ হইতে ১৮শ অধ্যায়ে "অগ্নিচয়নের" কথা আছে। ১৯ হইতে ২৫ এই সাত অধ্যায়ে ঐ সকল যজ্ঞের সাধারণ বিধানগুলি বিবৃত হইয়াছে। পরবর্তী ১৪ অধ্যায় (২৬—৩৯) পূর্বোক্ত বিষয়গুলির ব্যাখ্যায় নিয়োজিত। ৪০ অধ্যায়টি উপনিষদ্। ইহাতে যজ্ঞীয় কোনও মন্ত্রাদি নাই। উহাকে ঈশোপনিষৎ বলে। এই অধ্যায়ে একদিকে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অন্ধ কিঙ্করতা ও অপর দিকে উপনিষদের যজ্ঞকাণ্ডের প্রতি অনাস্থা এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন পৌরাণিক ঐতিহ্য অনুসারেই শুক্লযজুর্বেদের সকল সংহিতাগুলিই কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখাগুলির পববর্তী কালে যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্বেদে ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রাংশের সহিত ওতপ্রোতভাবে থাকায় সংহিতাভাগ বিচ্ছিন্ন ও ব্যবহিত অবস্থায় আছে; শুক্লযজুর্বেদে ব্রাহ্মণাংশ মন্ত্রাংশ হইতে পৃথক্কৃত হওয়ায় যজুঃভাগ বিষয়ের ক্রম অনুসাবে সুপ্রণালীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শুক্লযজুর্বেদের উবটাচার্যকৃত "মন্ত্রভাষ্য" এবং মহীধরাচার্যকৃত "বেদদীপ" নামক টীকা আছে।

সামবেদ ও যজুর্বেদ এই উভয়েই যজ্ঞের প্রয়োগবিধির নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়াছে। সামবেদে কেবল সোমযজ্ঞেরই প্রণালী আছে। যজুর্বেদে সকল যজ্ঞেরই প্রণালী আছে। সামবেদেব অধিকাংশই ঋগ্‌বেদ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার কেবল ¼ পরিমাণ ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত, আর অবশিষ্ট অংশ "যজুঃ" বা গদ্যময় প্রয়োগবিধি-দ্বারা পরিপূর্ণ। এই যজুঃ ভাগ সম্পূর্ণই নূতন, তাহা ঋগ্‌বেদে নাই। যজুর্বেদের এই গদ্যময় অংশ প্রাচীন বৈদিক সূক্তের ভাষা অপেক্ষা নবীন কিন্তু পরবর্তী যুগের সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা বহু প্রাচীন।

যজুর্বেদের যুগ

ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে যজুর্বেদের প্রাধান্য ঋগ্‌বেদেব পরবর্তী কালে ঘটিয়াছিল এবং যে প্রদেশে যজুর্বেদেব প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ব্রহ্মাবর্তের পূর্বদিকে অর্থাৎ ব্রহ্মর্ষি দেশে অবস্থিত ছিল। ঐ প্রদেশ পশ্চিমে ব্রহ্মাবর্ত হইতে পূর্বে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুরু, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেন ও উষীনর প্রভৃতি জনপদের নাম যজুর্বেদে পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়। কুরু ও পাঞ্চালদিগের বিশেষ উল্লেখ যজুর্বেদে আছে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি রাজগণ মধ্যে এই যজুর্বেদই প্রচলিত ছিল।

যজুর্বেদের প্রাধান্য যুগে যজ্ঞপ্রণালী এতই জটিলতা ধারণ করিয়াছিল যে বিশেষ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী অধ্বর্য্যুগণ ব্যতীত কেহই ঐ সুদীর্ঘ জটিল ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিতেন না। বহু পারদর্শী যাজ্ঞিক একত্রিত হইয়া বিপুল শ্রমসাধ্য দীর্ঘকালব্যাপী সত্রাদি নিষ্পন্ন করিতেন এবং ঐ যজ্ঞকার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য ও প্রকৃত মর্ম কি তাহাও তাঁহারা চিন্তন, মনন ও

নির্দ্ধারণ করিতেন। অগণ্য পশুবধ, অশ্বমেধ, নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ সকল যজ্ঞক্রিয়ার অতি ক্ষুদ্র অঙ্গের হানি বা ব্যতিক্রম হইলে সমস্ত যজ্ঞ পণ্ড ও নিষ্ফল হইবে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। নির্দোষ ও পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞদ্বারা ও বৈদিক মন্ত্রপ্রভাবে দেবগণকে বশীভূত করা যায় ও তদ্দারা অভীষ্ট সিদ্ধি হয় এবং ঐহিকজীবনে নানাপ্রকার সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি আনয়ন করা যায় এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাহার ফলে ঋগ্‌বেদের যুগের দেবগণের প্রতি সরল ও অটল বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভরতা ও দেবতাগণের প্রীত্যর্থ ত্যাগশীলতা প্রভৃতির অবসান উপস্থিত হইয়াছিল; তৎপরিবর্তে মন্ত্রশক্তি, যজ্ঞক্রিয়ার অলৌকিক ও অতিমানবীয় ক্ষমতা প্রভৃতি মানবহৃদয় অধিকার করিতেছিল। মন্ত্র ও যজুঃগুলি মহাশক্তিসম্পন্ন শস্ত্র ও তদ্দারা দেবতাগণকে বশীভূত করিয়া তাহাদের সাহায্যে সর্বপ্রকার সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি আনয়ন করা যাইতে পারে এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়ীভূত হইতেছিল। এবিষয়ে যজুর্বেদের ও অথর্ববেদের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ঋগ্‌বেদের যুগের সরল প্রার্থনামূলক আহ্বান সঙ্গীতগুলি এই যুগে দেবগণের নাগপাশ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। - উগ্র তপশ্চরণ, কঠোর উপবাস, শারীরিক ক্লেশাদি অলৌকিক শক্তিলাভের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। যুদ্ধজয়ের মন্ত্র, বারিবর্ষণের মন্ত্র, সৌভাগ্য লাভের মন্ত্র প্রভৃতি গুপ্তমন্ত্র ও নানাপ্রকার ইষ্টযজ্ঞের আবিষ্কার হইতেছিল। ঋগ্‌বেদের দেবতাবৃন্দের মর্য্যাদারও পরিবর্তন হইতেছিল। "প্রজাপতির" আধিপত্য ও গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। "রুদ্র", "শিব", "শঙ্কর" ও "মহাদেব" নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। "বিষ্ণু"ক্রমশই আধিপত্য লাভ করিতেছেন। "যজ্ঞ" তাঁহার দেহ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। রক্ষঃ অসুর প্রভৃতি দেবদ্বেষিগণ, অপ্সরা প্রভৃতি মনোমোহিনীগণ ক্রমশঃ আধিক্য লাভ করিতেছে। জাতিভেদ ক্রমশঃ পরিপক্বতা লাভ করিতেছে ও বর্ণসঙ্করতা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। স্বাভাবিকতার পরিবর্তে অলৌকিকতা ও অন্ধ কৈঙ্কর্য মানব হৃদয় অধিকার করিতেছে। যজুর্বেদের চরম গ্লানিতে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেব এই অবসাদ দূরীভূত করিয়া ধর্মে ও দর্শনে নবীনতা ও সজীবতা আনয়ন করিয়া অবতাররূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন; ভারতবর্ষ মহাভারতবর্ষে পরিণত হইয়াছিল।

অথর্ববেদ

ঋক্, সাম ও যজুর্বেদই প্রথমে "ত্রয়ী" নামে অভিহিত হইয়াছিল। তৎকালে অথর্ববেদ "অথর্বন্" বা "অথর্বাঙ্গিরস" নামে অভিহিত হইত; পরে অথর্বন্গুলি বেদব্যূহে প্রবেশ করিয়া বেদাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেদব্যূহে প্রবেশ করিতে অথর্বন্গুলির বহু যুগ অতীত হইয়াছিল। বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদিতে ঋক্, সাম ও যজুঃরই আবশ্যক হইত, তাহাতে অথর্বন্গুলির কোনও ব্যবহার ছিল না। পক্ষান্তরে অথর্ববেদের কোনও ক্রিয়া বা যজ্ঞে কেবলমাত্র অথর্ববেদেরই মন্ত্রপ্রয়োগ হইত, তাহাতে ঋক্, সাম্ ও যজুর্বেদের কোনও মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত না। সাধারণ যাগযজ্ঞের মন্ত্রাদি মহর্ষি বেদব্যাস ঋক্ সাম ও যজুর্বেদ মধ্যে সঙ্কলন করিয়াছিলেন। শত্রুমারণাদি, হিংস্র-জন্তু হইতে ত্রাণ, অভিসম্পাত বা দুর্দৈব হইতে রক্ষা প্রভৃতি ঐহিকফলপ্রদ যজ্ঞাদিতে ব্যবহার্য্য মন্ত্র "অথর্বন্" নামে প্রসিদ্ধ হয়। অঙ্গিরোবংশীয় অথর্বা ঋষিই ঐ সকল মন্ত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন জন্য তাঁহার নামানুসারে "অথর্বন্" নামে প্রসিদ্ধ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋক্, সাম ও যজুঃরই মাত্র উল্লেখ আছে। তৎসঙ্গে ইতিহাস ও পুরাণের উল্লেখ আছে, কিন্তু অথর্ববেদের কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী বলেন যে ঐ সকল গ্রন্থে অথর্বেরও অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। তাঁহার মতে "ঋক্", "সাম" ও "যজুঃ" শব্দ দ্বারা তত্তৎ লক্ষণাক্রান্ত ঋক্গুলিই সূচিত হইয়াছে, উহাদ্বারা কেবল ঐ ঐ সংহিতার উল্লেখ করা হয় নাই। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে "আঙ্গিরস" নামে অথর্ববেদেরই উল্লেখ হইয়াছে। অন্যান্য স্থলে ঋক্, সাম যজুঃর পরেই "অথর্ব" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে *। মহাভারত ও পুরাণগুলিতে "অথর্ব" বেদসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

* "মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ"।

বৃঃ আঃ ২।৪।১০

"নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ আথর্বণশ্চতুর্থঃ"।

ছাঃ ৭।১।৪

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা"।

মু ১।৫

পাতঞ্জল মহাভাষ্যে অথর্ববেদের উল্লেখ আছে। গৃহ্যসূত্রে অথর্ববেদের অপর নাম "ব্রহ্মবেদ" বলিয়া উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকের সহিত উহার ঐক্য হয়।

অথর্ববেদের অধিকাংশই পদ্য এবং সামান্য অংশ গদ্য। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল হইতেই অনেকগুলি সূক্ত সংগৃহীত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডলের সহিত অথর্ববেদের সৌসাদৃশ্য আছে।

শাখা

অথর্ববেদের ২টি শাখা বিদ্যমান আছে। ১। **পৈপ্পলাদ শাখা** ও ২। **শৌনকশাখা**। অথর্ববেদের পরিশিষ্টে পৈপ্পলাদশাখার পৈপ্পলাদমন্ত্রের উল্লেখ আছে। সম্প্রতি এই শাখা উড়িষ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। শৌনক-শাখার উপর পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহাব ভাষ্যে অথর্ববেদের সূক্তগুলির বহু ভিন্ন পাঠের উল্লেখ আছে।

শৌনকশাখা ২০টি কাণ্ড বা অধ্যায়ে বিভক্ত। তাহাতে ৭৩০টি সূক্ত ও ৬,০০০ ঋক্ আছে। তন্মধ্যে প্রায় ১২০০ ঋক্ ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল হইতেই অধিক ঋক্ সঙ্কলিত হইয়াছে। অথর্ববেদের প্রথম ১৩টি কাণ্ডই প্রাচীন সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়।

১ম হইতে ৭ম কাণ্ড পর্যন্ত কাণ্ডগুলিতে ঋকের সংখ্যা অনুসারে সূক্তগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১ম কাণ্ডের সূক্তগুলিতে সাধারণতঃ ৪টি করিয়া ঋক্ আছে। ২য় কাণ্ডের সূক্তে ৫টি করিয়া ঋক্, ৩য় কাণ্ডের সূক্তে ছয়টি করিয়া ঋক্, ৪র্থ কাণ্ডের সূক্তে ৭টি করিয়া ঋক্, ৫ম কাণ্ডের সূক্তে ৮টি হইতে ১৮টি ঋক্, ৬ষ্ঠ কাণ্ডের সূক্তে ৩টি করিয়া ঋক্ এবং ৭ম কাণ্ডের অধিকাংশ সূক্তে একটি করিয়া ঋক্ আছে।

৮ম হইতে ১৩শ কাণ্ডের সূক্তগুলি বড় বড়। ঐ সকল কাণ্ডে কোনও রীতি বা প্রণালীক্রমে সূক্তগুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ১৪শ হইতে ১৮শ কাণ্ড বিষয় অনুসারে সঙ্কলিত হইয়াছে। ১৪শ কাণ্ডে উদ্বাহক্রিয়ার মন্ত্রগুলি আছে। তাহার অধিকাংশই ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল হইতে গৃহীত। ১৫শ ও ১৬শ কাণ্ডদ্বয় ব্রাহ্মণভাগের ন্যায় গদ্যে রচিত। ১৭শ ও ১৮শ কাণ্ড দুইটি অতি ক্ষুদ্র। অষ্টাদশ কাণ্ডের ঋগ্‌গুলিও ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল হইতে গৃহীত। উহাতে মৃতের সংকার ও প্রেতকৃত্যাদি আছে।

১৯শ কাণ্ডটি "খিল" বা অন্যান্য কাণ্ডের পরিশিষ্ট স্বরূপ। ২০শ কাণ্ডে ঋগ্‌বেদ হইতে কতকগুলি সূক্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের দেবতা ইন্দ্র। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই ২০শ কাণ্ডটি পরে সংযোজিত হইয়াছে। সোমযজ্ঞে অথর্ববেদের কোনও প্রয়োগ ছিল না। ২০শ কাণ্ডে সোমযজ্ঞের বিষয়গুলি আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে ২০শ অধ্যায়ে সোমযজ্ঞের বিধানগুলি সংযোজিত হইবার পর অথর্ববেদ বেদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। ২০শ কাণ্ডের কুন্তপ সূক্তগুলি (১২৭-১৩৬) নুতন, তাহা ঋগ্‌বেদের দানস্তুতিগুলির ন্যায় দাতাগণের যশঃকীর্ত্তনে নিযুক্ত। অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যে ১৯শ ও ২০শ কাণ্ডের কোনও কথাই নাই, তাহাতেও অনুমান হয় ঐ প্রাতিশাখ্য রচিত হইবার সময় ঐ ২টি কাণ্ড বিদ্যমান ছিল না, পরে সংযোজিত হইয়াছে।

অথর্ববেদ অতি প্রাচীনকালে বেদ সংজ্ঞা ভুক্ত না হইলেও অথর্ববেদ অবজ্ঞাত হইত এবং অন্য বেদাবলম্বীরা উহার ক্রিয়া কলাপে বিরত হইতেন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোনও কারণ নাই। বেদবিহিত ক্রিয়া কাণ্ডে অথর্ববেদের কোনও প্রয়োগ না থাকিলেও অন্যান্য বেদাবলম্বীরা আবশ্যক অনুসারে উহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা মন্ত্রপ্রভাবে ঐ সকল উদ্দিষ্ট কার্য্য করিতেন তাঁহারা "যাতুবিদ্" নামে অভিহিত হইতেন এবং ঐ ক্রিয়াকে "যাতু" বলিত। যাতুবিদের নানা প্রকার বিপদাশঙ্কা ছিল তজ্জন্য ঐ ক্রিয়াকে অনেকেই ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে "যাতুবিৎ" ও "বাহ্বৃচ্"দিগকে প্রায় তুল্য স্থানই প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রৌত সূত্রগুলিতে অথর্ববেদের কোনও সংশ্রবই নাই, কারণ অথর্ববেদের ক্রিয়াগুলি "শ্রৌত" বা বেদ বিহিত যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে ঐগুলির প্রয়োগ ছিল এজন্য গৃহ্যসূত্রে উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গৃহ্য সূত্রে অথর্ববেদের যাতুমন্ত্রগুলি কোনও স্থলে অবিকল ভাবে ও কোনও স্থলে সামান্য পরিবর্তিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। যাতুবিদ্যা যেরূপ অথর্ববেদের অঙ্গ ছিল, ফলিতজ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্রও অথর্ববেদের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্র মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিদ্যা হইলেও অথর্ববেদের অঙ্গ হওয়ায় যাতুবিদ্, ফলিতজ্যোতিষী ও চিকিৎসক হিন্দুসমাজে নিন্দিত ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বেদবিভাগ, শাখাবিভাগ ও শাখাবিস্তার

বৈদিকযজ্ঞে প্রধানতঃ তিনজন বেদবিদের আবশ্যক হয়। হোতা আবশ্যকীয় ঋক্‌গুলি উচ্চারণ করেন, অধ্বর্য্যু যজুঃগুলির সাহায্যে বিধি-অনুসারে যজ্ঞপ্রণালী বলিয়া দেন এবং উদ্‌গাতা সামগানগুলি তানলয়যোগে গান করিয়া থাকেন। যজ্ঞের এই তিন বেদবিদের কর্তব্যকার্যের নাম হোত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদ্‌গাত্র। পুরাণগুলিতে বেদবিভাগের যে বর্ণনা আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের আবির্ভাবের পূর্বে কালক্রমে ঋক্‌, যজুঃ ও সামগুলি মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। অথর্বগুলিও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতির পুনঃসংস্কার আবশ্যক হইয়াছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসই এই বেদবিভাগাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ঋগ্‌বেদের জন্য পৈলকে, যজুর্বেদের জন্য বৈশম্পায়নকে, সামবেদের জন্য জৈমিনিকে শ্রাবক শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অথর্ববেদের জন্য সুমন্তকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন* এবং ইতিহাস পুরাণপাঠের জন্য রোমহর্ষণকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৈল ঋক্‌গুলি সংগ্রহ করিয়া তাহা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার দুই শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি ও বাষ্কলিকে অধ্যয়ন করাইলেন। মহামুনি বাষ্কলি তাঁহার পঠিত বেদ তাঁহার চারি শিষ্য বৌধ, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরকে অধ্যয়ন করাইলেন। ক্রমে তাহা হইতে শাখা ও প্রশাখা উদ্ভূত হইল। বাষ্কলি হইতে বাষ্কল, কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব

* "ঋগ্‌বেদ শ্রাবকং পৈলং সংজগ্রাহ মহামুনিঃ।
বৈশম্পায়ননামানং যজুর্বেদস্য চা গৃহী॥
জৈমিনিং সামবেদস্য তথৈবার্থবেদবিৎ।
সুমন্তুস্তস্য শিষ্যোঽভূদ্‌ বেদব্যাসস্য ধীমতঃ॥

চরণব্যূহ।

শাখা উদ্ভূত হইয়াছিল। ইন্দ্রপ্রমতির পুত্র মাণ্ডুকেয় মাণ্ডুকেয় শাখার প্রবর্তক। ইন্দ্রপ্রমতির অপর শিষ্য শাকপূণির শিষ্যত্রয় ক্রোঞ্চ, বৈতালিক ও বলাক তিন খানি শাখা প্রচলন করেন। এই শাকপূণিই নিরুক্তশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে শাকপূণির মত পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের ২৭খানি শাখা প্রবর্তন করেন। ব্রহ্মরাতপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যা পাতকের কি প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয় তাহা লইয়া গুরুশিষ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যকে পরিত্যাগ করেন। বৈশম্পায়ন শিষ্যেরা যজুর্বেদের যে শাখা অবলম্বন করিয়া রহিলেন তাহার নাম "চরক" বা "চরকাধ্বর্য্য" শাখা। যাজ্ঞবল্ক্য সবিতৃদেবের উপাসনা করিয়া যে এক নূতন শাখা প্রবর্তন করিলেন তাহার নাম হইল **শুক্লযজুর্বেদ** বা "বাজসনেয়ী সংহিতা"। ঐ বাজসনেয় সংহিতা হইতে কাণ্ব প্রভৃতি শাখা উদ্ভূত হইয়াছে। বৈশম্পায়নের নিকট যাজ্ঞবল্ক্য যে শাখা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (উদ্গীরণ করিয়াছিলেন); ঐ শাখা **তৈত্তিরীয়** শাখা নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ব্যাসশিষ্য জৈমিনি সামবেদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সুমন্তু ও সুমন্তুর পুত্র সুকর্মা। সুমন্তু ও সুকর্মা সামবেদের বহুধা বিভাগ করিয়াছিলেন। সুমন্তুর দুই শিষ্য হিরণ্যাভ ও পৌষ্পঞ্জি। হিরণ্যাভের শিষ্যেরা প্রাচ্যসামগ ও উদীচ্যসামগ শাখাগুলি প্রচলন করেন। পৌষ্পঞ্জির শিষ্যেরা লোকাক্ষী, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি। তাঁহারাও সামবেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রচার করিয়াছিলেন। কুথুমি-প্রবর্তিত **কৌথুমী-শাখা** অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

ব্যাসশিষ্য সুমন্তু অথর্ববেদ সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করেন। সুমন্তুশিষ্য কবন্ধ অথর্ববেদকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহার দুই শিষ্য দেবদর্শ ও পথ্য ঐ দুই শাখা অধ্যয়ন করেন। দেবদর্শের চারি শিষ্য মৌদগ, ব্রহ্মবলি, শৌক্তায়নি ও পিপ্পলাদ চারি খানি শাখা প্রবর্তন করেন। **পৈপ্পলাদ শাখা** বিদ্যমান আছে। পথ্যের তিন শিষ্য জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক। শৌনক

প্রবর্তিত শাখা প্রচলিত আছে। *মুক্তিকোপনিষদে শাখা সংখ্যা-অনুরূপ আছে।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে অধ্যাপক ভেদে বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল। কোন্ শাখা কোন্ প্রদেশে প্রচলিত ছিল তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে চরণব্যূহ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে ঃ—

"পৃথিব্যা মধ্যরেখা চ নর্মদা পরিকীর্তিতা।
দক্ষিণোত্তরয়োর্ভাগে শাখাভেদশ্চ উচ্যতে ॥ ১
নর্মদাদক্ষিণে ভাগে আপস্তম্ব্যাশ্বলায়নী।
রাণায়নী পিপ্পলাচ যজ্ঞকন্যা বিভাগিনঃ ॥ ২
মাধ্যন্দিনী, শাঙ্খায়নী কৌথুমী শৌনকী তথা।
নর্মদোত্তরভাগেচ যজ্ঞকন্যা বিভাগিনঃ ॥ ৩
তুঙ্গা কৃষ্ণা তথা গোদা সহ্যাদ্রিশিখরাবধি।
আন্ধ্রদেশপর্য্যন্তং বহ্বৃচশ্চাশ্বলায়নী ॥ ৪
উত্তরে গুর্জর দেশে বহ্বৃচঃ পরিকীর্তিতাঃ।
কৌষীতকিব্রাহ্মণঞ্চ শাখা শাঙ্খায়নী স্থিতা ॥ ৫
আন্ধ্রাদি দক্ষিণাগ্নেয়ী গোদা সাগরাবধি।
যজুর্বেদস্থ তৈত্তির্য্য আপস্তম্বী প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬
সহ্যাদ্রিপর্বতারম্ভাদ্ দিশাং নৈঋত্যসাগরাৎ।
হিরণ্যকেশি শাখা পরশুরামস্য সন্নিধৌ ॥ ৭
ময়ূরপর্বতাচ্চৈব যাবদ্ গুর্জর দেশতঃ।
ব্যাপ্তা বায়ব্যদেশাত্তু মৈত্রায়ণী প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৮
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাশ্চ কানীমো গুর্জরস্তথা।
বাজসনেয় শাখা চ মাধ্যন্দিনী প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৯
ঋষিণা যাজ্ঞবল্ক্যেন সর্বদেশেষু বিস্তৃতা।
বাজসনেয়বেদস্য প্রথমা কাণ্বসংজ্ঞকেতি ॥ ১০"

---

* ঋগ্‌বেদস্য তু শাখাঃ স্যুরেকবিংশতি সংখ্যকাঃ।
নবাধিক-শতং শাখা যজুষো মারুতাত্মজ ॥
সহস্রসংখ্যয়া জাতাঃ শাখাঃ সাম্নঃ পরন্তপ।
অথর্বণস্য শাখাঃ স্যু পঞ্চাশদ ভেদতো হরে ॥
মুক্তিকোপনিষৎ ১১।১২।১৩

উপরোক্ত শ্লোকগুলির স্থূল মর্ম এই যে নর্মদা নদীই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যবর্তীরেখা বলিয়া পরিগণিত। নর্মদার দক্ষিণ দিকে ঋগ্‌বেদের আশ্বলায়নীশাখা, কৃষ্ণযজুর্বেদেব আপস্তম্বীশাখা, সামবেদের রাণায়নীশাখা ও অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখা প্রচলিত। তুঙ্গভদ্রা (কৃষ্ণার উপনদী) কৃষ্ণা ও গোদাবরীধৌত প্রদেশে ও সহ্যগিরি হইতে অন্ধ্রদেশ পর্যন্ত ঋগ্‌বেদের ঐ আশ্বলায়নী শাখা প্রচলিত। গোদাবরী হইতে সমুদ্র পর্যন্ত অন্ধ্রাদি দেশে কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আপস্তম্ব শাখা প্রচলিত। সহ্যগিরি হইতে নৈঋ‌র্ত-কোণে সমুদ্র পর্যান্ত কৃষ্ণযজুর্বেদের হিরণ্যকেশি শাখা বিস্তৃত আছে, ময়ূর পর্বত হইতে গুর্জ্জরদেশ পর্যন্ত কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রায়ণী শাখা প্রচলিত।

নর্মদার উত্তর দিকে ঋগ্‌বেদের শাঙ্খায়নী শাখা, শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনীশাখা, সামবেদের কৌথুমীশাখা, ও অথর্ববেদের পৈপ্পঞ্জীশাখা ও শৌনকশাখা প্রচলিত।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশীম ও গুর্জর প্রদেশে শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী-শাখা ও কাণ্বশাখা যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক বিস্তৃত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বিশ্বাস কবেন যে শুক্লযজুর্বেদ যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক প্রথমে বিদেহ বাজ্যে প্রবর্তিত হয় এবং ঐ শাখা কৃষ্ণযজুর্বেদ অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করায় সম্পূর্ণ উত্তরভারতে আধিপত্য লাভ করিয়াছে এবং কৃষ্ণযজুর্বেদ উত্তবভাবত হইতে শুক্লযজুর্বেদের প্রভাবে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে বর্ণিত আছে ঐ কালে কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ ও কলাপ শাখা গ্রামে গ্রামে বিজয়দুন্দুভি নিনাদ করিতেছিল* কিন্তু চরণ-ব্যূহ গ্রন্থ রচিত হইবার সময় উত্তরভাবতে যজুর্বেদের প্রচার বিরল হইয়া গিয়াছে। গ্রীকগণেব বিবরণ হইতে জানা যায় যজুর্বেদের কঠ কপিষ্ঠলশাখা পাঞ্জাব ও কাশ্মীরদেশে প্রচলিত ছিল। কপিষ্ঠলশাখা অন্তর্হিত হইয়াছে। কাশ্মীরদেশে কঠশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ আছে। কলাপশাখার নামান্তর "মৈত্রায়ণীয়শাখা"। ঐ শাখা নর্মদানদীর তীরদেশে বিদ্যমান ছিল। বরদা হইতে নাসিক এই প্রদেশে (মহারাষ্ট্র দেশে) কোনও কোনও স্থানে এই শাখার বিরল প্রচার দৃষ্ট হয়।

---

* গ্রামে গ্রামে কলাপকং কাঠকঞ্চ প্রোচ্যতে তত্রাদর্শনাৎ।
৪।৩।১০১ মহাভাষ্য ৪র্থ অধ্যায় ৩য় পাদ, কাশী সং ১৪০ পৃঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদিক কাল ও আর্য্যগণের আদিম নিবাস

আর্য্যগণ বিশ্বাস করেন বেদ অপৌরুষেয় দিব্যজ্ঞান। ঋষিগণ ঐ সূক্তগুলি দর্শন করিয়াছেন মাত্র। কালে উহার উদয় হয় না এবং কালে উহা বিলীন হয় না। ঋষিগণ বেদ রচনা করেন নাই। উহা চিরন্তন। বেদ ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত। কল্পান্ত-কালে উহা ভগবানের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং কল্পান্তে সৃষ্টিকালে উহা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। পরব্রহ্ম যেমন দেশকালের অতীত নিত্য বিরাজমান তাঁহার জ্ঞানও তদ্রূপ শাশ্বত অভ্রান্ত ও দেশকালাতীত। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে উহা উদয় করিয়াছেন এবং গুরুপরম্পরা ক্রমে উহার প্রবাহ চলিয়া আইসে এবং কল্পান্তকালে উহা ভগবানের হৃদয়ে লীন হইয়া থাকে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন "হে মৈত্রেয়ি মানব শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক ও সহজ আকাশ হইতে বৃহৎ, সর্বব্যাপী পরমেশ্বর হইতে জগদুৎপত্তির প্রারম্ভে ঋগ্‌বেদাদি বেদ চতুষ্টয়ের আবির্ভাব ও প্রলয়ে তাঁহাতেই তিরোভাব তদ্রূপই স্বাভাবিক"।[১]

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বেদ ঋষি কর্তৃক কোন্ যুগে দৃষ্ট হইয়াছিল তাহারই বিচার আরোহ প্রণালীতে করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন্ যুগে ঋষিগণ উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা কেহই বিদিত নহেন। ইউরোপীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব প্রথমে ম্যাক্সমূলারই ঐতিহাসিকভাবে বেদের কাল নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পুর্বেই বেদ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ রচিত হইয়াছিল, তিনি ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বেদ ও ব্রাহ্মণ ভাগের রচনা কাল ১২০০—১০০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপন করেন।

(১) হে মৈত্রেয়ি মহত আকাশাদপি বৃহতঃ পরমেশ্বরস্য সকাশাৎ ঋগ্‌বেদ চতুষ্টয়ং নিশ্বাসবৎ সহজতয়া নিঃসৃতমস্তীতি বিদ্ধম্। যথা শরীরাৎ শ্বাসো নিঃসৃত্য তদেব প্রবিশতি তথৈব ঈশ্বরাদ্ বেদানাং প্রাদুর্ভাবতিরোভাবৌ ইতি নিশ্চয়ঃ।

ম্যাক্সমুলার তাঁহার গিফোর্ড অভিভাষণে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ঐ ১২০০—১০০০ পূর্ব খৃষ্টাব্দই বেদ ও ব্রাহ্মণভাগ রচনার সর্ব নিম্ন কাল বলিয়া গণনা করা তাঁহার অভিপ্রায়। ম্যাক্সমুলারের নির্দিষ্ট ঐ কালই ইউরোপে সর্ববাদি-সম্মতরূপে গৃহীত হইত এবং কেহই উহার প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন না। কিন্তু লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও অধ্যাপক এইচ, জেকবি স্বাধীন ভাবে বহু যুক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বেদ ম্যাক্সমুলারের নির্দিষ্ট কাল হইতে বহু প্রাচীন। লোকমান্য তিলক জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর অবস্থান, ভূতত্ত্ব ও নৈসর্গিকতত্ত্ব প্রভৃতির বিচার দ্বারা প্রমাণ করেন যে ব্রাহ্মণগুলির সময়ে কৃত্তিকাপুঞ্জে বিষুবসংক্রান্তি হইত। কৃত্তিকাপুঞ্জে বিষুবসংক্রান্তি ২৫০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে এবং মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুব সংক্রান্তি ৪৫০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে হইত। তিনি বলেন ৪৫০০-২৫০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেদ ও ব্রাহ্মণভাগ সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি বৈদিকযুগের তিনটি স্তর নির্দেশ করেন। ১ম অদিতিযুগ ৬০০০-৪০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ; ২য় মৃগশিরা যুগ ৪০০০-২৫০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ, সম্ভবত এই যুগেই ইরানিক শাখা (পারসিকগণের পূর্বপুরুষ) ভারতীয় আর্যশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল (অনুমান ৩০০০-২৫০০ পূঃ খৃঃ); ; ৩য় কৃত্তিকাযুগ ২৫০০-১৪০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ, এই যুগেই তৈত্তিরীয় সংহিতা ও প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি রচিত হইয়াছিল।

জার্মান অধ্যাপক এইচ, জেকবিও স্বাধীনভাবে জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের বিচার মূলে ২৭৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বৈদিক কাল নির্দেশ করেন। হিন্দু বিবাহে "ধ্রুব" বা "অরুন্ধতী" প্রদর্শন প্রথা আছে। উত্তর মেরুকেন্দ্রে ধ্রুব বা অরুন্ধতী ২৭৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দে ছিল। কিন্তু ঋগ্‌বেদের বিবাহ সূক্তে ঐ প্রথার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ঋগ্‌বেদের ঐ সূক্তের রচনার পর ঐ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে ২৭৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বে ঋগ্‌বেদ সংগৃহীত হইয়াছে। মান্দ্রাজের কামেশ্বর আয়ারও কৃত্তিকাপুঞ্জের অবস্থান দ্বারা ২৩০০-২০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ ব্রাহ্মণযুগ বলিয়া নির্দেশ করেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলী বেদের অত্যধিক প্রাচীনত্ব নির্দেশে সর্বদাই কুণ্ঠিত; তাঁহারা ঐ উভয় মতেরই তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। প্রাচ্য জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক থিবো বলেন যে প্রাচীন হিন্দু বৎসর সকল ঋতুতেই আরম্ভ হইত এবং ধ্রুব নক্ষত্রের কার্যও যে কোনও উজ্জ্বল নক্ষত্র দ্বারাই নির্বাহিত হইত।

এই সকল অস্থির ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোনও জ্যোতিষমূলক গণনা করা নিরাপদ নহে।

অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র দাস ২৫,০০০-২০,০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে বেদের রচনাকাল স্থাপন করেন। তাঁহার ঐ মত ভিণ্টারনিস্ ভাষাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের দিক্ হইতে অসম্ভব বিবেচনা করিয়াছেন। দাস তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থের প্রারম্ভে ভূতত্ত্ব প্রভৃতির সাহায্যে পূর্বমত সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে "বৃষাকপি সূক্ত" ১৬,০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের কালে আরবসমুদ্র ও ভারতীয় দোয়াব প্রদেশ ও বঙ্গোপসাগর একই অবিচ্ছিন্ন সমুদ্রাকারে থাকিয়া জম্বুদ্বীপকে (কাশ্মীর ও পাঞ্জাব প্রদেশ) দক্ষিণ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ভূতত্ত্ববিদ্ এইচ্, জি, ওয়েলস্ ঐ মতে স্বাধীনভাবে উপনীত হইয়াছেন। তিনিও বলেন যে আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এক সমুদ্র ছিল তাহা পাঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশকে দক্ষিণ ভারত হইতে পৃথক্ করিত। ঐ সমুদ্রভাগ অনুমান ৭৫০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন ১৬,০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে মানবের সৃষ্টি হয় নাই।

ভি, বি, কেটকার বলেন যে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ৩য় অধ্যায়ের ৪।১।৫ অংশে বৃহস্পতিগ্রহ তিষ্য নক্ষত্রকে আবৃত করায় একটি গ্রহণ হইয়াছিল, উহা ৪৬৬০ পূঃ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। কেটকারের মত সমালোচনা করিয়া যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন খৃঃ পূঃ ২৪৪৯ অব্দে কৃষ্ণযজুর্বেদ-দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ সময়ে কৃত্তিকাতারা কৃত্তিকানক্ষত্র-মণ্ডলের আদিতে ছিল। কিন্তু ভিণ্টারনিস্ ঐ সকল মত গ্রহণ না করিলেও তিনি বলেন যে বৈদিক যুগ ১২০০-১০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা বহু প্রাচীন। যাস্ক পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন। যাস্কাচার্যকে অন্ততঃ পক্ষে খৃঃ পূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে স্থাপন করা উচিত। যাস্কের সময়ই বেদের বহু অংশ দুর্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহা অপেক্ষাও প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন যে বেদের বহু অংশ এরূপ অর্থবিহীন যে উহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। বিশেষতঃ ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনঃশেফের যে উপাখ্যান কথিত আছে তাহাতে "ঋক্" ও "গাথা" উভয়ই আছে। "ঋক্" ঈশ্বর নিশ্বসিত এবং "গাথা" মনুষ্য রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শুনঃশেফের ঐ উপাখ্যান রাজসূয় যজ্ঞে কথিত হইয়া

থাকে। বিশেষতঃ যজুর্বেদ ও সামবেদ ঋগ্‌বেদ হইতে সংগৃহীত এবং ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ যুগেও বহুকাল অতীত হইয়াছে। এই সকল কারণে ভিণ্টারনিস্ মনে করেন যে ঋগ্‌বেদের যুগ অন্ততঃ পক্ষে ২৫০০-২০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে হইতে পারে।

মহাভারতের ও পুরাণগুলির মতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসই প্রচলিত বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। পুরাণের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই ব্যাস ঐ বেদ বিভাগ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। জনমেজয়ের যজ্ঞের সময় নবপ্রচলিত শুক্ল যজুর্বেদানুসারে যজ্ঞ নির্বাহের প্রস্তাব হইয়াছিল এবং বৈশম্পায়নের মতাবলম্বিগণ তদ্‌বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। হিন্দু পুরাণগুলিতে কলিযুগের রাজবংশাবলী ও নভোমণ্ডলে সপ্তর্ষি মণ্ডলের অবস্থানের যে উক্তি আছে সেই গুলির সমালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বর্তমান কাল হইতে অন্ততঃপক্ষে ৩৮৫০ বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর ও তৎপূর্বেই বেদ বিভাগ সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ঐ কালেই শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ এই দুই শাখা বিদ্যমান ছিল। জনমেজয়ের সময়েই শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল। বিচারপতি পার্‌জিটার্ তাঁহার কলিযুগের রাজবংশাবলী (Dynasties of Kaliyuga) গ্রন্থে পুরাণ কথিত রাজবংশাবলীর সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন এবং ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের (৪র্থ ২৩-২৪ অধ্যায়) উক্তি অনুসারে মগধরাজ জরাসন্ধ হইতে রিপুঞ্জয় পর্যন্ত ২৪ জন বার্হদ্রথ রাজগণের রাজত্বকাল ১০০০ বৎসর। "এতে বার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষসহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি"। বার্হদ্রথ বংশের পর প্রদ্যোত বংশ। প্রদ্যোতবংশীয় ৫ জন নৃপতি ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। "এতে অষ্টত্রিংশদুত্তরম্ অব্দশতং পঞ্চপ্রদ্যোতাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি"। তদনন্তর শিশুনাগবংশীয় দশজন ভূমিপাল ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করেন। "শৈশুনাগা দশভূমিপালা স্ত্রীণি দ্বিষষ্ট্যধিকানি ভবিষ্যন্তি"। ইহার পর, মহাপদ্ম নন্দ ও তাহার পুত্রগণের রাজত্বকাল ১০০ বৎসর। "মহাপদ্ম স্তৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতম্ অবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি"। তাহার পর কৌটিল্য বা চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংশ করিয়া মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে স্থাপন করেন। ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে ৩২১ পূঃ

খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব আরম্ভ করেন। ১০০০+১৩৮+৩৬২+১০০+৩২১= ১৯২১ পূঃ খৃষ্টাব্দ। ঐ কালে মগধরাজ জরাসন্ধ জীবিত ছিলেন এবং ঐ কালেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমর হইয়াছিল।* ঐ সময়ে বেদ বিভাগ সম্পন্ন হইয়া থাকিলে তাহার বহু পূর্বে বেদ রচিত হওয়া সম্ভব। ভিণ্টারনিস্ ও তিলকের মতের সহিত পুরাণগুলির মতের কোনও বৈষম্য দৃষ্ট হয় না।

কিছুদিন পূর্বে ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে মহেঞ্জদারাও নামক স্থানে এক প্রোথিত নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অন্ততঃ পক্ষে খৃষ্টের ৩০০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। ঐ প্রোথিত নগরে যে সভ্যতা ও স্থপতিবিদ্যার নিদর্শন দৃষ্ট হয় তাহা বর্তমান সভ্যতা অপেক্ষা হীন নহে। ঐরূপ পূর্ণ সভ্যতায় উপনীত হইতে বহুযুগের আবশ্যক হইয়াছিল।

বেদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আরও প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা লক্ষ্য করিয়াছেন। হিন্দুকুশ হইতে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে বহু সমৃদ্ধিশালী রাজত্ব ও সভ্যতা প্রাচীনকালে উদ্ভূত হইয়াছিল। আসীরিয়া, বাবিলোনিয়া ও সুমেরিয়ার সভ্যতা ঐ প্রদেশেই উদ্ভূত হইয়া বিলীন হইয়াছিল। অধুনা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় বহু সমৃদ্ধ নগরের প্রোথিত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত উৎকীর্ণলিপির পাঠ হইতে জানা যাইতেছে যে ঐ সকল সভ্যতা ৪০০০ হইতে ২২০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ সকল উৎকীর্ণ লিপি কিউনিফরম অক্ষরে লিখিত এবং ঐ অক্ষরই প্রাচীন জগতের প্রচলিত লিপি ছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বিবেচনা করেন যে প্রাচীন আর্যজাতির আদিম নিবাস ভারতবর্ষে ছিল না, সম্ভবতঃ তাঁহাদের প্রাচীন বাসস্থান আরাল ও কাশ্যপহ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আর্যগণের আদিম নিবাস কৈলাস পর্বতের উত্তরদিগস্থ সাইবেরিয়া প্রদেশে ছিল এরূপ অনুমান করিয়াছেন। লোকমান্য তিলক পৃথিবীর উত্তর মেরুপ্রদেশই আর্যগণের আদিম নিবাস ছিল বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা

* অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ভারতযুদ্ধকাল ১৪৫৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে বলেন। প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ঐ যুদ্ধকাল ২৩৬০ পূঃ খৃঃ হইতে ২৩৩৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে হওয়া বলেন। পুরাণ প্রবেশ ঐ যুদ্ধকাল ১৪১৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করে। পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১০১৫ বৎসর। নন্দের অভিষেক ৪০১ পূঃ খৃঃ। ১০১৫+৪০১=১৪১৬ পূঃ খৃঃ।

করিয়াছেন। আর্যজাতির আদিম নিবাস যে স্থানেই থাকুক না কেন, নৈসর্গিক পরিবর্তনে, প্রাকৃতিক বিপ্লবে অথবা জীবনের অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আর্যগণ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন মুখে গমন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সকলেই একমত। কোনও কোনও শাখা ইউরোপ প্রদেশে, কোনও কোনও শাখা হিন্দুকুশ ও এশিয়া মাইনরের মধ্যবর্তী প্রদেশে গমন করেন। প্রাচীন জেন্দাবেস্তের ইরানিক ভাষা ও বৈদিক ভাষার সৌসাদৃশ্য এতই অধিক যে, ভারতীয় ও ইরানিক শাখাদ্বয়ই বহুকাল একত্র বাস করিয়া সর্বশেষে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং একশাখা ভারতে ও অন্যশাখা ইরান প্রদেশে গমন করিয়াছিল এরূপ প্রতীয়মান হয়। ইরানিক আর্যেরা পারস্য তাতার প্রভৃতি স্থানে এবং ভারতীয় শাখা গান্ধার পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

এশিয়া মাইনরের মলসিয়া প্রদেশে বোঘাজকোই নামক স্থানে প্রাপ্ত হিট্টাইট্ শাখাভুক্ত মিটানির রাজগণের কিউনিফরম অক্ষরে ক্ষোদিত লিপিপাঠে জানা যায় যে ১৫০০—১৪০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে মিটানির রাজগণ আর্যগণের বৈদিক দেবতাগণের নাম ধারণ করিতেন এবং তাঁহারা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র নাসত্যৌ প্রভৃতি দেবতাগণের অর্চনা করিতেন। উক্ত মিটানির রাজগণ আর্যগণের কোন শাখাভুক্ত ছিলেন তাহা নির্দেশ করিবার উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই কিন্তু এ অনুমান অনিবার্য যে বৈদিক সভ্যতা ও বৈদিকভাষা মলসিয়া দেশে প্রচলিত ছিল এবং তাহা ১৫০০—১৪০০ পূঃ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ববর্তী। হিন্দুকুশ পর্বতের পশ্চিমভাগস্থ প্রদেশে বৈদিকযুগে আর্যগণের যে সংশ্রব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পারসিকগণের সুপ্রাচীন জেন্দাবেস্ত গ্রন্থ ও ঋগ্‌বেদের সৌসাদৃশ্য দেখিলে সহজেই অনুমান হয় যে তাহারা ভারতীয় আর্যগণের অতি নিকটজ্ঞাতি ছিলেন। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে পারসিকগণ দিতির পুত্র (দৈত্য, অসুর) এবং ভারতীয় আর্যগণ অদিতির বংশধর বা সুর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর্যজাতির যে শাখা হিন্দুকুশ অভিমুখে গমন করে তাহারা খাইবার পাস্ পথ অবলম্বন করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে ও পরে ক্রমে গঙ্গা যমুনার উপত্যকা ভূমিতে বিস্তৃত হইয়াছিলেন এবং কতক পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বর্তমান বেলুচিস্তান, পারস্য ও এশিয়া মাইনর মুখে গমন করিয়াছিল। অগ্নি উপাসক পারসিকগণ শেষোক্ত শাখার বংশধর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেদের ব্যাখ্যা প্রণালী, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বৈদিকসমাজ, আচার ব্যবহার

বৈদিক যুগের সামাজিক অবস্থা, আচার ব্যবহার ও কালধর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বেদসংহিতার সূক্তগুলির অর্থ ও অভিপ্রায় কি তাহা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। একমাত্র পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্যই বেদসংহিতার সম্পূর্ণ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজে যে অর্থ তৎকালে প্রচলিত ছিল এবং তৎকালে বৈদিক প্রাচীন গ্রন্থাদি যাহা বিদ্যমান ছিল তদ্দ্বারা যে অর্থ উপলব্ধ হয় তাহাই তিনি ভাষ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ ভাষ্য ব্যতীত সমগ্র বেদসংহিতার সম্পূর্ণ অন্য কোনও ব্যাখ্যা বা ভাষ্য নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথের বিজয়নগর রাজ্যে নৃপতি বুক্করায়ের রাজত্বকালে মাধবাচার্য ও সায়ণাচার্য দুই ভ্রাতা বিদ্যমান ছিলেন।* ঐ বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দক্ষিণ ভারতের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলারী জেলার তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে হাম্পি নামক স্থানে বিদ্যমান আছে। তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণানদীর উপশাখা। উত্তর ভারতে বৈদেশিক আক্রমণে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে হিন্দুধর্মের অনেক গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল এবং বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিও লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু সুদূর দক্ষিণাপথে হিন্দুধর্মের প্রাচীন আচার ব্যবহার ও প্রথা বিদ্যমান ছিল। বুকরাও, মাধবাচার্য ও সায়ণাচার্য সকলেই তৎকালীন মহাপণ্ডিত বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরের শিষ্য ছিলেন এবং বুকরাও হিন্দুধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৈদিকসাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। মাধবাচার্য সায়ণাচার্যের জ্যেষ্ঠ

* মাধবাচার্য, সায়ণাচার্য ও ভোগনাথ তিন সহোদর ভ্রাতা। তাঁহাদিগের পিতার নাম মায়ণ ও মাতার নাম শ্রীমতী। সায়ণাচার্য "সুভাষিত সুধানিধি", "প্রায়শ্চিত্ত-সুধানিধি" "অলঙ্কার সুধানিধি", "মাধবীয়ধাতুবৃত্তি," "পুরুষার্থ সুধানিধি," "যজ্ঞতন্ত্র সুধানিধি" ও বেদভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

ভ্রাতা ছিলেন এবং তিনি বুক্করাওয়ের মন্ত্রী ছিলেন। পরে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বিদ্যারণ্যস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন এবং শৃঙ্গেরীমঠের অধিপতি হইয়াছিলেন। মাধবাচার্য উত্তর মীমাংসা, পূর্ব মীমাংসা (অধিকরণমালা) মাধবীয় ধাতুবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎকালে তিনি অগাধ বৈদিকবিদ্যার অধিকারী ছিলেন। বিদ্যাতীর্থের ইঙ্গিতক্রমেই বুক্করাও মাধবাচার্যকে বেদার্থ প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। মাধবাচার্য বুক্করাওকে তাঁহার সহোদর সায়ণাচার্যকে ঐ ব্যাখ্যাকার্যে নিযুক্ত করিবার আদেশ করেন। মণিকাঞ্চন সংযোগ হইল। সায়ণাচার্যের ঋগ্‌বেদ-ভাষ্যোপোদ্‌ঘাতে উল্লিখিত আছে ঃ—

"যৎ কটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্ বুক্কমহীপতিঃ।
আদিশন্ মাধবাচার্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে॥
যে পূর্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
কৃপালু র্মাধবাচার্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ॥
স প্রাহ নৃপতিং রাজন্ সায়ণার্যো মমানুজঃ।
সর্বং বেত্ত্যেষ বেদানাং ব্যাখ্যাতৃত্বে নিযুজ্যতাম্॥
ইত্যুক্তো মাধবার্যেণ বীরবুক্কমহীপতিঃ।
অন্বগাৎ সায়ণাচার্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে॥"

কথিত আছে ঋগ্‌বেদসংহিতার ভাষ্যের প্রথমাংশ সায়ণাচার্য স্বয়ং রচনা করেন অবশিষ্টাংশ তাঁহার তত্ত্বাবধানে ও অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ রচনা করেন। তৎকালে বৈদিক সাহিত্যসংক্রান্ত যে সকল গ্রন্থাদি বিদ্যমান ছিল তাহা সম্যক্ আলোচনা করিয়াই সায়ণাচার্য ঐ ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং উহাতে সায়ণাচার্যের অগাধ বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে সায়ণাচার্যের পূর্বে ঐরূপ সমগ্র বেদ-সংহিতার ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল না। সায়ণাচার্যের পূর্ববর্তী যাস্কাচার্য তাহার নিরুক্ত গ্রন্থে বেদের কঠিন কঠিন অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং বৈদিক দুরূহ শব্দগুলির ব্যাখ্যা ও বৈদিক শব্দগুলির নিঘণ্টু প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। যাস্কাচার্যের কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ খৃঃ পূর্ব ৮০০ হইতে ৬০০ পূঃ খৃঃ মধ্যে স্থাপন করেন কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি উহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর হইতে পারেন। যাস্কাচার্যের কালেই বেদের কোনও কোনও

অংশ এত দুর্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে তাহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় চেষ্টা কোনও কোনও আচার্যের মতে বাতুলতামাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। বৈদিক যুগের ক্রিয়াকলাপ, ও বৈদিক সাহিত্যের মর্ম ও প্রাচীন গ্রন্থাদি যাস্কাচার্যের সময় যাহা বিদ্যমান ছিল তাহা সায়ণাচার্যের সময় বিদ্যমান ছিল না। পরন্তু যাস্কাচার্যের সময়ে যে সকল বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল তাহার কেবল একটু ক্ষীণাভাস মাত্রই তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় যাস্কাচার্যেরই যে বেদব্যাখ্যানকার্যে অধিক সুগমতা ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সায়ণাচার্য অনেক স্থানে যাস্কাচার্যের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। সায়ণাচার্য একই শব্দের বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ প্রকার বিভিন্ন অর্থ যাস্কাচার্যের অভিপ্রেত নহে। এই দুই বৈদিক আচার্যের ব্যাখ্যা সঙ্কট ও যাস্কাচার্যের যুগের অন্যান্য আচার্যগণের নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তি (অর্থাৎ বেদের অনেকস্থল ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র) এই উভয় বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে কেহই বেদের সকলস্থলের বৈদিক দ্রষ্টা ঋষিগণের উদ্দিষ্ট তাৎপর্য বিদিত ছিলেন না। এক শ্রেণীর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যাকে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বলিয়া উহা মূল্যবান মনে করেন না। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত সায়ণাচার্যের ভাষ্য দ্বারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধার করিবার চেষ্টাকে বাতুলতা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

বোসেন ঋগ্‌বেদের ১ম অষ্টক মুদ্রিত করিবার পরই ইউরোপে বৈদিক সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয়। অধ্যাপক বার্ণুফের ছাত্র অধ্যাপক রোটই সর্বপ্রথমে স্বাধীনভাবে বেদের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। ঐ সম্প্রদায়কে বেদেব স্বাধীনব্যাখ্যাতৃসম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। তাঁহারা দুরূহস্থলে সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যাকে আদৌ মূল্যবান মনে করেন না। তাঁহারা সমগ্র আর্যজাতির ভাষার তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে বিশেষতঃ জেন্দাবেস্তার সাহায্যে বেদসংহিতার অর্থ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। সমস্ত আর্যজাতি একই বংশোদ্ভূত ও তাহাদিগের আদিম ভাষা একই ছিল, কালক্রমে ও দেশভেদে উহাতে পার্থক্য জন্মিয়াছে কিন্তু মূল শব্দগুলির অর্থ কোনও না কোন ভাষায় অব্যাহত আছে ইহাই 'স্বাধীন ব্যাখ্যাতৃসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা-প্রণালীর মূল সূত্র। সকল আর্যশাখার প্রাচীন শব্দগুলি একই অর্থের

দ্যোতক ছিল। সেই শব্দমালার প্রাচীন অর্থ ঐতিহাসিকভাবে আলোচনা পূর্বক সেইগুলির সাহায্যে বেদের ব্যাখ্যা করাই স্বাধীন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য, কারণ ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ ঐ সকল প্রাচীন অর্থেই প্রাচীন শব্দগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন।

অপর পক্ষে অধ্যাপক লাড্‌উইগ্‌ ও উইল্‌সনের দল অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বেদসংহিতার কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কিরূপভাবে সূক্তগুলির প্রয়োগ হইয়াছে তাহাই অতি মূল্যবান মনে করেন। তাঁহারা সায়ণাচার্য ও যাস্কের ব্যাখ্যা প্রতিপদে অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং প্রাচীন গ্রন্থে ও পুরাণাদিতে সূক্ত বা ঋগ্‌বিশেষের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সসম্মানে গ্রহণ করেন। দুরূহস্থলে মতদ্বৈধ হইলেও সায়ণাচার্য ও যাস্কাচার্যের মত মূল্যবান মনে করেন।

তৃতীয় পন্থীদিগকে এই উভয় মতের সমন্বয়কারী বলা যাইতে পারে। অধ্যাপক লাড্‌উইগের ছাত্র অধ্যাপক পিশেল্‌ ও গেল্ডনার্‌ এই সমন্বয়কারী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারা বলেন পূর্বোক্ত উভয় মতেই কতক সত্য নিহিত আছে। এক প্রণালীর ভ্রম-প্রমাদ অন্য প্রণালী দ্বারা সংশোধন করিয়া লওয়াই নিরাপদ।

যাস্কাচার্যের নিরুক্ত হইতেই দৃষ্ট হয় তৎকালে বেদব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে ঐতিহাসিক, পূর্বযাজ্ঞিক, নৈদান প্রভৃতি সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল ব্যাখ্যাতৃগণের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকায় যাস্কাচার্য বৈদিক শব্দগুলির ধাতুগত ব্যাখ্যার উপর গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যাস্কাচার্যের নিরুক্ত সর্বতোমুখ হওয়ায় বেদের অন্যান্য প্রাচীন নিরুক্ত ও সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা কালক্রমে তিরোহিত হইয়াছে এবং যাস্কাচার্যের নিরুক্তের ব্যাখ্যা বহুকাল সম্মানিত হইয়াছে। সায়ণাচার্যও ঐতিহ্যমূলক ব্যাখ্যাদি যথাসঙ্গতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োগ ইত্যাদির উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় অধ্যাপক পিশেল্‌ ও গেল্ডনারের সমন্বয়মত যে বিশেষ উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের যতই প্রসার হইবে বেদের বহু দুরূহ শব্দের নাগপাশ বা ফণিকুণ্ডলী ততই অপসৃত হইবে। কিন্তু ঐতিহ্য, প্রাচীন কথা, সূক্তের প্রয়োগ ও উদ্দেশ্য

অবগত না থাকিলে, কেবল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব দ্বারা এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যুগে যুগে ঐ সকল ঐতিহ্য, কথা ও প্রয়োগাদি পাষাণের ন্যায় স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে এবং ঐ পাষাণের গাত্রে বহু অর্থলিপি উৎকীর্ণ আছে।

ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত দেশ, নদী, পর্বত ও জাতি।

নদী। ঋগ্‌বেদে যে সকল নদী, পর্বত ও জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাতে আর্যগণ পঞ্চনদ প্রদেশে তৎকালে বাস করিতেছিলেন এরূপ প্রতীয়মান হয়। ঋগ্‌বেদে প্রায় ২৫টি নদীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই পাঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত। ঐ সকল নদীর মধ্যে অনেকগুলি সিন্ধুনদীর উপনদী। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের দেবতাগণ নদীসমূহ। ঐ সূক্তের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋক্ দুইটি এই :—

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমম্ সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া ॥৫
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।
ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎন্বা সরথং যাভিরীয়সে ॥৬

ইহাতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর উল্লেখ আছে। সিন্ধুনদের উপনদী-গুলিরও উল্লেখ আছে। শুতুদ্রি=শতদ্রু (Sutlej), পরুষ্ণী=ইরাবতী= রাভি (Ravi), অসিক্নী=চন্দ্রভাগা=চেনাব (Chenab), বিতস্তা=ঝিলাম= (Jhelum), অসিক্নী বিতস্তার সহিত মিলিত হইলে উহার নাম মরুদ্বৃধা ; আর্জীকীয়া—বিপাশা (Beas), কুভা=কাবুলনদী, গোমতী=গোমালনদী, ক্রুমুনদী কুভা ও গোমতীর মধ্যভাগে অবস্থিত। ঐ সকল নদীর অবস্থান অনুসারে দেখা যায় যে পঞ্চনদ প্রদেশের একদিকে সিন্ধুনদ ও তাহার শাখাগুলি ও অপর দিকে গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীশ্রেণী ধৌত প্রদেশই ঐ সূক্তদ্রষ্টা ঋষি লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ প্রদেশে তৎকালে উৎকৃষ্ট অশ্ব (সৈন্ধব) উৎকৃষ্ট বস্ত্র, লোম, সুবর্ণ ("জাম্বুনদ হেম"), মধু, সোমলতা, সীলমাতৃণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

"স্বশ্বা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্যয়ী সুকৃতা বাজিনীবতী ;
ঊর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে সুভগা মধুবৃধম্ ॥" ঋ১০।৭৫।৮

ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩ ও ৫৩ সূক্ত হইতে জানা যায় যে বিশ্বামিত্র ঋষি পূর্বে তৃৎসুদিগের অধিপতি সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। পরে বশিষ্ঠ তাহার পুরোহিত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ঈর্ষান্বিত হইয়া ভরতদিগের পুরোহিত হইয়া তাহাদিগকে শুতুদ্রী ও বিপাশানদী পার করিয়া লইয়া যান। তৃতীয় মণ্ডলে ঐ নদীর স্তুতি আছে। বশিষ্ঠের প্রভাবে সুদাস ভরতদিগকে পরাজিত করেন। ইহাতে অনুমান হয় সুদাস, ভরতগণ ও ঐ ঋষিদিগের নিবাসভূমি পাঞ্জাব প্রদেশে অথবা অতি নিকটবর্তী স্থানে ছিল।

সমুদ্র। ঋগ্‌বেদের আর্যেরা "সমুদ্র" জানিতেন। "সমুদ্র" ও "সমুদ্রিয়" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়ঃ—

"বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ" ১।২৫।৭। "যে অস্যা আচবণেষু দাধ্রিরে সমুদ্রেণ শ্রবস্যবঃ।" ১।৪।৩ "প্রযৎ সমুদ্রম্ ঈরয়াব মধ্যম্" ৭।৮৮।৩ "সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ" ২৩৩৩।২।

"সিন্ধু" এই শব্দটি দ্বারা সাধাবণতঃ সকল উপনদীব সমবেত স্রোত সিন্ধুনদকেই বুঝাইত কিন্তু পবে সিন্ধু শব্দও সমুদ্র অর্থে প্রযুক্ত হওয়া দৃষ্ট হয়।

পর্বত। ঋগ্‌বেদে "পর্বত" ও পর্বতবাচক শব্দের বহুল প্রয়োগ ও উল্লেখ আছে। উহাব বিশেষ নাম "হিমবৎ" কথাবও প্রয়োগ আছে। উত্তুঙ্গ হিমালয়কে লক্ষ্য করাই অনুমান হয়। পরবর্তীযুগে উহার নাম "হিমালয়" হইয়াছে। পর্বতশিখর মধ্যে কেবল "মূজাবৎ" নামক শিখরের নাম দৃষ্ট হয়। এই মূজাবৎ পর্বতই বৈদিক সোমলতার জন্মভূমি বলিয়া বিদিত। ঐ পর্বতশিখর কাবুল উপত্যকার পশ্চিমদিকে এবং কাশ্মীরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ব্রাহ্মণযুগে বহুদূরদেশ হইতে সোমলতা আনয়ন করিতে হইত। কখনও কখনও সোমলতার অভাবে তাহার পরিবর্ত ব্যবহৃত হইত। অথর্ববেদে "ত্রিকুদ" পবতের নাম দৃষ্ট হয়। পরবর্তী যুগে তাহাই "ত্রিকূট" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে যে "ত্রিকোট" নামক পর্বতের পাদদেশ দিয়া অসিক্নী প্রবাহিত তাহাই ঐ ত্রিকূট পর্বত। অথর্ববেদে "নাবপ্রভ্রংশন" নামক পর্বতের উল্লেখ আছে। উহাই সম্ভবতঃ শতপথ ব্রাহ্মণে "মনোরবসর্পণ" নামে অভিহিত হইয়াছে এবং পরবর্তীযুগে "নৌবন্ধন" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্থানেই মৎস্যাবতারে প্রলয়

প্লাবনের পর মনুর নৌকা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে বিন্ধ্য-পর্বতমালার কিম্বা নর্মদানদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

শস্যাদি। ঋগ্‌বেদে "ধান্যে"র নাম নাই কিন্তু ঐ নামের প্রয়োগ না থাকাতেই ঐ শস্য প্রচলিত ছিল না এরূপ অনুমান করা নিরাপদ নহে। অন্যান্য বেদে "ধান্য" সাধারণ খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। আর্যগণ ভূমি কর্ষণ দ্বারা "যব" উৎপাদন করিতেন। ঐ "যব" শব্দ দ্বারা কেবল আধুনিক যব শস্য বুঝাইত এরূপ বোধ হয় না। সম্ভবতঃ যব শব্দ দ্বারা যব জাতীয় অন্য বাসন্ত শস্যও বুঝাইত।

বৃক্ষ, লতা। বৃক্ষের মধ্যে "অশ্বত্থ" বৃক্ষের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। উহার কাষ্ঠ দ্বারা সোমপাত্র প্রস্তুত হইত এবং অগ্নি চয়নের জন্য "প্রমন্থ" ও "অরণিকাষ্ঠ" প্রস্তুত হইত। দেবতাগণ স্বর্গে অশ্বত্থপাদপের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই অশ্বত্থপাদপ অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। ন্যগ্রোধ (বট) বৃক্ষের নাম ঋগ্‌বেদে দৃষ্ট হয় না। ন্যগ্রোধের ন্যায় বিশালকায় অবরোহবিশিষ্ট বৃক্ষ ঐ প্রদেশে বিদ্যমান থাকিলে নিশ্চয়ই ঋষিগণ তাহার উল্লেখ করিতেন। কিন্তু অনুল্লেখ দ্বারা অবিদ্যমানতা অনুমান করা সংশয়জনক। সোমলতার রস বৈদিক সোম যজ্ঞের প্রধান উপাদান ছিল। ঐ লতা মূজাবৎ পর্বতে জন্মিত। পরবর্তীযুগে আর্যগণ মূজাবৎ পর্বত হইতে বহুদূরতর প্রদেশে বাস করায় উহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। তাহার পরিবর্তে যে লতা আর্যেরা ব্যবহার করিতেন তাহা ঠিক সোমলতার ন্যায় গুণবিশিষ্ট ছিল না। ঐ লতার রস বমন উদ্রেক করিত ও সোমরসের ন্যায় বিমল আনন্দ দায়ক ছিল না। সোমলতার অপর নাম "বনস্পতি" কারণ উহা অত্যাবশ্যকীয় ও আদরণীয় উদ্ভিদ ছিল।

জীব, জন্তু, পক্ষী। আরণ্য জন্তুর মধ্যে সিংহের নাম ঋগ্‌বেদে আছে, কিন্তু ব্যাঘ্রের নাম নাই। অথর্ববেদে নরভুক্ ব্যাঘ্রের (পুরুষাদ্) উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ অথর্ববেদের সময় আর্যেরা ব্যাঘ্রবহুল নেপাল প্রদেশের উপত্যকায় আসিয়াছিলেন। হস্তী, ভল্লুক, (ঋক্ষ), বানর (কপি), মহিষ, শূকর (বরাহ), বৃক (নেকড়ে বাঘ) প্রভৃতি বন্য জন্তুর নাম দৃষ্ট হয়। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে অশ্ব, গাভী, বলীবর্দ, ছাগল, মেষ, গর্দভ প্রভৃতির নাম

দৃষ্ট হয় কিন্তু বিড়ালের নাম দৃষ্ট হয় না। ঋগ্‌বেদের সময় গাভীই ধন সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। বহুসূক্তেই দেবগণের নিকট গো ও অশ্ব প্রাপ্তির প্রার্থনা আছে। "অস্মভ্যং শর্ম সপ্রথো গবেহশ্বায় যচ্ছত" ঋ ৮।৩০।৪। দস্যুগণ ধেনুগুলিকে অপহরণ করিয়া লুকায়িত রাখিত। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আর্যগণ শত্রুদিগের হস্ত হইতে ধেনু রক্ষা করিতেন। যুদ্ধে অশ্ব ব্যবহৃত হইত এবং অশ্ব রথ বহন করিত।

ঋগ্‌বেদে সর্পের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং সর্পবাচক বহু শব্দ আছে।

পক্ষিগণের মধ্যে "আমিষার্থী শ্যেন" (১) হংস, চক্রবাক, ময়ূরী, শুক, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। হংস ক্ষীরাম্বুমিশ্র হইতে ক্ষীর পৃথক্ করিয়া লইতে পারে এই বিষয়টি শুক্লযজুর্বেদে আছে।

খাদ্য দ্রব্যাদি। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ঘৃত দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হইত। শাক, শস্য ও ফলমূলাদি খাদ্যদ্রব্যরূপে প্রায়ই ব্যবহৃত হইত। বিশেষ ব্যাপার উপলক্ষে মাংসাদি ব্যবহৃত হইত। ঋগ্‌বেদের সময়ে গোমাংস ব্যবহারে কোনও বাধা ছিল না। গোমেধ যজ্ঞে ঐ মাংস ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ঐ কালেই অপর এক সম্প্রদায় গোবধ করা মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা গোকে "অঘ্ন্য" (অহননীয়) বলিতেন। যে সম্প্রদায় গোকে মেধ্য বলিতেন তাঁহারা ঐ হনন কার্যকে "মহোক্ষা" বলিতেন। শুক্লযজুর্বেদের কালেই গোবধকারীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। চরকসংহিতায় দৃষ্ট হয় কোনও প্রাচীন ঋষি গোমেধযজ্ঞে বহু পশু হনন করেন, ঐ সকল দুষ্পাচ্য মাংস লোভী ব্রাহ্মণগণ ব্যবহার করায় তাহারা শাপগ্রস্ত হইয়া উদরাময়রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সকল দৃষ্টে বোধ হয় প্রাচীন যজ্ঞে গোমাংস ব্যবহৃত হইলেও প্রাচীন কাল হইতেই উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

মিশ্র খাদ্য মধ্যে "করম্ভ" (porridge), "অপূপ", "ক্ষীরোদন", "যবাগূ", "পুরোডাশ" প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত।

পানীয় মধ্যে সোমরস, সুরা ও পান্ত ব্যবহৃত হইত।

(১) "শ্যেনাইব শ্রবস্যতঃ, ঋ ৬।৪৬।১৩

ধাতু। ধাতু মধ্যে স্বর্ণ (হিরণ্য, লোহ) অতি মূল্যবান্ ও উজ্জ্বল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সিন্ধু প্রভৃতি নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যাইত। সুবর্ণ নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত। "অয়ঃ" অর্থাৎ লৌহ বহু কার্যে ব্যবহৃত হইত। রজত বা রৌপ্যের নাম ঋগ্‌বেদে দৃষ্ট হয় না।

ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত রাজন্যবর্গ। ঋগ্‌বেদে আর্যগণের শাখাজাতির নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে গান্ধার, পুরু, তুর্বসু, যদু, অনু দ্রুহ্যুগণ অতি প্রসিদ্ধ। বিতস্তার পশ্চিম দিক্ হইতে কাবুল নদীব পশ্চিম ভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ বর্তমান আফগানিস্থানের কতক অংশে গান্ধারদিগের বাসভূমি ছিল। বর্তমান "কান্দাহার" ঐ গান্ধার নামের অপভ্রংশ। পুরাণগুলির বংশাবলী তুলনা করিলে দেখা যায় যে নহুষের পুত্র যযাতি ছিলেন। যযাতির ৫ পুত্র যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু। যদুর বংশ দক্ষিণাপথে, তুর্বসুর বংশ দক্ষিণ পূর্ব প্রদেশে, দ্রুহ্যু পশ্চিম প্রদেশে, অনু উত্তর প্রদেশে ও পুরু সর্বপৃথিবীপতি হইয়াছিলেন। যদুর অপর পুত্র ক্রষ্টুর বংশে জ্যামোঘ ও তাঁহার বংশ হইতে চেদি ও কুন্তিবংশ এবং কুন্তিবংশে বসুদেব ও তাঁহার ভগিনী পাণ্ডবজননী পৃথা জন্ম গ্রহণ করেন। যদু হইতে বসুদেব, বসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণ এবং পৃথা হইতে পাণ্ডবগণ উদ্ভূত হইয়াছিল। চেদিবংশে শিশুপাল জন্ম গ্রহণ করেন।

পুরুর বংশে কণ্ব ঋষি, তৎপুত্র মেধাতিথি জন্মগ্রহণ করেন। এই মেধাতিথি হইতেই ঋগ্‌বেদের কাণ্বায়ন দ্বিজগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উহার অপর শাখায় দুষ্মন্ত ও তৎপুত্র রাজচক্রবর্তী ভরত জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বংশের শাখা হইতেই পঞ্চাল নৃপতিগণ ও মগধরাজ জরাসন্ধ উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

তুর্বসুর বংশে মরুত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অপুত্রক হওয়ায় পুরু-বংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে কল্পনা করেন। দ্রুহ্যুব বংশে প্রচেতাঃ জন্মগ্রহণ করেন; তিনি উদীচ্য ম্লেচ্ছগণের উপর আধিপত্য করিতে থাকেন।

অনুর বংশে উশীনর জন্মগ্রহণ করেন। এই উশীনরের ৫ পুত্র,—শিবি, নৃগ, নর, কৃমি ও সর্ব। শিবিদিগের নাম ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত আছে। এই বংশেই ঋগ্‌বেদের দীর্ঘতমা ঋষি ও ভার্গবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারই ক্ষত্রিয় পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ সুহ্ম ও পুণ্ড্রের রাজবংশ স্থাপন করেন।

তৃৎসুদিগের জনপতি সুদাস। তিনি পরুষ্ণীনদীতটে মহাযুদ্ধে অন্যান্য

নৃপতিবৃন্দকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদে মৎস্যগণেরও উল্লেখ আছে। তাহাদিগের সহিত তৃৎসুদিগের বিষম বিরোধ ছিল। ঋগ্‌বেদে ইক্ষ্বাকু রাজার নাম আছে। পরবর্তী যুগে ইনিই অযোধ্যার সূর্যবংশের বীজপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। যদিও এই রাজগণ পরস্পর নিকট জ্ঞাতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কখনই একতাবদ্ধ ছিলেন না। প্রায়ই তাঁহারা পরস্পরের সহিত রণপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতেন।

শাসন প্রণালী, সামাজিক বন্ধন ও ব্যবসাদি। কতকগুলি "গ্রাম" লইয়া একটি "বিশ্‌" হইত। কতকগুলি "বিশ্‌" লইয়া একটি "জনপদ" হইত। গৃহগুলি সাধারণতঃ কাষ্ঠনির্মিত হইত। প্রতি গৃহেই হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিত। শত্রুর আক্রমণ ও জলপ্লাবন হইতে রক্ষার নিমিত্ত প্রাচীরবেষ্টিত নগর বা "পুর" প্রস্তুত হইত। জনপদের অধিপতি রাজা নামে অভিহিত হইতেন। রাজপদ বংশানুক্রমে চলিত। কখনও কখনও বিশাম্পতিগণ "রাজা" নির্ণয় করিয়া লইতেন; কিন্তু রাজবংশীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন না। যুদ্ধের সময় রাজাই যুদ্ধনায়ক হইতেন। গায়কগণ রাজস্তুতি ও বন্দনা গান করিতেন। পুরোহিতেরা রাজার মঙ্গল কামনা করিয়া বিশেষতঃ যুদ্ধাদির পূর্বে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সকল রাজস্তুতি অনেক সময়ই অতিবর্ঞ্জিত হইত। পরিবার মধ্যে পিতাই "গৃহপতি" বা কর্তা ছিলেন এবং মাতা গৃহপত্নী বা গৃহিণী ছিলেন। ১০ম মণ্ডলের সূর্যা ও সাবিত্রীসূক্তে বিবাহের পর নববধূকে যে আশীর্বাদ করা হইয়াছে তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারি নববধূকে পতিগৃহে গিয়া কাহাদের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হইবে।

"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু। ১০ মং ৮৫।৪৬

স্বয়ম্বর প্রথাও প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়। তৎকালে বহু বিবাহ প্রথা সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। পূর্ণাবয়বা কন্যার ও বিবাহলক্ষণোপেত কন্যার বিবাহ হইত। ১০ মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ২১ ও ২২ ঋকে বিবাহদেবতা বিশ্বাবসুর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে যে "এক কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হইল, অন্য বিবাহলক্ষণযুক্তা পূর্ণাবয়বা কন্যার নিকট গমন করুন।" স্বয়ম্বর বিবাহে প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে কখনও যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। পুরুমিত্রের

কন্যা "কমদ্যু" "বিমদ"কে স্বয়ম্বরে বরণ করিয়াছিল। ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিগণ বিমদকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে কিন্তু অশ্বিদ্বয় কমদ্যুকে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।* বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। যাস্কের নিরুক্তে "দেবর" কথার ব্যাখ্যায় ঐ বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত আছে। নারীগণের শিক্ষার কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে বিশ্ববারা, আত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষী নারী আছেন।

আর্যসভ্যতার একটি বিশেষত্ব সতীত্ব। পাতিব্রত্য ও সতীত্ব আর্যসভ্যতার স্রোতকে যুগে যুগে পরিচালনা করিয়াছে। পরস্ত্রীসংসর্গ মহাপাতকের মধ্যে গণনীয় ছিল এবং পরস্ত্রীগামীর ও বলাৎকারীর গুরুতর দণ্ডের বিধান ছিল।

চৌর্য ও দস্যুতার কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে কিন্তু সাধারণতঃ গো মহিষাদি অপহরণেই উহা নিবদ্ধ ছিল। কখনও কখনও বিবাহযোগ্যা কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়া লইয়া তাহাকে বিবাহ করা হইত।

ঋণদান ও ঋণগ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল। অন্যের উপার্জিত ধন ভোগ করিয়া জীবনধারণ করা দুঃখজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। পৈতৃক ও স্বকৃত ঋণ পরিশোধ করা প্রধান কর্তব্য ছিল।

"পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি মাহং রাজন্নন্য কৃতেন তোজম্।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাস আ নো জীবান্বরুণ তাসু শাধি॥"†

হে বরুণ, পূর্বপুরুষের ঋণ পরিশোধ করিতে দাও, আমরা সম্প্রতি যে ঋণ করিতেছি তাহাও পরিশোধ করিতে দাও। হে বরুণ, আমাকে যেন অন্যের উপার্জিত বিত্ত ভোগ করিতে না হয়। হে বরুণ, আমাদের পক্ষে (ঋণী থাকা হেতু) অনেক উষাই যেন উদিত হয় নাই। আমরা যেন সকল উষাতেই জীবিত থাকিতে পারি এরূপ আজ্ঞা কর।"

ঋগ্‌বেদের কালে জাতিভেদ আদৌ ছিল না একথা বলা যায় না। তৎকালে গুণ-কর্ম বিভাগ দ্বারাই জাতি নির্দেশিত হইত। পরবর্তী যুগে বংশক্রমে জাতিভেদের দৃঢ়তা জন্মিয়াছে। ঋগ্‌বেদের বহু বংশের একধারা ক্ষত্রিয় ও অপরধারা বৈদিক ঋষি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

* ঋ ১ মং ১১৬।১

† ঋ ২মং ২৮।৯

মৃত্যু হইলে মৃতদেহ ভস্মীভূত করা হইত। দাহনের পরে অস্থি সংগ্রহ করিয়া প্রোথিত করা হইত।

"উচ্ছ্বং চমানা পৃথিবী সুতিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপহি শ্রয়ন্তাম্।

তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সংত্বত্র॥ ঋ ১০মং ১৮।১২

এই ঋকৃটি অদ্যাপি অস্থিসংগ্রহকালে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ এই ঋকৃটি হইতে মনে করেন যে মৃত দেহকে প্রোথিত করিবার নিয়ম ছিল কিন্তু ইহার প্রয়োগ দৃষ্টে তাহা প্রমাণিত হয় না। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা হইত এবং উহা অবশ্য কর্তব্য ছিল। ঋগ্বেদের যুগে নৌবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, রথপরিচালন, নাপিতের ক্ষৌরকার্য, কুম্ভকারের মৃৎপাত্রনির্মাণ, তন্তুবায়ের বস্ত্রবয়ন, ত্বষ্টার কাষ্ঠদ্রব্য নির্মাণ, কর্মকারের অলঙ্কার ও লৌহ দ্রব্য নির্মাণ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। পশুহননকারিগণ হত পশুর চর্ম উঠাইয়া লইয়া তাহা রৌদ্রে বিস্তৃত করিত।* ঋগ্বেদের কালে যুদ্ধ ও অশ্বারোহণ অতি আবশ্যকীয় বিদ্যা ছিল। যুদ্ধকালে ধনুঃ ও তূণীর ব্যবহৃত হইত। ঐ তূণীর মধ্যে বহু বাণ থাকিত। তূণীর যোদ্ধার পৃষ্ঠদেশে নিবদ্ধ থাকিত। বাণের পুচ্ছে পক্ষিপুচ্ছ থাকিত ও বাণের অগ্রভাগে মৃগদন্ত বা লৌহফলক থাকিত। ধনুকের ছিলা বা জ্যা গরুর স্নায়ুদ্বারা নির্মিত হইত। যুদ্ধে অশ্ব ও রথ ব্যবহৃত হইত।†

গীত, বাদ্য, নৃত্যও আর্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দুন্দুভি, বাণ ও বীণার নাম দৃষ্ট হয়। পাশক্রীড়া তৎকালে প্রচলিত ছিল। উহা অতি সাধারণ ব্যসন ছিল। ঐ ব্যসনে অনেকের সর্বনাশ হইত। "বিভীদক" (বর্তমানে বিভীতক=বহেড়া) বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা পাশ প্রস্তুত হইত। কোন কোনও সূক্তে ঐ পাশক্রীড়ার সময় মানসিক উদ্বেগ, আশা ও নিরাশা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে।(৩)

* ঋ ৫মং ৮৫।১

† ঋ ৬মং ৭৫।৫।১১

(৩) ঋ ৫মং ৮৫।৮

সপ্তম অধ্যায়

বৈদিকধর্ম, দেবতা, দর্শন ও কাব্য

সরলমতি আর্যগণের হৃদয়ে প্রকৃতিদেবীর বিশালশক্তিনিচয়, ও তাঁহার ভীষণ ও কোমল মূর্তি স্বতঃই ভক্তি, ভীতি ও বিস্ময় সঞ্চার করিত। ঐশ শক্তির ও ঐশ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের আহ্বান ও পূজা এবং ঐ সকল শক্তির আহ্বান ও পূজাকালে তাঁহাদের প্রসন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি সম্পাদন করাই বৈদিক ধর্মের মূলভিত্তি। আর্যজাতির নবোন্মেষকালে তাঁহারা কখনও "জগজ্জ্যোতি" উষার মূর্তি দেখিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন, কখনও প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল ও চকিত হইতেন। পার্বত্যপ্রদেশে উষার বিমল অলক্তকভাতি, উদীয়মান সবিতার বরেণ্যজ্যোতি, মেঘের বজ্রনির্ঘোষ ও বারিবর্ষণ, মরুদ্‌গণের প্রচণ্ড বিক্ষোভ, দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যবর্তী অনন্তপ্রদেশে আবর্তমান "গ্রহ চন্দ্র তারা", অমৃতবর্ষী মেঘ, কল্লোলনাদী বিশাল সিন্ধুনদ, শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা, এই সকলেরই অন্তরালে এক এক ঐশীশক্তি (দেবতা) বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং ঐ সকল বিভিন্ন শক্তি একই মহতীশক্তির স্ফুরণ, ইহাই আর্যজাতির ধর্মবিশ্বাসের মূল। আর্যগণ ঐ সকল ঐশীশক্তির অভিমানিনী দেবতাদিগকে সর্বদাই প্রাণের আবেগের সহিত আহ্বান করিতেন, তাঁহাদের প্রীতির জন্য "যজ্ঞের হোতা ও সম্রাট," অগ্নিতে ঘৃতাদি উৎসর্গ করিতেন এবং আর্যগণ সরল বিশ্বাসে তাঁহাদিগের নিকট গো, অশ্ব, ধন, সম্পদ্, দীর্ঘজীবন, পুত্র পৌত্রাদি যাচ্ঞা করিতেন। তাঁহাদিগের ঐশী শক্তির ও করুণার উপর আর্যগণের অচল বিশ্বাস ছিল।

মহর্ষি যাস্ক তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থের দৈবতকাণ্ডের চতুর্থ সূত্রে বলিয়াছেন :—

"যৎকামা ঋষির্যস্যাং দেবতায়াং আর্থপত্যম্ ইচ্ছন্

স্তুতিং প্রযুংক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি"।

যে ঋষি যে অভিপ্রায়সিদ্ধিজনক দেবতার স্তুতি করিতেন সেই সেই স্তুতি ঐ দেবতার মন্ত্র। যাস্কাচার্য দেবতাগণকে সাধারণতঃ লোকক্রমে তিনভাগে

বিভক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীলোকের দেবতা, অন্তরীক্ষলোকের দেবতা ও দ্যুলোকের দেবতা (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ)।* ঐ সকল দেবতার কেহ একাই স্তুত হইয়াছেন, কখনও কখনও দেবতাযুগ্ম বা বহুদেবতা স্তুত হইয়াছেন। মিত্র বরুণের সহিত, পূষন্ রুদ্রের, সোমের, বা অগ্নির সহিত, পর্জন্য বায়ুর সহিত, চন্দ্রমা বায়ুর বা সংবৎসরের সহিত স্তুত হইয়াছেন। সকল মরুদ্গণ ও বিশ্বেদেবগণ সমষ্টিভাবে স্তুত হইয়াছেন।

ঋগ্‌বেদে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশটী উক্ত হইয়াছে। "যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ" ৮মং।৩০।২। কিন্তু কোনও কোনও স্থানে ঐ তেত্রিশটীর বহির্ভূত বহু দেবতার নাম আছে, কারণ যে কোনও প্রকার শক্তিরই অভিমানিনী দেবতাকে আহ্বান করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি যাস্ক প্রভৃতি নৈরুক্তগণ দেবতাগণকে লোক অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। "অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থান." যাস্ক ৭।২। দ্যুলোকের দেবতা মধ্যে দ্যৌঃ সবিতা, সূর্য, মিত্র পূষন্ বিষ্ণু ও উষাই প্রধান। উষার আহ্বান-সঙ্গীতে আর্য ঋষিগণের কবিপ্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। দেবতাগণের মধ্যে কয়েকটির প্রকৃতি বা ঐশভাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বরুণ। বৈদিকসূক্তে বরুণ কেবল জলদেবতা নহেন। তিনি জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ ও নৈতিক জগতের সম্রাট্। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি অপরিসীম। তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি জানেন, তাঁহার মহিমায় নদী সকল প্রবাহিত হয়ঃ—

"বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাম্। বেদ নাব সমুদ্রিয়ঃ।
বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজায়ত। বেদা য উপজায়তে॥

১মং ২৫।৭—৮।

"যিনি অন্তরীক্ষে পক্ষিগণের গতিপথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা-সমূহের গতিপথ অবগত আছেন; যিনি ধৃতব্রত হইয়া নিজ নিজ ফলোৎপাদী দ্বাদশটী মাসকে জানেন, যিনি আগন্তুক (মলমাস) মাসকে জানেন"। পরবর্তী যুগে বরুণদেবতা কেবল জলাধিপতি বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন।

* "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ" ৭।১

ইন্দ্র। ঋগ্‌বেদ যুগে ইন্দ্র একটী প্রধান দেবতা। তিনি বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছেন, অহিকে হনন করিয়াছেন, তাহাতে বৃষ্টিধারা পতিত হইয়াছে। তিনিই জলস্রোতের পথ খনন করিয়াছেন। তিনি পণিকর্তৃক অপহৃত ও লুক্কায়িত গাভীগুলিকে জয় করিয়া আনিয়াছেন। তিনি, স্থাবর জঙ্গম, শান্তপশু, শৃঙ্গীপশুদিগের রাজা, তিনি মনুষ্যদিগের রাজা; চক্রের নেমি যেরূপ মধ্যস্থ কাষ্ঠগুলিকে ধারণ করে, তিনি তেমনি সকলকে আপনার মধ্যে ধারণ করেন। তিনি সোমকে জয় করিয়াছিলেন। পৌরাণিক যুগে তিনি ত্রিদিবাধিপতি শচীপতি দেবরাজ হইয়াছেন।

অগ্নি। অগ্নি যজ্ঞের হোতা এবং সম্রাট্। "হোতা বিদথেষু সম্রাট্" ৩মং ৫৫।৭।৮ ঋগ্‌বেদের ১ম মণ্ডলের ১ম সূক্তের দেবতা অগ্নি। তিনিই যজ্ঞের "পুরোহিত" এবং "হোতা"। "অগ্নিমীলে পুরোহিতং * * হোতারম্ রত্নধাতমম্" ১মং ১।১। তিনি সকল দেবতার মুখপাত্র ও তাঁহাদের নিকট হব্য বহন করিয়া লইয়া যান। অগ্নি সমিদ্ধ না হইলে যজ্ঞ হইতে পারে না। অগ্নির ত্রিমূর্তি—পৃথিবীতে অগ্নি, আকাশে বিদ্যুৎ, স্বর্গে জ্যোতি। প্রায় ২০০ সূক্তে অগ্নি স্তুত হইয়াছেন। তিনি যজ্ঞবেদীতে, বনমধ্যে, আকাশে, স্বর্গলোকে সর্বত্রই থাকেন। অগ্নি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলিত করেন। "সং জাম্পত্যং সুযমমা কৃণুষ" ৫ মং ২৮।৩। অগ্নির মঙ্গলময়ীমূর্তি মৃতব্যক্তিকে পুণ্যবান্ লোকদিগের ভুবনে লইয়া যান।

"যাস্তে শিবা স্তম্বো জাতবেদাস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামুলোকম্"।

১০ম ১৬।৪।

এই অগ্নি সমিদ্ধ হইয়া গার্হস্থাশ্রমে সর্বদা বাস করেন। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের সময় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত তাহা নির্বাপিত করা হইত না।

সূর্য, সবিতা, পূষা। এই তিন দেবতা একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ। সূর্যমণ্ডলের যে শক্তি সর্বভূতকে রক্ষা করেন তিনিই পূষা। "সর্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতা আদিত্যঃ"। তাঁহার অপর নাম "ইলস্পতি" ও "পুরূবসু"। তিনি কুটিলাচারী ও দুষ্টাচারীদিগকে পথ হইতে বিদূরিত করেন; সুখগম্য ও শোভনীয় পথদ্বারা তৃণযুক্তদেশে লইয়া যান। তিনি পথপ্রদর্শক দেবতা। তিনি বিশ্ব দর্শন করেন ও নরগণকে রক্ষা করেন।

সূর্যের যে শক্তি মানবগণকে প্রেরণা শক্তি প্রদান করেন তিনিই সবিতা। আর্যগণ যে গায়ত্রীমন্ত্র প্রত্যহ জপ করেন তাহা ঐ সবিতার উদ্দেশ্যে রচিত। ঐ ঋকের পূর্ব ঋকে পূষা স্তুত হইয়াছেন :—

যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা স চ পশ্যতি।
স নঃ পূষাবিতা ভুবৎ ॥
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

৩মং ৬২।৯-১০।

বিষ্ণু। বিষ্ণু ঋগ্‌বেদের অনেক সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। কোনও কোনও স্থানে তিনি আদিত্যের সহিত অভিন্নরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন, কোথাও বা তিনি সূর্যরশ্মির সহিত ব্যাপ্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি সপ্ত কিরণের সহিত ভূপরিক্রম করেন, তিনি রক্ষক, তিনি ধর্ম ধারণ করেন, তিনি ইন্দ্রের সখা। তিনি ত্রিপদে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ১ম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৬—২১ ঋকে বিষ্ণুর স্তুতি আছে। "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং" এই ঋকের ব্যাখ্যায় যাস্ক, ঔর্ণবাভ ও শাকপূণি এই "ত্রেধা" কি তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তিনি যে আদিত্য তৎসম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই। এই সবব্যাপক বিষ্ণু পরবর্তী যুগেও সর্বময় সর্ব দেবাধিপতি বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। অদ্যাপি আচমনকালে ঐ সূক্তের ২০ ঋক্ উচ্চারিত হয় :—

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

রুদ্র। তিন চারিটী সূক্তে রুদ্রের স্তুতি আছে। একস্থানে "শিব" (মঙ্গলময়) এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি "স্থিরধনুঃ" ও "ক্ষিপ্রেষুঃ" "তিগ্মায়ুধঃ"। বজ্রও তাঁহার একটী অস্ত্র। তাঁহার মূর্তি ভীষণ কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অমঙ্গলের আধার নহেন। তিনি চিকিৎসক, "সহস্রংতে স্ববিপাত ভেষজা মা ন স্তোকেষু তনয়েষুরীরিধঃ" পরবর্তী যুগেব রুদ্রের সহিত কোনও কোনও বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। রুদ্র শিবের ভীষণ মূর্তি।

অশ্বিদ্বয়। অশ্বিদ্বয়ের অপর নাম "নাসত্যা"। এই দেবযুগল চির-সুন্দর চিরযুবক। সূর্যর সহিত একই রথে আরোহণ করেন। ঐ রথের

বাহক গর্দভ (রাসভ)। ইঁহারা দেবচিকিৎসক বলিয়া বিখ্যাত; বৃদ্ধ চ্যবনমুনিকে যৌবন ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। "যুবং চ্যবানং জরসোঽমুমুক্তং" ৭মং ৭১।৫। ঋজ্রাশ্ব অন্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে দৃষ্টিদান করিয়াছিলেন ১মং ১১৬।১৬। বিশ্‌পলার ছিন্নপদের পরিবর্তে লৌহনির্মিত পা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ঋ ১।১১৬।১৫।

উষা। দেব দুহিতা উষার মনোহর মূর্তি বহু বৈদিক প্রাচীন ও নবীন ঋষিগণের হৃদয় কবাট খুলিয়া দিয়াছিল! পূর্বকালের ঋষিগণও উষাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, নবীন ঋষিগণের আহ্বানেও সন্তুষ্ট হও।

"যে চেদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব উতয়ে জুহুরেঽবসেমহি।
সা নঃ স্তোমাঁ অভি গৃণীহি রাধ সোষঃ শুক্রেণ শোচিষা॥　১মং ৪৮।১৪।

রাত্রি অবসানে উষার অলক্তকভাতি জীবজগৎকে জাগরিত করে, তাহার প্রত্যেক আগমনে জীব দিনে দিনে জরা প্রাপ্ত হয় কিন্তু উষা চিরযুবতী। উষার রমণীয় কান্তি অন্ধকার দূর করে; উষা জ্যোতিদ্বারা আকাশের দ্বার উন্মোচন করে। ঋগ্‌বেদের উষার সূক্তগুলিতে হৃদয়গ্রাহী কবিত্ব দৃষ্ট হয়।

পরলোক। মৃত্যুর পর মানুষের পার্থিব দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, এবং জন্মমরণ বিবর্জিত চিরন্তন অংশ (আত্মা) পুণ্যবান্ লোকদিগের ভুবনে যায়, আর্যগণ ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন। আত্মা পিতৃলোকে গমন করে। যম পিতৃলোকে তাহাকে স্থান প্রদান করেন। আর্যগণ মৃতদেহ সংকারের সময় যে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করেন তাহাতে ইহাই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে মৃত্যুর পর আত্মা পিতৃলোকে গমন করে। ঐ প্রয়াণপথকে পিতৃযান বলে। পরে দেবযানে গিয়া দেবতাগণের বশবর্তী হইয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে।

শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽথে মেনং পরিদত্তাৎ পিতৃভ্যঃ।
যদা গচ্ছাত্যসুনীতি মেতামথা দেবানাং বশনী র্ভবাতি॥ ২
সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ॥ ৩
অজো ভাগস্তপ সা তং তপস্ব তংতে শোচিস্তপতু তংতে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদাভির্বহৈনং সুকৃতাম্ লোকম্॥ ৪

ঋগ্‌বেদ ১০মং ১৬। ২-৪;

হে অগ্নি! যখন ইহার দেহ উত্তমরূপে তুমি পক্ক করিবে তখন ইহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট দিবে; যখন ইনি পুনর্বার সজীবত্ব লাভ করিবেন, তখন ইনি দেবতাগণের বশতাপন্ন হইবেন। ২

হে মৃতব্যক্তি! তোমার চক্ষু সূর্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে গমন করুক। তুমি ধর্মকার্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে গমন কর। যদি জলে গেলে তোমার হিত হয় তবে জলে গমন কর; তোমার শরীর ওষধিতে অবস্থান করুক। ৩

মৃত ব্যক্তির যে ভাগ জন্মরহিত (অজ-নিত্য) তাহা তেজদ্বারা উত্তপ্ত কর, হে অগ্নি তোমার শিখা ও উজ্জলতা দ্বারা ঐ অংশকে উত্তপ্ত কর। হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময় (শিব) শক্তি আছে সেইগুলিদ্বারা এই মৃতব্যক্তিকে সুকৃতিপূর্ণ ভুবনে (লোক) লইয়া যাও। ৪

মৃত্যুর পর যম ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান এবং তাহাদের জন্য আবাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। যমই সেই স্থানের পথ দেখাইয়া দেন। মৃতব্যক্তি পরলোকে গিয়া যম ও বরুণকে দেখিতে পান।

যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বা॥ ২

*   *   *   *

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্যত্রা ন পূর্বে পিতরং পরেযুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদংতা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্॥

ঋগ্‌বেদ ১০মং ১৪।২-৭

আমরা কোন্ পথে যাইব প্রথমে তাহা যমই দেখাইয়া দেন; ঐ পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদের পূর্বপুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই নিজ কার্যফলানুসারে সেই পথে যাইবে। ২

আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন তুমিও সেই পথে যাও— তুমিও সেই পথে যাও। সেই দুই রাজা যম ও বরুণকে তথায় দর্শন কর, তাঁহারা দুইজন স্বধা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছেন। ৭

যমলোকের দ্বারে সরমার বংশীয় দুইটি কুকুর প্রহরীস্বরূপে আছে; তাহাদিগের দৃষ্টি কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। বিকট যমদূত সকল

আছে তাহারা সকলের নিকটই যায়। ঐ কুক্কুরদ্বয় ও যমদূতগণের কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্যগণ স্তুতি করিতেন।

"যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরিদেহি রাজনৎ স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ১১
উরূণসাবসুতৃপা উদুংবলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্যায় পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রম্ ॥ ১২

ঋগ্বেদ ১০মং ১৪। ১১-১২

হে যম! তোমার রক্ষক যে কুক্কুর দুইটি আছে, যাহাদের চারিটি করিয়া চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে, যাহাদের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই আসিতে হয়, তাহাদের কোপ হইতে মৃতকে রক্ষা কর। হে রাজন্, ইহাকে (মৃতব্যক্তিকে) কল্যাণভাগী ও নীরোগ কর। ১১

সেই দুই যমদূত যাহাদের নাসিকা উন্নত, যাহারা তৃপ্ত হয় না, যাহারা সকল ব্যক্তির পশ্চাদনুসরণ করে তাহারা যেন অদ্য আমাদিগকে এই স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে। আমরা যেন সূর্যের দর্শন লাভ করিতে পারি। ১২

স্বর্গলোক। স্বর্গধাম আলোকময় অমৃতময় ও অক্ষয় স্থান—তথায় জীবন অমর—তথায় মানুষের সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, তথায় নিরবচ্ছিন্ন আমোদ, আহ্লাদ ও আনন্দ বিরাজমান।

লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরিস্রব ॥ ৯

*　　*　　*　　*

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো পরিস্রব ॥ ১১

ঋগ্বেদ ৯মং ১১৩।৯—১১

যে স্থান সর্বদা আলোকময় (জ্যোতিষ্মন্ত) তথায় আমাকে লইয়া অমর (অমৃত) কর। ইন্দ্রের জন্য সোম রক্ষিত হও। ৯

যেখানে আনন্দ, আহ্লাদ, আমোদ বিদ্যমান আছে, যেখানে অভিলষিত কামনা পূর্ণ হয় সেখানে আমাকে লইয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য সোম ক্ষরিত হও।"

সৃষ্টি প্রক্রিয়া। এই বিচিত্র বিশাল বিশ্ব কিরূপে সৃষ্ট হইল এই বিষয়

সমস্যা বৈদিক আর্যগণের হৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল। সকল দেবতাগণও কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছেন তাহারও তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলেই বহুবিধ দার্শনিক তত্ত্বের সমাবেশ আছে। দেবগণের যুগের পূর্বেই বা কি সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং দেবগণের যুগেই বা কি সৃষ্ট হইয়াছিল, দেবগণই বা কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে আলোচনা আছে। ঋষিগণ, অদিতি হইতে দক্ষ এবং দক্ষ হইতে অদিতির উদ্ভব হওয়া এই বিপরীত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন (যেমন দিবস হইতে রজনী ও রজনী হইতে দিবস উদ্ভব হয়)

দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥ ২
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি ॥ ৩
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদদিতিঃ পরি ॥ ৪
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫

"দেবগণের পূর্ব যুগে অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিল। দেবদিগের যুগে প্রথমে অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিল তাহার পর (উত্তানপৎ) ঊর্দ্ধমূল আকাশ (বৃক্ষ, সায়ণাচার্য) জন্মিয়াছিল। উত্তানপদ হইতে ভূ (পৃথিবী) জন্মিয়াছিল। পৃথিবী হইতে দিক্ জন্মিয়াছিল। অদিতি হইতে দক্ষ উদ্ভূত হইয়াছিল এবং পরে দক্ষ হইতে অদিতির উদ্ভব হইয়াছিল। হে দক্ষ! তোমার দুহিতা অদিতি দেবদিগকে জন্ম দিয়াছিলেন ঐ অমৃতবন্ধু দেবগণ অদিতির পরে জন্মিয়াছিলেন"। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকার সমাধান আর্যগণ নিঃসংশয়রূপে করিতে পারেন নাই, উহা কেহই করিতে পারিবেন এরূপ সম্ভাবনা নাই। ঐ প্রহেলিকা কুজ্ঝটিকার ন্যায় মানবদৃষ্টি আবরণ করিয়া রহিয়াছে। এক মহান্ পরমাত্মা আছেন কেবল তিনিই ঐ সৃষ্টি প্রক্রিয়া জানেন। মানুষ কেবল জল্পনা কল্পনাই করিতে পারে।

"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ৎ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭

ঋগ্‌বেদ ১০মং ১২৯ ॥

এই সৃষ্টি কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, কে করিল, কেহ করিল বা না করিল তাহা কেবল তিনিই জানেন—এই সৃষ্টির অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে আছেন। তিনি না জানিলে কে জানিবে? সৃষ্টির পূর্বে কি ছিল তৎসম্বন্ধে ঐ দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের প্রথম ঋক্ দুইটিতে যে সুগভীর চিন্তা আছে তাহা অতি সুপ্রসিদ্ধ; পরবর্তী দর্শনও উহাই গ্রহণ করিয়াছে।

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥ ১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচনাস॥ ২

ঋগ্বেদ ১০মং ১২৯।১।২

প্রথমে এক হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন তিনিই পৃথিবী ও আকাশ যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

ঋগ্বেদ ১০মং ১২১।১

সেই অনাদি অযোনিসম্ভূত পুরুষের নাভিতে (ঊর্ণনাভের ন্যায়) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিহিত ছিল, কারণার্ণব ঐ গর্ভ ধারণ করিল এবং দেবতারা উহাতে মিলিত ছিল।

"তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবা সংগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ"।

ঋগ্বেদ ১০ মং ৮২।৭

নৈসর্গিক দৃশ্যগুলি ও প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় আর্যগণের নিকট দেবতা বলিয়া প্রতিভাত হইতেন কিন্তু ঐ সকল অভিমানিনী দেবতাগণ একই মহান্ পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ তাহাও আর্যেরা সম্যক্ প্রণিধান করিয়াছিলেন। "একং বা ইদং বি বভুব সর্বম্" ৮মং ৫৮।২ তিনি একই বিভিন্নরূপে উদ্ভূত হইয়াছেন। বামদেব ঋষি হংসবতী ঋকে পরমাত্মার বিভিন্ন মূর্তি সর্বত্র বিদ্যমান দেখিয়াছেন :—

"হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্ বৃহৎ॥

ঋগ্বেদ ৪মং ৪০।৫

"তিনি সূর্যরূপে (হংস) আকাশে থাকেন, বসুরূপে অন্তরীক্ষে থাকেন, হোতারূপে বেদিস্থলে, অতিথিরূপে গৃহে, মানুষরূপে, বরণীয়স্থানে, যজ্ঞস্থলে, অন্তরীক্ষস্থলে অবস্থান করেন ; তিনি জলে জন্মিয়াছেন, কিরণে জন্মিয়াছেন, সত্যে জন্মিয়াছেন, অদ্রিতে জন্মিয়াছেন এবং তিনিই সত্য।"

পুরুষ সূক্তে (১০মং ৯০ সূক্ত) ঐ বিরাট সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ পুরুষ হইতেই এই বিশ্ব উদ্ভূত এবং ঐ বিরাট পুরুষই সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। তিনিই ঋক্, যজুঃ সাম ; তাঁহার দেহ হইতেই ব্রাহ্মণ. রাজন্য (ক্ষত্রিয়) বৈশ্য ও শূদ্র উদ্ভূত হইয়াছে।

সস্রহশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ. সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্। ১
ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যতে পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ।·৫
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিবে।
ছন্দাংসি জজিবে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ্জায়ত। ৭
ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্ বাহু বাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শদ্রো অজায়ত। ১১

প্রসিদ্ধ দেবী সূক্তে এক মহাশক্তি জগদীশ্বরীই সর্বদেবে, সর্বকার্যে, সর্বযজ্ঞে ও সর্বশক্তিতে বিদ্যমানা। তিনিই জগৎসৃষ্টিকালে বায়ুরূপে প্রবাহিত হন, তিনিই পৃথিবী ও আকাশের পরেও আছেন, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপিণী, তাঁহার অসীমতা সর্বত্র।

অহং রুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রা বরুণোভা বিভর্ম্যহম্ ইন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈংশৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবংতে বদামি॥ ৪
অহমেব বাতইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সম্বভূব॥ ৮

বৈদিক আর্যগণ বিশ্বাস করিতেন যে সত্য ও ঋত এই বিচিত্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। হংসবতীঋকেও ঐ সত্য ও ঋতের উল্লেখ আছে। দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে উক্ত হইয়াছে :—

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ॥

সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, সূর্য স্বর্গকে (দ্যৌঃ) উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, ঋতপ্রভাবে আদিত্য সকল আকাশে অবস্থিত আছেন; তাহারই প্রভাবে চন্দ্র (সোম) সেই স্থান আশ্রয় করিয়াছেন।

অদৃষ্টবাদ। দেবতাগণের উপর আর্যগণ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। ঐশীশক্তির স্তুতিতেই ঋগ্‌বেদ পরিপূর্ণ। দেবগণের উপর অসীম নির্ভরতার ফলেই অদৃষ্টবাদ অতি প্রাচীন কালে মানবহৃদয় অধিকার করিয়াছিল।

মানুষের কোনও শক্তিই নাই, অদৃষ্টচক্র অনুসারেই জীবনের পথ নির্দিষ্ট হয় এই দৃঢ় বিশ্বাস ঋগ্‌বেদেই দৃষ্ট হয়:—

"ন স স্বোদক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ"

হে বরুণ, কাহারও স্বকীয় শক্তি নাই, অদৃষ্টচক্রই সুরাসক্তি, ক্রোধশীলতা, পাশক্রীড়ারূপ ব্যসন ও চিত্তের দৌর্বল্য আনয়ন করে ও তাহা হইতেই জীবনের দুঃখ আইসে।

কাব্য

আর্য ঋষিগণ মানসনেত্রে প্রকৃতির শক্তিনিচয় ও মূর্তি সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত, পুলকিত ও স্তম্ভিত হইতেন। প্রকৃতির মনোহর মূর্তি সন্দর্শনে তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত। সোমরস তাঁহাদের হৃদয়ের কবাট উন্মোচন করিয়া আনন্দ উৎসে লইয়া যাইত। প্রকৃতির ভীষণ-মূর্তি ও তাণ্ডব নৃত্য তাঁহাদিগের হৃদয়ে ভয় ও উদ্বেগ সঞ্চার করিত ও নির্ভরশীলতা আনয়ন করিত। প্রকৃতির গম্ভীর মূর্তি তাঁহাদিগের হৃদয়ে গভীর-তত্ত্বগুলির প্রেরণা করিত। এই সকলই কাব্যের অনুকূল। আর্য ঋষিগণের সরল হৃদয়-উৎস হইতে যে ভাবমন্দাকিনী প্রবাহিত হইত তাহা কাব্যাংশে মনোহর না হইয়াই পারে না। ঐ কাব্যে আন্তরিকতা ও সরলতাই স্বাভাবিক। উপমা ও রূপকগুলি বাস্তব জীবনের ঘটনা ও দৃশ্য ও অনুভূতি হইতে গৃহীত হওয়ায় অতি উপাদেয় ও মনোরম হইয়াছে। "অর্থ" "যশসং বীরবত্তমম্" (উহা যশস্কর ও বীরত্বপ্রদ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে; "দিবীব

চক্ষুরাততম্" ১।২২।২০, "হিরণ্যমিব রোচতে" ১।৫৩।৫, "মাতা চ যত্র দুহিতা চ ধেনূ সবর্দুঘে ধাপয়তে সমীচী" ৩।৫৫।১২ [মাতা (পৃথিবী) ও দুহিতা (দ্যুলোক) ক্ষীরদায়িনী ধেনুর ন্যায় অন্তরীক্ষে মিলিত হইয়া পরস্পরকে রসপান করাইতেছে]; যূথে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠসে" ৯।১১০।৯ যূথমধ্যে বৃষের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকে]; বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের সমস্বরে পাঠগ্রহণ বর্ষাকুতূহলী ভেকগণের সঙ্গীতের ন্যায়, এই সকল উপমা ও রূপকে সরসতা আছে।

উষার স্তুতিবাচক যে সকল সূক্ত আছে তাহাতে আর্যঋষিগণের কবিত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ঐ সকল মনোরম শ্লোকগুলি বর্তমান যুগেও আদরণীয় হইয়াছে। অবশ্য বহু ঋষি বহুভাবে বহুসূক্তে উষা, বরুণ, ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয়, সোম ও অন্যান্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে স্তব স্তুতি দ্বারা প্রীত করিয়া বরভিক্ষা করিয়াছেন। তাহার ফলে প্রত্যেক দেবতার স্তুতি কালেই তিনি শ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। এই অতিরঞ্জন দোষ ঋষিগণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই—কারণ স্তুতিকালে ঐ দেবতাই তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। অনেক স্থলে এক প্রকার কার্যের যশই অনেক দেবতায় আরোপিত হইত। এই সকল পুনরুক্তি দোষ বশতঃ অনেক স্থল ক্লান্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি "চাতকের প্রতি" অথবা "কোকিলের প্রতি" শীর্ষক জগতের সাহিত্যের অতি উৎকৃষ্ট কবিতাগুলিও একস্থানে সংগৃহীত হয় তাহা হইলে ঐ প্রকারই ক্লান্তিজনক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ

ইতিপূর্বেই বেদের শাখাভেদ উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার একখানি করিয়া **ব্রাহ্মণ** ছিল। ব্রাহ্মণভাগ সংহিতা হইতে পৃথক্ গ্রন্থ। বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়া প্রণালী, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় এবং ব্যাখ্যা ও আখ্যানাদি বর্ণনা করাই ব্রাহ্মণগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। স্থানে স্থানে আনুষঙ্গিক ব্যাকরণাদি ও অবান্তর তত্ত্বও আছে। এই ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ গদ্যে রচিত কিন্তু কোন কোন স্থানে "গাথা" বা পদ্যময় অংশও আছে। এই ব্রাহ্মণের শেষাংশ **আরণ্যক** নামে অভিহিত। আরণ্যকের শেষ ভাগ **উপনিষৎ**। আরণ্যকগুলি গার্হস্থ্যাশ্রমের অবসানে নিভৃত অরণ্যে আচরিত বা পাঠ্য ছিল বলিয়া আরণ্যক নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত যজ্ঞপ্রণালী নিরূপিত হইতে পারিতনা, তজ্জন্য প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখাধ্যায়িগণেরই একখানি ব্রাহ্মণ ছিল। ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারাই ঐ শাখাবলম্বী আর্যগণের যাগ যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু কালক্রমে একই বেদের কোনও কোনও শাখাবলম্বীরা অপর শাখার ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিয়াছে এরূপ প্রমাণ আছে। সম্ভবতঃ ঐ শাখাবলম্বীদিগের ব্রাহ্মণের সহিত গৃহীত ব্রাহ্মণের বিশেষ পার্থক্য ছিল না অথবা ভিন্ন ভিন্ন শাখাধ্যায়ীরা তাহাদিগের শাখাগুলির মধ্যে যে ব্রাহ্মণখানি উৎকৃষ্ট এবং মান্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহাই গ্রহণ করিতেন। কেহ কেহ মনে করেন যে দুর্বল শাখাধ্যায়ীরা কোন প্রবল শাখাধ্যায়িগণের সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ প্রবল শাখার ব্রাহ্মণই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তজ্জন্য দুর্বল শাখার ব্রাহ্মণ কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণভাগে তিনটি বিষয় থাকে। (১) যজ্ঞপ্রণালী বা যজ্ঞবিধি (২) অর্থবাদ বা ব্যাখ্যা, (৩) উপনিষৎ বা ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রাহ্মণভাগে যে যজ্ঞ প্রণালীর সকল বিবরণই আছে তাহা নহে। যাঁহারা যজ্ঞপ্রণালী মোটামুটি অবগত আছেন তাঁহাদিগকে সাহায্য করাই ও যজ্ঞতত্ত্বাদির বিচার করাই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য তজ্জন্য অনেক সাধারণ বিষয় ব্রাহ্মণে উক্ত হয় নাই।

ব্রাহ্মণগুলি সংহিতার ন্যায় উদাত্তাদি স্বরক্রমে উচ্চারিত ও উহা কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণকর্তৃক ঈশ্বরের নিশ্বসিত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু দয়ানন্দ সরস্বতী বলেন কাত্যায়ন ব্যতীত অন্য কোনও ঋষি ব্রাহ্মণগ্রন্থকে বেদ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না।*

সকলগুলি ব্রাহ্মণই সমকালীন নহে। বৈদিক সাহিত্যে যজুর্বেদের গদ্য অংশই সর্বপ্রাচীন। সকল ব্রাহ্মণই যজুর্বেদের গদ্য অংশ অপেক্ষা অর্বাচীন। সামবেদের **পঞ্চবিংশ** ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণযজুর্বেদের **তৈত্তিরীয়** ব্রাহ্মণ অন্যান্য ব্রাহ্মণগুলি হইতে প্রাচীন। ঐ দুইখানি ব্রাহ্মণের ভাষা অতি প্রাচীন এবং ঐ দুইখানি ব্রাহ্মণে স্বরগুলি সংহিতা ভাগের ন্যায় উদাত্তাদি স্বরচিহ্নযুক্ত আছে। সামবেদীয় **জৈমিনীয়** ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদীয় **কৌষীতকি** ব্রাহ্মণ ও ঋগ্বেদীয় **ঐতরেয়** ব্রাহ্মণ, "পঞ্চবিংশ" এবং "তৈত্তিরীয়" ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অর্বাচীন বলিয়া বোধ হয়। শুক্ল যজুর্বেদীয় **শতপথ** ব্রাহ্মণ ঐগুলি অপেক্ষাও পরে সংকলিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্ভবতঃ সর্বশেষে অথর্ববেদীয় **গোপথ** ব্রাহ্মণ এবং সামবেদীয় ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণগুলি রচিত হইয়াছে। আরণ্যকভাগ মূল ব্রাহ্মণ ভাগের পরে রচিত বলিয়া বোধ হয়। আরণ্যকাংশ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী শৃঙ্খল। ব্রাহ্মণভাগে বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যাখ্যান ও তত্ত্ব, উপনিষদে গভীর ব্রহ্মতত্ত্বচিন্তায় পরিপূর্ণ। উপনিষদের পরমাত্মা সম্বন্ধীয় গভীর চিন্তাপূর্ণ আলোচনা জগতের অন্য কোনও সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না।

ঋগ্‌বেদীয় ব্রাহ্মণ

ঋগ্‌বেদের দুইখানি ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে **ঐতরেয়** ব্রাহ্মণই প্রধান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮টি পঞ্চিকা আছে; প্রত্যেক পঞ্চিকায় ৫টি করিয়া অধ্যায়; সর্বশুদ্ধ ৪০টি অধ্যায়। শেষ দশটি অধ্যায় পরে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে ঐ দশটি অধ্যায়ের তুল্য কোনও অধ্যায় নাই।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে সোমযজ্ঞ বিবৃত হইয়াছে। ১ হইতে ১৬ অধ্যায়ে একদিনব্যাপী "অগ্নিষ্টোম", ১৭ হইতে ১৮ অধ্যায়ে বর্ষব্যাপী "গবাময়ন"

* দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত ঋগ্‌বেদভাষ্য ভূমিকা (বঙ্গানুবাদ) ৮৯ পৃষ্ঠা

এবং ১৯ হইতে ২৪ অধ্যায়ে "দ্বাদশাহ্" যজ্ঞ বর্ণিত আছে। ২৫ হইতে ৩২ অধ্যায়ে "অগ্নিহোত্র" উক্ত হইয়াছে এবং ৩৩ হইতে ৪০ অধ্যায়ে "রাজ্যাভিষেক" প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

ঐতরেয় আরণ্যকে ৫টি ভাগ আছে, প্রত্যেকটিকেই "আরণ্যক" বলে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় আরণ্যকের ৪ হইতে ৬ অধ্যায়কে **ঐতরেয় উপনিষৎ** বলে। উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে জগতের উৎপত্তি কথা, ২য় অধ্যায়ে জীবের জন্ম এবং ৩য় অধ্যায়ে পরম ব্রহ্মের তত্ত্ব আছে।

এই ব্রাহ্মণের ৭ম পঞ্চিকার ৩য় অধ্যায়ে হরিশ্চন্দ্র রাজার, রোহিতাশ্বের ও আজীগর্ত্ত ঋষির পুত্র শুনঃশেপের কাহিনী আছে। শেষ অধ্যায়গুলিতে পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়, মনুপুত্র শার্যাত, পিজবনপুত্র সুদাস, দুষ্মন্তপুত্র ভরত প্রভৃতি রাজার উল্লেখ আছে। ঐ কালে আর্যাবর্তের পূর্ব সীমায় বিদেঘ (বিদেহ), দক্ষিণে ভোজরাজ্য, পশ্চিমে নীচ্য ও অপাচ্যদিগের রাজ্য, উত্তরে উত্তরকুরু এবং মধ্যদেশে কুরুপঞ্চালদিগের রাজ্য থাকা উল্লিখিত আছে।

ঋগ্‌বেদের অপর ব্রাহ্মণ খানির নাম **শাঙ্খায়ন** বা **কৌষীতকি ব্রাহ্মণ**। এই ব্রাহ্মণখানি ৩০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে নৈমিষারণ্যের প্রসিদ্ধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে এবং ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। কৌষীতক এই ব্রাহ্মণের প্রধান উপদেষ্টা; তাঁহার নামানুসারে কৌষীতকি নাম হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণখানিতে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের বিষয়ীভূত যজ্ঞগুলির বর্ণনা আছে, কিন্তু বর্ণনাগুলি অধিকতর বিস্তীর্ণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ ১০ অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়গুলি কৌষীতকি ব্রাহ্মণে নাই।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণের সময়ে কাশ্মীরাদি উত্তর প্রদেশই বিদ্যাপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ দেশে অধীতবিদ্য পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে সম্মানিত ও সমাদৃত হইতেন।* পরবর্তী কাব্য যুগেও কাশ্মীরই সরস্বতী পীঠ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণের শেষভাগ কৌষীতকি আরণ্যক। কৌষীতকি

* "তস্মাদ্ উদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বা গুহ্যত উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুং যো বা ওত আগচ্ছতি তস্য শুশ্রূষন্ত ইতি" শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণ। ৭ অঃ।৬

আরণ্যকে ১৫টি অধ্যায় আছে। উহার ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় **কৌষিতকি উপনিষৎ**। ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিপি পুস্তকে এই উপনিষদের অধ্যায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, আরণ্যকভাগ রচিত হইবার পর ঐ উপনিষদ্ ভাগ পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে তজ্জন্য উহার স্থান সুদৃঢ়ভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই।

এই উপনিষদের ১ম অধ্যায়ে ক্ষত্রিয়রাজ চিত্রগাঙ্গয়নি, আরুণি উদ্দালক নামক ব্রাহ্মণকে পরলোক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। ৩য় অধ্যায়ে ইন্দ্র কাশীরাজ দিবোদাসকে প্রাণ ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন এবং ৪র্থ অধ্যায়ে ক্ষত্রিয় কাশিরাজ আনূচান গার্গ্যবালাকিকে (ব্রাহ্মণকে) পরব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই কালে জাতিভেদ দৃঢ় হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণেরাই কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের উপদেষ্টা ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের শিক্ষা ও দীক্ষা "প্রতিলোম" বলিয়া গণ্য হইত। বালাকি যখন "সমিৎপাণি" হইয়া গিয়া অজাতশত্রুর নিকট বলিলেন, "আমি শিষ্যের ন্যায় আপনার নিকট আসিয়াছি", অজাতশত্রু বলিলেন, "ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিবেন ইহা আমি প্রতিলোম ব্যবহার মনে করি।"

"তত উ হ বালাকিঃ সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রম উপায়ানীতি। তং হোবাচা জাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেব তন্মধ্যে যৎক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণমুপনয়েতৈহি।"

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণযজুর্বেদে ব্রাহ্মণভাগ সংহিতার সহিত বিজড়িত ভাবে আছে; তথাপি কৃষ্ণযজুর্বেদের পৃথক্ ব্রাহ্মণও আছে। সম্ভবতঃ শুক্লযজুর্বেদে সংহিতা হইতে ব্রাহ্মণ ভাগ পৃথক্কৃত হওয়ার পর কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ পৃথক্ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। **তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণই** যজুর্বেদের সর্বপ্রধান ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তিনটি খণ্ড আছে। প্রত্যেকটি খণ্ড অনেকগুলি প্রপাঠকে বিভক্ত। উহার আরণ্যকভাগ ১০টি প্রপাঠকে বিভক্ত। ঐ ১০টি প্রপাঠকের মধ্যে ৭ম, ৮ম ও ৯ম প্রপাঠক **তৈত্তিরীয় উপনিষৎ**। ১০ম প্রপাঠকটি **মহানারায়ণ উপনিষদ্** নামে খ্যাত; উহার অপর নাম **যাজ্ঞিকী উপনিষৎ**। এই ১০ম প্রপাঠকখানি পরবর্তীযুগে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

তৈত্তিরীয় সংহিতার মধ্যে যে গদ্যভাগ আছে তাহাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের "কঠ" ও মৈত্রায়ণীয়" শাখার কোনও পৃথক্ ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয় না। ঐ দুই শাখার সংহিতাভাগের গদ্যঅংশই ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রাহ্য। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় খণ্ডের শেষ তিনটি প্রপাঠক এবং আরণ্যকের প্রথম দুই প্রপাঠক সম্ভবতঃ মূলে কঠশাখাভুক্ত ছিল। প্রাতিশাখ্য ব্যাকরণে যে বিধান আছে তদনুসারে কঠশাখার বিহিত নিয়মানুসারেই ঐ সকল অংশে স্বরের পরিবর্তন ও সন্ধি হইয়াছে। বিশেষতঃ "নাচিকেত" অগ্নির উল্লেখ দৃষ্টেও বোধ হয় কঠোপনিষদের নচিকেতাই লক্ষ্যীকৃত হইয়াছে। **কঠোপনিষৎ** কঠশাখার উপনিষৎ।

মৈত্রায়ণীয় শাখার কোনও পৃথক্ ব্রাহ্মণ না থাকিলেও ইহার ৪র্থ অধ্যায়ে প্রথম তিন অধ্যায়ের ব্যাখ্যা আছে উহাই ব্রাহ্মণ ভাগ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ

শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম **শতপথব্রাহ্মণ**। এই ব্রাহ্মণখানি ১০০ অধ্যায়ে বিভক্তজন্য উহার নাম "শতপথ"। এই শতপথ ব্রাহ্মণের দুইটি সংস্করণ আছে। মাধ্যন্দিনী শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে ১৪টি কাণ্ড আছে এবং ১০০টি অধ্যায় আছে। কাণ্বশাখায় ১৭টি কাণ্ড আছে।

মাধ্যন্দিনী শাখার শতপথ ব্রাহ্মণের ১৪টি কাণ্ডের মধ্যে প্রথম ৯টি কাণ্ডই কাহারও কাহারও মতে সর্ব প্রাচীন অংশ। দশম কাণ্ডকে "অগ্নিরহস্য" বলে, একাদশ কাণ্ডে "অগ্নিচয়ন" আছে। দ্বাদশ কাণ্ডে প্রায়শ্চিত্তবিধি আছে। ত্রয়োদশ কাণ্ডে অশ্বমেধ, নরমেধ প্রভৃতির বিবরণ আছে এবং দুষ্মন্ত, ভরত, সাত্রাজিত, কাশীরাজ, ধৃতরাষ্ট্র, পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ১৪শ কাণ্ডটি আরণ্যক এবং ১৪শ কাণ্ডেব শেষ ৬ অধ্যায় **বৃহদারণ্যক উপনিষদ্** নামে খ্যাত।

৬ষ্ঠ হইতে ১০ম কাণ্ডে শাণ্ডিল্য ঋষি এবং অন্যান্য কাণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি উপদেষ্টা। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি আরুণির শিষ্য। বিদেহরাজ জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে বিদেঘরাজ মাঠরের ঐতিহ্য পাঠ করিলে মনে হয় তিনি ও তাঁহার কুলগুরু গোতমরাহুগণ সরস্বতীতীরে গিয়াছিলেন।

তথা হইতে "অগ্নি বৈশ্বানর" তাঁহাদিগকে অনুগমন করিয়া সদানীর নদ (গণ্ডক) পর্যন্ত গিয়াছিলেন। ঐ সদানীরই কোশল ও বিদেহ রাজ্যের মধ্যসীমা ছিল। পূর্বে ব্রাহ্মণেরা সদানীর নদের পূর্ব পারে যাইতেন না। অগ্নি বৈশ্বানরই মাঠবকে সদানীরের পূর্বদিকে বাস করিতে আদেশ দেন।

শতপথব্রাহ্মণের যুগে বিদেহ বেদের কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞান কাণ্ডে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। জনকরাজসভায় যে সকল উপনিষৎ তত্ত্বের বিচার হইয়াছে তাহাতে বহু ঋষি ও বিদুষী মহিলা যোগ দিয়াছেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে চরকাধ্যর্য্যুগণের নিন্দা আছে। "চরকাধ্যর্য্যু" বলিতে কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় চরক, কঠ, কপিষ্ঠল ও মৈত্রায়ণীয় সকল শাখাই বুঝিতে হইবে।

শতপথব্রাহ্মণে উর্বশী ও পুরুরবার ও দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কাহিনী সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে। মহাভাবতে ঐ কাহিনী সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। মৎস্যাবতারের জলপ্লাবনের আখ্যান শতপথ ব্রাহ্মণে ও পরে মহাভাবতে কথিত হইয়াছে। উহার মূল অথর্ববেদে ও ইরাণিক জেন্দাবেস্তে আছে।

সামবেদের ব্রাহ্মণ।

সামবেদের পৃথক্ দুইখানি শাখার ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছে। **তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ** ব্রাহ্মণ এবং **তলবকার** বা **জৈমিনীয়** বা **ষড়বিংশ** ব্রাহ্মণ। প্রকৃত প্রস্তাবে সামবেদীয় কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণ ৪০ ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম ২৫ ভাগ তাণ্ড্যব্রাহ্মণ নামে অভিহিত, তৎপরবর্তী ৫ ভাগকে তলবকার বা ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ বলে; তৎপরবর্তী ২ ভাগকে **মন্ত্রব্রাহ্মণ** বলে এবং শেষ ৮ ভাগকে **ছান্দোগ্য উপনিষৎ** বলে।

তাণ্ড্যব্রাহ্মণ সোমযজ্ঞে পরিপূর্ণ। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণকে **প্রৌঢ়ব্রাহ্মণ**ও বলে। এই ব্রাহ্মণে ব্রাত্যস্তোম ও প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান আছে।* ইহাতে নৈমিষারণ্যের যজ্ঞের ও কুরুক্ষেত্রের, কোশলাধিপতির ও বিদেহরাজ নমীসাপ্যের উল্লেখ আছে। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের ঋগ্বেদীয় কৌষীতকি ব্রাহ্মণের

* ঐ যুগে জাতিভেদ থাকিলেও উহা কঠিনভাব ধারণ করে নাই। ক্ষত্রিয় বংশে বহুঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য ও বিদ্যা দ্বারা বর্ণ নির্ণয় হইত।

উপর বিশেষ বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদংশে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের নাম দৃষ্ট হয়। উহাতেও ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের উপনিষৎ তত্ত্ব শ্রবণ করা দেখা যায়। ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ **অবধুত ব্রাহ্মণ** নামে অভিহিত। উহাতে বহু ভবিষ্যৎ কুলক্ষণের উল্লেখ আছে। তবলকার ব্রাহ্মণের মধ্যে **কেন** বা **তবলকার** উপনিষৎ আছে। উহা সামবেদের একখানি প্রসিদ্ধ উপনিষৎ। এই দুইখানি ব্রাহ্মণ ব্যতীত সামবেদীয় আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ আছে।

(১) **ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ**। ইহাতে সোম যজ্ঞের কোনও বিধান নাই। ইহাতে জাতকর্ম, বিবাহ, দেবস্তুতি প্রভৃতি আছে। অবশিষ্ট অংশ **ছান্দোগ্য উপনিষৎ**।

(২) **সামবিধান ব্রাহ্মণ**—ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ নহে। ইহাতে সামগানগুলির দ্বারা কতকগুলি অলৌকিক কার্য সম্পাদনের বিধান আছে।

(৩) **দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ**—ইহাতে সামসঙ্গীতের দেবতাগুলির নাম আছে।

(৪) **বংশ ব্রাহ্মণ**—ইহাতে সামবেদের ঋষিগণের বংশাবলী আছে।

অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ

অথর্ববেদের সহিত বৈদিক যজ্ঞের কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও উহার **গোপথ ব্রাহ্মণ** নামে একখানি ব্রাহ্মণ আছে। অথর্ববেদ সংহিতার সহিতও উহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। গোপথ ব্রাহ্মণে দুইটি কাণ্ড ও ১১টি প্রপাঠক আছে। এই দুইটি কাণ্ডই **বৈতান সূত্রের** পর রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। প্রথম কাণ্ড কোনও যজ্ঞ প্রণালী অনুসারে সংগৃহীত হয় নাই, সম্ভবতঃ ঐ কাণ্ডই মৌলিক ব্রাহ্মণ ভাগ। দ্বিতীয় কাণ্ডটী শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ এবং মৈত্রায়ণীয় ও তৈত্তিরীয় সংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে শতপথ ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

অথর্ববেদের অনেকগুলি উপনিষৎ আছে, তাহার অধিকাংশই আধুনিক কালের গ্রন্থ। অন্যান্য বেদের উপনিষৎগুলি পরব্রহ্মের আলোচনায় পরিপূর্ণ কিন্তু অথর্ববেদের উপনিষদ্‌গুলি সাম্প্রদায়িক তর্কে ও অবতার

বাদে পরিপূর্ণ। অথর্ববেদের তিনখানি উপনিষৎ ব্রহ্মবিচার পরিপূর্ণ মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও প্রশ্ন উপনিষৎ। শঙ্করাচার্য এই তিনখানিকেই প্রামাণ্য বিবেচনা করিয়াছেন।

উপনিষৎ

বেদের দুইটি কাণ্ড আছে, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। একই মহাবৃক্ষের দুইটি কাণ্ড কিন্তু মূল একই। কর্মকাণ্ডে বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রণালী ও ব্যাখ্যান এবং উদ্দেশ্য বর্ণিত আছে। জ্ঞানকাণ্ড পরমাত্মার তত্ত্বে পরিপূর্ণ। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের সূক্তগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক ঋষিগণ কেবল বেদবিহিত কর্তব্যকার্য যজ্ঞাদি করিয়াই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পরিদৃশ্যমান বিশ্বের অন্তরালে ও প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অভিমানিনী দেবতাগণের আশ্রয়স্বরূপে যে এক বিশ্বব্যাপী "মহতো মহীয়ান্" পরমব্রহ্ম আছেন তাহাও ঋষিগণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বেদের জ্ঞানকাণ্ড এই পরব্রহ্মতত্ত্বেই পরিপূর্ণ। এক ঋষি সম্প্রদায় কেবল জ্ঞানকাণ্ডেরই পক্ষপাতী ছিলেন, অপর সম্প্রদায় কর্ম-কাণ্ডেরই অনুরক্ত ছিলেন। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বতঃই একটি বিরোধাভাস দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রাচীনকালেই কোনও কোনও উপনিষদে ঐ বিরোধের সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগুলির শেষভাগ আরণ্যক এবং আরণ্যকের শেষভাগ উপনিষৎ; এই উপনিষদ্ ভাগ পরম ব্রহ্মের তত্ত্বান্বেষণে নিমগ্ন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে বেদের প্রত্যেক শাখাধ্যায়িগণেরই একখানি পৃথক্ ব্রাহ্মণ ছিল এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অন্ত্যভাগ এক একখানি করিয়া উপনিষৎ*। কালক্রমে ঐ সকল ব্রাহ্মণের অনেকগুলি লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু উহার ব্রহ্মচিন্তাপরিপূর্ণ উপনিষদংশ কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং কোনও বেদের একশাখার ব্রাহ্মণের উপনিষৎ লুপ্তব্রাহ্মণ হইতে বিচ্যুত হইয়া ঐ বেদের অপর শাখার ব্রাহ্মণের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে আর্যগণের আদিমধর্ম কর্মকাণ্ডেই নিবদ্ধ ছিল; ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের

* একৈকস্যাস্তু শাখায়া একৈকোপনিষন্মতা। মুক্তিকোপনিষৎ ১৪

সূক্তগুলি বৈদিকযুগের সর্বশেষে দৃষ্ট হইয়াছে এবং ঐ মণ্ডলের সূক্তগুলিতেই দর্শন তত্ত্বগুলি দৃষ্ট হয়। উপনিষদের তত্ত্বগুলির মূলভিত্তি ঋগ্‌বেদের যুগেই যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সকল জাতির সভ্যতা বিকাশেই দৃষ্ট হয় যে সামাজিক কর্মজীবনই জাতি-গঠনের প্রথম সোপান। জাতীয় প্রতিভার বিকাশের সহিত জাতীয় দর্শন-শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ হয় এবং দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ দর্শনতত্ত্বগুলি সামাজিক ও কর্মজীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং আংশিকভাবে কর্মজীবনকে পরিবর্তিত করিয়া থাকে। ইহা অসম্ভব নহে যে অতি প্রাচীন আর্যধর্মে কর্মকাণ্ডেরই প্রাধান্য ছিল, পরে উপনিষদের দার্শনিক চিন্তা ঐ কর্মকাণ্ডকে মন্দীভূত করিয়াছে কিন্তু ঐ দার্শনিক চিন্তাও কর্মকাণ্ডের যুগে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল এবং পরে কর্মকাণ্ডের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ঋষিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ শিষ্যানুক্রমে যে দার্শনিক চিন্তাসুধারসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন তাহা কালক্রমে পরিস্রুত হইয়া উপনিষদ্ মূর্তি ধারণ করিয়াছে; উহা যুগযুগান্তের চিন্তা-সুধার অমৃতখণ্ড। ঋগ্‌বেদের যুগে ঐ স্রোত প্রবাহমান হইয়া বহু ঋষির হৃদয়কন্দরে পরিস্রুত হইয়া সংঘর্ষে ও সম্মিলনে উপনিষদাকার ধারণ করিয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধ বিপ্লবের পূর্বেই প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি রচিত হইয়াছিল এবং কতকগুলি ঐ নাস্তিক ধর্মদ্বয়ের সংঘর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে। উপনিষদ্‌গুলি এরূপ গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ যে জগতের অন্য কোনও জাতির সাহিত্যে ঐরূপ গম্ভীর তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ নাই। ভিণ্টার্‌নিস্ বলিয়াছেন যে জাতিবিশেষের সাহিত্য কেবল ঐ জাতির স্বকীয় চিন্তায় পূর্ণ; উহা ব্যতীত জগতের সাহিত্য নামে একটি বিশ্বজনীন সাহিত্য আছে তাহা জগতের সম্পদ্। উপনিষদ্‌গুলি ঐ বিশ্বজনীন সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

দুই শতের অধিক উপনিষদের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার বহুগুলিই আধুনিক। কতকগুলিতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতের অবতারণা হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য ১২খানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং ঐ বারখানিই তিনি প্রামাণিক ও প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বেদ অনুসারে নিম্নলিখিতভাবে ঐগুলিকে বিভাগ করা যাইতে পারে।

ঋগ্‌বেদ—	১। ঐতরেয়	২। কৌষীতকি
সামবেদ—	৩। ছান্দোগ্য	৪। কেন
যজুর্বেদ—		
(ক) কৃষ্ণযজুর্বেদ	৫। তৈত্তিরীয়	৬। কঠ ৭। শ্বেতাশ্বতর
(খ) শুক্লযজুর্বেদ	৮। বৃহদারণ্যক	৯। ঈশা
অথর্ববেদ—	১০। প্রশ্ন	১১। মুণ্ডক ১২। মাণ্ডুক্য

প্রাচীনতা অনুসারে ঐ উপনিষদ্‌গুলিকে ৪টি স্তরে স্থাপন করা যাইতে পারে।

১ম স্তর। **বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি**। এইগুলির ভাষার সহিত প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলির ভাষার সৌসাদৃশ্য আছে। এইগুলি গদ্যে রচিত।

২য় স্তর। **কেন**। ইহার কতকাংশ পদ্য ও কতকাংশ গদ্য। কঠ, ঈশা, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক ও মহানারায়ণ উপনিষৎ সম্পূর্ণ পদ্যে রচিত। এই উপনিষদ্‌গুলিতে কোন নূতন তত্ত্বের বিকাশ দৃষ্ট হয় না।

৩য় স্তর। **প্রশ্ন, মৈত্রায়ণীয়, মাণ্ডূক্য** এই তিন খানিও গদ্যে রচিত কিন্তু ইহাদের ভাষা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীন নহে।

৪র্থ স্তর। অথর্ববেদের অন্যান্য অর্বাচীন উপনিষদ্‌গুলি।

উপনিষদ্‌গুলিতে পরমব্রহ্মতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। কর্মকাণ্ড ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধিতে ব্যাপৃত কিন্তু উপনিষদ্‌গুলিতে পরমব্রহ্মের স্বরূপ ও ভববন্ধন হইতে মুক্তি প্রভৃতিই চিন্তিত হইয়াছে। কেন আসিয়াছি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কেন জীবনস্রোতে সুখ-দুঃখের অধীন হইয়াছি, প্রকৃত সুখ কি, এই সকল গভীর চিন্তাতেই উপনিষৎগুলি পরিপূর্ণ।

"কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃস্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥" শ্বেতাশ্বতর ১.১

উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে যে বিরোধাভাস দৃষ্ট হয় ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনে

তাহারই সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। এক অনবচ্ছিন্ন, সর্বব্যাপী, কূটস্থ, অবিচল ও অনন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই স্বাধীন সত্তা নাই। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই সকল দেবতা, তিনিই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, তিনিই স্থূল ভূত, তিনিই জীব জন্তু পক্ষী উদ্ভিদাদি—তিনিই প্রজ্ঞান।

"এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাব্রতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপ জ্যোতীংষী ভৌতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব। বিজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জরায়ুজানি চ স্বেদজানি, চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণিজঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞাননেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। (ঐতরেয় উপনিষৎ ৩য় অধ্যায়)। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম, বিশ্বজগৎই ব্রহ্মে অবস্থিত, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মে অবস্থিত এবং ব্রহ্মেই বিলীন হইবে।

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি"

ছান্দোগ্য ৩য় প্রপাঠক ১৪ খণ্ড।

যিনি ইহাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্মরূপে সর্বদা বিদ্যমান যাঁহার সত্তাতেই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মবান্ তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তিনিই তুমি।

"স য এষোঽণিমৈতাত্মমিদং সর্বং তৎ সত্যম্ স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো"　　—ছান্দোগ্য ৬ষ্ঠ প্রপাঠক ১০ খণ্ড।

তিনি আনন্দময়, তিনি রসস্বরূপ। তিনি আনন্দস্বরূপে না থাকিলে জগৎ আনন্দ কোথা হইতে পাইত?

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।

তৈত্তিরীয় ২য় বল্লী ৭ অনুবাদ

অল্পে সুখ নাই, ক্ষুদ্রে সুখ নাই, যিনি ভূমা অর্থাৎ মহান্ তিনিই সুখস্বরূপ। ঐ ভূমাই বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য বিষয়।

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্"　　—ছান্দোগ্য ৭ম অধ্যায় ৩৩ খণ্ড।

সেই ভূমাই সমস্ত। তিনিই সর্বত্র। তিনিই অধোভাগে, তিনিই উপরিভাগে, তিনিই পশ্চাদ্‌ভাগে, তিনিই সম্মুখভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে।

"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিতি" —ছান্দোগ্য ৭ম অধ্যায় ২৫ খণ্ড।

সেই ভূমা এক ও অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মায়াবী, তিনি নিজ শক্তিসমূহ দ্বারাই এই লোকসকলকে নিয়মিত করেন। তাঁহার শক্তিই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ এবং তিনিই সকল কার্যের হেতু অর্থাৎ মূলকারণ। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় হেতু নাই। ইহা যাঁহারা অবগত হইয়াছেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

"য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্বাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ শ্বেতাশ্বতর ৩।১।

তপঃ দম এবং কর্মই উপনিষদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। বেদসকল উপনিষদের অঙ্গ। সত্যই উপনিষদের আশ্রয়ভূমি। যিনি এই উপনিষৎকে জানেন তিনি স্বীয় পাপসমূহ বিনষ্ট করিয়া সেই অনন্ত ও মহৎ স্বর্গধামে বাস করেন।

"তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্বাঙ্গাণি সত্যমায়তনম্।

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্‌মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ কেন ৪র্থ খণ্ড ৮—৯।*

কঠোপনিষৎ। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষৎ একখানি প্রাচীন উপনিষৎ। উহা বহুলভাবে পঠিত হইয়া থাকে কারণ উহা কাব্য ও দর্শনও বটে। বাজশ্রবা ঋষির কুমার নচিকেতা পিতার আদেশ অনুসারে যমালয়ে গেলেন এবং তথায় তিন রাত্রি উপবাসী ছিলেন। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যমরাজ তিনটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন মৃত্যুর পর কি হয় তাই আমাকে বলুন।

* বঙ্গদেশে উপনিষদের প্রচার অতি বিরল হইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই উপনিষদের পুনঃ প্রচার বঙ্গদেশে হইয়াছে।

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্‌বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহম্‌
বরাণাম্‌ এব বরস্তৃতীয়ঃ॥

যমরাজ বিপদে পড়িলেন। তিনি কুমারকে বহু প্রলোভন দেখাইলেন কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ কুমার কোনও লোভে আকৃষ্ট হইলেন না। যমরাজ বাধ্য হইয়া প্রথমে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ের বিচার আরম্ভ করিলেন। অগ্নিলভ্য স্বর্গলোকাদির সুখ সম্পদ সসীম। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ভোক্তা, আত্মা ও পুরুষের বিশ্লেষণ করিলেন।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ"।

কিন্তু সেই পরম পুরুষ দেহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত, সুখে দুঃখে লিপ্ত হন না।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু
ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥

সব আলোচনার পর যমরাজ বলিলেন—

"হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্‌।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম যথা শ্রুতম্‌॥

এই দেহীর মুক্তি কখন হয় তাহাও যমরাজ বলিলেন—

"যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্‌ অনুশাসনম্‌॥"

যমরাজ কথিত অমৃতবিদ্যা ও যোগবিধি অবগত হইয়া নচিকেতা বিরত হইলেন।

নবম অধ্যায়

বেদাঙ্গ ও পরিশিষ্ট

বেদাঙ্গ ছয়খানি, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। "শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্"। এইগুলিকে ষড়ঙ্গ বলে। বেদাধ্যয়নের সহায়তাকারী বলিয়া উহাদিগকে **বেদাঙ্গ** বলে। ঐ গুলির জ্ঞান না হইলে বেদাধ্যয়ন অসম্পূর্ণ থাকে এবং বেদের অর্থ বোধ হয় না এবং বৈদিক ক্রিয়াদি সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা যায় না। এই ৬টি অঙ্গ শ্রুতি বলিয়া গ্রাহ্য নহে। এইগুলি মনুষ্য রচিত। এই অঙ্গগুলি সূত্রাকারে নিবদ্ধ। সূত্রগুলির বিশিষ্টতা এই যে সেগুলি স্বল্পাক্ষর, অসংদিগ্ধ ও বিশ্বতোমুখ এবং গদ্যে রচিত। সূত্রগুলিব বচনা সম্বন্ধে একটী প্রচলিত বাক্য আছে যে ব্যাকরণের সূত্রকাব যদি সূত্র-প্রণয়নে একটি অর্ধমাত্রারও লাঘব করিতে পাবেন তাহা হইলে তিনি পুত্রোৎসবের ন্যায় আনন্দ অনুভব কবেন। "অর্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণা."।

পূর্ববর্তী যুগে এই ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে ও দর্শনাদি সম্বন্ধে বিপুল চর্চা হইয়া যে সিদ্ধান্তে ঋষিগণ উপনীত হইয়াছিলেন তাহার নিগূঢ় মর্ম সংক্ষিপ্ত-ভাবে বলাই সূত্রের উদ্দেশ্য। এই সংক্ষেপের জন্য সূত্রকারদিগকে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। প্রথমে কতকগুলি "সংজ্ঞাসূত্র," (definition) পরে কোনও বিশেষ বিষয় আরম্ভ কবিতে একটি "অধিকরণ সূত্র" প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকরণ সূত্রের পরই বিষয় সংক্রান্ত সূত্র আরম্ভ হয়, ঐ বিষয় সূত্রের মধ্যে পূর্ব সূত্রে যে কথাটি উক্ত হইয়াছে পববর্তী সূত্রে তাহা পুনরুক্ত হয় না, পূর্ববর্তী সূত্র হইতে এই শব্দটি গ্রহণ করিয়া লইতে হয় বলিয়া উহাকে "অনুবৃত্তি" বলে। সূত্রমধ্যে সাধারণ নিয়ম প্রথমে উক্ত হয়। তাহা অতি ব্যাপক হইলে, পরবর্তী সূত্রে ঐ অতিব্যাপ্তির বাধক সূত্র স্থাপিত হয়। এই প্রণালীতে সূত্র রচনায় অচিন্তনীয় সংক্ষেপ সাধিত হইয়াছে।

কল্পসূত্র

ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে বেদশাখার ব্রাহ্মণভাগে বেদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে তাহার কোনও কোনও স্থানে বহু জটিল তর্কের মীমাংসা, গাথা, ঐতিহ্য, ব্যাকরণ তত্ত্ব, যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি আছে। কালক্রমে যজ্ঞ প্রণালী ও ব্রাহ্মণ ভাগ এতই জটিল ও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে উহার সংক্ষিপ্তসার সংগৃহীত না হইলে যজ্ঞপ্রণালী শিক্ষা করাই দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সকল যজ্ঞপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত-প্রক্রিয়াই কল্পসূত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগুলিরই **কল্পসূত্র** রচিত হইয়াছিল। ঐ কল্পসূত্রগুলি ৩ খণ্ডে বিভক্ত—**শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র** ও **ধর্মসূত্র**। সাক্ষাৎ শ্রুতিবিহিত প্রাচীন যজ্ঞাদির প্রণালী যে ভাগে বিবৃত আছে তাহাকে "শ্রৌতসূত্র" বলে; শ্রৌতসূত্রগুলি ব্রাহ্মণ ভাগের যজ্ঞপ্রণালীর সার মর্ম এবং ব্রাহ্মণের উপর প্রতিষ্ঠিত। গৃহীর জীবনে অবশ্য কর্তব্য যজ্ঞগুলির প্রণালী যাহাতে নিবদ্ধ আছে তাহাকে "গৃহ্যসূত্র" বলে; গৃহ্যসূত্রগুলি কোনও মূল ব্রাহ্মণভাগে নাই। ঐগুলি শাখাধ্যায়ীগণের মধ্যে প্রচলিত নিয়মানুসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে এরূপ বোধ হয়; এবং যে অংশে পারমার্থিক, রাজনৈতিক ও বর্ণাশ্রমধর্মের নিয়ম, সামাজিক রীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র বা আইন নিবদ্ধ আছে, তাহাকে "ধর্মসূত্র" বলে। এই "ধর্মসূত্র" গুলিই স্মৃতিগুলির মূলভিত্তি।

শ্রৌতসূত্রে প্রাচীন শ্রৌত যজ্ঞগুলির প্রণালী উক্ত হইয়াছে। গৌতম শ্রৌতসূত্রে ১৪টি শ্রৌত যজ্ঞের বিধান আছে। তন্মধ্যে ৭টি হবির্যজ্ঞ ও ৭টি সোমযজ্ঞ। ৭টি হবির্যজ্ঞ এই (১) অগ্ন্যাধান (২) অগ্নিহোত্র (৩) দর্শ-পূর্ণমাস (৪) আগ্রহয়ণ (৫) চাতুর্মাস্য (৬) নিরূঢ় পশুবন্ধ (৮) সৌত্রামণী। ঐ ৭টি যজ্ঞ চরু পুরোডাশাদি হবির্দ্বারা সম্পন্ন হইত, তজ্জন্য উহাদের নাম হবির্যজ্ঞ; ৭টি সোমযজ্ঞের নাম (১) অগ্নিষ্টোম (২) অত্যগ্নিষ্টোম (৩) উক্থ (৪) ষোড়শী (৫) বাজপেয় (৬) অতিরাত্র ও (৭) অপ্তোর্যাম। এই ৭টি যজ্ঞে সোমরসের প্রাধান্য বলিয়াই এইগুলিকে সোমযজ্ঞ বলে।

গৃহ্যসূত্রে ব্রহ্মচর্য সমাপ্তির পর গৃহস্থ ধর্মজীবনের সম্পাদ্য যজ্ঞগুলি বিবৃত হইয়াছে। গৃহস্থমাত্রেরই ঐ যজ্ঞগুলি অনুষ্ঠেয়, এইগুলি শ্রৌতযজ্ঞ অপেক্ষাও প্রধান, তজ্জন্য এই যজ্ঞগুলিকে "প্রধান যজ্ঞ" বা "পাকযজ্ঞ" বলে। পাকযজ্ঞ

৭টি (১) পিতৃশ্রাদ্ধ (২) পার্বণশ্রাদ্ধ (৩) অষ্টকাশ্রদ্ধ (৪) শ্রাবণীযজ্ঞ আশ্বযুজী যজ্ঞ (৬) আগ্রহায়ণী ও (৭) চৈত্রী যজ্ঞ।

এই ৭টি পাকযজ্ঞ ব্যতীত গৃহ্যসূত্রে ও ধর্মসূত্রে আরও ৫টি মহাযজ্ঞের বিধান আছে তাহাও গৃহীর কর্তব্য। (১) ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) দেবযজ্ঞ, (৩) পিতৃযজ্ঞ, (৪) ভূতযজ্ঞ ও (৫) মনুষ্যযজ্ঞ।

ঐ সকল যজ্ঞ ব্যতীত ১৫টি "সংস্কার" নির্দিষ্ট আছে, উহা অদ্যাপি হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে। গৌতম সূত্রে ঐ সংস্কারগুলির নাম (১) গর্ভাধান (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন (৪) জাতকর্ম (৫) নামকরণ (৬) অন্নপ্রাশন (৭) চূড়াকরণ (৮) উপনয়ন (৯) মহানাম্নীব্রত (১০) মহাব্রত (১১) উপনিষদ্‌ব্রত (১২) গোদানব্রত (১৩) সমাবর্তন (১৪) বিবাহ (১৫) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

সীমন্তোন্নয়নব্রত (অর্থাৎ গর্ভবতী নারীর কেশবিন্যাস) বঙ্গদেশে অপ্রচলিত হইয়াছে, মহারাষ্ট্র প্রদেশে উহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ জাতকর্ম, নামকরণ ও অন্নপ্রাশন একসঙ্গেই সম্পন্ন হয়। মহানাম্নী-ব্রত, মহাব্রত, উপনিষদ্‌ব্রত ও গোদানব্রত এই চারিটি বেদাধ্যয়ন কালের ব্রত; সমাবর্তন অর্থাৎ পাঠ সমাপনান্তে স্নানবিশেষ, এইগুলি বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের উপনয়নকালে অতিসংক্ষেপে কয়েক দিনেই সম্পাদিত হয়, কারণ বঙ্গদেশে বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপনা নামমাত্রই হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত কাত্যায়নগৃহ্যসূত্রে ও গোভিলগৃহ্যসূত্রে "নিষ্ক্রামণ" নামে একটি সংস্কার আছে, তাহা বঙ্গদেশে অন্নপ্রাশনের সময় সম্পন্ন হয়।

ঋগ্‌বেদীয় কল্পসূত্র

ঋগ্‌বেদের ২খানি ব্রাহ্মণের অনুযায়ী দুইখানি কল্পসূত্র আছে, **আশ্বলায়ন কল্পসূত্র** ও **কৌষীতকি কল্পসূত্র**; উহার অপর নাম শাঙ্খায়ন সূত্র।

আশ্বলায়ন, প্রসিদ্ধ ঋষি শৌনকের শিষ্য ছিলেন। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে ১২টি অধ্যায় আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সকল শ্রৌতযজ্ঞের বিধান আছে তাহাই আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে পাকযজ্ঞ, মহাযজ্ঞ ও সংস্কারগুলি উক্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ঋগ্‌বেদের মণ্ডলগুলির

ঋষিগণের নাম ও সুমন্ত্র (অথর্ববেদ), জৈমিনি (সামবেদ), বৈশম্পায়ন (যজুর্বেদ), পৈল (ঋগ্‌বেদ) প্রভৃতি বেদ বিভাগ কালের বেদপাঠকগণেব নাম, সূত্র সমূহ, ভাষ্য সমূহ ও মহাভারতের নামগুলির উল্লেখ আছে।

শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে ১৮টি অধ্যায় আছে। উহাতে চতুর্দশ শ্রৌত যজ্ঞ ও তদতিরিক্ত বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, ও সর্বমেধ প্রভৃতি বৃহৎ যজ্ঞগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত আছে।

শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাব তৃতীয় অধ্যাযে গৃহনির্মাণ, গৃহপ্রবেশ, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতিও বর্ণিত আছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তের বিধানগুলি বিবৃত আছে।

কালক্রমে শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ও ধর্মসূত্রগুলি পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিযাছে এবং কোনও কোনও শাখাব কোনও কোনও সূত্র সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য কল্পসূত্র সাধাবণতঃ সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওযা যায় না। কেবলমাত্র যজুর্বেদীয় **আপস্তম্ব-কল্প** সূত্রই সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওযা গিয়াছে। অন্যান্য বেদেব সম্পূর্ণ কল্পসূত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। ঋগ্‌বেদেব আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র বিদ্যমান আছে কিন্তু ধর্মসূত্র লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্‌বেদীয় **বশিষ্ঠধর্মসূত্র** প্রচলিত আছে ঐ বশিষ্ঠধর্মসূত্র ৩০ অধ্যায়ে বিভক্ত। বশিষ্ঠধর্মসূত্রে প্রাচীন মনুস্মৃতি হইতে কিয়দংশ গদ্য ও কিয়দংশ পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে বোধহয় প্রাচীন বা বৃদ্ধমনুস্মৃতি গদ্যে ও পদ্যে বচিত ছিল। সম্ভবতঃ প্রচলিত মনুস্মৃতি উহাবই নবীন সংস্কবণ মাত্র। কুমারিল ভট্টের কালে ঋগ্‌বেদীয়েবা বশিষ্ঠধর্মসূত্র ব্যবহাব কবিতেন।

সামবেদের কল্পসূত্র

সামবেদেব ৩ খানি প্রসিদ্ধ শ্রৌতসূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, (১) **মাশক**, (২) **লাট্যায়ন** ও (৩) **দ্রাহ্যায়ণ** শ্রৌতসূত্র।

১। মাশক শ্রৌতসূত্র সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেব উপব প্রতিষ্ঠিত।:

২। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র সামবেদেব কৌথুমী শাখাব জন্য রচিত। লাট্যায়নেরা **গোভিলগৃহ্যসূত্র** ব্যবহাব কবেন। এই গোভিলগৃহ্যসূত্রখানি ৪টি প্রপাঠকে বিভক্ত।

৩। দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্র সামবেদের রাণায়ণী শাখাধ্যায়ীগণের ব্যবহৃত শ্রৌতসূত্র। তাহারা খদির গৃহ্যসূত্র ব্যবহার করেন।

সামবেদীয় ধর্মসূত্রের মধ্যে **গৌতমধর্মসূত্রই** প্রধান। ঐ ধর্মসূত্রখানি ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই ধর্মসূত্রে ৮ প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে; যথা (১) ব্রাহ্ম (২) প্রাজাপত্য (৩) আর্য (৪) দৈব (৫) গান্ধর্ব (৬) আসুর (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। ইহার মধ্যে প্রথম ৪টি উৎকৃষ্ট ও শেষ ৪টি অপকৃষ্ট।

এই ধর্মসূত্রে অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, সূত, মাগধ, আয়োগব, চণ্ডাল, ধীবর, মাহিষ, যবন করণ প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার সঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে।

যজুর্বেদীয় কল্পসূত্র

(১) কৃষ্ণযজুর্বেদ

কৃষ্ণযজুর্বেদের আপস্তম্ব শাখার সম্পূর্ণ কল্পসূত্র মুদ্রিত হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের ৬খানি শ্রৌতসূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে:—

(১) **বৌধায়ন**, (২) **আপস্তম্ব**, (৩) **হিরণ্যকেশি**, (৪) **ভারদ্বাজ** (৫) **মানব**, (৬) **বৈখানস**।

ঐ সকল শ্রৌতসূত্রানুযায়ী গৃহ্যসূত্রও বিদ্যমান আছে। হিরণ্যকেশি, বৌধায়ন ও মানবধর্মসূত্র কৃষ্ণযজুর্বেদীয়। তন্মধ্যে সম্ভবতঃ মানবশ্রৌতসূত্রই সর্বপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। মানবগণ মৈত্রয়াণীয় শাখার শাখান্তর বলিয়া বিবেচিত। মানবগৃহ্যসূত্র মানব শ্রৌতসূত্রানুযায়ী। ইহাতে বিনায়কগণের পূজা আছে। মানবগৃহ্যসূত্র অনুসারেই কাঠক গৃহ্যসূত্র রচিত।

বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র উনবিংশ অধ্যায় বা প্রশ্নে বিভক্ত। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র ৪ প্রশ্নে বিভক্ত এবং উহার ধর্মসূত্রও ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত। বৌধায়নকল্পসূত্রের মধ্যে **হিন্দু জ্যামিতি** বা **শুল্বসূত্র** নিবদ্ধ আছে। বৌধায়নধর্মসূত্রে আর্যাবর্ত ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নাম আছে। উহাতে লিখিত আছে আরট্ট, কারস্কর পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও প্রানূনদিগের দেশে ভ্রমণ করিলে ভ্রমণকারীদিগকে পুনস্তোম বা সর্বপৃষ্ঠা ইষ্টি সম্পাদন করিতে হয়। উহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে ঐ সকল প্রদেশে আর্যগণের বসতি ছিল না, সম্ভবতঃ অনার্যগণের বাসস্থান ছিল।

বৌধায়ন কল্পসূত্রের অনুমান শতাধিক বৎসর পরে **আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র** রচিত হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। আপস্তম্বশাখাধ্যায়ীরা নর্মদার দক্ষিণভাগে বাস করিতেন। অন্ধ্ররাজ্যে ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র প্রচলিত ছিল। আপস্তম্ব কল্পসূত্রখানি ৩০টি অধ্যায় বা প্রশ্নে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম ২৪টি শ্রৌতসূত্র, ২৫শ প্রশ্ন পরিভাষা, ২৬, ২৭ প্রশ্ন গৃহ্যসূত্র, ২৮ ও ২৯ প্রশ্ন ধর্মসূত্র এবং ত্রিংশ প্রশ্ন শুল্বসূত্র বা জ্যামিতি। আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রে খাদ্যাখাদ্য বিচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে।

হিরণ্যকেশিশ্রৌতসূত্র আপস্তম্বসূত্রের পরবর্তী এবং আপস্তম্বসূত্রাবলম্বনেই রচিত বলিয়া বোধহয়। সম্ভবতঃ হিরণ্যকেশিগণ আপস্তম্বগণেরই শাখান্তর, তজ্জন্য ঐ দুই শ্রৌতসূত্রের এতাদৃশ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

(২) শুক্ল যজুর্বেদীয় কল্পসূত্র

শুক্লযজুর্বেদেরও অনেকগুলি কল্পসূত্র ছিল, তন্মধ্যে দুইখানি প্রসিদ্ধ—

(১) **কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র**, (২) **পারস্কর গৃহ্যসূত্র** বা কাটীয় বা বাজসনেয় গৃহ্যসূত্র। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ২৬টি অধ্যায় আছে। শুক্লযজুর্বেদের অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবর্তনে শতপথ ব্রাহ্মণের ৯টি কাণ্ড গঠিত এবং শতপথ ব্রাহ্মণের ৯টি কাণ্ড অবলম্বনে কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের ১৮ অধ্যায় রচিত। এই শ্রৌতসূত্রে ব্রাত্যগণেব ও মগধদেশীয় "ব্রহ্মবন্ধু"গণের উল্লেখ আছে। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ব্যবহারীগণ পারস্করগৃহ্যসূত্র ব্যবহার করিতেন। পারস্করগৃহ্যসূত্র তিন কাণ্ডে বিভক্ত। পারস্করের নাম পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতে আছে। পারস্করসূত্রের মতানুসারেই যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি সংগঠিত বলিয়া অনুমান হয়। পারস্কর গৃহ্য সূত্রের ভর্তৃযজ্ঞকৃত "পারস্কর গৃহ্যবিবরণ" ব্যাখ্যা সর্বপ্রাচীন টীকা। মেধাতিথি ভর্তৃযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ক তাঁহার পরবর্তী।

অথর্ববেদীয় কল্পসূত্র

অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণানুসারে **বৈতানশ্রৌতসূত্র** রচিত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী কৌশিক গৃহ্যসূত্র আছে।

শিক্ষা

শিক্ষা নামক বেদাঙ্গে উচ্চাবণ প্রণালী বিবৃত আছে। উহাতে স্বব ব্যঞ্জন উদাত্তাদি ভেদ প্রভৃতির উচ্চারণ নিবদ্ধ হইত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শিক্ষার উল্লেখ আছে। কয়েকখানি শিক্ষা দৃষ্ট হয় তাহার অধিকাংশই বৈদিক যুগের পরে রচিত এবং বৈদিক উচ্চাবণেব নিয়মাবলীতে পরিপূর্ণ। ঐ শিক্ষাগুলির মধ্যে পাণিনীয় শিক্ষাই সুপ্রসিদ্ধ। শিক্ষার বিষয়গুলি প্রাতিশাখ্যে নিবদ্ধ হওয়াতেই সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের শিক্ষাগুলি লোপ পাইয়াছে।

ব্যাকরণ

অতি প্রাচীনকাল হইতেই শব্দশাস্ত্রের সূক্ষ্মচর্চা আবম্ভ হইয়াছিল। কোনও কোনও প্রাচীন ব্রাহ্মণে ব্যাকরণসংক্রান্ত চর্চা দৃষ্ট হয়। যুগে যুগে বহু বৈয়াকরণ ও শাব্দিক অবতীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সকল ব্যাকবণ লুপ্ত হইয়াছে, কেবল পাণিনিব অষ্টাধ্যায়ীসূত্র বিদ্যমান আছে। সম্ভবতঃ পাণিনিব সূত্রগুলি সর্বতোমুখী ও সর্বদেশদর্শী হওয়াতেই তাহাবই প্রতিভায় অন্যান্য প্রাচীন ব্যাকরণগুলি বিলীন হইয়া গিয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীতে লৌকিক ও বৈদিক উভয় ব্যাকরণই আছে। বৈদিকাংশে বেদেব সাধারণ নিয়মগুলিই উক্ত হইয়াছে। (ব্যাকরণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বেদেব প্রত্যেক শাখার ব্যাকবণাদি তত্তৎ প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে। বর্তমানে যে সকল **প্রাতিশাখ্য** আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলির সূত্রসমূহ পাণিনিব বৈদিক সূত্রগুলি হইতে আবও সম্পূর্ণ ও সূক্ষ্ম, তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় ঐ প্রাতিশাখ্যসূত্রগুলি অষ্টাধ্যায়ী সূত্রগুলির পবে রচিত। ঐ প্রাতিশাখ্যগুলিতে বেদের শাখার বিশেষব্যাকরণবিধি ও উচ্চারণপ্রণালী নিবদ্ধ আছে। চারিখানি প্রাতিশাখ্যসূত্র প্রচলিত আছে। একখানি ঋগ্‌বেদের, একখানি অথর্ববেদের ও একখানি তৈত্তিরীয় সংহিতার, অপরখানি বাজসনেয় সংহিতার।

ঋগ্‌বেদীয় প্রাতিশাখ্য সূত্র তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং পদ্যে রচিত। উহা শৌনকরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আশ্বলায়ন শৌনকের শিষ্য ছিলেন। পুরাণে দৃষ্ট হয় শৌনক বৈদিক ঋষি গৃৎসমদের পুত্র ছিলেন। এই ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্যের সারাংশ **উপলেখ** নামে অভিহিত হইয়াছে। অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যও শৌনক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই প্রাতিশাখ্যখানি ব্যাকরণ-

প্রধান। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে বহু প্রাচীন অশ্রুতপূর্ব ঋষির নাম আছে। বাজসনেয় শাখার প্রাতিশাখ্য ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। ঐ প্রাতিশাখ্য কাত্যায়ন বিরচিত। এই কাত্যায়নই পাণিনির বার্তিকসূত্রকার বলিয়া বিশ্বাস হয়। কাত্যায়ন শৌনককে পূর্বাচার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নিরুক্ত

নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গে বৈদিক শব্দের বিশ্লেষণ ও তাহার অর্থ আছে। বৈদিক দুরূহ শব্দগুলির ব্যাখ্যা ও তাহার প্রয়োগ প্রদর্শন করাই নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। প্রাচীন নিরুক্তকারগণের গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইয়াছে। ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর ন্যায় কেবলমাত্র যাস্কাচার্যের নিরুক্তই বর্তমান যুগে বিদ্যমান আছে। যাস্কের নিরুক্তে বহু পূর্বাচার্যের মত উল্লিখিত ও কোনও কোনও স্থলে খণ্ডিত হইয়াছে। ঐ নিরুক্ত গ্রন্থে যাস্ক অন্যান্য আচার্যগণের মধ্যে গার্গ্য, গালব, শাকটায়ন, ঔর্ণবাভ, শাকপূণি ও কৌৎস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে নৈরুক্ত ও বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে যে গুরুতর মতভেদ ছিল তাহা যাস্কাচার্য উল্লেখ করিয়াছেন। নৈরুক্তগণের ও বৈয়াকরণদিগের মধ্যে শাকটায়নের মতে সকল নামই ধাতুজাত। কিন্তু নৈরুক্তগণের মধ্যে গার্গ্য ও বৈয়াকরণগণ কেহ বলেন সকল নামই ধাতুজাত নহে। "তত্র নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ" ১।১২।২ "ন সর্বানীতি গার্গ্যো বৈয়াকরণাং চৈকে।" ১।১৩।৩। কথিত আছে সকল নামই ধাতুজ ইহাই সমর্থন করিবার জন্য শাকটায়ন মুনি "উণাদি" শব্দশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পাণিনি "উণাদয়ো বহুলম্" সূত্রদ্বারা ঐ মত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা হয়।

ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ ও ভিণ্টারনিস্ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য আচার্যগণের মতে যাস্কাচার্য খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থকার। নিরুক্ত গ্রন্থখানি ২ ষট্‌কে বিভক্ত। নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ে "উপোদ্‌ঘাত" অর্থাৎ শব্দশাস্ত্রের সাধারণ বিষয়গুলি উল্লিখিত হইয়াছে। ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে একার্থবোধক শব্দগুলির নিঘণ্টু, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে নৈগমকাণ্ড অর্থাৎ উহাতে দুরূহ শব্দগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ৬ অধ্যায়কে "পূর্ব ষট্‌ক" বা প্রথম ৬ অধ্যায় বলে। ৭ হইতে ১২ পর্যন্ত ৬ অধ্যায়কে "উত্তর ষট্‌ক" বা শেষ ৬ অধ্যায় বলে, উহা

দৈবতাকাণ্ড নামে খ্যাত। ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায় নিরুক্তের পরিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত। নিরুক্তকার যে ব্যাখ্যা বা যে অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রতিপাদন জন্য বেদ হইতে উদাহরণ দিয়াছেন। এইরূপ বৈদিক শব্দব্যাখ্যা ও উদাহরণ থাকাতে ঋগ্বেদের অধিকাংশ দুরূহ স্থানেরই টীকা রচিত হইয়া গিয়াছে। যাস্কাচার্যের কালেই বেদের অনেক স্থল এরূপ দুর্বোধ্য হইয়াছিল যে কোনও কোনও আচার্য ঐ সকল সূক্তের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা নিরর্থক শ্রম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। যাস্কাচার্য ঐ কথা তাঁহার নিরুক্তে প্রকাশ করিয়াছেন। যাস্কাচার্য শব্দগুলির মূলজ ধাতুগত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহারই সাহায্যে বেদ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেবতাগণকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন—ভূলোকের, দ্যুলোকের ও অন্তরীক্ষলোকের—ঐ দেবতাগুলি একই ঐশীশক্তির বিকাশ, প্রত্যেক শক্তিই এক একটি অভিমানিনী দেবতা। যাস্কাচার্য বৈদিক যুগের নিকটবর্তী বলিয়া শাকপূণি প্রভৃতি বহু পূর্বাচার্যের মত জ্ঞাত থাকা হেতু বেদব্যাখ্যানে তাঁহার যে সুবিধা ছিল সায়ণাচার্যের ঐ পরিমাণ সুবিধা ও সম্পদ্ ছিল না। কিন্তু সায়ণাচার্যও সকল স্থলের ব্যাখ্যানে যাস্কাচার্যের নিরুক্তের মত গ্রহণ করেন নাই। শাকপূণি কত প্রাচীন তাহা বিবেচনা করা উচিত। যাস্কাচার্য বহু স্থলে প্রাচীন আচার্য শাকপূণির মত উল্লেখ করিয়াছেন। এই আচার্য শাকপূণি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের প্রশিষ্য বলিয়া পরিগণিত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পৈলকে ঋগ্বেদ পাঠক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পৈলের শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি এবং ইন্দ্রপ্রমতির শিষ্য শাকপূণি। ইনি ঋগ্বেদের একটি শাখার প্রবর্তক এবং নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন।*

যাস্কের নিরুক্তের কাশ্মীরবাস্তব্য দুর্গাচার্যকৃত ঋজ্বর্থ নামক প্রসিদ্ধ টীকা আছে।

ছন্দঃ।

ব্রাহ্মণগুলির কোনও কোনও স্থানে বৈদিক ছন্দের উল্লেখ আছে। শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্রে (৭।২৭) ও ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যের শেষ পটলে বিশেষতঃ সামবেদের নিদানসূত্রে বৈদিক ছন্দের উল্লেখ আছে। কাত্যায়নের

* বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪

অনুক্রমণীতেও বৈদিক ছন্দের বিচার আছে। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র বৈদিক ছন্দের প্রামাণিক গ্রন্থ কিন্তু উহা সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে কারণ উহাতে সংস্কৃতযুগের ছন্দঃশাস্ত্রও আছে। পিঙ্গলের ছন্দঃ-শাস্ত্রের হলায়ুধের ব্যাখ্যা আছে।

জ্যোতিষ

বৈদিক যাগযজ্ঞের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধ। বিশেষ বিশেষ তারিখে ও চন্দ্রসূর্যের অবস্থান অনুসারে যজ্ঞাদি আরম্ভ ও সম্পন্ন হইত। তজ্জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা বৈদিকযুগ হইতেই আরম্ভ হয়। জ্যোতিষ কাল-বিজ্ঞান-শাস্ত্র। লগধমুনি বলিয়াছেন "বেদা হি যজ্ঞার্থম্ অভিপ্রবৃত্তাঃ কালানুপূর্বা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ। তস্মাদিদং কালবিজ্ঞানশাস্ত্রং যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞম্॥"* জ্যোতিষ গণিতবিজ্ঞান সাপেক্ষ। ঋগ্‌বেদের ২য় মণ্ডলের ৩২ সূক্তে তিথিগণনার কথা, ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ২, ১৩ ঋকে নক্ষত্র গণনা, ১ম মণ্ডলের ২৫ সূক্তের ৮ ঋকে মলিম্লুচ বা মলমাস, ১০ মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ১৮ ঋকে ঋতুগণনা ও ৫ম মণ্ডলের ৪০ সূক্তে ৫-৯ ঋকে অত্রিবংশীয়দিগের গ্রহণ-গণনা করার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতের ও ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির গৃহীত উপাদান হইতে ঋক্ ও যজুর্বেদীয় বেদাঙ্গজ্যোতিষের কাল ১৪০০-১২০০ খৃঃ পূঃ নির্দেশ করেন। শতপথ ব্রাহ্মণের ২।১।২ অংশে প্রায় ৩০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে নক্ষত্র গণনাপ্রণালী বিদ্যমান থাকা অনুমিত হয়। ঋগ্‌বেদের বহুস্থানে গণিতের সাধারণ প্রণালী পরিজ্ঞাত থাকা সূচিত হয়; ভারতবর্ষে গণিত, জ্যোতিষের একটি অংশ মাত্র। জ্যোতিষের আশ্রয় ব্যতীত স্বাধীনভাবে গণিতের কোনও পরিপুষ্টি হয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদেও জ্যোতিষ ও গণিতালোচনা দৃষ্ট হয়।† রামায়ণ ও মহাভারতেও গণিতচর্চার প্রমাণ আছে। লগধমুনি গণিতের প্রশংসায় বলিয়াছেন "যথা শিখা ময়ুরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা। তদ্‌বদ্ বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধনি স্থিতম্॥" বেদাঙ্গ জ্যোতিষের গ্রন্থ মধ্যে লগধমুনির ঋগ্‌বেদীয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ও শেষমুনির

*(বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ৩।)

†(ছান্দোগ্য ১।৭।২, ৪৭৬-৪৮০)

যজুর্বেদীয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষ বিদ্যমান আছে। ইউরোপীয় আচার্যগণ মনে করেন যে এই দুই বেদাঙ্গ জ্যোতিষগ্রন্থ বৈদিকযুগের পরবর্তী। পরবর্তী হইলেও ১৪০০-১২০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত নহে।

পরিশিষ্ট

বেদাঙ্গ ব্যতীত ও বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক বহু গ্রন্থ আছে যেগুলিকে উপাঙ্গ বা পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। ব্যাকরণ বেদাঙ্গ বলিয়া পবিগণিত কিন্তু **প্রাতিশাখ্য** বৈদিক ব্যাকরণের পরিশিষ্ট। উহাতে বেদের ব্যাকরণের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছন্দঃ ইত্যাদি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। প্রত্যেক বেদেরই একখানি প্রাতিশাখ্য আছে। ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্য শৌনকরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বেদসংহিতাগুলি প্রাচীন কালে কখনই লিখিত হইত না। বেদের পাঠের একটি স্বরেরও কোনও বিকৃতি না জন্মে তজ্জন্য **পদপাঠ, ঘনপাঠ, জটাপাঠ** প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঋগ্‌বেদের কোন্ সূক্ত কোন্ ঋষি দৃষ্ট তাহা নির্দেশ করিবার জন্য **আর্ষানুক্রমণী**, কোন্ ঋকের কোন্ দেবতা তাহা নির্দেশ করিবার জন্য **দেবানুক্রমণী**, কোন্ সূক্তের কোন্ ছন্দঃ তাহা **ছন্দোনুক্রমণীতে** লিপিবদ্ধ আছে। ঋগ্‌বেদ ৮৫টি অনুবাকে বিভক্ত। অনুবাকানুক্রমণীতে ঐ বিভাগ নির্দিষ্ট আছে। অনুবাকানুক্রমণী শৌনক বচিত।

কাত্যায়নকৃত **সর্বানুক্রমণীতে** ঐ সকল গুলির সমাবেশ আছে। সম্ভবতঃ তজ্জন্যই অন্যান্য অনুক্রমণীগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অনুবাকানুক্রমণী ও সর্বানুক্রমণীর উপর ষড্‌গুরুশিষ্যের অতি প্রাঞ্জল টীকা আছে। সম্ভবতঃ উহা ১১শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। ষড্‌গুরুশিষ্যের প্রকৃত নাম জানা যায় না। যে ছয়টী গুরুর মত গৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের নাম বিনায়ক, ত্রিশূলাঙ্ক, গোবিন্দ, সূর্য, ব্যাস ও শিবযোগী। **বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে** সকল সূক্তের সকল ঋকের দেবতাগুলির নাম আছে।

নৈগমপরিশিষ্টগ্রন্থে একার্থবাচক শব্দগুলির সমাবেশ আছে। উহা নিরুক্তের একাংশ বলিয়া পরিগণিত। ঋগ্‌বেদ ব্যতীত শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদেরও অনুক্রমণী আছে।

প্রবরাধ্যায়গ্রন্থে এক বংশীয় প্রধান প্রধান ঋষিগণের নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

চরণব্যূহগ্রন্থে বেদের প্রত্যেক শাখার নাম ও যে যে প্রদেশে ঐ শাখা প্রচলিত তাহা উল্লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থ আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

লৌকিক সাহিত্য

প্রথম অধ্যায়

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ

অনেকেরই মত এই যে বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের প্রাচীন ভাষাই কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে। বৈদিক সাহিত্য ধর্ম্মমূলক। ঐ ধর্ম্মমূলক সাহিত্যের জন্য বহুকাল হইতেই একটি শিষ্টসম্মত সুসংযত এবং বিজ্ঞানানুমোদিত ভাষা প্রচলিত ছিল। ঐ "শিষ্টসম্মত" ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ঋষিগণ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।* পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতে ঐ ব্যাকরণের পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বহু গবেষণার ফলে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্যাকরণসম্মত সংস্কৃতভাষা ব্যতীত অপর একটি দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষাও তৎকালে প্রচলিত ছিল ও তাহাই ঋষিগণ সাধারণতঃ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মন্ত্রমূলক ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোনও কার্যকালে ঐ কথিত ভাষার প্রয়োগ না করিয়া তাঁহারা শিষ্টসম্মত সুসংযত সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ করিতেন। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে ইহার একটি উদাহরণ দৃষ্ট হয়। যে স্থলে ঋষিগণ কথিতভাষায় "যর্বাণস্তর্বাণঃ" বলিতেন, কোনও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকালে তৎপরিবর্তে "যদ্বানস্তদ্বানঃ" বলিতেন।† বিশেষতঃ কোনও বৈদিক ক্রিয়াবসানে উচ্চারণাদির ত্রুটির প্রত্যবায়জনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। মন্ত্রের উচ্চারণে একটি স্বর অথবা বর্ণের দুষ্টপ্রয়োগে যজমানের ভীষণ অনিষ্ট হইতে পারে এই রূপ বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল। এই সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে ঋষিগণ

---

* "কৈঃ পুনরুপদিষ্টাঃ। শিষ্টৈঃ। কে পুনঃ শিষ্টাঃ। বৈয়াকরণাঃ। কুত এতৎ। শাস্ত্রপূর্বিকা হি শিষ্টিঃ। বৈয়াকরণাশ্চ শাস্ত্রজ্ঞাঃ" মহাভাষ্য ৬।৩।১০৯

† মহাভাষ্য ১।১।১ পৃঃ ৩১

বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক্ একটি কথিতভাষাও ব্যবহার করিতেন। পরবর্তীযুগে ঐ ভাষা আর্যভাষা নামে অভিহিত হইত এবং অসংস্কৃত কোন প্রয়োগ দৃষ্ট হইলে তাহাকে আর্ষপ্রয়োগ বলিত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে মূল রামায়ণ, মহাভারত, ও প্রাচীন পুরাণগুলি এই আর্ষভাষায় রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে বিশুদ্ধসংস্কৃতপ্রভাবে ঐ সকল গ্রন্থের বহুস্থান মার্জিত হইয়াছে তথাপি বহু আর্ষভাষা উহাতে রহিয়া গিয়াছে। পাণিনি ও তাঁহার পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ ঐ আর্ষভাষার ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহারা শিষ্টসম্মত বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। তজ্জন্যই রামায়ণ ও মহাভারত এবং পুরাণের বহু আর্ষপ্রয়োগের নিয়মাদি ঐ সকল ব্যাকরণে দৃষ্ট হয় না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বহু প্রয়োগ পাণিনিব্যাকরণসিদ্ধ নহে; পরন্তু পাণিনিপ্রয়োগের বিপরীত দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে পাণিনি ব্যাকরণের পরবর্তী যুগে রামায়ণ ও মহাভারতাদি রচিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

কাব্যসাহিত্যযুগে আর্যভাষা দৈনন্দিন কথিতভাষারূপে প্রচলিত ছিল না। ঐ যুগেই পাণিনিব্যাকরণসম্মত বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে উহা ব্যবহৃত হওয়ায় এবং কবিগণের নিরঙ্কুশতায় পাণিনির পরবর্তীযুগেও উহার কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ঐ সকল পরিবর্তন বহু বৈয়াকরণ পরবর্তীকালে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পাণিনির টীকাকারগণও নানা উপায়ে সেগুলির সমর্থন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে আমরা প্রাচীন আর্যভাষার বহু নিদর্শন দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলে পুরাণগুলি প্রথমে প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে সংস্কৃতভাষায় পরিবর্তিত হইয়াছে। ঐ অনুমান কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হয়। ঋগ্‌বেদাদিতে ছন্দেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়; বেদের ন্যায়, রামায়ণ মহাভারতাদিতেও ছন্দঃই অবলম্বিত হইয়াছে এবং অনুষ্টুভ্‌ ছন্দেই অধিকাংশ ভাগ রচিত হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর জাতীয় সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত। কাব্য-মাত্রই সহৃদয় দর্শক বা শ্রোতার হৃদয়ে এক অলৌকিক অখণ্ড আনন্দরস

আনয়ন করে, কিন্তু সকল কাব্যই সার্বজনীন সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হয় না। বহু কাব্যে মানবজীবনের বা দেবজীবনের অনেক লৌকিক বা অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ আছে ও তাহাতে মনোহারিত্বও আছে এবং তাহা কালে কালে বহু হৃদয়েব আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহা সার্বজনীনরূপে জাতীয় সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই। রামায়ণ ও মহাভারত সম্প্রদায় বিশেষের সম্পদ্ নহে, উহা ভারতের সকল আর্যনরনারীর হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের সুখ ও দুঃখ, আশা ও নিরাশা, ত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠা, কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা নায়ক নায়িকার সুখ, দুঃখ বা অনুভূতি বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; উহা ভারতেব সকল আর্য নরনারীর হৃদয়ের অনাবিল অনুভূতির প্রতিচ্ছায়া।

রামায়ণ আর্য নরনারীর হৃদয় কতদূর অধিকার করিয়াছে তাহাব প্রমাণ ভারতের সর্বপ্রদেশেই বিদ্যমান। ভারতের এমন প্রাদেশিক ভাষা নাই যাহাতে "রামায়ণ কথা" লিখিত হয় নাই। একজন পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন যে এক তুলসীদাসের "রামচরিত মানস"ই যত লোকের অশ্রুবর্ষণ করাইয়াছে ইংল্যাণ্ডে তত লোক খৃষ্টধর্মশাস্ত্র বাইবেলও পাঠ কবে নাই। ইহা অতিরঞ্জিত নহে। যুক্তপ্রদেশে এমন একজন বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট হিন্দু নাই যাহার গৃহে রামচরিতমানসের অন্ততঃ একটি অধ্যায় সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হয় না।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা রামায়ণের যে যশঃপ্রতিষ্ঠা কামনা কবিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা কম প্রতিষ্ঠা রামায়ণ লাভ কবে নাই। তিনি বলিয়াছিলেন :—

কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাং।
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে॥ ৩৬
তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি॥ ৩৭

বালকাণ্ড ২য় সর্গ।

কথিত আছে কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনেব ক্রৌঞ্চকে কোনও নিষাদ তীক্ষ্ণশর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। ঐ শোণিতাক্ত নিহত ক্রৌঞ্চকে দেখিয়া ক্রৌঞ্চী করুণস্বরে রোদন করিয়াছিল।

"তস্মাত্তু মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ।
জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ॥ ১০
তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
ভার্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্॥ ১১

বালকাণ্ড ২য় সর্গ।

মহর্ষি ঐ ক্রৌঞ্চীর করুণরোদন শ্রবণ করিয়া শ্লোকচ্ছন্দে বলিয়াছিলেন :—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্ অবধীঃ কামমোহিতম্॥ ১৫

মহর্ষির শোকোদ্ভূত ঐ ছন্দই শ্লোক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

"শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ"॥ ২৯

জনকদুহিতা ঐ ক্রৌঞ্চীর প্রতিচ্ছায়া এবং করুণরসই রামায়ণের উপাদান।

মহর্ষি রামায়ণে সূর্যবংশের ইতিহাস ও বিশেষভাবে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের চরিত বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্মনিষ্ঠতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সহনশীলতা ও সতীত্বগৌরব আর্য জীবনের ও আর্য সভ্যতার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। রামায়ণের স্তরে স্তরে ঐ বৈশিষ্ট্যগৌরবই প্রতিষ্ঠিত। ঐ গৌরব রক্ষা করিতে গিয়াই শোক ও দুঃখ, নৈরাশ্য ও করুণা পুঞ্জীভূত পাষাণের ন্যায় মানবহৃদয়ের উচ্চ আদর্শকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। কাল-সমুদ্রের ঊর্মিমালা তাহার উপর ঘাতপ্রতিঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়াছে কিন্তু কর্তব্যপরায়ণতা, সতীত্বগৌরব ও সীতার "দুঃখমূর্তি" ঐ ঘাতপ্রতিঘাতে মলিন হয় নাই। সতীত্বের যে আদর্শ কবিগুরুর সম্মুখে ছিল তাহা এই :—

"পতির্হি দেবতা নার্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ ভর্তুঃ কার্যং বিশেষতঃ॥

রামায়ণ ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের আধার। উহা বহু রত্নপূর্ণ মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও শ্রুতিমনোহর। মহর্ষি বলিয়াছেন :—

কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরং।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্॥ বালকাণ্ড ৩।৮

রামায়ণের রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে মহর্ষি বলিয়াছেন :—

উদারবৃত্তার্থপদৈর্মনোরমৈ—
স্তদাস্থ রামস্থ চকার কীর্তিমান্।
সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈর্যশস্বিনো
যশস্করং কাব্যমুদারদর্শনঃ॥ ৪২
তত্বপগতসমাসসন্ধিযোগং
সমমধুরোপনতার্থবাক্যবদ্ধম্।
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতম্
দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্॥ ৪৩

বালকাণ্ড ২য় সর্গ।

রামায়ণের ভাষা প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, উহা বৈদর্ভরীতিতে রচিত। ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও মনোহারিত্বে, চিত্রনৈপুণ্যে ও প্রাকৃতিক বর্ণনায় কবির অসীমশক্তি। চরিত্রগুলি আলোকচিত্রের ন্যায় সজীব, স্বাভাবিক ও জটিলতাবিহীন। দাক্ষিণাত্যের অরণ্যানী, চিত্রকূট পর্বত, দণ্ডকারণ্য, তাপসাশ্রম, ফেণিল অম্বুরাশি, সকলই মহাকবি মানসপটে অঙ্কন করিয়া তাঁহার প্রতিভারশ্মিতে উদ্ভাসিত করিয়াছেন।

রামায়ণে যে সভ্যতা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা মহাভারতের সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন। মহাভারতের যুগে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ, প্রতাপশালী রাজন্যবর্গ, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কূটনীতি ও অর্থশাস্ত্র লক্ষিত হয় তাহা রামায়ণের স্বচ্ছ সরল জীবন অপেক্ষা বহু অধিক জটিলতাপূর্ণ ও পরবর্তী। রামায়ণের যুগে দক্ষিণাপথে কোনও রাজত্ব থাকা দৃষ্ট হয় না। ঐ বিস্তীর্ণ ভূভাগ বনাকীর্ণ ছিল ও তাহা বানর, রাক্ষস প্রভৃতির আবাসভূমি ছিল এবং কোনও কোনও স্থানে শান্তরসাস্পদ তাপসাশ্রম ছিল। রামচন্দ্র বনে যাইবার সময় ভরদ্বাজ আশ্রমে উপনীত হইলে ভরদ্বাজ চিত্রকূট যাইবার পথ নির্দেশ করেন। ঐ বর্ণনা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে রামচন্দ্র প্রয়াগের নিকট গঙ্গাযমুনা সঙ্গমস্থলের ন্যগ্রোধপাদপের নিকট যাইয়া কালিন্দী পার হইয়া চিত্রকূট পর্বতে গমন করেন।

"গঙ্গাযমুনয়োঃ সন্ধিমাদায় মনুজর্ষভ।
কালিন্দীমনুগচ্ছেতাম্ নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্॥"

অযোধ্যা ৫৫ সর্গ।

তৎকালে চিত্রকূট পর্বতে কুলপতি বাল্মীকির আশ্রম ছিল।* ঐ আশ্রম মাল্যবতীনদীর নিকটে অবস্থিত ছিল। তথা হইতে ক্রমে অত্রিমুনির, শরভঙ্গমুনির ও সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমে রামচন্দ্র গিয়াছিলেন এবং দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া অগস্ত্যমুনির আশ্রমে ও তথা হইতে গোদাবরীতটে পঞ্চবটী-বনে গিয়া কিছুদিন বাস করেন। ঐ পঞ্চবটী বর্তমানে বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জেলায় অবস্থিত। সীতাহরণের পর রাম ও লক্ষ্মণ ঐ পঞ্চবটী ত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যের মধ্য দিয়া ঋষ্যমূক পর্বতে গমন করেন। এই সুদীর্ঘপথ ভ্রমণে কোনও নগর বা রাজত্বের পরিচয় বা নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়না। পরন্তু বহু রাক্ষস ও ভীষণ বন্যজন্তুপূর্ণ ভূভাগের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সকল ঋষিগণ আশ্রমে বাস করিতেন তাঁহারাও রাক্ষসের উপদ্রবে সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন। কপিপুঙ্গব হনূমানের ঋষ্যমূক হইতে মহেন্দ্র পর্বতে ও তথা হইতে লঙ্কা গমনকালেও কোনও জনপদ বা নগবের উল্লেখ দেখা যায়না। পরন্তু মহাসমরের অবসানে যখন রামচন্দ্র সীতা-সমভিব্যাহারে হংসযুক্ত পুষ্পকারোহণে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন তখনও ঠিক পূর্বপথ দিয়াই চলিতেছিলেন। প্রিয়দর্শন রামচন্দ্র বৈদেহীকে বিমান হইতে লঙ্কা, সেতুবন্ধ, কিষ্কিন্ধ্যা,† ঋষ্যমূকপর্বত, "নলিনীচিত্রকাননা" পম্প, জনস্থানে জটায়ুর নিবাসস্থান, পঞ্চবটী, অগস্ত্যাশ্রম, শরভঙ্গাশ্রম, কুলপতি অত্রির আশ্রম, চিত্রকূট, যমুনা, ভরদ্বাজাশ্রম ও প্রয়াগের প্রসিদ্ধ ন্যগ্রোধপাদপ দেখাইয়াছেন কিন্তু অন্য কোনও জনপদ বা নগর বিমান হইতে দেখার কথা বলেন নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে তৎকালে দক্ষিণা পথে কোনও প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল না।

রামায়ণরচনাকালে পাটলীপুত্র (পাটনা) নগর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পাটলীপুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং তাঁহার পৌত্র উদয়ী (৩৮৮-৩৫৫ পূঃ খৃঃ) রাজগৃহ হইতে পাটলীপুত্রে রাজধানী লইয়া যান। ঐ রাজত্ব কালেই বৈশালী (বিশালা) নগরীতে খৃষ্টপূর্ব ৩৮০ অব্দে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভা আহূত হইয়াছিল। রামায়ণের বালকাণ্ডের ৩২ সর্গে বিশ্বামিত্র

* পরে তমসাতীরে তাঁহার আশ্রম হইয়াছিল।

† ভাণ্ডারকর বিশ্বাস করেন কিষ্কিন্ধ্যা বর্তমান হাসলী জেলায় অবস্থিত ছিল।

ঋষির সহিত মিথিলা গমনকালে রাম ও লক্ষ্মণ শোণনদকূলে সমাহিত মুনিগণের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কৌতূহলান্বিত হইয়া বিশ্বামিত্রকে ঐ দেশের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বসুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মগধরাজধানী গিরিব্রজপুর নগরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কৌশাম্বী প্রভৃতি নগরেব নামোল্লেখ করিয়াছেন। পরে শোণনদ যে স্থলে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে ঠিক ঐ স্থান দিয়াই গমন করিয়াছেন, কিন্তু পাটলীপুত্রের উল্লেখ করেন নাই। পাটলীপুত্র গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থলেই স্থাপিত ছিল। তৎকালে পাটলীপুত্র বিদ্যমান থাকিলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন এবং বিশ্বামিত্র পাটলীপুত্রের উল্লেখ করিতেন।*

রামায়ণের রচনাকালে কোশলের রাজধানী অযোধ্যানগরী বলিয়া অভিহিত হইত। কিন্তু বৌদ্ধযুগে, জৈনযুগে ও গ্রীক্ রাজত্বকালে এবং মহর্ষি পতঞ্জলির সময়ে কোশলের রাজধানীর নাম "সাকেত" ছিল। উত্তরকাণ্ডপাঠে আমরা জানিতে পারি রামচন্দ্রের পুত্র লব শ্রাবস্তীনগরে রাজধানী স্থাপন করেন! ঐ নগরের নাম পূর্ববর্তী কাণ্ড সমূহে দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধদেবের সময়ে প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তীনগরে রাজত্ব করিতেন। রামায়ণের বালকাণ্ডে মিথিলা ও বিশালা এই নগরীদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ রাজা কর্তৃক শাসিত হওয়া দৃষ্ট হয়; কিন্তু বুদ্ধদেবের সময় উহা মিলিত হইয়া বৈশালী নাম ধাবণ করিয়াছিল। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, রামায়ণের মূল অংশ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল।

রামায়ণের কোন্ অংশ প্রাচীন ও কোন্ অংশ নূতন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। উত্তরকাণ্ড পরে সংযোজিত হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। লঙ্কাকাণ্ডেব শেষে "ফলশ্রুতি" দৃষ্ট হয়। উহাই প্রাচীন মূলগ্রন্থের সমাপ্তিবাক্য বলিয়া বোধ হয়। বালকাণ্ডের ১ম সর্গের ৮৯, ৯০ শ্লোকে যে বিষয়সূচী দৃষ্ট হয় তাহাতে উত্তরকাণ্ডের উল্লেখ নাই।

"নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘঃ।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্॥৮৯
পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবৎ মুদিতাঃ প্রজাঃ।
অযোধ্যাপতিঃ শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ॥৯০

*বালকাণ্ড ৩২ ও ৩৪ সর্গ।

কিন্তু বালকাণ্ডের ৩য় সর্গের ৩৮ শ্লোকে যে বিষয়সূচী আছে তাহাতে বৈদেহীবিসর্জনের উক্তি আছে ঃ—

"রামাভিষেকাভ্যুদয়ং সর্বসৈন্যবিসর্জনম্।
স্বরাষ্ট্ররঞ্জনঞ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্॥ ৩৮

কিন্তু প্রথম সূচীপত্রে না থাকায় ও দ্বিতীয় সূচীপত্রে থাকায় ইহাই অনুমান হয় যে উত্তরকাণ্ড সংযোজিত হইবার পর এই দ্বিতীয় সূচীপত্র সংযোজিত হইয়াছে। চতুর্থ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে যে উক্তি আছে তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ৭ম কাণ্ডটি পরে সংযোজিত হইয়াছে।

"চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥

এই শ্লোকানুযায়ী সর্গ ও শ্লোক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সর্গ ও শ্লোক রামায়ণে দৃষ্ট হয়। বলিদ্বীপে প্রাপ্ত কবিভাষায় রচিত রামায়ণেও উত্তরকাণ্ড নাই।

রামায়ণের বালকাণ্ডটিও পরে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। বালকাণ্ডে দুইটি সূচীপত্র দৃষ্ট হয়, একটি প্রথম সর্গে, অপরটি তৃতীয় সর্গে। প্রথম সূচীপত্রে বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের নাম নাই। অধ্যাপক জেকবি বলেন যে বর্তমান রামায়ণের বালকাণ্ডের ৫ম সর্গই মূল প্রাচীন রামায়ণের আরম্ভবাক্য ছিল এবং অযোধ্যাকাণ্ড হইতেই রামায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। মূল অযোধ্যাকাণ্ড হইতে কতকাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ও নূতন কয়েকটি সর্গ তাহার সহিত যোগ করিয়া বালকাণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। জেকবির মতে বালকাণ্ডের ১ম সর্গের

"সর্বাপূর্বমিয়ং যেষামাসীৎ কৃৎস্না বসুন্ধরা ;
প্রজাপতিমুপাদায় নৃপাণাং জয়শালিনাম্॥১

এই শ্লোকটিই মূল রামায়ণের প্রারম্ভশ্লোক ছিল। কিন্তু এই সকল যোজনা ও পরিবর্তন বহুকাল পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছে। রামায়ণের তিনটি পৃথক্ পৃথক্ পাঠ বা সংস্করণ ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয়। ঐ তিনটি সংস্করণ প্রচলিত হইবার পূর্বেই ঐ সকল যোজনা ও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, কারণ ঐ সকল সংস্করণে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও তাহাতে বর্তমানকালে প্রচলিত রামায়ণের কাণ্ড ও সর্গগুলির সামঞ্জস্য আছে।

প্রচলিত রামায়ণে ৭টি কাণ্ড ও প্রায় ২৪,০০০ শ্লোক আছে। রামায়ণের যে তিনটি সংস্করণ বা পাঠ আছে তাহা প্রাদেশিক বলা যাইতে পারে। (১) বঙ্গীয়, (২) উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয়, (৩) বোম্বাই প্রদেশীয় (সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র)। প্রায় ৮০০০ শ্লোকে এই তিন সংস্করণেরই অনৈক্য লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশীয় পাঠই সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রাচীন পাঠ বলিয়া গৃহীত হয়। সম্ভবতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৈদর্ভরীতি ও বঙ্গে গৌড়ীরীতির প্রাধান্য থাকায় পণ্ডিতসমাজ ও গায়কগণ প্রাচীন রামায়ণের শ্লোকগুলিকে তাহাদের রুচি অনুসারে স্থানে স্থানে মার্জিত ও স্থানে স্থানে কতকগুলি অতিরিক্ত শ্লোক যোজনা করিয়া লইয়াছেন, তজ্জন্যই তিনটি সংস্করণে পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র বিদ্যমান না থাকায় এই প্রকার বিস্তীর্ণ গ্রন্থের পাঠভেদ হওয়া স্বাভাবিক।

রামায়ণের দুইখানি সংক্ষিপ্তসার বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর নাটকে ও অলঙ্কারগ্রন্থে উহার বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐগুলি দৃষ্টে বোধহয় যে ঐ সকল গ্রন্থকারগণ বোম্বাইপাঠ অথবা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাঠ জ্ঞাত ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্রের **রামায়ণ-মঞ্জরী** গ্রন্থ (১১শ শতাব্দী) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাঠ অনুসারে রচিত এবং ভোজরাজ রচিত **রামায়ণ-চম্পূ** (১১শ শতাব্দী) বোম্বাই পাঠের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ হয়।

রামায়ণের মূল অংশ মহাভারতের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বাল্মীকি "আদিকবি" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাহাই সমর্থিত হয়। মহাভারতের বহুস্থানে রামায়ণের উপাখ্যানগুলির উল্লেখ আছে কিন্তু রামায়ণের কোনও স্থানেই মহাভারতের উল্লেখ নাই। পরন্তু মহাভারতে রামায়ণেব মূল অংশ হইতে একটি শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বনপর্বে রামোপাখ্যানে রামায়ণের ভাষা কথঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ঐ ঐ আখ্যান রচিত হইয়াছে। রামায়ণের সূর্য বংশের ও মহাভারতের চন্দ্রবংশের সমসাময়িক নৃপতি হইতে বংশপঞ্জিকা গ্রহণ করিলে রামায়ণের ঘটনার বহু পরে মহাভারতের ঘটনা স্থাপিত হয়। অন্ততঃ ৫০ পুরুষের ব্যবধান দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই যে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল তাহা বৌদ্ধ জাতক কাহিনীগুলি দ্বারাও প্রমাণিত হয়। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের একটি শ্লোক পালি জাতকে অবিকল গৃহীত হইয়াছে।

রামায়ণের এক স্থানে বুদ্ধের উল্লেখ আছে।

"যথা হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।"

অযোধ্যা ১০৯।৩৪

ঐ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার কারণ আছে। বিশেষতঃ বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে ও মহাভারতে দৃষ্ট হয়, কপিলাবস্তুর বুদ্ধদেবের পূর্বে একাধিক বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু যুগাবতার বুদ্ধদেবই ঐ বুদ্ধমত সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সকল বিষয় সম্যক্ বিবেচনা করিলে রামায়ণের মূল অংশ যে বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী যুগের, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।*

রামায়ণের বর্ণনায় আমরা আর্যসভ্যতা ব্যতীত আরও দুইটি সভ্যতার বিবরণ দেখিতে পাই। ঐ দুইটি সভ্যতা তৎকালে দক্ষিণাপথে বিদ্যমান ছিল। একটি বানর-সভ্যতা, অপরটি রাক্ষস-সভ্যতা। বানর-সভ্যতাটি আর্য-সভ্যতার প্রতিকূল ছিল না কিন্তু রাক্ষসসভ্যতাটি আর্যসভ্যতার সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল। যে সকল ঋষিগণ দণ্ডকারণ্য ও জনস্থান প্রদেশে বাস করিতেন তাঁহাদের উপর রাক্ষসগণ অত্যাচার করিত। অনেকেরই বিশ্বাস যে রাক্ষসগণের কোনও প্রকার সভ্যতা ছিল না, তাহারা নরমাংসলোলুপ নৃশংস বিকটাকার প্রাণী ছিল। কিন্তু রামায়ণ পাঠ করিলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে রাক্ষসগণ নানা প্রকার কলাবিদ্যার অধিকারী ছিল এবং তাহাদের সভ্যতা আর্যসভ্যতার বিদ্বেষী হইলেও উহা বহু প্রাচীন ছিল।

রামায়ণরচয়িতা আদিকবি বাল্মীকির বিশেষ কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিম্বদন্তী আছে তিনি রত্নাকর নামক এক দস্যু ছিলেন, পরে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ম-রা ম-রা এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে বল্মীকদ্বারা আবৃত হইয়া যান, তজ্জন্য তিনি বাল্মীকি নামে অভিহিত হন। এই কিম্বদন্তীর কোনও শাস্ত্রীয় ভিত্তি নাই। রামায়ণ পাঠে জানা যায় যে রামচন্দ্রের বন-গমনের সময় তাঁহার আশ্রম চিত্রকূট পর্বতে ছিল, পরে তাঁহার আশ্রম

* বৌদ্ধ দশরথজাতকে রামায়ণের মূল আখ্যায়িকা আছে কিন্তু উহা বহুধা বিকৃত হইয়াছে। ঐ জাতকে সীতাদেবী রামের ভগিনী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

তমসানদী তীরে ছিল। অযোধ্যায় রাজ্যশাসনে অযোধ্যাপতি দশরথ যে কুলপতি বাল্মীকির পরামর্শও গ্রহণ করিতেন তাহাও প্রতীয়মান হয়।* সীতা বনবাসকালেও তাঁহারই তমসাকূলস্থ আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তিনিই রামায়ণ রচনা করিয়া লব ও কুশকে তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কুলপতি বাল্মীকির সম্বন্ধে আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না। ব্যক্তিগত ইতিহাসে আর্যগণ চিরদিনই উদাসীন ছিলেন। জন্ম, তপশ্চরণ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গ্রন্থপ্রণয়ন ইত্যাদি জীবনের ঘটনা লইয়া আর্যগণ ব্যগ্র ছিলেন না। গ্রন্থকারের গ্রন্থ জগতে রহিয়া গেল, চিন্তাশীল মনস্বিগণ ঐ গ্রন্থেই গ্রন্থকারকে যুগে যুগে সন্দর্শন করিবেন। আদিকবির নশ্বর জীবনচরিত কোন্ সুদূর অতীতের মহাপঙ্কে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহার অমৃতময় বাণী যতকাল অভ্রভেদী হিমালয় ও পুণ্যতোয়া ভাগীরথী থাকিবে তত কাল মানব হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

রামায়ণের বহু টীকা আছে তন্মধ্যে **রামায়ণকতকই** সর্বপ্রাচীন টীকা। বেনারস কুইন্স কলেজের লাইব্রেরীতে ও তাঞ্জোর রাজলাইব্রেরীতে ঐ টীকার হস্তলিখিত পুস্তক আছে। রামশর্মন্ বা রামবর্মন্ কৃত **তিলক** টীকা সর্বত্র সমাদৃত হয়। নাগেশ ভট্ট তাঁহার পৃষ্ঠপোষক শৃঙ্গবেরপুরাধীশ রাম-বর্মণের নাম দিয়া রচনা করিয়াছেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। (১৮ শতাব্দী) গোবিন্দরাজকৃত (মহুর টীকাকার) **রামায়ণভূষণ** নামক টীকাও প্রাচীন টীকা (১২ শতাব্দী)। মহেশ্বর তীর্থ ও বরদরাজ (মৈথিল) রামায়ণের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ত্র্যম্বকযজ্বনকৃত ধর্মকূট ও রামানন্দতীর্থকৃত রামায়ণ-কূটটীকা নামক দুইখানি টীকা আছে। এতদ্ব্যতীত বাল্মীকিহৃদয়, বিদ্বন্মনোরমা ও শৃঙ্গারসুধাকর উল্লেখযোগ্য।

* রাজ্ঞো দশরথস্যৈব পিতুর্মে মুনিপুঙ্গবঃ।
সখা পরমকো বিপ্রো বাল্মীকিঃ সুমহাযশাঃ।
৭।৪৭।১৬—১৭

মহাভারত।

মহাভারত হিন্দুশাস্ত্রে "কার্ষ্ণবেদ" বা পঞ্চমবেদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পাণিনিব্যাকরণ রচিত হইবার পূর্বেই যে মহাভারতের মূল অংশ বিদ্যমান ছিল তাহার অসংদিগ্ধ প্রমাণ আছে। ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথের সুচিন্তিত-মতে পাণিনি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। মহাভারতের মূল অংশ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। পরে কালক্রমে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। কুরুপঞ্চাল সমরই মহাভারতের মুখ্য বিষয়—আখ্যান, উপাখ্যান ও ইতিহাস গৌণ হইলেও উহার মূল বিষয়ের সহিত বিজড়িত হইয়াছে। বর্তমান মহাভারতে ১ লক্ষ শ্লোক আছে এবং উহা ১৮টি পর্বে বিভক্ত। কোনও কোনও পর্বের মধ্যে অনেকগুলি অনুপর্ব আছে। হরিবংশ মহাভারতের পরিশিষ্ট বলিয়া পবিগণিত।

রামায়ণেব ন্যায় মহাভারতেরও প্রাদেশিক পাঠ বা সংস্করণ বিদ্যমান আছে। বঙ্গীয় পাঠ ও বোম্বাই প্রদেশীয় পাঠেব মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই কিন্তু মোটেব উপর বোম্বাই প্রদেশীয় পাঠই শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। বোম্বাই পাঠে প্রায় ২০০ শ্লোক অধিক দৃষ্ট হয়। এই উভয় পাঠই আর্যাবর্তের পাঠ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের তেলেগু প্রদেশের যে পাঠ দৃষ্ট হয় তাহার সহিত আর্যাবর্তেব পাঠেব বহু পার্থক্য আছে. কিন্তু মূল বিষয়গুলির সামঞ্জস্য আছে।

আদিপর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে মহাভারতে মূল ৮৮০০ শ্লোক ছিল, পরে উপাখ্যানগুলি সংযোজিত হওয়ায় শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০ হইয়াছিল। সর্বশেষে নরলোকে লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ।
অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা॥" ১।১।৮১
"উপাখ্যানৈঃ সহজ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমম্।
চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্" ১।১।১০২
"একংশতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্" ১।১।১০৭

এই সকল শ্লোক হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে মহাভারতের তিনটি পৃথক্ পৃথক্ স্তর আছে।

কুরুপঞ্চালগণের মধ্যে যুদ্ধই মহাভারতের মূল বিষয় কিন্তু ফলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নাম যজুর্বেদের কাঠকসংহিতাতে দৃষ্ট হয়। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রেও মহাভারতের নাম দৃষ্ট হয়। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে মহাভারতের যযাতি উপাখ্যানের একটি শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে বিষ্ণুর সহস্র নামের উল্লেখ আছে এবং উহাতে গীতার "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" শ্লোকটিও উদ্ধৃত আছে। আশ্বলায়ন ও বৌধায়ন উভয়েই মহাভারত জানিতেন। ডাঃ বুলার বলেন বৌধায়ন খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতেও মহাভারতের উল্লেখ আছে।* বৌদ্ধ পালিসাহিত্যেও মহাভারতের বর্ণিত ব্রহ্মা গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতে বিষ্ণুর অবতার বর্ণনায় বুদ্ধদেবের নাম নাই। শান্তিপর্বে দশ অবতারের নামোল্লেখকালে কৃষ্ণের পরই কল্কির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু বনপর্বে কলিযুগের ভবিষ্যৎ অবস্থার বর্ণনায় "এডুকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা" এইরূপ উক্তি আছে "এডুক" শব্দের অর্থ বুদ্ধদেবের দন্তাদি প্রোথিত করিবার স্থানে নির্মিত চৈত্যাদি। সম্ভবতঃ ঐ ভবিষ্যদ্বাণী-অংশ পরে মহাভারতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল দৃষ্টে অনুমিত হয় যে মহাভারতের মূল অংশ বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী। মূল ৮৮০০ শ্লোক বৌদ্ধ যুগের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। কোন্ যুগে উপাখ্যানসহ শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০ হইয়াছিল এবং কোন্ সময়ে উহা লক্ষ শ্লোকাত্মক হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে পাতঞ্জলমহাভাষ্যে "কালঃ পচতি ভূতানি" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর বহু ভূমিদান তাম্রশাসনে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতের উল্লেখ আছে। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর প্রথমভাগে গুপ্তরাজগণের শিলালিপিতে লক্ষশ্লোক মহাভারতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুবন্ধু মহাভারতের পর্বগুলির ও হরিবংশের ব্যবহার করিয়াছেন। ৭ম শতাব্দীতে বাণভট্টও লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত জানিতেন, তৎকালে ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভগবদ্গীতাধ্যায়গুলি বিদ্যমান ছিল। ৮ম শতাব্দীতে মীমাংসক কুমারিলভট্ট মহাভারতের অনেক পর্বের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

---

*মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু।
পা ৬।২।৩৮

কুমারিলভট্টের সময়ে "অনুক্রমণিকা" ও "পর্বসংগ্রহ" অধ্যায় বিদ্যমান ছিল। শঙ্করাচার্য ৮ম শতাব্দীতে ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করেন এবং মহাভারতকে স্মৃতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ১১শ শতাব্দীতে কাশ্মীরকবি ক্ষেমেন্দ্র "ভারতমঞ্জরী" নামক মহাভারতের এক সারসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। ঐ সারসংগ্রহের সহিত মহাভারতের আর্যাবর্তের পাঠের ঐক্য দৃষ্ট হয়।

মহাভারতের পাঠান্তর

ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করিয়া তাঁহার পঞ্চ মুখ্য শিষ্য বৈশম্পায়ন, সুমন্তু, জৈমিনি, পৌল, ও শুকদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন।

"সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ।"

ঐ সংহিতাগুলির পৃথক্ পাঠই বোধহয় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পৃথক্ পাঠের মূল কারণ। বৈশম্পায়ন সর্বপ্রথমে জনমেজয়ের যজ্ঞসভায় মহাভারত আবৃত্তি করিয়াছিলেন। পরে পুনরায় নৈমিষারণ্যে সৌত্রিও আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ভারতে যেসকল পাঠ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কোনও পাঠের আখ্যানগুলির কতক পরিত্যক্ত হইয়াছে কোনও পাঠে উহা গৃহীত হইয়াছে। কোনও পাঠে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আদি পর্বের কাশ্মীরী শারদা পাঠে ৭৯৮৪ শ্লোক, কলিকাতা সংস্করণে ৮৪৬০ শ্লোক, মহারাষ্ট্র সংস্করণে ৮৬২০ শ্লোক, মান্দ্রাজ সংস্করণে ৯৯৮৪ শ্লোক এবং কুম্ভকোণাম সংস্করণে ১০,৮৮৯ শ্লোক দৃষ্ট হয়। আর্যাবর্তের পাঠ অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য পাঠে অধিক শ্লোক দৃষ্ট হয়।

সংস্করণগুলিকে মুখ্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটী আর্যাবর্ত পাঠ অপরটি দাক্ষিণাত্যপাঠ। আর্যাবর্তের পাঠগুলিকে পুনরায় বিভিন্ন রূপে বিভাগ করা যাইতে পারে (১) কাশ্মীরী-পাঠ (২) মধ্যভারতীয় (নেপালী, মৈথিলী, ও দেবনাগরী) ও (৩) বঙ্গীয় পাঠ। দাক্ষিণাত্য পাঠের তেলেগু, তামিলীগ্রন্থপাঠ ও মলয়ালম্ পাঠ। আর্যাবর্ত পাঠের মধ্যে কাশ্মীরী শারদা লিপির পাঠই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত কারণ কাশ্মীরই আর্যাবর্তে সরস্বতী-পীঠ ছিল। সরস্বতী-পীঠে পণ্ডিতগণ বিদ্যা সমাপ্ত না

করিলে পাণ্ডিত্যগৌরব লাভ করিতে পারিত না। মধ্যভারতীয় পাঠগুলি সাধারণতঃ দেবনাগরী লিপিতে লিখিত। বঙ্গীয় পাঠ কাশ্মীরী পাঠের উপরে গঠিত।

ভারতের সর্বপ্রদেশের হস্তলিপি পাঠ, মুদ্রিত পাঠ ও ইউরোপীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকের পাঠ বিবেচনা করিয়া পুণ্যপত্তন হইতে মহাভারতের প্রকৃত পাঠ নির্দ্ধারণের যে মহতী প্রচেষ্টা হইতেছে তাহা প্রশংসনীয়। আদি পর্ব মুদ্রিত হইতেই প্রায় ৬০ খানি পুস্তক ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত টীকাকারগণের গৃহীত পাঠও বিবেচিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

হরিবংশ মহাভারতের "খিল" বা পরিশিষ্টস্বরূপ। হরিবংশে প্রায় ১৬,০০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়। আদিপর্বে হরিবংশের শ্লোক সংখ্যা ১২,০০০ বলিয়া উল্লেখ আছে।

দশশ্লোকসহস্রাণি বিংশৎশ্লোকশতানি চ।
খিলেষু হরিবংশেচ সংখ্যাতানি মহর্ষিণা॥" ১।২।৩৭৯

অনুমান ৪,০০০ শ্লোক পরে হরিবংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের বংশের ইতিহাস কথিত হইয়াছে।

মহাভারতের টীকা। দেববোধ, বিমলবোধ, শাণ্ডিল্য, সর্বজ্ঞ-নারায়ণ, রত্নগর্ভ, অর্জ্জুন মিশ্র, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির টীকা প্রসিদ্ধ। দেব বোধের উত্তানদীপিকা টীকাই সর্বপ্রাচীন ও সর্বসম্মানিত টীকা। উহা কাশ্মীরী পাঠের উপর রচিত। রত্নগর্ভ আর্যাবর্ত-দাক্ষিণাত্য মিশ্র পাঠের উপর রচিত। অর্জ্জুন মিশ্রের অর্থদীপিকা আর্যাবর্তের পূর্ব প্রদেশের পাঠের উপর আস্তৃত। উহা সম্ভবতঃ ১৪শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। সর্বশেষে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নীলকণ্ঠ তাঁহার ভারতভাবদীপ রচনা করিয়াছেন। তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

মহারাষ্ট্রপ্রদেশস্থ কূর্পরবাসী নীলকণ্ঠ ১৬শ **শতাব্দীতে** মহাভারতের **ভারতভাবদীপনামক** টীকা রচনা করেন। **তিনি বহু** দেশীয় পাঠ ও **বহু** কোষ বিবেচনা করিয়াছেন:—

বহূন্ সমাহৃত্য বিভিন্ন দেশ্যান্
কোষান্ বিনিশ্চিত্য চ পাঠমগ্র্যম্।

প্রাচাং গুরূণামনুসৃত্য বাচম্
আরভ্যতে ভারতভাবদীপঃ ॥

এতদ্ব্যতীত দেববোধ ও রত্নগর্ভ-কৃত ২ খানি টীকা আছে, তাহা মুদ্রিত হয় নাই।

মহাভারত পঞ্চমবেদ বলিয়া খ্যাত। বেদাদিশাস্ত্র সকল জাতির পঠিতব্য ছিলনা ও তাহাতে শূদ্রের অধিকার আদৌ ছিলনা। তজ্জন্য অখিল বেদশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, স্মৃতি প্রভৃতির সারসংগ্রহ মহাভারতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সকলগুলি উপনিষদের সারমর্ম ও সকলগুলি দর্শনের সামঞ্জস্য ভীষ্মপর্বের গীতাধ্যায়ে সন্নিবেশিত হওয়ায় মহাভারত একাধারে জগতের সাহিত্যে এক বিপুল সংগ্রহ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন।—

"অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥" ১।২।৩৮৩

রামায়ণের সহিত মহাভারতের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রামায়ণের বর্ণিত সভ্যতা মহাভারতের বর্ণিত সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন। রামায়ণে সভ্যতার বিকাশ, মহাভারতে উহার পূর্ণতা। সম্ভবতঃ মহাভারতের যুদ্ধের অবসানেই হিন্দু-সভ্যতার অবনতির সূচনা হয়। যে কালে বেদবিভাগাদি সম্পাদিত হইয়াছিল সেই কালেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমরপ্রাঙ্গণ ভারতীয় রাজন্যবর্গের শোণিতাক্তকর্দমলিপ্ত হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধের অবসানে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই অবসাদ হইতে কখনই মুক্তিলাভ করে নাই।

মহাভারতে বিভিন্ন দর্শনাদির মতগুলি ও মতভেদ বিশেষতঃ সকল দর্শন গুলির মতের সমন্বয় করিবার যে চেষ্টা দেখা যায় তাহাতে তৎকালেই ষড়-দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়।* ধর্ম-শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতির পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হয়। বেদবিহিত ধর্মের সহিত কপিলের সাংখ্যযোগের সমাবেশ, ও

* আধুনিক কালে ষড়দর্শন বলিলে যে দর্শনগুলি বুঝায়, প্রাচীনকালে ষড়দর্শন কথা দ্বারা তাহা বুঝাইত না।

ভক্তিযোগের উদয় হইয়াছে। নারায়ণীয় ও ভক্তিবাদের স্রোত ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বৈদিক মন্ত্রশক্তির স্থান অধিকার করিতেছে। ব্রাহ্মণেতর জাতিও ধর্মমতের প্রবর্ত্তক হইতেছে। বিদুরের মত জনসমাজের হৃদয় অধিকার করিতেছে।

পুরাণ

বেদের অর্থ প্রকাশ (উপবৃংহন) করিবার জন্য পুরাণগুলি গঠিত হইয়াছিল। উহাতে বহুকাল ব্যয়িত হওয়া সম্ভব।

স্তুতিপ্রধান ঐশীশক্তি, ভাবপ্রসূত রূপকল্পনা, কল্পনাঘন দেবতামূর্তি ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করিয়াছে। বেদেব স্তুতি, উপনিষদের সর্বব্যাপিণী বিশ্বদৃষ্টি ও পুরাণের কল্পনাঘন প্রতীকপূজা ক্রমশঃ বিস্তৃতি ও বিকাশ লাভ করিয়াছে।

"ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং উপদেশসমন্বিতম্।
পুরাবৃত্তকথাযুক্তং ইতিহাসং প্রচক্ষতে॥" —দেবী ভাগবত

অধুনা ইতিহাস অংশ পুবাণেব সহিত মিলিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

বহুকাল ব্যাপিয়া বর্তমান পুবাণগুলি গঠিত হইয়াছে। পুরাণগুলি পরস্পর পরস্পরের নাম উল্লেখ করে, শ্লোকসংখ্যা ও বিষয়বস্তুগুলির উল্লেখ করে। প্রাচীন পুবাণগুলি পঞ্চলক্ষণযুক্ত। ভাগবত পুরাণগুলিকে দশলক্ষণযুক্ত বলিয়াছেন।

"সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষামন্বন্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরূপাশ্রয়ঃ॥"

অতিরিক্ত পঞ্চলক্ষণ ক্রমশঃ স্থান পাইয়াছে। অষ্টাদশ পুবাণের নামের মধ্যেই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কূর্ম অগ্নিপুরাণের নাম করেন না, বায়ুর নাম করেন। অগ্নি শৈবপুরাণের নাম না করিয়া বায়ুব নাম করেন। বরাহ, গরুড়পুরাণের ও ব্রহ্মাণ্ডের নাম না করিয়া বায়ু ও নরসিংহের নাম করেন। মার্কণ্ডেয়, বিষ্ণু ও ভাগবত বায়ুর নাম করেন না। মৎস্য ও অগ্নি শৈবকে গণনা করেন না।

ভাগবতপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের নাম যথাক্রমে কথিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতম্ আগ্নেয়ং স্কান্দ-সংজ্ঞিতম্॥

ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডমিতিত্রিষট্॥"
ভাঃ ১২।৭।২৩-২৪।

সূতগণেরা পুরাণ পাঠ করিতেন, মাগধেরা বংশ কীর্তন করিতেন এবং বন্দিগণ রাজবংশ বর্ণনা কবিতেন।

"সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা
মাগধাঃ বংশবেদিনঃ।
বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ
প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ॥"

পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ও অধ্যায়সংখ্যা এবং শ্রেণীবিভাগ

পুবাণের শ্লোকসংখ্যা অগ্নি, মৎস্য, ভাগবত, ও পদ্ম বলিয়াছেন। পুরাণের শ্লোকসংখ্যা কোথাও বেশী দৃষ্ট হয়, কোথাও কম দৃষ্ট হয়। কোথাও এক পুরাণের অংশ অন্য পুবাণে গিয়াছে এরূপ বোধ হয়। ভবিষ্যদ্ অংশগুলি পরে সংযোজিত হইয়াছে এরূপ ধারণা হয়।* পুবাণগুলি সাধারণতঃ তিন-শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়।

সাত্ত্বিকপুরাণ—বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গারুড়, পদ্ম ও বরাহ।

রাজসিকপুরাণ—ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মা।

তামসপুরাণ—মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ, ও অগ্নি। দেবতা অনুসারে বিভাগও দৃষ্ট হয়।

(১) ব্রাহ্মপুরাণ। (২) বৈষ্ণবপুরাণ। (৩) শৈবপুবাণ।
ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মাপুরাণ এই ছয়খানি ব্রাহ্ম পুরাণ। বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ পুবাণ এই ছয়খানি বৈষ্ণবপুবাণ। মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, বায়ু, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ এই ছয়খানি শৈবপুবাণ।

* পদ্মপুরাণ বলেন ভাগবতে ৩৩২ অধ্যায় আছে কিন্তু শ্রীধর স্বামী ৩৩৫ অধ্যায়েরই টীকা করিয়াছেন। ৩ স্কন্দ ৩য় অধ্যায়, ৭ স্কন্দ ৭ অধ্যায়; ১২ স্কন্দ ১ অধ্যায় পরে সংযুক্ত হইয়াছে মনে হয়।

মহাভারতের পরই পুরাণের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারত রচিত হইবার পর যে কতকগুলি পুরাণ রচিত হইয়াছে তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে দৃষ্ট হয়। ব্যাসশিষ্য জৈমিনী মহাভারত অধ্যয়নের পর দেখিলেন কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর মহাভারতে নাই। ব্যাসদেব অনবসর থাকায় তিনি মার্কণ্ডেয়কে ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান নারায়ণ কি জন্য মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী কেন হইয়াছিল ইত্যাদি। মার্কণ্ডেয় বলিলেন আমার জানা নাই। পক্ষীযোনিপ্রাপ্ত পিঙ্গাক্ষ মুনিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন। প্রাচীন শাস্ত্রে ইতিহাস ও পুরাণের নাম একত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রোল্লিখিত "ইতিহাস" বিদ্যমান আছে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। মহাভাষ্যের ব্যাখ্যাকার কৈয়ট "ইতিহাস" ও "পুরাণ" কথার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন "পূর্বানুচরিতমিতিহাসঃ"। "বংশাদ্যনুকীর্ত্তনং পুরাণম্"। পুরাণের লক্ষণ বিষ্ণুপুরাণে ও অন্যান্য গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। উহাতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, মন্বন্তর, বংশানুচরিত প্রভৃতি বর্ণিত থাকে।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
সর্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ॥

—বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।২৫

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ
বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চেতি
পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ —বায়ুপুরাণ।

পুরাণ অতি প্রাচীন শাস্ত্র। কোনও কোনও বেদের ব্রাহ্মণে পুরাণের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে "পুরাণ" উল্লিখিত হইয়াছে। "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থম্ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং" ইত্যাদি ৭।২।৪৭। মহাভারতের ১ম ও ১৮শ সর্গে ও হরিবংশে পুরাণের উল্লেখ আছে। পাণিনীয় মহাভাষ্যে শব্দপ্রয়োগবিষয়ের উল্লেখে "পুরাণ" উল্লিখিত আছে। "বাকোবাক্যমিতিহাসঃ পুরাণং বৈদ্যকমিতি এতাবান্ শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ" মহাভাষ্য

২৯ পৃঃ। এই সকল দৃষ্টে বোধ হয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুরাণশাস্ত্র প্রচলিত ছিল।

হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে পুরাণগুলিও শ্রুতির ন্যায় ব্রহ্মার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মা অতীতকল্পের স্মৃতি হইতে বেদ পুরাণাদি তাঁহার মানস পুত্র ভৃগু, অত্রি, মরীচি প্রভৃতির নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের অধস্তন ও অন্যান্য ঋষিগণ গুরুপরম্পরা ক্রমে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পুরা পরম্পরাং বক্তি পুরাণং তেন বৈ স্মৃতম্।

পদ্মপুরাণ, ২য় অধ্যায়।

বেদের তথ্য বিকাশ করাই ইতিহাস ও পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল :—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ"।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদবিভাগ ও পুরাণসংগ্রহ কার্যে ব্যাপৃত হন। তিনি পুরাণশাস্ত্রসংগ্রহের জন্য রোমহর্ষণ সূতকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন ও রোমহর্ষণের সাহায্যে তৎকালে জ্ঞেয় পুরাণসাগর মন্থন করিয়া সারসংগ্রহ সংকলন করেন। উহাই পুরাণসংহিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ঐ সংহিতা রোমহর্ষণকে দিয়াছিলেন; তৎকালে উহা একখানি মাত্র সংহিতাই ছিল। রোমহর্ষণ একখানি ও তাঁহার শিষ্যেরা ৩ খানি মোট চারিখানি পুরাণ-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ পুরাণসংহিতাগুলি নৈমিষারণ্যে কথিত হইয়াছিল।

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাংচক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোথ সাবর্ণিঃ ষট্‌শিষ্যাস্তস্য চাভবন্॥
কাশ্যপঃ (অকৃতব্রণ) সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
রোমহর্ষণিকা চান্যা তিস্ৰণাং মূলসংহিতা॥
চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে।

বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬ অধ্যায়।

সম্ভবতঃ পরীক্ষিতের রাজত্বকালে ঐ ৪ খানি সংহিতা অষ্টাদশ পুরাণে বিভক্ত হয়। প্রথমে নৈমিষারণ্যে, দ্বিতীয়বার পরীক্ষিতের রাজত্বকালে তৃতীয়বার জনমেজয়ের রাজত্বকালে এবং চতুর্থবার জনমেজয়ের পৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের (অধিসোমকৃষ্ণ) সময়ে পুরাণ কথিত হইবার সংবাদ অবগত হওয়া যায়। কালক্রমে ঐ কথনপ্রণালী ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইলে বিষয়ের বহু বিস্তার এবং স্মৃতিশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইলে ঐ পুরাণগুলি গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে পুবাণগুলিতে মোট ৪,০০,০০০ চারি লক্ষ শ্লোক থাকা অবগত হওয়া যায়। কোন্ পুরাণে ঐ চারি লক্ষ শ্লোকের কতগুলি ছিল তাহা অগ্নি, মৎস্য ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও দেবীভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়।* বিশেষতঃ যথাপ্রাপ্ত পুবাণগুলির প্রাচীন অংশে যে অনুক্রমণিকা ও অন্যান্য পুবাণের যে বিষয়সূচী আছে তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন পুরাণগুলির বহু অংশ বিকৃত, স্থানচ্যুত, ও অন্তর্হিত হইয়াছে এবং বহু অবান্তর ও অপৌরাণিক বিষয় তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষবশতঃ ও স্ব স্ব সম্প্রদায়েব গৌরবকীর্তনের জন্য বহু আধুনিক বিষয় ঐ সকল পুরাণের অঙ্গবৃদ্ধি করিয়াছে। বহু নবীন তীর্থ, আধুনিক সাম্প্রদায়িক আচার্যের আবির্ভাব ও ব্রতনিয়মাদির বিধান পরিকীর্তিত হইয়াছে। ঐ প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি ফেলিয়া দিয়া পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত মূল অংশগুলি সংগ্রহ করিলে প্রাচীন পুরাণগুলির আংশিক উদ্ধার সম্ভবপর। এ পর্যন্ত কোনও পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য পণ্ডিত ঐ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেবল পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাঁহার পুরাণতত্ত্বে উহার দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। পার্জিটার সাহেব পুরাণগুলিতে যে কলিযুগের রাজবংশ আছে সেইগুলি একত্রিত করিয়া তুলনাপূর্বক কলিযুগের রাজবংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

---

* বিষ্ণুপুরাণ ২৩,০০০	মৎস্য ১৪,০০০	ব্রহ্মাণ্ড ১২,০০০
নারদীয় ২৫,০০০	কূর্ম ১৭,০০০	ব্রহ্মবৈবর্ত ১৮,০০০
ভাগবত ১৮,০০০	লিঙ্গ ১১,০০০	মার্কণ্ডেয় ৯,০০০
গরুড় ১৯,০০০	বায়ু ২৪,০০০	ভবিষ্য ১৪,৫০০
পদ্ম ৫৫,০০০	স্কন্দ ৮১,১০০	বামন ১০,০০০
বরাহ ২৪,০০০	অগ্নি ১৫,৪০০	ব্রহ্ম ১০,০০০

যথাপ্রাপ্ত পুরাণগুলিতে কি পরিমাণ কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে ও বর্তমানে মোটামুটি কি কি বিষয় আছে তাহা স্থূলভাবে প্রদত্ত হইল।

১। মূল **ব্রাহ্মপুরাণে** ১০,০০০ দশ হাজার শ্লোক থাকা অবগত হওয়া যায়। বঙ্গবাসীর সংস্করণে ১৫,০০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়। উহাতে ওড্র বা উড়িষ্যাদেশের তীর্থগুলির প্রাধান্য বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ যথাপ্রাপ্ত সংস্করণখানির অধিকাংশই আধুনিক।

ব্রাহ্মপুরাণ, বিষয়বস্তু।

লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যে সমবেত মুনিগণ সমক্ষে প্রথম আবৃত্তি করিয়াছিলেন। **প্রথম খণ্ডে** সৃষ্টি প্রকরণ, মন্বন্তর, সূর্য ও চন্দ্রবংশ (শ্রীকৃষ্ণের কালপর্যন্ত), পৃথিবীব বিবরণ, উড়িষ্যার পবিত্র মন্দিরগুলির বিবরণ, বিষ্ণু আরাধনা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ঐ বর্ণনায় জগন্নাথদেবের মন্দির ও কোণার্কের সূর্যমন্দিরেব বিবরণ আছে।

উত্তর খণ্ডে দেবমাহাত্ম্য ও বলজানদীর (সম্ভবতঃ রাজস্থানের বনাস নদীর) পবিত্রতা কীর্তিত হইয়াছে। শেষভাগে যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যান আছে। যুগধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, তীর্থ-প্রসঙ্গ ও গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

২। মূল **পদ্মপুরাণে** শ্লোকসংখ্যা ৫৫,০০০ পঞ্চান্ন হাজার ছিল। মূল-গ্রন্থে সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ড নামক ৫টি খণ্ড ছিল ; আধুনিক সংস্করণে ব্রহ্মখণ্ড ও ক্রিয়াযোগখণ্ড নামক ২টি খণ্ড সংযোজিত হইয়াছে। অনুক্রমণিকায় লিখিত বিষয়ের অতিরিক্ত বহু অবান্তব বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ, বিষয়বস্তু।

অতি বিস্তৃত পুরাণ। পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত।

(১) সৃষ্টিখণ্ড। লোমহর্ষণ সূত উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে বলিয়াছেন। সর্বপ্রথম ব্রহ্মা পুলস্ত্যকে বলিয়াছিলেন।

(২) ভূমিখণ্ড। পৃথিবীর বিবরণ ও তীর্থস্থান প্রভৃতির বিবরণ। পুষ্কর-তীর্থ মাহাত্ম্য (পুষ্কর হ্রদ) বর্ণিত আছে।

(৩) স্বর্গখণ্ড। উপরিস্থ লোকের বর্ণনা, বৈকুণ্ঠলোক, দক্ষযজ্ঞ ইত্যাদি

(৪) পাতালখণ্ড। নাগলোকের বর্ণনা, রামলীলা, অশ্বমেধযজ্ঞ, রঘুবংশ, ভাগবত প্রশংসা, বিষ্ণু আরাধনা ইত্যাদি। পাতালখণ্ডে পাতাল বা নাগলোকের বর্ণনা, শ্রীরামচন্দ্রের আখ্যান, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও বিষ্ণুভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। বিষ্ণুঅবতার ও বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণ কথিত হইয়াছে।

(৫) উত্তরখণ্ড। বহুবিধ বিষয়, দিলীপরাজা ও বশিষ্ঠের কথোপকথন, ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য। তদতিরিক্ত ক্রিয়াযোগসার আছে। শ্রীরঙ্গমমন্দির ও বেঙ্কটাদ্রির উল্লেখ আছে। জৈনদিগের ও ম্লেচ্ছদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

৩। **বিষ্ণুপুরাণ**খানিতে মূল ২৩,০০০ তেইশ হাজার শ্লোক থাকার উল্লেখ আছে কিন্তু বর্তমানে প্রাপ্ত গ্রন্থে মাত্র ৬০০০ শ্লোক আছে। যথাপ্রাপ্ত বিষ্ণুপুরাণ ব্যাসসঙ্কলিত না হইলেও উহা পরাশরকথিত এবং উহাতে সর্বপ্রকার পুরাণলক্ষণ বিদ্যমান আছে। উহাতে ছয়টি অংশ আছে যথা—সৃষ্টিক্রিয়া, ভূমণ্ডলবর্ণন, চতুর্দশ মনুর বিবরণ, সূর্য ও চন্দ্রবংশ, কৃষ্ণলীলা ও কলিবৃত্তান্ত। বিষ্ণুপুরাণের কোনও কোনও ভাগ গদ্যে রচিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীও বিষ্ণুপুরাণখানিকে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন।

বিষ্ণুপুরাণ, বিষয়বস্তু।

পঞ্চলক্ষণযুক্তপুরাণ, বারাহকল্প। মৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বৈবস্বত মনুবংশ, অযোধ্যার সূর্যবংশ, ইক্ষ্বাকুর বংশ, মিথিলার রাজবংশ, বৈশালীরাজবংশ, পুরুরবার বংশ, কাশী, মগধ ও কুশস্থলি দ্বারকার, মথুরা, অনু, দ্রুহ্য, তুর্বসুর বংশ, কৃষ্ণকথা।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, জড় ও পুরুষ (কাল মধ্যবর্তী) শৃঙ্খল।

ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, দেবতা ও প্রাণী ইত্যাদি সৃষ্টি করেন, রুদ্রকল্পে প্রলয় ঘটান। প্রলয়ান্তে বিষ্ণু শেষশয্যায় নিদ্রিত থাকেন।

সমুদ্রমন্থন, দেবতা ও দানবগণের মিলিত চেষ্টা। ধ্রুব, বেণ, পৃথু, প্রহ্লাদ উপাখ্যান ও দৈত্যবংশ বর্ণন।

সপ্তদিগ্ বিভাগ। ভরত হইতে ভারতবর্ষ। বর্ষাদির বিবরণ, পর্বত, সরিৎগুলির বিবরণ। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাসস্থান। গর্গমুনির জ্যোতিষজ্ঞান, নরক, ভূবাদি সত্যলোক পর্যন্ত লোক, সূর্য ও গ্রহাদির গতি, চন্দ্রের গতি।

বেদবিভাগ ও শাখাবিভাগ আঠাশজন ব্যাস। বিষ্ণু অর্চনা বিধি। ছাত্র ও ব্রহ্মচর্যব্রত, গৃহী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থীর কর্তব্য।

জাতকর্মাদি, বিবাহ, সদাচার, অতিথিসেবা ও শ্রাদ্ধাদি।

দৈত্যগণের বেদ অগ্রাহ্যকরণ। বৌদ্ধ ও জৈনগণের বেদবাহ্যতা ও অপকৃষ্টতা। জীবহিংসা ত্যাগ বিহিত হইয়াছে। শেষাংশে বিষ্ণুভক্তি, শ্রীকৃষ্ণচরিত, বৃন্দাবনলীলা ও রাসলীলা ইত্যাদি বর্ণিত আছে।

৪। পুরাণগণনায় কোনও কোনও মতে ৪র্থ স্থানে **শিবপুরাণ** স্থাপন না করিয়া **বায়ুপুরাণকে** গ্রহণ করে। মতান্তরে বায়ু অষ্টাদশতম পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ব্যাস সংকলিত পুরাণ সংহিতা বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গবাসী সংস্করণে ১৯,০০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়। উহাতে, জ্ঞান, বিদ্যেশ্বর, কৈলাস, সনৎকুমার, বায়ু ও ধর্ম এই ৬টি সংহিতা আছে। সম্ভবতঃ মূল শিবপুরাণের ইহা ধ্বংসাবশেষ মাত্র। মূল শিবপুরাণে ১২টি সংহিতা থাকা দৃষ্ট হয়। বম্বে সংস্করণে ঐ বারটি সংহিতা অনুযায়ী খণ্ডগুলি দৃষ্ট হয় কিন্তু উহাও কৃত্রিমতাপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কাশীর হস্তলিপির সহিত উহার কোনও ঐক্য নাই।

বায়ুপুরাণ, বিষয়বস্তু।

সূতকর্তৃক নৈমিষারণ্যে কথিত হইয়াছিল। ইহা চারি পাদে বিভক্ত।

(১) প্রক্রিয়াপাদ—সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।

(২) উপোদ্‌ঘাত। জীবসৃষ্টি, শ্বেতকল্পাদি। মন্বাদিবংশ বিস্তার, পিতৃগণ। বেদপ্রবর্তক ঋষিগণ।

(৩) অনুষঙ্গ। সপ্তঋষি বংশ, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি, শ্রাদ্ধকল্প, চন্দ্র ও সূর্যবংশ।

(৪) উপসংহার। ভবিষ্যৎমন্বন্তর। দেশ ও কালের বিভাগ, সৃষ্টিধ্বংস (প্রলয়), যোগের প্রভাব।

৫। **ভাগবতপুরাণ** লইয়া একটি তুমুল বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন প্রচলিত ভাগবতপুরাণখানি আধুনিক উপপুরাণ এবং দেবীভাগবতই প্রকৃত ভাগবতপুরাণ। তাঁহাদের মতে ভাগবতপুরাণ বোপদেবগোস্বামিকৃত অথবা তৎকালে রচিত। কিন্তু বেনারস কুইন্সকলেজের লাইব্রেরীতে

হস্তলিখিত যে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত আছে তাহা বোপদেবগোস্বামীর জন্মের বহুপূর্বে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে। অপর পক্ষ বলেন যে মৎস্য ও অগ্নিপুরাণে ভাগবতপুরাণের যে বিষয়সূচী পাওয়া যায় তাহার সহিত দেবীভাগবতের বিষয়ের ঐক্য আছে। মূল ভাগবত পুরাণে ১৮,০০০ শ্লোক থাকা উল্লিখিত আছে।

ভাগবতপুরাণ, বিষয়বস্তু।

নৈমিষারণ্যে সূত কর্তৃক কথিত।

রাজা পরীক্ষিত শৃঙ্গীনামক মুনিপুত্রের অভিশাপে সাতদিনের মধ্যে তক্ষক কর্তৃক দংশনে মরিবেন জানিয়া ব্যাসপুত্র শুকদেবের নিকট এই পুরাণ-পাঠ গঙ্গাতীরে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শুকদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই সূত নৈমিষারণ্যে বলিয়াছিলেন। এই ভাগবতপুরাণই প্রকৃত ভাগবতপুরাণ কি না, অথবা দেবীভাগবতই প্রকৃত ভাগবতপুরাণ তাহা লইয়া তর্ক হইয়া থাকে। ঐ তর্ক শ্রীধরস্বামীর একটি সংদিগ্ধ বাক্যের উপর সংস্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীধরস্বামী ভাগবতপুরাণের টীকা লিখিয়াছেন ও তাঁহার টীকায় পূর্বতন চিৎসুখমুনির টীকা (ত্রয়োদশ শতাব্দী প্রথম ভাগে) উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দেবীভাগবত ভাগবতপুরাণ হইতে পারে না। একটি আধুনিক কিংবদন্তী সৃষ্টি হইয়াছে যে ভাগবতপুরাণের গ্রন্থকর্তা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচয়িতা বোপদেব গোস্বামী। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীধরস্বামী চিৎসুখমুনির টীকার নাম উল্লেখ করায় ও এরূপ প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীধর ভাগবতের টীকা লিখিতেন না এবং তাহা সর্বভারতে সমাদৃত হইত না।

ভাগবতপুরাণের ১২টি স্কন্ধ। পুরাণের সর্বলক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান আছে। নবম স্কন্ধে সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ কথিত হইয়াছে এবং যদুবংশের বর্ণনা আছে। দশমে কৃষ্ণলীলা। একাদশে যদুবংশ ধ্বংস। দ্বাদশে ভাবী মাগধরাজবংশ কথিত হইয়াছে। বেদবিভাগ ও শাখাবিভাগও এই স্কন্ধে আছে। ভাগবতপুরাণ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মান্যগ্রন্থ। মহাপদ্মনন্দ, নবনন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ আছে। ১ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে কীকটে (মধ্যগয়া) বুদ্ধ উদ্ভূত হইবেন উল্লেখ আছে।

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধনাম্নাঞ্জন-সুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।"

শ্রীধরস্বামী "কীকট" মধ্যগয়া প্রদেশ এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

৬। **মূল নারদীয়** পুরাণে ২৫,০০০ শ্লোক থাকা জানা যায়। যথাপ্রাপ্ত বঙ্গে সংস্করণে পঞ্চবিধ লক্ষণযুক্ত পুরাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই পুরাণখানি সম্ভবতঃ মূল পুরাণখানি লুপ্ত হইবার পর আবির্ভূত হইয়াছে।

নারদীয়পুরাণ, বিষয়বস্তু।

বৃহৎকল্পে নারদ কথিত। নারদীয়পুরাণ নৈমিষারণ্যে (গোমতীতীরে) কথিত হইয়াছে। উহা পঞ্চলক্ষণযুক্ত নহে। **বিষ্ণু** ভক্তি-প্রধান। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ উপাখ্যান বর্ণিত আছে। রুক্মাঙ্গদ রাজার মানসকন্যা মোহিনীর উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। শুক ও পরীক্ষিতের নাম উল্লেখ থাকায় ভাগবতের পরবর্তী বলিয়া বোধ হয়। বৃহন্নারদীয়পুরাণ নারদীয়পুরাণের অনুরূপ। উহা কোনো পুরাণের খণ্ডিত অংশ। উহাতে সৃষ্টিপ্রকরণ ও মন্বাদিবংশ নাই। উহাতে সাগরবংশ ভস্ম উপাখ্যান আছে।

৭। মূল **মার্কণ্ডেয় পুরাণে** ৯০০০ শ্লোক ছিল। যথাপ্রাপ্ত সংস্করণে ৭০০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহার কতক অংশ লুপ্ত হইয়াছে। চণ্ডী বা সপ্তশতী ইহার একাংশ বটে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বিষয়বস্তু।

ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট মহাভারতে অনুক্ত বাসুদেব-তত্ত্বাদি ও অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। মার্কণ্ডেয় অন্য কার্যে ব্যাপৃত থাকায় জৈমিনীকে বিন্ধ্যপর্বতবাসী দিব্যজ্ঞানী পক্ষিগণের নিকট যাইতে উপদেশ দেন। জৈমিনী পিঙ্গাক্ষ ও উহার ভ্রাতাগণের নিকট গিয়া ঐ প্রশ্নগুলি (যাহা ভারতে নাই) জিজ্ঞাসা করেন ও উত্তর শ্রবণ করেন। **চণ্ডীসপ্তশতী** মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত। উহা হিন্দুদিগের পবিত্র গ্রন্থ। উহার বহু প্রাদেশিক টীকা আছে। তন্মধ্যে নাগেশভট্ট, বিদ্যাবিনোদ, গোপালবন্দ্যকৃত-তত্ত্বপ্রকাশিকা ভাস্কর রায়কৃত গুপ্তবতীটীকা (সপ্তদশ শতাব্দী) সচরাচর পঠিত হইয়া থাকে।

৮। **অগ্নিপুরাণ** যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে মূলভাগ কতক থাকা অনুমিত হয় কিন্তু ছন্দঃ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ইত্যাদি বহু অবান্তর বিষয় ঐ মুদ্রিতগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কৃতিত্বেও উহাতে বহু বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল অগ্নিপুরাণে ১৫,৪০০ শ্লোক ছিল।

অগ্নিপুরাণ, বিষয়বস্তু।

ব্যাসদেব সূতকে শিক্ষা দেন। সূত নৈমিষারণ্যে বলিয়াছিলেন। প্রথম অধ্যায়গুলিতে অবতারগুলি বর্ণিত হইয়াছে। রাম বাল্মীকির অনুরূপ, কৃষ্ণ ব্যাসের মহাভারতের অনুরূপ, শালিবাহন ও বিক্রমাদিত্য রাজার ঐতিহ্য প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্মাচরণ, গুরু, শিষ্য, দীক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা আলোচিত হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, ভূ-পৃষ্ঠের বিভাগাদি বর্ণিত হইয়াছে। তীর্থস্থান মাহাত্ম্য, বিশেষতঃ গয়ামাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। রাজধর্ম যুদ্ধবিগ্রহাদি ও ব্যবহারশাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। বেদবিভাগ ও পুরাণ-প্রচার বিবৃত হইয়াছে। রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত আছে। অথর্ব-বেদের ধনুর্বিদ্যা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দঃ, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত আকারে কথিত হইয়াছে। মোটের উপর ইহা একখানি সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ।

৯। **ভবিষ্যপুরাণে** ১৪,৫০০ শ্লোক থাকা অবগত হওয়া যায়। মুদ্রিত গ্রন্থে ২৫,০০০ শ্লোক। মৎস্যপুরাণে ভবিষ্যের যে বিবরণ আছে তাহার সহিত ঐক্য নাই। সম্ভবতঃ ইহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত।

ভবিষ্যপুরাণ, বিষয়বস্তু।

অঘোরকল্পীয়।

ভবিষ্যদ্বাণী ব্রহ্মা সূর্যের মাহাত্ম্য মনুর নিকট বলিতেছেন। প্রথমাংশে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। উহাতে মনুর স্মৃতি অনুসৃত হইয়াছে। ধর্মাচরণ, ক্রিয়াকাণ্ড, সংস্কারাদি, সন্ধ্যাবন্দনাদি, আশ্রমধর্ম, চাতুর্বর্ণ্য, ব্রতনিয়মাদি, নাগপঞ্চমী, গুরুভক্তি, উপবাসাদি, শ্রীকৃষ্ণশাম্বসংবাদ, সূর্যের কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্যক্ষমতা, কথিত হইয়াছে।

এই পুরাণে পারসিক জাতির সূর্য উপাসনা পরিলক্ষিত হয়।

ভবিষ্যোত্তরপুরাণ এই পুরাণের সম্পূরক বলিয়া গণ্য হয়। যথাপ্রাপ্ত পুস্তকের ১২৬টি অধ্যায় আছে। উহাতে রথযাত্রা উৎসব বর্ণিত হইয়াছে।

১০। **ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে** ৪টি খণ্ড আছে (১) ব্রহ্মখণ্ড (২) প্রকৃতি খণ্ড (৩) গণেশ খণ্ড (৪) শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড। ইহার অনুক্রমণিকার সহিত নারদীয় পুরাণের উল্লিখিত বিষয়সূচীর ঐক্য নাই। কিন্তু ইহাতে মূলাংশ কতক আছে ও কৃত্রিমতা ঢুকিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বিষয়বস্তু।

রথন্তরকল্পে সাবর্ণি নারদকে বলিযাছেন এরূপ উক্তি আছে। ইহাতে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু যথাপ্রাপ্ত সংস্করণে নারায়ণ ঋষি নারদকে এবং নারদ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন। ব্যাস সূতকে শিক্ষা দিয়াছেন। সূত নৈমিষারণ্যে পাঠ করিয়াছেন। ইহা চারিটি খণ্ডে বিভক্ত।

(১) ব্রাহ্ম, (২) প্রকৃতি (দেবী), (৩) গণেশ, (৪) শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড।

কিন্তু তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডই প্রবল। কিশোর কৃষ্ণ ও রাধিকার অনন্ত-প্রেম, গোপীগণসহ লীলা, বৃন্দাবন ও গোলকধামের বর্ণনা, ইত্যাদি পরিপূর্ণ-ভাবে বর্তমান আকারে প্রকটিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতপুরাণে রাধিকার নাম দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই পুরাণে উহা দৃষ্ট হয়। ইহাতে কেহ কেহ সন্দেহ করেন মৎস্য পুরাণের উল্লিখিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ইহাই কিনা? সাবিত্রী ও সত্যবানের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। সুরভি, স্বাহা, স্বধা, সুরথ, ইন্দ্রের প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ, কার্তবীর্য ও পরশুরাম প্রভৃতি উপাখ্যান আছে।

বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবমত এই পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মখণ্ডে কারু-শিল্পীদিগের উৎপত্তি বিবরণ আছে। প্রকৃতি (দেবী) খণ্ডে ও গণেশখণ্ডে দেবী ও গণেশের মাহাত্ম্য ও আখ্যানগুলি বর্ণিত হইয়াছে।

১১। **লিঙ্গ পুরাণ**—ইহার মূল শ্লোকসংখ্যা ১১,০০০। মুদ্রিত গ্রন্থে শ্লোক সংখ্যা কম। এই কম সত্ত্বেও পুরাণবহির্ভূত বিষয় সন্নিবিষ্ট থাকা দৃষ্ট হয়।

লিঙ্গপুরাণ, বিষয়বস্তু।

উহা ঈশানকল্পের ব্যাপার।

প্রথমতঃ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া উক্ত হইয়াছে। শিবই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কল্পদ্বয়মধ্যে অগ্নিতুল্য শিব আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু বিষ্ণু ও ব্রহ্মা উভয়েই শিবশক্তির প্রাধান্য অঙ্গীকার করিলেন না।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। হঠাৎ লিঙ্গমূর্তির আবির্ভাবে উভয়েই লজ্জিত হইলেন। সহস্র সহস্র বৎসর উর্দ্ধদিকে ও অধোদিকে ভ্রমণ করিয়াও অন্ত পাইলেন না। শিবলিঙ্গের উপর ওঙ্কার প্রকটিত হইল। ওঙ্কার হইতে বেদ নিঃসৃত হইল। তাহা দৃষ্টে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন ও শিবের মাহাত্ম্য স্বীকার করিলেন।

ত্রৈলোক্যের বিবরণ, রাজবংশ, উপাখ্যান, ঐতিহ্য ও আচারাদি কথিত হইয়াছে।

লিঙ্গ (চিহ্ন) দ্বিবিধ। বাহ্য ও মানসিক অর্থাৎ মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও ধাতব নির্মিত। জ্ঞানীরা বাহ্য মূর্তি অবলম্বন করেন না। চিন্তাশীলেরা সেই অদৃশ্য, অতীন্দ্রিয়, অস্পর্শ নিত্যবস্তুতে মনোনিবেশ করেন। যোগপ্রণালীর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

১২। **বরাহ পুরাণ**—মূল শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০। বঙ্গবাসী সংস্করণে ৯,০০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়। উহাসত্ত্বেও পুরাণলক্ষণের বহির্ভূত ৬,০০০ শ্লোক আছে। ঐগুলি বাদ দিলে মাত্র ৩,০০০ মূল শ্লোক উহাতে বিদ্যমান থাকা প্রতীয়মান হয়।

বরাহ পুরাণ, বিষয়বস্তু।

বিষ্ণু বরাহরূপে ধরণীকে বলিয়াছেন। বর্তমান শ্লোক সংখ্যা অনেক কম। ইহা একখানি প্রাচীন পুরাণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। অতি সংক্ষেপে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও রাজবংশ বর্ণিত হইয়াছে। লিঙ্গপুরাণের ন্যায় পূজা, অর্চনা-বিধি ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। মথুরা ও অন্যান্য তীর্থস্থানের বর্ণনা আছে। মথুরামাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে।

১৩। **স্কন্দ পুরাণ**—মৎস্য ও অগ্নি পুরাণের মতে উহাতে ৮১,১০০ বা ৮৪,০০০ শ্লোক থাকা দৃষ্ট হয়। ভবিষ্যপুরাণের মতে উহাতে ১,০০,০০০ শ্লোক আছে। ইহাতে সনৎকুমারসংহিতা, সূতসংহিতা, শাঙ্করীসংহিতা, বৈষ্ণবীসংহিতা, ব্রাহ্মীসংহিতা ও সৌরীসংহিতা নামে ৬খানি সংহিতা থাকার উক্তি আছে কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে তাহা দৃষ্ট হয় না। যথা প্রাপ্ত সংস্করণে ৭টি খণ্ড আছে (১) মহেশ্বর (২) বিষ্ণু (৩) ব্রহ্ম (৪) কাশী (৫) আবন্ত্য (৬) নাগর ও (৭) প্রভাসখণ্ড।

স্কন্দপুরাণ, বিষয়বস্তু।

তৎপুরুষকল্পে মহেশ্বর কর্তৃক কথিত। ষড়ানন অর্থাৎ কার্তিকেয়ের নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে বহু খণ্ড আছে। **কাশীখণ্ডেই** বার হাজার শ্লোক। **কাশী** (বারাণসী) ও তন্নিকটবর্তী স্থানগুলির শিবমন্দিরগুলির উল্লেখ আছে। কাশীরাজ দিবোদাসের ইতিবৃত্ত আছে। অগস্ত্যমুনির দক্ষিণাপথ যাত্রার উপাখ্যান দৃষ্ট হয়।

উৎকল খণ্ডে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরগুলি ও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের উল্লেখ আছে। অন্যান্য খণ্ডগুলি **রেবাখণ্ড, ব্রহ্মোত্তরখণ্ড, শিব-রহস্যখণ্ড, হিমবৎখণ্ড** ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত **সূতসংহিতা, সনৎকুমার-সংহিতা, সৌরসংহিতা, কপিলসংহিতা** প্রভৃতি এই পুরাণের অন্তর্গত। ইহা ব্যতীত বহু মাহাত্ম্য আছে।

১৪। **বামনপুরাণ**—মূলগ্রন্থে মাহেশ্বরী, ভাগবতী, সৌরী ও গাণেশ্বরী এই চারিটি সংহিতা থাকিবার ও প্রত্যেক সংহিতায় ১০০০ শ্লোক থাকিবার উক্তি আছে। কিন্তু প্রাপ্ত সংস্করণে তাহা দৃষ্ট হয় না।

বামনপুরাণ, বিষয়বস্তু।

শিবকল্পে চতুর্মুখ ব্রহ্মার দ্বারা কথিত। মানবজীবনের উদ্দেশ্য, চাতুর্বর্ণ্যের উপদেশ আছে। বিষ্ণু বামন মূর্তি ধারণ করিয়া বলিকে ত্রিপাদ-ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহা মুখ্যতঃ বৈষ্ণব পুরাণ হইলেও লিঙ্গপুরাণ বলা যায়।

দক্ষযজ্ঞ বর্ণিত আছে। দক্ষযজ্ঞে ব্রাহ্মণ দগ্ধ করার পাপ বিমোচন করার জন্য শিবের কাশীগমন, কামদেবভস্ম, স্থাণুতীর্থ (স্থাণ্বেশ্বর) মাহাত্ম্য, কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য ও শিবপার্বতীর বিবাহ আছে।

এই পুরাণখানি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্য।

১৫। **কূর্মপুরাণ**—মূল কূর্মপুরাণে ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী ও বৈষ্ণবী চারিটি খণ্ড ছিল। এখন কেবল ব্রাহ্মীখণ্ডই কূর্মপুরাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্য তিন খণ্ড লুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মীখণ্ড মূল পুরাণের অংশ।

কূর্মপুরাণ, বিষয়বস্তু।

লক্ষ্মীকল্প। জনার্দন পৃথিবীর ভারবাহী কূর্ম মূর্তিতে চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সূত পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা শৈব পুরাণ। চারিটি সংহিতায় বিভক্ত।

(১) ব্রাহ্মীসংহিতা। (২) ভাগবতীসংহিতা। (৩) সৌরসংহিতা।
(৪) বৈষ্ণবীসংহিতা।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, (কৃষ্ণের কাল পর্যন্ত) সূর্য ও চন্দ্রবংশ, ভৈরব কর্তৃক অন্ধকাসুর-বধ, শক্তির আবির্ভাব (মহেশ্বরী, শিবাণী, সতী ও হৈমবতী), কাশীমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

ঈশ্বরগীতায় শিবতত্ত্ব, ব্যাসগীতায় বেদবিহিতপ্রণালীর দ্বারা শিবতত্ত্ব অর্জন বর্ণিত আছে। ইহাতে অর্হৎ ও জৈনদিগের উল্লেখ আছে।

১৬। **মৎস্যপুরাণ**—ইহাতে ৫০টি অধ্যায় ও ১৪,০০০ শ্লোক ছিল। কিন্তু ঐ পরিমাণ শ্লোক দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বৈবস্বতমনুর কালের জলপ্লাবনের আখ্যান আছে।

মৎস্যপুরাণ, বিষয়বস্তু।

বিষ্ণু মৎস্যদেহ ধারণ করিয়া মনুর নিকট এই পুরাণ বিবৃত করিয়াছিলেন। মহাভারতে এই মৎস্যাবতার বর্ণিত আছে। মহাজলপ্লাবনে পৃথিবী নিমগ্ন হইলে মনুর মহাতরী মৎস্যের সহিত আবদ্ধ ছিল। মৎস্যরূপী বিষ্ণুর সহিত মনুর ক্রমশঃ আলোচনা আরম্ভ হইল। প্রথমে ব্রহ্মা ও মানসপুত্রগণের পিতৃগণের সৃষ্টি, পরে রাজবংশের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

গৃহীর কর্তব্য, ব্রাহ্মণকে দান, ব্রতনিয়মাদি পালন ও আচরণাদি কথিত হইয়াছে। বিশ্বের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিপুরাসুর বধ, তারকাসুরের সহিত যুদ্ধ, মদনভস্ম, উমার জন্ম, শিবের সহিত বিবাহ, কার্তিকেয়ের অর্থাৎ কুমারের জন্ম, ময় ও অন্ধকাসুর নিধন বিবৃত হইয়াছে। সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান এই পুরাণে কথিত হইয়াছে। নর্মদামাহাত্ম্য এই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। আচার ও ব্যবহার প্রভৃতির আলোচনা আছে। বাস্তুশাস্ত্র, গৃহনির্মাণ ও প্রতিমাগঠন উক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ রাজবংশের বিবরণ আছে।

১৭। গরুড়পুরাণ—মূল শ্লোকসংখ্যা ১৮,০০০ মতান্তরে ১৯,০০০। ইহার দুইটি খণ্ড—পূর্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড (প্রেতখণ্ড)। ১ম খণ্ডে আয়ুর্বেদ, নীতিশাস্ত্র ও ব্রতনিয়মাদি সংযোজিত হইয়াছে তথাপি শ্লোকসংখ্যা মাত্র ১১,০০০।

গরুড়পুরাণ, বিষয়বস্তু।

ব্রহ্মা ইন্দ্রের নিকট বলিয়াছেন। ইহাতে গরুড়ের জন্ম বিবৃত হয় নাই। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। ব্রত, নিয়ম ও উপবাসাদি ও পর্বাদি বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। গরুড়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।

জ্যোতিষ, সামুদ্রিকশাস্ত্র, হীরকাদির বিচার, মণিমাণিক্যাদির লক্ষণ ও বিচার আছে। চিকিৎসাশাস্ত্র বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ-শাস্ত্র বিচারিত হইয়াছে। এগুলি সাধারণতঃ পুরাণের বিষয়ভুক্ত নহে।

১৮। বায়ুপুরাণ—সম্ভবতঃ শিবপুরাণের অন্তর্গত বায়ুসংহিতাই বায়ু-পুরাণে পরিণত হইয়াছে। অষ্টাদশ পুরাণের নাম কোনও কোনও পুরাণে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিয়া কথিত হয়, সম্ভবতঃ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ কোনও স্বতন্ত্র পুরাণ নহে; উহা বেদব্যাস সঙ্কলিত পুরাণসংহিতা। বিষ্ণুপুরাণে ১৮ খানি পুরাণের নামোল্লেখ আছে এবং ব্রহ্মপুরাণ সকল পুরাণের আদি বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ১৮ শতম স্থানে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উল্লিখিত হইয়াছে।

আদ্যং সর্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥২১
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্ ॥২২
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্ ॥২১
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশম্।
চতুর্দশং বামনঞ্চ কৌর্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্ ॥২৪
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্।

বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।২১-২৫

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বিষয়বস্তু।

সম্পূর্ণগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। কতক খণ্ড ও মাহাত্ম্যগুলি সংগৃহীত হইয়া যথাপ্রাপ্ত পুরাণ গঠিত হইয়াছে।* ইহা চারি পাদে বিভক্ত। (১) প্রক্রিয়াপাদ (২) অনুষঙ্গপাদ (৩) উপোদ্ঘাত (৪) উপসংহার পাদ। প্রথমাংশে প্রলয় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে অগস্ত্যমুনির দক্ষিণাপথে ও কাঞ্চীতে গমন আখ্যান আছে। তথায় বিষ্ণু হয়গ্রীবমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। দুর্গা ললিতাদেবীর মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। কুমারিকায় মন্দির আছে। তিনি ভাণ্ডাস্বরকে বধ করিয়াছেন। ললিতাদেবীর অর্চনাবিধি বিস্তৃতভাবে উক্ত। এই পুরাণের একটি অংশ **অধ্যাত্ম রামায়ণ** নামে প্রসিদ্ধ।

বিদ্যমান ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একটি অংশ **অধ্যাত্ম রামায়ণ** নামে প্রসিদ্ধ।

পাশ্চাত্ত্য আচার্যেরা মনে করেন যে অধুনা যথা প্রাপ্ত পুরাণগুলি আধুনিক এবং ঐগুলি ব্রাহ্মণ উপনিষদ্ মহাভারতাদির উল্লিখিত পুরাণ নহে কারণ উহাদের ভাষা আধুনিক এবং উহাতে কলিযুগের বহু রাজবংশের বংশানুচরিত আছে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা (সূত) নৈমিষারণ্যের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সত্রকালে পুরাণগুলি বলিয়াছিলেন। পুরাণাদি হইতে জানা যায় যে ঐ নৈমিষারণ্যের মহাসত্র অসীমকৃষ্ণ বা অধিসীমকৃষ্ণের রাজত্বে সম্পাদিত হইয়াছিল। অধিসীমকৃষ্ণ মহারাজা পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের প্রপৌত্র। তৎকালে রাজবংশ অনুকীর্তিত হইলে অধিসীমকৃষ্ণের নাম পর্যন্তই কীর্তিত হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যে সকল পুরাণ বর্তমান যুগে প্রচলিত আছে তাহাতে বহু পরবর্তী কালের এমন কি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর ১ম ভাগের রাজগণের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত আছে। সম্ভবতঃ পুরাণের রাজবংশ কীর্তনের নিয়মানুসারে কালে কালে ঐ সকল রাজবংশের ইতিহাস ভবিষ্যদ্‌ বাক্যরূপে পুরাণগুলিতে সংযোজিত হইয়াছে।

পুরাণগুলির বক্তা ও শ্রোতার নাম, যে কালে বা রাজত্বকালে ঐ পুরাণ কথিত হইয়াছে এইগুলি লক্ষ্য করিলে পুরাণগুলিতে তিনটি স্তর দৃষ্ট হয় রোমহর্ষণকর্তৃক সংকলিত পুরাণে সম্ভবতঃ পরীক্ষিৎ অথবা জনমেজয়ের কাল

* কুমারিকায় মন্দির আছে।

পর্যন্ত ছিল ; এবং সম্ভবতঃ অধিসীমকৃষ্ণের রাজত্ব কালে ঐ রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাই উহা পাঠ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে অধিসীমকৃষ্ণের রাজত্বকালে সমকালবর্তী অন্যান্য রাজবংশে যে যে রাজা বিদ্যমান ছিলেন তাঁহাদের নাম পর্যন্ত সংযোজিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ভবিষ্যদ্‌রাজগণের নাম সংযোজিত হইয়া ভবিষ্যদ্ বাণীরূপে উক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণেই পুরাণলক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। উহার অনেকাংশ গদ্যে রচিত। সকল পুরাণগুলিরই কিছু কিছু প্রাচীন অংশ বিদ্যমান থাকা সম্ভব এবং সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরাণের গদ্যাংশ অতি প্রাচীন রচনা। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতও পরিবর্তিত হইতেছে ; তাঁহারা বলিতেছেন যে প্রাচীন পুরাণগুলির ভাষা পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিয়া যে অংশ আছে তাহা পরবর্তীকালে সংযোজিত হইয়াছে। ঐ মতের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পার্জিটার সাহেব বলেন যে অধুনা প্রাপ্ত পুরাণগুলি প্রাচীন মাগধীপুরাণ হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার মতে প্রাচীন পুরাণগুলি মাগধী প্রাকৃত ভাষায় রচিত ছিল, পরে মাগধী প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে পরিণত হইয়াছে। তিনি বলেন যে ভবিষ্যদ্বংশানুচরিতে মগধরাজগণের বংশাবলী ও রাজত্বকাল অতিবিস্তৃত ও শুদ্ধরূপে বর্ণিত আছে কিন্তু অন্য কোনও রাজবংশ এতাদৃশ শুদ্ধরূপে ও রাজত্বকালের পরিমাণ এত সূক্ষ্মরূপে বর্ণিত হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে মাগধী প্রাকৃত ভাষায় অঙ্ক সংখ্যাগুলি যে ব্যাকরণ-প্রণালীতে উক্ত হয় সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণালী সেরূপ নহে। মাগধীভাষার কথাগুলি সংস্কৃতে পরিণত হওয়ায় তাহার ফলে মাগধীভাষায় যে রাজ্যকালের বৎসরসংখ্যা স্বাভাবিক ও সম্ভবপর, তাহাই সংস্কৃতভাষায় অনূদিত হওয়ায় সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়মানুসারে ব্যাখ্যাত হইয়া অসম্ভব বাতুলতা প্রতীয়মান হয়। তিনি ইহাই সমর্থন ও সুস্পষ্ট করিতে পুরাণের বহুসংখ্যাবাচক সমাসযুক্ত পদের বিশ্লেষণ করিয়া মাগধী প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের অর্থ দেখাইয়াছেন। এই মতের বিশেষ বিচার আবশ্যক।

প্রথমতঃ পার্জিটার সাহেবের মতানুসারে কেবল পুরাণগুলির ভবিষ্যদ্-অংশেই ঐ নিয়ম লক্ষিত হয় ; পুরাণগুলির অন্যান্য অংশে ঐ নিয়ম দৃষ্ট

হয় না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মতে ঐ ভবিষ্যদংশই পরে পুরাণগুলিতে সংযোজিত হইয়াছে। পুরাণগুলির প্রাচীন অংশ কোনও কালেই প্রাকৃত ভাষায় রচনা হওয়ায় কোনও ইতিবৃত্ত শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয় না বা কোনও প্রাচীন হস্তলিপিতে মাগধীভাষায় লিখিত পুরাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যকালেই রাজন্যবর্গের ক্ষমতায় মাগধী ভাষার প্রাধান্য হইয়াছিল কিন্তু প্রাচীন পুরাণগুলি ঐ কালের পূর্ববর্তী, বিশেষতঃ যে কালে (২০০—৩২৫খৃঃ) ভবিষ্যদংশ রচিত হওয়া পার্জিটার বলেন তৎকালে মাগধী-ভাষা সাম্রাজ্যের ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল না, তাহার পূর্ব হইতেই পুনরায় সংস্কৃতভাষা হিন্দু ভারতের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পার্জিটার আর একটি বিষয় আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, সেটি এই: অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্যগণের মধ্যে দুই প্রকার সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক শাস্ত্রানুমোদিত কার্যের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহারই ব্যাকরণ পাণিনি প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। ঋষিগণ ঐ বিজ্ঞানসম্মত, সুসংযত ও সুসংস্কৃত ভাষা বৈদিকজীবনের কার্যপ্রণালীতে ব্যবহার করিতেন এবং ধর্মগ্রন্থাদিও ঐ ব্যাকরণসিদ্ধ ভাষায় রচিত হইত। ঐ সকল গ্রন্থাদিতে শূদ্রাদির অধিকার ছিল না। কিন্তু আর্যগণের দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা উহা হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক্ ছিল; উহাই প্রচলিত ভাষা ছিল এবং আর্ষভাষা বলিয়া অভিহিত হইত। পঞ্চমবেদ অর্থাৎ ইতিহাস, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারতাদি জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ঐ ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণের নিয়ম সর্বদা প্রতিপালন করিত না, তজ্জন্যই মহাভারত ও পুরাণাদিতে ব্যাকরণবিরুদ্ধ বহু আর্ষপ্রয়োগ আছে।

ভবিষ্যদংশে যে সকল মগধ রাজার বিবরণ আছে তাহা মগধের রাজ-সভায় রক্ষিত রাজবংশাবলী হইতে গৃহীত হওয়া সম্ভবপর। মগধরাজ্যের ভাষা মাগধী প্রাকৃত ছিল, এরূপ স্থলে ঐ ভবিষ্যদংশের ভাষা মাগধীভাষার ছায়া বহন করিবে ইহা অসম্ভব নহে কিন্তু পুরাণের ঐ ঐ অংশ মাগধীভাষায় রচিত হইবার পর সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দৃষ্ট হয় না।

পার্জিটার পুরাণগুলির কলিযুগের রাজবংশাবলীর তুলনামূলক সমালোচনা

করিয়া ঐগুলির রচনাকাল নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভবিষ্যদংশে রাজবংশাবলী দুই স্থানে পরিসমাপ্ত হওয়া দৃষ্ট হয়। অন্ধ্ররাজগণের পতনকাল পর্যন্ত রাজবংশ বর্ণিত হইয়াই একবার সমাপ্তি হইয়াছে। মৎস্তপুরাণে ঐ পর্যন্তই বর্ণিত আছে। অন্ধ্ররাজবংশের পতনকাল ২৩৬ খৃষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় মৎস্ত পুরাণের ঐ ভবিষ্যদংশ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হওয়া সম্ভব।

বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় মাত্র বর্ণিত আছে কিন্তু তাঁহাদিগের দিগ্‌বিজয় ও অশ্বমেধ ও একচ্ছত্র আধিপত্যের সংবাদ তাহাতে নাই। গুপ্তবংশের অভ্যুদয়কাল ৩১৯—৩২০ খৃষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ঐ সকল পুরাণের ভবিষ্যদংশ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংযোজিত হইয়াছে তাহা নিরাপদে বলা যাইতে পারে।

মৎস্ত, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত কলিযুগের রাজবংশাবলীর বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডের সাদৃশ্য এতই অধিক যে ঐ দুইখানি একই মূল অবলম্বনে রচিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বায়ু ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোনও স্থানে পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে একখানির সহিত মৎস্তের ঐক্য আছে। মৎস্তপুরাণখানিই বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ তিনখানিই একই মূল গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত এরূপ বোধ হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন ভবিষ্যপুরাণই ঐ তিনখানির মূল অবলম্বন ছিল।* কিন্তু বর্তমানকালে যে ভবিষ্যপুরাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয় কারণ মৎস্ত ও বায়ু স্পষ্টভাবে ভবিষ্যপুরাণ হইতে সংকলন করা প্রকাশ করে।

"তান্ সর্বান্ কীর্তয়িষ্যামি ভবিষ্যে কথিতান্ নৃপান্"।

কিন্তু যথাপ্রাপ্ত ভবিষ্যপুরাণে ঐ সকল মূল বিষয় দৃষ্ট হয় না।

বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণের ভবিষ্যদংশেরও সৌসাদৃশ্য আছে। বিষ্ণু পুরাণে গদ্য ও ভাগবতে পদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুইখানির সহিত মৎস্ত, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বর্ণনার সৌসাদৃশ্য নাই। বিষ্ণু ও ভাগবতের

* আপস্তম্বধর্মসূত্রেও প্রাচীন ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ আছে।

রাজগণের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ও আশুগতি। ভাগবতপুরাণ বিষ্ণুপুরাণের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

গরুড়পুরাণের বিবরণ ভাগবতপুরাণ হইতেও সংক্ষিপ্ত এবং সম্ভবতঃ ঐগুলির পরে রচিত।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে অন্যান্য পুরাণের ন্যায় সাম্প্রদায়িক তীব্রতা দৃষ্ট হয় না। এই পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের—ত্রিমূর্তিবাদ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। **চণ্ডী** বা **সপ্তশতী** এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত কয়েকটি অধ্যায়। উহা ভক্তিভাবে সযত্নে হিন্দুগণ পাঠ করিয়া থাকেন। উহার বহু প্রাদেশিক টীকা আছে, তন্মধ্যে নাগেশভট্ট, বিদ্যাবিনোদ ও গোপালবন্দ্যকৃত তত্ত্ব-প্রকাশিকা ও ভাস্কর রায়কৃত গুপ্তবতীনামক টীকা সচরাচর পঠিত হইয়া থাকে। ভাস্কর রায় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

পদ্মপুরাণ কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হয়। কালিদাসের রঘুবংশের বর্ণিত সূর্যবংশবিবরণ ও শকুন্তলার বিবরণ পদ্মপুরাণ হইতেই কালিদাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন।* ইহাতে বৈষ্ণব সাহিত্যের মধুরলীলার উজ্জ্বলরসমূর্তি রাধিকার উল্লেখ আছে। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণেও ঐ নাম নাই। ইহাতে অনুমান হয় পদ্মপুরাণ, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের পরবর্তী।

ঐ পুরাণগুলি ব্যতীত অনেকগুলি উপপুরাণ আছে। তন্মধ্যে দেবী-ভাগবত, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, মরীচিপুরাণ, সূর্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ, মহেশ্বর-পুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, নন্দিপুরাণ, শিবধর্মোত্তর, বশিষ্ঠকৃত লিঙ্গপুরাণ, কালিকাপুরাণ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পরিশিষ্ট

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও কথাগ্রন্থ পরবর্তীকালের কবিগণের উপ-জীব্য। সংস্কৃতসাহিত্যের সকল প্রসিদ্ধ কবিই ঐ সকল মূল গ্রন্থের অংশবিশেষ অবলম্বনে স্ব স্ব কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন। নিম্নের লিখিত তালিকা

* Padmapurana and Kalidas by H. Sarma (1925)

হইতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি পরবর্তী কাব্য সাহিত্যের কত পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

রামায়ণ অবলম্বনে ঃ—মহাকবি ভাসরচিত অভিষেক-নাটক ও প্রতিমানাটক; মহাকবি কালিদাসকৃত রঘুবংশমহাকাব্য ও কুমারসম্ভব; মহাকবি ভবভূতিরচিত মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত নাটক; ভট্টিকবিকৃত ভট্টিকাব্য; কুমারদাসকৃত জানকীহরণকাব্য; চক্রকবিকৃত জানকীপরিণয়-কাব্য; মহাকবি শক্তিভদ্র বিরচিত আশ্চর্যচূড়ামণি, জয়দেবরচিত প্রসন্ন-রাঘব; মুরারিরচিত অনর্ঘরাঘব; রাজশেখররচিত বালরামায়ণ; দামোদর মিশ্র গ্রথিত হনুমন্নাটক; বেদান্তদেশিককৃত হংসসন্দেশ; নীলকণ্ঠদীক্ষিতকৃত গঙ্গাবতরণ, দিঙ্‌নাগকৃত কুন্দমালা ইত্যাদি।

মহাভারত অবলম্বনে ঃ—মহাকবি ভাসকৃত পঞ্চরাত্র, মধ্যমব্যায়োগ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার ও উরুভঙ্গ; মহাকবি কালিদাসকৃত অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশীয়; মহাকবি ভারবিরচিত কিরাতার্জুনীয়-মহাকাব্য; মহাকবি মাঘকৃত শিশুপালবধমহাকাব্য, মহাকবি শ্রীহর্ষকৃত নৈষধীয়চরিত; বামনভট্টবাণকৃত নলাভ্যুদয়কাব্য; বস্তুপালকৃত নরনারায়ণা-নন্দকাব্য; ভট্টনারায়ণকৃত বেণীসংহারনাটক, কুলশেখরবর্মকৃত তপতী সংবরণ ও সুভদ্রাধনঞ্জয়নাটক; কাঞ্চনাচার্যকৃত ধনঞ্জয়বিজয়; নীলকণ্ঠদীক্ষিতকৃত নলচরিত্রনাটক ইত্যাদি। কবিরাজকৃত রাঘবপাণ্ডবীয় ও ধনঞ্জয়কবিকৃত দ্বিসন্ধানমহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত উভয় অবলম্বনে রচিত।

হরিবংশ অবলম্বনে ভাসকবির বালচরিত, শেষকৃষ্ণরচিত কংসবধ-নাটক ও পারিজাতহরণচম্পূ।

পুরাণ অবলম্বনে ঃ—মার্কণ্ডেয়পুরাণ অবলম্বনে আর্যক্ষেমীশ্বররচিত চণ্ড-কৌশিক নাটক; পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড অবলম্বনে মহাকবি ভবভূতির উত্তররাম-চরিতের অংশবিশেষ রচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত পদ্মপুরাণের অংশবিশেষ কেহ কেহ মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশমহাকাব্য ও অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের উপজীব্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহার কুমারসম্ভবও শিবপুরাণ অবলম্বনে রচিত এইরূপ মত প্রচলিত আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র

অর্থশাস্ত্র প্রাচীন বিদ্যা। মহাভারতের শান্তিপর্বে বৃহস্পতি, বিশালাক্ষ, উশনাঃ, মহেন্দ্র, সহস্রাক্ষ, মনু প্রাচেতস, ভারদ্বাজ, গৌরশিরঃ প্রভৃতি "রাজশাস্ত্রপ্রণেতারঃ" বলিয়া উল্লিখিত আছে (মহাভাবত শান্তি ৫৭)। প্রাচীনকালে অন্ততপক্ষে অর্থশাস্ত্রের ৪টী প্রধান সম্প্রদায় থাকা দৃষ্ট হয় (১) বার্হস্পত্য সম্প্রদায় (২) মানব সম্প্রদায় (৩) ঔশনস ও (৪) পরাশর সম্প্রদায়। বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্র নামে যে গ্রন্থ লাহোব হইতে মুদ্রিত হইয়াছে উহা প্রাচীন অর্থশাস্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। অর্থশাস্ত্রের যে সকল প্রাচীন আচার্যের গ্রন্থ ছিল তন্মধ্যে ভারদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর বা পাবাশব, পিশুন (নারদের নামান্তর) কৌণপদন্তেব নাম দৃষ্ট হয়। কাদম্বরীতে নারদের অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। ত্রিকাণ্ডশেষের মতে কৌণপদন্ত ভীষ্মের নামান্তর। মহাভারতে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে রাজধর্মসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাহুদন্তীপুত্র, কাত্যায়ন, কণিক ভারদ্বাজ, দীর্ঘচারায়ণ, ঘোটকমুখ, বাতব্যাধি ও পিশুনপুত্র কিঞ্জল্কের প্রণীত অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাস প্রতিমানাটকে "বার্হস্পত্যম্ অর্থশাস্ত্রম্" উল্লেখ করিয়াছেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে উল্লিখিত আছে :—

"যদ্রাজশাস্ত্রং ভৃগুরঙ্গিরা নশ্চক্রতু বংশকরাঁবৃষী তৌ।
তয়োঃ সুতৌ তৌ চ সসর্জতু স্তৎকালেন শুক্রশ্চ বৃহস্পতিশ্চ।"

কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে "ধর্মশাস্ত্র" ও "অর্থশাস্ত্রে"র বিরোধ উপস্থিত হইলে ধর্মশাস্ত্রই বলবান্ বলিয়া গণ্য হয়;

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র উল্লেখে আমরা যে গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি* তাহা কোন

* শ্যামশাস্ত্রী মহাশয় সর্বপ্রথমে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করেন।

সময়ে রচিত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। চাণক্যের বহু নাম অভিধানে দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কৌটিল্য ও বিষ্ণুগুপ্ত নাম আছে (হেমচন্দ্র মর্তকাণ্ড)। অর্থশাস্ত্র কামশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনখানি প্রাচীন প্রধান গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্র বা কামশাস্ত্র এবং কামন্দককৃত নীতিসার। শ্যাম শাস্ত্রী মহাশয় যে অর্থশাস্ত্র মুদ্রিত করিয়াছেন তাহার প্রারম্ভশ্লোক দৃষ্টে বোধ হয় ঐ গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্বে বহু আচার্য ঐ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে ব্রহ্মা ১ লক্ষ অধ্যায়ে, বিশালাক্ষ ১০,০০০ অধ্যায়ে, ইন্দ্র ৫,০০০ অধ্যায়ে, বৃহস্পতি ৩,০০০ অধ্যায়ে এবং উশনাঃ ১,০০০ অধ্যায়ে অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

"পৃথিব্যা লাভে পালনে চ যাবন্ত্যর্থশাস্ত্রাণি পূর্বাচার্যৈঃ
প্রস্তাবিতানি প্রায়শস্তানি সংহৃত্য একমিদম্ অর্থশাস্ত্রং কৃতম্॥

কামন্দক তাঁহার নীতিশাস্ত্রে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"যস্যাভিচারবজ্রেণ বজ্রজ্বলনতেজসঃ।
পপাত মূলতঃ শ্রীমান্ সুপর্বানন্দপর্বতঃ॥ ৪

*　　*　　*

নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমান্ অর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।
সমুদ্দধ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে॥৬"

গ্রন্থকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় আছে :—

"যেন শাস্ত্রঞ্চ শস্ত্রঞ্চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ।
অমর্ষণোদ্ধৃতান্যাশু তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম্॥
দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেষু ভাষ্যকারাণাম্।
স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চকার সূত্রঞ্চ ভাষ্যঞ্চ॥

উপরোক্ত শ্লোক অনুসারে নন্দবংশধ্বংসকারী চাণক্যই এই অর্থশাস্ত্রের সূত্র ও ভাষ্যকার বলিয়া প্রতীতি হয়; কারণ বিষ্ণুগুপ্তের অপর নাম চাণক্য। ঐ অর্থশাস্ত্রে বহু স্থানে "ইতি কৌটিল্যঃ" এরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। উহা হইতেই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে কৌটিল্যমতাবলম্বী পরবর্তী কোনও গ্রন্থকার ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা মনে করেন অধিকাংশস্থলেই কৌটিল্যরচিত অর্থশাস্ত্রের সূত্রগুলি ঐ গ্রন্থে আছে। কিন্তু দর্শনাদি বহু গ্রন্থে গ্রন্থকার নিজ মত কি তাহা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিতে

প্রথমপুরুষে ঐরূপভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "প্রায়েণ গ্রন্থকারাঃ স্বমতং পরাপদেশেন ব্রুবতে" ইতি মেধাতিথিঃ।

অধ্যাপক জলী, অটোষ্টীন্, ভিণ্টারনিস্ প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, কৌটিল্যের যথাপ্রাপ্ত অর্থশাস্ত্র খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে ও বাৎস্যায়ন কৃত কামশাস্ত্র বা কামসূত্র খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। ভাণ্ডারকরের মতে আরও ১ শতাব্দী পূর্বে ঐ গ্রন্থদ্বয় প্রণীত হওয়া সম্ভব। তাঁহারা আরও বলেন যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়াই বাৎস্যায়নের কামসূত্র রচিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতানুসারে কৌটিল্য ও বাৎস্যায়ন পৃথক্ ব্যক্তি। পঞ্চতন্ত্রকার ও চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র পৃথক্ গ্রন্থকারের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "ততো ধর্মশাস্ত্রাণি মন্বাদীনি, অর্থশাস্ত্রাণি চাণক্যাদীনি, কামশাস্ত্রাণি বাৎস্যায়নাদীনি"। কিন্তু হেমচন্দ্রের অভিধানের মর্তকাণ্ডের নিম্নলিখিত শ্লোক বিবেচনা করিলে কৌটিল্য, বিষ্ণুগুপ্ত ও বাৎস্যায়ন একই ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।*

"বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলিশ্চ সঃ॥"

অশ্বঘোষ, ভাস ও কালিদাসের কাব্য নাটকাদি পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে তাঁহারা অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহারা শ্যাম-শাস্ত্রিকর্তৃক মুদ্রিত অর্থশাস্ত্রের ন্যায় কোনও অর্থশাস্ত্র অবগত ছিলেন। কিন্তু তাহা যে এই অর্থশাস্ত্রগ্রন্থই এরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অধ্যাপক ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ) বলেন যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর গ্রন্থ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ গ্রন্থের বহুশব্দ প্রাচীন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার "বিদ্যাসমুদ্দেশ" অংশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্তব্য। ইহা ৪ ভাগে বিভক্ত। মনুস্মৃতিতেও ঐ চারিটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়

---

* পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন বলেন যে কৌটিল্য বা কৌটিল্যের অপর নাম বাৎস্যায়ন ছিল কিন্তু কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন কৌটিল্য হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বলেন যে খৃঃ পূঃ ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে ক্ষোদিতলিপিতে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত বহুশব্দের তত্তৎ অর্থপ্রয়োগ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। খৃষ্টের পর ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে ঐ সকল শব্দ ঐ প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হওয়া দৃষ্ট হয় না। তিনিও অধ্যাপক ক্ষেত্রেশচন্দ্রের মত সমর্থন করেন। দণ্ড্যাচার্য তাঁহার দশকুমারচরিতের ৮ম উচ্ছাসে বলিয়াছেন "ইয়মিদানীমাচার্যবিষ্ণুগুপ্তেন মৌর্য্যার্থে ষড়্ভিঃ শ্লোকসহস্রৈঃ সংক্ষিপ্তা"। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে চাণক্যই মৌর্যগণের জন্য অর্থশাস্ত্র সংক্ষেপে রচনা করিয়াছিলেন। কৌটিল্যের মতে আন্বীক্ষিকী বলিতে "সাংখ্য", "যোগ" ও "লোকায়ত" শাস্ত্র বুঝায়। মনুও ঐ শব্দ ঐ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিলে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মৌর্যগণের সময়ে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে) রচিত হওয়া সিদ্ধান্ত হয়।* এই অর্থশাস্ত্রের ভট্টস্বামিকৃত "প্রতিপদপঞ্চিকা" ও মাধবযজ্বনৃকৃত "ন্যায়চন্দ্রিকা" নামক টীকা আছে।

বাৎস্যায়নের **কামসূত্র** বা **কামশাস্ত্রই** কামশাস্ত্রের প্রচলিত প্রধান গ্রন্থ। তাঁহার পূর্বেও ঐ শাস্ত্রের বহু পূর্বাচার্য বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহাদিগের মত বাৎস্যায়ন উল্লেখ করিয়াছেন। বাভ্রব্য, কুচুমার, নন্দীশ্বর, শ্বেতকেতু প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু তাঁহাদিগের রচিত কোনও গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সর্বপ্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে বাৎস্যায়নের কামসূত্রই বিদ্যমান আছে। এই কামসূত্রে অন্ধ্রদেশীয় শাতকর্ণিরাজ শাতবাহনের নাম উল্লিখিত আছে। (তাঁহার রাজত্ব কাল ২৪০ হইতে ২২০ পূঃ খৃষ্টাব্দ।) (কামশাস্ত্র ৭।২৮।)

বাৎস্যায়নের কামসূত্রের প্রারম্ভে উল্লিখিত আছে যে প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহা রক্ষার জন্য লক্ষ অধ্যায়ে ত্রিবর্গের (ধর্ম, অর্থ, কাম) সাধনশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। মনু তাহার একাংশ ধর্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি অর্থশাস্ত্রের প্রবক্তা। মহাদেবের অনুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়ে কামশাস্ত্র বলিয়াছিলেন। উদ্দালকতনয় শ্বেতকেতু পাঁচশত অধ্যায়ে তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। পাঞ্চালদেশবাসী বাভ্রব্য ৭টি খণ্ডে ১৫০ অধ্যায়ে ঐ শাস্ত্র রচনা করেন। (বাৎস্যায়ন ঐ সাতটি বিভাগই

* Cambridge History of India Vol. I গ্রন্থেও অর্থশাস্ত্র মৌর্যগণের রাজত্বকালে রচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অবলম্বন করিয়াছেন)। বাভ্রব্যের পরে ও বাৎস্যায়নের পূর্বে আর কেহই সম্পূর্ণ কামশাস্ত্রের আচার্য ছিলেন না কিন্তু উহার একদেশী (পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডিত অধিকরণের) বহু আচার্য ছিলেন। দত্তক (পাটলীপুত্র), চারায়ণ, ঘোটকমুখ, গোনর্দীয়, কুচুমার, গোণিকাপুত্র, সুবর্ণনাভ প্রভৃতি আচার্য কামশাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অধিকরণের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধিকরণ-গুলির পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ বিস্তৃতভাবে রচিত হওয়ায় কামশাস্ত্র বিপ্রকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য বাৎস্যায়ন সম্পূর্ণ শাস্ত্রের সার-সংগ্রহ প্রণয়ন করেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের যশোধরেন্দ্র, মতান্তরে, জয়মঙ্গল কৃত জয়মঙ্গলা নামে একখানি প্রাচীন টীকা আছে। জয়মঙ্গল টীকাকার হইলে এই জয়মঙ্গল ভট্টিকাব্যের টীকারচয়িতা জয়মঙ্গল (জটীশ্বর, জয়দেব) ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় কারণ তিনি ভট্টিকাব্যের টীকার শেষভাগে "জটীশ্বরো জয়দেবো জয়মঙ্গল ইতি নামভিস্ত্রিভিঃ সুপ্রসিদ্ধস্য অনেকশাস্ত্রব্যাখ্যানকৃতৌ টীকায়াং কাব্যস্য অযোধ্যাপ্রত্যাগমনং নাম দ্বাবিংশ সর্গঃ" এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন বাৎস্যায়ন খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে কামসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।* কিন্তু জার্মাণ পণ্ডিত স্মিড্ (Schmidt) বাৎস্যায়নকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন। কামসূত্রের ২য় অধ্যায় ৪৮ সূত্রে আছে "বোদ্ধব্যস্তু দোষেম্বিব ন হি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি স্থাল্যো নাধিশ্রিয়ন্তে। ন হি মৃগাঃ সন্তীতি যবা নোপ্যন্ত ইতি বাৎস্যায়নঃ।" মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ঐ সূত্রের শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন "নহি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি স্থাল্যো নাধি-শ্রিয়ন্তে ন চ মৃগাঃ সন্তীতি যবা নোপ্যন্তে"—মহাভাষ্য কাশী সংস্করণ ১।১।৩৯ ২২১ পৃঃ। সূত্রানুসারে দৃষ্ট হয়—উহা বাৎস্যায়নের স্বকীয় মত। তাহা হইলে বাৎস্যায়ন পতঞ্জলির পূর্ববর্তী।

পরবর্তীকালের গ্রন্থের মধ্যে কোক্কাচার্যের **রতিরহস্য** অতিমান্য গ্রন্থ। রতিরহস্য "গুণপতাকা" নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন। জয়মঙ্গলা রতিরহস্য গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছেন। ভোজদেব শৃঙ্গাররহস্যে জয়মঙ্গলাকে ব্যবহার করিয়াছেন। ভোজদেবের কাল ১০১০—১০৬২ খৃঃ। রতিরহস্য ভোজদেবের

* Journal, Bihar and Orissa Research Society Vol. IX P, 49—113.

পূর্ববর্তী। "গুণপতাকা" তাহারও পূর্ববর্তী। দক্ষিণাবর্তনাথ মেঘদূতের ৬৪ শ্লোকে ও পূর্ণ সরস্বতী মালতী মাধব টীকাতে গুণপতাকা স্মরণ করিয়াছেন। পদ্মপণ্ডিত বা পদ্মশ্রীজ্ঞান **নাগরক সর্বস্ব** (১০০০ খৃঃ) রচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। নেপালরাজ জগজ্জ্যোতির্মল্ল (১৬১৭—১৬৩৩ খৃঃ) উহার একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। জ্যোতির্মল্ল বা জ্যোতিরীশ্বর **পঞ্চসায়ক** নামক গ্রন্থ ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। তিনি অনঙ্গরঙ্গের গ্রন্থকার কল্যাণমল্লের পূর্ববর্তী। কল্যাণমল্ল (১৪৮৮—১৫১৭ খৃঃ) লোদীবংশীয় লাটার্খাঁর সন্তুষ্টির জন্য **অনঙ্গরঙ্গ** প্রণয়ন করেন। বীরভদ্রদেব ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে (হরলোচন হরলোচনরসশশি বিক্রমাব্দে) কন্দর্পচূড়ামণি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীতও অন্যান্য গ্রন্থ আছে। ১১শ. শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্র **দেশোপদেশ** ও **নর্মমালা** নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, উহাও কামশাস্ত্রের শাখা বিশেষ। নর্মমালাতে কায়স্থগণের উৎপত্তি, রাজ্যশাসনে তাহাদের আধিপত্য ও অত্যাচার প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

দণ্ডাচার্যের দশকুমার চরিতের ১ম উচ্ছ্বাসে **কামন্দকীয় নীতির** উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন দশকুমার চরিতের ঐ অংশ পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আলঙ্কারিক বামন (৮ম শতাব্দী) ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় সূত্রে "কামং কামন্দকী নীতিরস্যারস্যা দিবানিশম্" এই বাক্যদ্বারা কামন্দকীনীতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বামনের পূর্বেই কামন্দকী নীতিসার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থে কামন্দকীনীতির কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কামন্দকীনীতি হিন্দুগণ বলীদ্বীপে লইয়া গিয়াছিলেন। বলীদ্বীপে হিন্দুপ্রাধান্যকাল হইতেই উহা তথায় প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধপ্রাধান্যের সময় হিন্দুগণ বলীদ্বীপ হইতে চলিয়া আসে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় কামন্দকীনীতি অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল।

শুক্রনীতিসার নামক যে গ্রন্থ বিদ্যমান আছে তাহা শুক্রাচার্যের রচিত নীতিশাস্ত্র বলিয়া বোধ হয় না।

চণ্ডেশ্বরের "রাজনীতিসার" ও রাজা সোমদেবের "মানসোল্লাস" এই শ্রেণীর গ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থই অধুনা মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

কাব্য সাহিত্য (পদ্য)

যে বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ পাণিনি লিখিয়াছেন, তাহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতভাষাই হিন্দুসাম্রাজ্যের ভাষা ছিল। হিন্দুধর্মের অবনতির কালেই বুদ্ধাবতার হইয়াছিল। হিন্দু-ধর্মের উন্নতিকালে নিশ্চয়ই বহু কাব্য, ইতিহাস, বৈদ্যকশাস্ত্র, নাটকাদি বিদ্যমান ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু কালক্রমে ঐ সকল লুপ্ত হইয়াছে। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে (১৮০-১৪০ খৃঃ পূঃ) "বলিবন্ধ" "কংসবধ" প্রভৃতি কাব্যের উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত উহাতে কাব্য হইতে অনেক ছন্দোবদ্ধ শ্লোকাংশ উদাহরণ স্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা "জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ" ইত্যাদি। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মের মালিন্য উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মমত ও উপদেশ সংস্কৃতভাষায় লিপিবদ্ধ না হইয়া প্রচলিতভাষায় প্রচারিত হইবার আদেশ করায় হিন্দুধর্মের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষারও অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই কালকে সংস্কৃতসাহিত্যের অবসাদ যুগ বলা যাইতে পারে। খারবেল লিপির পাঠ অনুসারে গৌতমবুদ্ধ ৫৪৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। উহার সহিত সিংহলের মতের সামঞ্জস্য আছে। বুদ্ধদেব যে ধর্মবন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা ভারতের তীরভূমি অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে তাতার ও পূর্বে চীনদেশ পর্যন্ত প্লাবিত করিয়াছিল। ভারতের রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্মের রক্ষক ও প্রচারক হইয়াছিলেন। এখনও ভারতের ও তাতারের পর্বতগাত্রে ও প্রস্তরস্তম্ভে ক্ষোদিতলিপি বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের প্রচার-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। রাজন্যবর্গ বুদ্ধদেবের বাক্যের অবহেলা করেন নাই। তাঁহারা লোকহিতকামনায় প্রচলিতভাষায় পর্বতগাত্রে ও প্রস্তরস্তম্ভে ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপদেশবাক্য ক্ষোদিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাক্য পালি বা মাগধী ভাষায় লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে রাজন্যবর্গ পালি বা মাগধী ভাষাকেই সাম্রাজ্যের ভাষা বলিয়া গ্রহণ

করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তৎকালে মাগধীভাষাই সংস্কৃতের স্থলাধিকার করিয়াছিল এবং সংস্কৃত ভাষা মুষ্টিমেয় হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। সংস্কৃতের ন্যায় পালিভাষাকে সার্বজনীন করিবার উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট ব্যাকরণাদি প্রণীত হইয়াছিল এবং তৎকালের বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিযত্নে পালিভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। উপরোক্ত অবস্থায় ঐ অবসাদযুগে সংস্কৃত ভাষায় অধিক মৌলিক গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতসাহিত্যের প্রবাহ কখনই রুদ্ধ হয় নাই। আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিতেছি তাহাতে ঐ যুগে কতকগুলি টীকা, টিপ্পনী ও ভাষ্য প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল এবং পূর্ববর্তী যুগের প্রচারিত ও গৃহীত তত্ত্বসমূহ সূত্রাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রবল বন্যা মন্দীভূত হইলে বৌদ্ধ জগতে পালিভাষার অবস্থাও সংস্কৃতের ন্যায় কেবল বৌদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীরই বোধগম্য থাকিল। পরন্তু ভারতের সর্বপ্রদেশেই সর্বকালে অনাহতভাবে সংস্কৃতভাষা পণ্ডিতমণ্ডলীর বোধগম্য ছিল। কিন্তু পালিভাষা প্রাদেশিক ভাষামূলক হওয়ায় বৌদ্ধ ত্রিপটক প্রভৃতি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য উহা শিক্ষা করিতে হইত। ঐ সকল কারণে পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদিও সর্বভারতীয় সংস্কৃতভাষায় লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। আবশ্যকতাই প্রণালীর প্রবর্তক হইয়া থাকে; উত্তরপশ্চিমপ্রান্তের তক্ষশীলার বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরবর্তী যুগে পাটলীপুত্র, নালন্দ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের বিশেষ চর্চা হইত। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তৎকালে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। আমরা ইতিহাসে, দেখিতে পাই যে তক্ষশীলার কুশানবংশীয় রাজা কনিষ্কের সময় সংস্কৃতের ও হিন্দুবিদ্যার পুনরভ্যুত্থান হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালে চরক প্রাচীন অগ্নিবেশতন্ত্রের এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক নাগার্জ্জুন সুশ্রুততন্ত্রের প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন এবং এই কালেই বৌদ্ধ দার্শনিক ও কবি **অশ্বঘোষ** সংস্কৃত ভাষার কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অশ্বঘোষের দুইখানি কাব্য **সৌন্দরনন্দ** ও **বুদ্ধচরিত** প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। **সৌন্দরনন্দে** ২০টি সর্গ আছে। ১ম সর্গে কপিলাবস্তু, ২য় সর্গে রাজা, ৩য় সর্গে তথাগত বুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। তথাগতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ তাঁহার স্ত্রী সুন্দরীকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। নন্দ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু হইলেন। সুন্দরীর বিলাপ ষষ্ঠসর্গে বর্ণিত হইয়াছে। পরে নন্দও তাহার

কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। বহু জল্পনা কল্পনা ও তর্কের পর আনন্দ নন্দকে পুনরায় দীক্ষিত করিলেন। নন্দ তথাগতের নিকট গিয়া তাঁহার পূর্ণ উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

বুদ্ধচরিতে মোট ২৮টি সর্গ ছিল কিন্তু মাত্র মূল ১৩টি সর্গ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর কোনও গ্রন্থকার আরও ৪টি সর্গ যোগ করিয়া দেওয়ায় বারাণসীধামে বুদ্ধদেবকর্তৃক দীক্ষার বর্ণনা শেষ হইয়াছে। তিব্বতীয় ও চীনদেশের ভাষায় সম্পূর্ণ গ্রন্থেব অনুবাদ পাওয়া যায়। কাব্যের যে সকল লক্ষণ আছে তাহা অশ্বঘোষের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। নগর, রাজা, রাণী ইত্যাদির অতিমনোমুগ্ধকর বর্ণনা আছে। এই কাব্যে বুদ্ধদেবের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যাংশে "সৌন্দরনন্দ" ও "বুদ্ধচরিত" অতি উপাদেয় বস্তু। প্রাঞ্জলতা ও স্বাভাবিকতাই অশ্বঘোষেব কাব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া অলঙ্কারাদিরও অভাব নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে কালিদাস অশ্বঘোষের ভাবগুলি স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়া তাহা আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন ; কালিদাস অশ্বঘোষেব নিকট বহুলভাবে ঋণী ও কালিদাস অশ্বঘোষ অপেক্ষা অর্বাচীন। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে কনিষ্ক খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী মধ্যে ও ভিন্‌সেণ্ট্‌ স্মিথের মতে কনিষ্ক ১২০ খৃষ্টাব্দে তক্ষশীলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক কীথ্‌ বলেন কালিদাস যে অশ্বঘোষেব কতকগুলি বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার কবা সম্ভবপর নহে। তাঁহার মতে অজের নগরপ্রবেশ (রঘুবংশ ৫ম সর্গ ৫-১২ শ্লোক) বুদ্ধচরিতের ৩য় সর্গের ১৩-২৪ শ্লোকের অনুকরণ মাত্র। অশ্বঘোষ সংস্কৃত-কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের অতি কূট তর্কগুলিও অবগত ছিলেন। ছন্দোব্যবহারেও অশ্বঘোষের নৈপুণ্য ছিল। গণ্ডীস্তোত্রগাথাতে অশ্বঘোষেব ছন্দোব্যবহাবের পূর্ণ নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

অশ্বঘোষের কালে সংস্কৃত কাব্যের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা প্রশস্তি ও উৎকীর্ণ লিপি হইতে বোধগম্য হয়। গুজরাটের অন্তর্গত গির্ণার পর্বত-গাত্রে রাজা রুদ্রদামনের ক্ষোদিত প্রশস্তি হইতে তৎকালে সংস্কৃত কাব্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ লিপি ১৫০ অব্দে ক্ষোদিত হয়। ঐ লিপিতে গৌড়ীরীতি, শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস প্রভৃতি ও অর্থালঙ্কার এবং গদ্য ও পদ্যের

সমাবেশ দৃষ্ট হয়। কাব্যের লক্ষণঃ—"স্ফুটলঘুমধুরচিত্রকান্তশব্দসময়োদারালংকৃত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সমুদ্রগুপ্ত এলাহাবাদে (প্রয়াগে) যে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে কবিহরিষেণকৃত প্রশস্তি ক্ষোদিত আছে তাহাও তৎকালীন কাব্যের নিদর্শন। পদ্যে আরম্ভ হইয়া গদ্যে চলিয়াছে এবং ঐ গদ্যে সমাসবহুলতা দৃষ্ট হয়। রূপক, উপমা, শ্লেষ প্রভৃতি কবির অতি প্রিয়বস্তু। ঐ সকল দৃষ্টে বোধ হয় তৎকালে পদ্যে বৈদর্ভরীতি ও গদ্যে গৌড়ীরীতি প্রচলিত ছিল।

কালিদাস

কালিদাসের তুলিকাস্পর্শে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক মহিমান্বিত হইয়াছে। প্রচলিত শ্লোকে "উপমা কালিদাসস্য" বলিয়া তাঁহার যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহাতে কালিদাসের কাব্যের গভীরতার কোনও নিদর্শনই নাই। এই মহাকবির জীবনের কোনও ইতিহাসই সংস্কৃত সাহিত্যে নাই। সংস্কৃতসাহিত্য ব্যক্তিগত ইতিহাসসম্বন্ধে চিরকালই উদাসীন। পরবর্ত্তী যুগের কোনও কোনও কবি কিছু কিছু আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। যে কিছু পরিচয় আছে তাহাও "স্বল্পং তদপি দুর্লভম্"। কালিদাসের কাব্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার লেশ মাত্র নাই। তিনি স্বতঃই বিনয়াবনত। তিনি রঘুবংশে "ক চাল্পবিষয়া মতিঃ", "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী", "তনুবাগ্‌বিভবোপি", "উদ্বাহুরিব বামনঃ" প্রভৃতি দ্বারা যে বিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য আত্মলাঘব সূচিত হয়। জনশ্রুতি আছে যে কবি কালিদাস একজন মূর্খ লোক ছিলেন। মন্ত্রী রাজকন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। মন্ত্রী তজ্জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ষড়যন্ত্রপূর্বক ঐ নিরেট মূর্খের সহিত রাজকন্যার বিবাহ দেন। পরে রাজকন্যার উপদেশ অনুসারে কালিদাস বাণীদেবীর (মতান্তরে ৺কালীর) আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি অশ্লীল আদি-রসাত্মক শ্লোক কালিদাসের স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়া থাকে। আরও কিম্বদন্তী আছে যে কালিদাস সিংহল-রাজ, কুমারদাসের বন্ধু ছিলেন এবং সিংহলে বারবিলাসিনীগৃহে নিহত হইয়াছিলেন।

এই সকল জনশ্রুতির কোনও মূল্য নাই। কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে যে প্রতিভা ও শাস্ত্রজ্ঞান দৃষ্ট হয় তাহাতে কালিদাস হিন্দুসভ্যতার সকল শাস্ত্রেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস হয়। কিম্বদন্তী ব্যতীত কালিদাসের আর কোনও জীবনী নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই মহাকবির সময় নির্দেশ সম্বন্ধেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিপুল পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কালিদাসের কাল সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিনটি মত প্রচলিত আছে। (১) ৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দ উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে; (২) খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ৫ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ও সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল; (৩) খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী। এই তিন মতের অনুকূলেই বহু অনুমান-প্রমাণমূলক যুক্তি আছে। কিন্তু কোনও প্রমাণই সন্দেহের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে নাই। প্রত্যেক মতেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি আছে তাহা অতি সংক্ষেপে উক্ত হইল।

(১) ৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দ। কালিদাস উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন। এই মতটীকে ভারতীয় মত বলা যাইতে পারে। দেশীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী পূর্বাচার্যক্রমে এই মত গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। ঐ ঐতিহ্য বা জনশ্রুতি যে নিতান্ত অমূলক তাহা নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে সার্ উইলিয়াম্ জোন্স্ সর্বপ্রথমে এই মত গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ম্যাক্‌স্‌মূলার প্রভৃতি সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ ঐ মতকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। ফার্গুসন সাহেব সর্বপ্রথমে সম্বৎ-সম্বন্ধে এই মত প্রচার করেন যে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য শকদিগকে ভারত হইতে ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে বিতাড়িত করিয়া ঐ বিজয়ের তারিখের ৬০০ বৎসর পূর্ব হইতে সম্বৎ অব্দ স্থাপন করেন। তাঁহার মতে ৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে কোনও বিক্রমাদিত্য বিদ্যমান ছিলেন না এবং ঐ সময়ে সম্বৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ম্যাক্‌স্‌মূলার ফার্গুসনের মত অবলম্বন করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই ভারতীয় কাব্যযুগের চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল এবং কালিদাস প্রভৃতি সেই যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক ফ্লীটের ও হর্ণেলের গবেষণা ফার্গুসনের ঐ মত খণ্ডন করিয়াছে। ৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দের মত জ্যোতির্বিদাভরণের একটী শ্লোকদ্বারা সমর্থিত হয় এবং ঐ

শ্লোকটিই ভারতীয় মতের একমাত্র লিখিত প্রমাণ। ঐ শ্লোকটি সর্বজন বিদিত।

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্ট-ঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"

কিন্তু ঐ জ্যোতির্বিদ্যাভরণগ্রন্থ আলোচ্য কবি কালিদাসের রচিত নহে বলিয়া ইউরোপীয় অধ্যাপকগণ বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন কোনও অর্বাচীন কবি উহা প্রণয়ন করিয়া ভণিতায় রঘুকারকালিদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। জ্যোতির্বিদ্যাভরণ জ্যোতিষগ্রন্থ। উহাতে গ্রহাদির যে অবস্থান সূচিত হইয়াছে তদ্দারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে উক্ত গ্রন্থ ১৫শ শতাব্দীর পরে রচিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থ আধুনিক হইলেও নবরত্ন মত উহার বহু পূর্ববর্তী ধারাধিপতি ভোজ-রাজের কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় ও বাণীবিলাসগ্রন্থমালার অভিজ্ঞানশকুন্তলার মুখবন্ধে জে, কে, বালসুব্রহ্মণ্যম্ ভারতীয় মতই সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক এস্. রায় বলেন ডাঃ মার্শাল এলাহাবাদের নিকট ভিটাতে যে মেডালিয়ান্ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে শকুন্তলা নাটকের দুষ্মন্তের আশ্রমপথে প্রবেশ, ঋষিশিষ্যগণকর্তৃক মৃগবধ না করিবার প্রার্থনা, ঋষিকুমারীর আলবালে জলসেচন প্রভৃতি কালিদাসের শকুন্তলার প্রথমাঙ্কের আলেখ্য আছে। ঐ মেডালিয়ন্ শুঙ্গ বংশীয়গণের কালের। ঐ মেডালিয়ন্ হইতে দেখা যায় শুঙ্গবংশের সময়ে কালিদাসের শকুন্তলা পরিজ্ঞাত ছিল। পরন্তু তিনি ভাষা ও ব্যাকরণের দিক্ হইতেও ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক জে, কে, সুব্রহ্মণ্যম্ মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক হইতে যে অন্তর্নিহিত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা পরিহর্তব্য নহে। তিনি বলেন "নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ" এই নাট্যবিধির বশবর্তী হইয়া প্রাচীন নাটককারগণ কোনও প্রাচীন খ্যাতবৃত্তের উপর নাটক স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস জীবিতরাজার খ্যাতবৃত্তের উপরে মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক স্থাপন করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন :—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।"

কোনও কোনও পণ্ডিত বিশ্বাস করেন এই শ্লোকে "পুরাণ" কথায় শ্লেষ আছে। পরন্তু ঐ নাটকের শেষে ভরতবাক্যে কবি বলিয়াছেন :— .

আশাস্যভীতিবিগমপ্রভৃতি প্রজানাম্।
সংপৎস্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে॥"

"অগ্নিমিত্রে" এই ভাবেসপ্তমী প্রয়োগ দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে তৎকালে অগ্নিমিত্ররাজা জীবিত ছিলেন। এই অগ্নিমিত্র পুষ্পমিত্রের পুত্র এবং খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি আরও বলেন কালিদাসের নাটকে তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রের দায়াধিকারের ব্যবস্থানুসারে অপত্যহীনা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইতেন না। ঐ প্রকার স্মৃতির ব্যবস্থা খৃষ্টপূর্বেই প্রচলিত ছিল। গুপ্তরাজত্বকালে বা তাহার পরবর্তীকালে ঐ প্রকাব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। পরন্তু ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে নৃপতি ছিলেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা ইহাই অবধারিত হয় যে কালিদাস খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য-নৃপতির সভায় নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন।

দ্বিতীয় মত গুপ্তরাজত্বকাল। বহু অভিজ্ঞ ইউরোপীয় অধ্যাপক এই মতের সমর্থক। অধ্যাপক লাসেন্, কর্ণেল্ উইল্‌ফোর্ড্, জেমস্ প্রিন্সেপ্ অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্ এবং অধ্যাপক কীথ্, ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ প্রভৃতি মনীষিগণ বলেন গুপ্তরাজত্বকালেই ভারতের কাব্যসৌভাগ্যরবি মধ্যাহ্নগগন সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল এবং এই সুখ ও সমৃদ্ধির সময়েই কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাসের গ্রন্থে যে শান্তিময় তৃপ্তি ও আনন্দধারা প্রবাহিত তাহা ভারতের এই সৌভাগ্যকালেই সম্ভবপর। অধ্যাপক ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ বলেন যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতের সহিত চীন দেশের ঘনিষ্ঠতায় ভারতীয় ও চীন সভ্যতার সংমিশ্রণে যে এক নবীন সভ্যতা ও নবীন যুগের উন্মেষ হইয়াছিল তাহার পূর্ণ বিকাশ গুপ্তবংশের রাজত্বকালেই হয়। ঐ গুপ্তবংশের রাজত্বকালে কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাস চীনের দানসম্পদ্ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কালিদাস "চীনাংশুকমিব" বলিয়া ঐ দান স্বীকার করিয়াছেন। কীথ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে কালিদাস তাঁহার কাব্যে প্রচ্ছন্নভাবে গুপ্তরাজগণকে প্রশংসা করিয়াছেন।

রঘুবংশের "আসমুদ্রক্ষিতীশানাং" শ্লোকে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তৃতির শ্লেষ আছে। রঘুর দিগ্বিজয়ে, মালবিকাগ্নিমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞে সমুদ্রগুপ্তের কার্যকলাপের প্রতিচ্ছায়া আছে। তাঁহারা বলেন যে "কুমারসম্ভব" কুমারগুপ্তের জন্মোপলক্ষে রচিত। এইগুলি কেবলমাত্র অনুমান। ঐতিহাসিক প্রমাণ বিবেচনা করিতে গিয়া তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রমাণ উল্লেখ করেনঃ—(১) অশ্বঘোষ কনিষ্কের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন এবং কনিষ্ক সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে পাঞ্জাব প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। কালিদাস, অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিতের" নিকট বহুলভাবে ঋণী। কালিদাস, অশ্বঘোষ হইতে বহু বর্ণনা অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাস, অশ্বঘোষ অপেক্ষা অর্বাক্তন, কারণ ভাসের নাটকের প্রাকৃতভাষা অশ্বঘোষের ব্যবহৃত প্রাকৃত অপেক্ষা অর্বাচীন। কালিদাস তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্রে "ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাম্" (প্রথিতযশসাম্ ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাম্ প্রবন্ধান্ অতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়াং কথং বহুমানঃ") ঐ উক্তির দ্বারা ভাসকে পূর্ববর্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ভাসকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করা যায় এবং কালিদাস তৎপরবর্তীকালের কবি হইতেছেন। ইহাই কালিদাসের কালের প্রাচীন সীমা।

(২) (ক) বাণভট্ট তাঁহার "হর্ষচরিতে" কালিদাসের কবিত্বের প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছেনঃ—

নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥"

বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। (খ) চালুক্য নৃপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে জৈন কবি রবিকীর্তি রচিত প্রস্তরলিপিতে (৬৩৪ খৃষ্টাব্দ) কালিদাস ও ভারবির উল্লেখ আছেঃ—"স বিজয়তাম্ রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্ত্তিঃ"।

(গ) কুমারিলভট্ট তাঁহার তন্ত্রবার্ত্তিকে কালিদাসের একটী চরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে—

"প্রসিদ্ধিরূপং কবিভির্নিরূপিতম্। সতাং হি
সন্দেহ-পদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।"

কুমারিলভট্ট সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীর মীমাংসক।

(ঘ) দণ্ডাচার্য তাঁহার কাব্যাদর্শের প্রথম অধ্যায়ের ৪৫ কারিকায়ঃ—

"প্রসাদবৎ প্রসিদ্ধার্থম্ ইন্দোরিন্দীবরদ্যুতিঃ।
লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতীতি প্রতীতিসুভগং বচঃ॥"

কালিদাসের কবিতা হইতে "লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি" এই চরণটি গ্রহণ করিয়া কালিদাসের প্রসাদগুণের কীর্তন করিয়াছেন।

(ঙ) (প্রাচীন দশপুর) মন্দাসোরের সূর্যমন্দিরের প্রশস্তি বৎসভট্টি নামক কবি ৪৭২—৪৭৩ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। ঐ প্রশস্তির ভাষা ও রীতির সহিত কালিদাসের ভাষা ও রীতির বহু সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পরন্তু বৎসভট্টি মেঘদূত ও ঋতুসংহার হইতে বহু বিষয় মুখ্য ভাবে অনুকরণ করিয়াছেন। ইহাই কালিদাসের অর্বাক্তন সীমা নির্দেশ করা যায়।

উপরোল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর পর ও ৫ম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের পূর্বে কালিদাসের আবির্ভাবের কাল। গুপ্ত-বংশের রাজত্বকালে ভারতের পূর্ণসমৃদ্ধির সময়ই কালিদাসের কবিত্বের শান্তিপূর্ণ আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের "বিক্রমাদিত্য" উপাধি ছিল। তাঁহার রাজত্বকাল ৪১৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। তাঁহার রাজত্ব-কালই কালিদাসের সময় বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

(৩) ষষ্ঠ শতাব্দী

অধ্যাপক কার্ণ, ম্যাক্স্মূলার, ভাওদাজি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপন করেন। তাঁহাদের মতও ভারতীয় জনশ্রুতির একাংশের উপর স্থাপিত। তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা স্বীকার করেন, পরন্তু কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ টিকাকার মল্লিনাথের মেঘদূতের টীকার উপর নির্ভর করেন। বরাহমিহির নবরত্নের এক রত্ন। ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডখাদ্যের টীকাকার অমররাজ বলেন "নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে (৫০৯) বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ"। ঐ প্রমাণ বিশ্বাস করিলে বরাহমিহিরের মৃত্যু ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে হয়। কালিদাস

বরাহমিহিরের সমসাময়িক, অতএব কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। দিঙ্‌নাগাচার্য ও ধর্মকীর্তি অসঙ্গের ছাত্র ছিলেন। তিব্বতের রত্নধর্মরাজ বলেন বুদ্ধনির্বাণের ৯০০ বৎসর পর অসঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। অশোক বুদ্ধনির্বাণের ১০৭ বৎসর পরে ছিলেন। অশোকের রাজত্বকাল ২৫৯—২১২ পূঃ খৃষ্টাব্দ। অসঙ্গ ৫৪১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত হয়। দিঙ্‌নাগাচার্য ও নিচুল অসঙ্গের অন্ততঃ ২৫ বৎসর পরে ছিলেন। মল্লিনাথ পূর্বমেঘের

"স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং।
দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥ ১৪॥

শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন "নিচুল" ও "দিঙ্‌নাগ" কথায় শ্লেষ আছে। কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী দিঙ্‌নাগ ও বন্ধু নিচুলের নাম ধ্বনিত হইয়াছে। দিঙ্‌নাগ বসুবন্ধুরও ছাত্র ছিলেন। বসুবন্ধু সমুদ্রগুপ্তের সময় বিদ্যমান ছিলেন।* উদ্যোতকর দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করিয়া ন্যায়বার্তিক প্রণয়ন করেন। সুবন্ধু তাঁহার বাসবদত্তায় "ন্যায়স্থিতিম্ ইবোদ্দ্যোতকরস্বরূপম্" বাক্য দ্বারা উদ্দ্যোতকরের নাম এবং "বৌদ্ধসঙ্গতিমিবালঙ্কারভূষিতাম্" বাক্য দ্বারা ধর্মকীর্তি "বৌদ্ধসঙ্গতি" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়েই উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী রাজা ছিলেন। এতদ্দ্বারা কালিদাস এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালেই বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত হয়। এই তিনটি বিবদমান মত প্রবলভাবে চলিতেছে। প্রত্নতত্ত্বের বর্তমান অবস্থায় কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভবপর নহে।

কালিদাসের জন্মভূমি।

বর্তমান সিন্ধিয়া রাজ্যভুক্ত প্রাচীন মালবপ্রদেশস্থ মন্দসোর (প্রাচীন দশপুর) নামক প্রসিদ্ধ নগরে অথবা তাহার অতি নিকটবর্তী স্থানে কালিদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। ঐ স্থান হইতেই উজ্জয়িনীর রাজসভার সহিত তাঁহার সংশ্রব হইয়াছিল। (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিহার ও উড়িষ্যা জার্ণালে এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন এবং ভিন্‌সেণ্ট স্মিথও ঐ মত গ্রহণ করিয়াছেন)।

* V. Smith 2nd Edition p. 169 Oxford History of India.

কালিদাসের ধর্ম্মমত।

কালিদাসের ধর্মমত কি ছিল তাহা তাঁহার গ্রন্থারম্ভে নমস্ক্রিয়া বাক্য হইতেই বোধগম্য হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে "পার্বতী-পরমেশ্বরকে" অভিবাদন করিয়াছেন। বিক্রমোর্বশীর প্রারম্ভে "স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগ-সুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্ত বঃ" এই নমস্কার বাক্য আছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে "একৈশ্বর্য্যে স্থিতোপি প্রণতবহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ কান্তাসংমিশ্রদেহোপ্য-বিষয়মনসাং" এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলার প্রারম্ভবাক্যে "প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনু-ভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ" আছে। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে কালিদাস শৈব ছিলেন। কিন্তু কালিদাস কোনও সাম্প্রদায়িক ভাব অবলম্বন করেন নাই। সর্বত্রই তিনি (অক্ষর, সর্বব্যাপী একমেবাদ্বিতীয়ং) ব্রহ্ম ও বেদান্তমত অনুসরণ করিতেন। কুমারের ২য় সর্গে ব্রহ্মা, রঘুর ১০ম সর্গে বিষ্ণু এবং কুমারের ৭ম সর্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব সকলকেই তিনি এক মহাশক্তির বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রঘুবংশের ত্রয়োদশসর্গেও শ্রীরামচন্দ্রকে "হরি" অর্থাৎ বিষ্ণু আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কালিদাসের ন্যায় সার্বজনীন ও সার্বভৌম হৃদয়ে কোনও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থাকা সম্ভবপর নহে। তিনি সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিশ্বাস করিতেন এবং রঘুবংশে শেষ জীবনে যোগদর্শনের পন্থাও অবলম্বনীয় বলিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস হয় তৎকালে প্রচলিত দর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতি যাহা বিদ্যমান ছিল ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তজ্জন্যই তিনি শূদ্র যোগাবলম্বন করায় তাহার বধ অকুণ্ঠিতচিত্তে সমর্থন করিয়াছেন। তৎকালীন প্রচলিত দর্শনে বিশ্বাস থাকাতেই তিনি স্বাধীনভাবে এই বিশ্বজগতের বিচিত্রতার ও সৃষ্টির কোনও স্বাধীন পৃথক্ মীমাংসা করিতে প্রয়াস পান নাই।

কালিদাসের কবিত্ব।

ভারতীয় মতে কালিদাসের উপমাতেই শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। "উপমা কালিদাসস্য ·ভারবেরর্থগৌরবম্"। বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতের প্রারম্ভে কালিদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সুক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥"

কোনও প্রাচীন সুভাষিতরত্ন কালিদাসের অতুলনীয়তা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

'পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে কনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতকালিদাসা।
অদ্যাপি তত্তুল্যকবেরভাবাদনামিকা সার্থবতী বভূব॥"

জয়দেবের পূর্ববর্তী গোবর্দ্ধনাচার্য কালিদাসের মধুর কোমল কণ্ঠরসের যশোগান করিয়াছেন ঃ—

সাকূতমধুরকোমলবিলাসিনীকণ্ঠকূজিতপ্রায়ে
শিক্ষাসময়েঽপি মুদে রতিলীলাকালিদাসোক্তী॥"

প্রসন্নরাঘবরচয়িতা জয়দেব কালিদাসকে "কবিকুলগুরু" নামে অভিহিত করিয়াছেন ঃ—

"ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ॥"

কালিদাস কেবল ভারতেরই নহেন, তিনি জগতের কবি বলিয়া বরেণ্য হইয়াছেন। ইউরোপের বহু কবি ও মনীষিগণ তাঁহার যশোগান করিয়াছেন। গেটে, শিলার প্রভৃতি কবি তাঁহার অসাধারণ কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছেন। গেটে বলিয়াছেন ঃ—

"যদি যৌবনের কুসুমবিকাশ ও বার্দ্ধক্যের ফলপরিণতি ; যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু হৃদয়মুগ্ধকারী, স্বর্গ ও পৃথিবী কোনও এক স্থানে সম্মিলিত হইয়া থাকে, তবে আমি ইহাই একটী কথায় বলি "শকুন্তলা", তাহা হইলেই সবই বলা হইল।"

কবি শিলার মেঘদূতের ছায়া লইয়াই তাহার Maria Stuart (মেরিয়া ষ্টুয়ার্ট) রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। হুমবোল্ট, শ্লেগেল, সার্ উইলিয়াম জোন্স্, লাসেন প্রভৃতি মনীষিগণ কালিদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছেন।

কালিদাসের ভাষার প্রাঞ্জলতা, বর্ণনার সজীবতা এবং স্বল্পভাষিতা তাঁহার কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি বৈদর্ভরীতির কবি। কালিদাসের কাব্যে তিনি যাহা বাচ্যার্থ দ্বারা প্রকাশ করেন তাহা অপেক্ষা তাঁহার ব্যঞ্জনার ধ্বনি বহু গভীর এবং তাঁহার ব্যঞ্জনাই প্রধান। কালিদাস মানবহৃদয়ের

সহিত প্রকৃতির যে গূঢ় সম্বন্ধ দেখিতে পান তাহাই তাঁহার বিশিষ্টতা। মূক ও জড় প্রকৃতিও তাঁহার নিকট অনুভূতিময়, স্থাবর জঙ্গম সকলেই পরস্পরের সুখ-দুঃখ অনুভব করে। নূপুর চরণবিচ্ছেদদুঃখে মৌন হইয়া যায়। বসন্তাগমে মূক প্রকৃতিও সজীব হয়। তিনি মানব হৃদয়ের অন্তরতম-প্রদেশে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করেন। সমবেত সর্বপ্রকার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের বার্তা দুই চারিটি কথাতেই ব্যক্ত করিয়া ফেলেন। মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মজ্ঞান থাকাতেই কাব্যরসের উপাদানসংগ্রহে তাঁহাকে প্রয়াস পাইতে হয় নাই। বিষয়ের সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি তাঁহার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠে। সেই জন্য আদিরস ও করুণরস এবং অদ্ভুত রসে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি উপমাতে সিদ্ধহস্ত কিন্তু তাঁহার উপমা অপেক্ষাও অর্থান্তরন্যাসের চমৎকারিত্ব অধিক। তাঁহার বহু অর্থান্তরন্যাস ও রূপক সুধীসমাজে ও কথিত ভাষায় স্থান পাইয়াছে।

কালিদাসের কাব্য

ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথম জীবনের রচনা। ইহাতে কালিদাসের অসামান্য প্রতিভা বিদ্যমান আছে কিন্তু কাব্যশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। উহাতে ছন্দোদোষ ও যতিপতন প্রভৃতি দোষ দৃষ্ট হয়। হিলেব্রাণ্ট্ প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিগণ ঐ অপরিপকতা দেখিয়া উহা আদৌ কালিদাসের রচিত কি না বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রকার সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। ভারতবর্ষে ঋতুসংহার কালিদাসের নহে বলিয়া কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বৎসভট্টি, মন্দাসোরপ্রশস্তি, রচনা করিতে ঋতুসংহার ব্যবহার করিয়াছেন, তৎবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ প্রশস্তি ৪৭২—৪৭৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। মল্লিনাথ ঋতুসংহারের টীকা না করায় ও আলঙ্কারিকেরা উহা হইতে কোনও উদাহরণ না দেওয়ায় উহা কালিদাসের নহে, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে কারণ উহা এত প্রাঞ্জল যে কোনও টীকাকারই উহার টীকা রচনা করা আবশ্যক মনে করেন নাই এবং কালিদাসের পরিপক্ক কাব্য হইতেই আলঙ্কারিকেরা উদাহরণ দেওয়া সঙ্গত বোধ করিয়াছেন। এই খণ্ডকাব্যখানিতে ষড় ঋতু ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ ১৫৩টি শ্লোক আছে। প্রত্যেক ঋতুর চিত্রেই কালিদাসের

স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা প্রকৃতিদেবীর পরিবর্তনগুলি সূক্ষ্মরূপে লক্ষ্য করিয়াছে। কালিদাস কয়েকটি সামান্য কথা দ্বারাই ঋতুটির এমন চিত্র হৃদয়ে আনয়ন করেন যে আমরা যেন সেই ঋতুই অনুভব করিতে থাকি। প্রত্যেক ঋতুর বর্ণনাতেই আদিরসের স্পর্শ আছে কিন্তু তাহাতে অশ্লীলতাদোষ নাই। প্রকৃতির পরিবর্তনের সহিত নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের ভাবান্তর কালিদাস নৈপুণ্য-সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক ঋতুরই নীরব সঙ্গীত যেন নায়ক-নায়িকার মরম স্পর্শ করে। প্রকৃতির সহিত মানব হৃদয়ের যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ আছে তাহাই কালিদাসের কবিত্বকে উদ্ভাসিত করিয়াছে।

মেঘদূত।

কালিদাসের কাব্যের মধ্যে "শকুন্তলার" পরেই "মেঘদূত" যশ এবং আদর লাভ করিয়াছে। ইহার কবিত্ব যে কেবল ভারতবর্ষেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে তাহা নহে। ইউরোপেও এই খণ্ডকাব্য সমাদর লাভ করিয়াছে। জার্মান কবি গেটে ও শিলার ইহার বহু যশোগান করিয়াছেন। কবি শিলার মেঘদূতেব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার মেরিয়া ষ্টুয়ার্ট লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

যে বিষয় লইয়া কালিদাস মেঘদূতের কাব্যলহরী সৃজন করিয়াছেন তাহা অতি মর্মস্পর্শী।* যক্ষ তাহার প্রভু কুবেরের আদেশ পালনে বিমুখ হওয়ায় মধ্যভারতের রামগিরি আশ্রমে এক বৎসরের জন্য নির্বাসিত হইয়াছিলেন। স্বদেশ হিমালয় ও প্রিয়তমা হইতে বিচ্যুত হইয়া রামগিরির নির্জনশৃঙ্গে "কান্তাবিরহগুরু" হৃদয়ে ক্রমশঃ (ভ্রষ্টকনকবলয়) ক্ষীণকলেবর হইতেছিলেন। আষাঢ় মাসের নবীননীরদসন্দর্শনে যক্ষের বিরহগুরুহৃদয় আরও গুরুভারে কাতর হইয়াছে। যক্ষ অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, চেতন

* কেহ কেহ বলেন রামায়ণের সীতাহরণের পর রামের বিলাপের ছায়া অবলম্বন করিয়া কালিদাস মেঘদূত রচনা করিয়াছেন। "সীতাং প্রতি রামস্য হনুমৎ-সন্দেশং মনসি নিধায় মেঘ-সন্দেশং কবিঃ কৃতবান্ ইত্যাহুঃ" মল্লিনাথ। "বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ। ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ। —রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড

অচেতন তাহার বোধ নাই। মেঘ পুষ্করাবর্তের বংশধর। তাহাকে প্রিয়তমার নিকট সন্দেশবহন করিবার জন্য দূতস্বরূপে নিয়োগ করিতেছেন। তিনি যদি দূত হইতে অসম্মত হন দুঃখ নাই, "যাচ্ঞা মোঘাবরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা"। পূর্বমেঘে মেঘ কোন পথে যাইবেন, কি দৃশ্য দেখিবেন যক্ষ তাহা বিনাইয়া বিনাইয়া মানসচক্ষে মেঘকে দেখাইতেছেন। মেঘ রামগিরি হইতে উত্তরমুখে যাইতে যাইতে অমর-কূটশৃঙ্গ, নর্মদানদী, বিদিশানগরী, বেত্রবতীনদী, অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী, পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া যক্ষের নিবাসভূমি অলকায় পৌঁছিবেন। উত্তরমেঘে যক্ষ তাহার অলকাপুরীর ও তাহার নিজ প্রাসাদের বর্ণনা করিতেছেন। উদ্বেলহৃদয়ে যক্ষ তাহার প্রিয়তমার সৌন্দর্যসম্পদ্ বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার বিরহবিধুরা প্রিয়তমার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। মেঘ কি অবস্থায় কি লক্ষণে প্রিয়তমাকে চিনিতে পারিবেন এবং যক্ষ বৎসরান্তে মিলন হইবে আশায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এই সংবাদ মেঘ প্রিয়তমাকে দিবেন। মেঘের স্তনিত সুভগধ্বনি। কাব্যেরও ধ্বনি অতি গভীর ও মর্মস্পর্শী। ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ। যক্ষ কেন কর্তব্য বিচ্যুত হইয়াছিল, কনকবলয় কেন ভ্রষ্ট হইতেছে সহৃদয় পাঠক বুঝিবেন। দারুণ গ্রীষ্মের অবসানে মেঘালোকে মানব-হৃদয়ে বিশেষতঃ প্রেমিকপ্রেমিকার হৃদয়ে কি ভাব-মন্দাকিনী প্রবাহিত হয় সবই অনুভূতিসাপেক্ষ। কবি কেবল উদ্দীপকগুলিই পূর্বমেঘে বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তরমেঘে বর্ণনা করিয়াছেন, আবাসগৃহ ও তাহার প্রিয়তমা। কালিদাস সকল ছন্দেই সিদ্ধ-হস্ত। কিন্তু এই কাব্যে তিনি মন্দাক্রান্তাছন্দঃ অবলম্বন করিয়াছেন ইহাই তাঁহার মহিমা। যক্ষ বিরহকাতর, হৃদয় গুরুভারে পীড়িত। শোকে ও দুঃখে চিন্তাগতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। বেহাগের ন্যায় করুণ মর্মস্পর্শী-স্বরে মন্দাক্রান্তাছন্দে ধীরে ধীরে বিনাইয়া বিনাইয়া যক্ষ বলিতেছেন, ভাবের সহিত ছন্দের অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে। কাব্যের ধ্বনি, ছন্দঃ ও রীতি যক্ষের করুণকণ্ঠে মিশিয়া এক অপূর্ব কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন সীতার বিরহে রামের দুঃখচ্ছায়া অবলম্বনেই কালিদাস এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।

মেঘদূতে ১১৮টি শ্লোক আছে। কোনও কোনও টীকাকার কয়েকটী

অতিরিক্ত শ্লোক পাঠমধ্যে গণ্য করিয়া তাহার টীকা করিয়াছেন। কিন্তু মল্লিনাথ ১১৮টি ব্যতীত অন্যান্য শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণনা দরিয়াছেন। বল্লভদেব ১২শ শতাব্দীতে ১১১টি শ্লোক উল্লেখে টীকা করিয়াছেন এবং মল্লিনাথ ১৫শ শতাব্দীতে ১১৮টি শ্লোকের টীকা করিয়াছেন। দক্ষিণাবর্ত নাথ ১৭০টি শ্লোক স্বীকার করিয়াছেন। মল্লিনাথধৃত পাঠই সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি যথাসাধ্য কালিদাসের মূল শ্লোকগুলি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে (৮৩৭ খৃঃ) জিনসেন কৃত পার্শ্বাভ্যুদয় নামক কাব্যগ্রন্থে মেঘদূতের চরণগুলি সমস্যাপুরণস্বরূপে গ্রথিত আছে। জিনসেনের পার্শ্বাভ্যুদয়ের শেষভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় আছে।

"ইতি বিরচিতমেতৎকাব্যম্ আবেষ্ট্য মেঘম্
বহুগুণমপদোষং কালিদাসস্য কাব্যম্।
মলিনিতপরকাব্যং তিষ্ঠতাদাশশাঙ্কম্
ভুবনমবতু দেবঃ সর্বদামোঘবর্ষঃ॥
শ্রীবীরসেনমুনিপাদসরোজভৃঙ্গঃ
শ্রীমানভূদ্ বিনয়সেন মুনির্গরীয়ান্।
তচ্চোদিতেন জিনসেনমুনীশ্বরেণ
কাব্যং ব্যধায়ি পরিবেষ্টিতমেঘদূতম্॥"

জিনসেনের ঐ পার্শ্বাভ্যুদয়ের দেহগত মেঘদূতের শ্লোকগুলি একত্র সংগৃহীত হইলে মেঘদূতের পাঠ ৯ম শতাব্দীতে ঐ প্রদেশে কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। মল্লিনাথধৃত পাঠের সহিতও পার্শ্বাভ্যুদয় পাঠের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সংস্কৃত কাব্যজগতে মেঘদূত যে অপূর্ব নবীনতা ও সৌকুমার্য আনয়ন করিয়াছিল, তাহাতে উহার অনুকরণ অনিবার্য। ১২শ শতাব্দীতে ধোয়ী তাঁহার **পবনদূত**, ১৩শ শতাব্দীতে বেদান্তদেশিক তাঁহার "হংসসন্দেশ" মেঘদূতের অনুকরণে রচনা করিয়াছেন এবং ১৫শ শতাব্দীতে রূপগোস্বামী **হংসদূত** ও ১৭শ শতাব্দীতে কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম **পদাঙ্কদূত** রচনা করিয়াছেন কিন্তু ঐ:সকল অনুকরণ কাব্য-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

কুমারসম্ভব।

সম্ভবত মেঘদূতের পরেই কালিদাস কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছিলেন। কুমারসম্ভবের হস্তলিখিত পুস্তকে ১৭টি সর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু সাধারণত ৭টি সর্গই পঠিত ও পাঠিত হইয়া থাকে। অষ্টম সর্গটি কালিদাসের রচিত তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আদিরসের অতি প্রাচুর্য্যহেতু উহা পঠিত পাঠিত না হওয়ায় টীকাকারগণ উহার টীকা করিতে বিমুখ হইয়াছেন। কিন্তু ৯ম হইতে ১৭শ সর্গ কালিদাস রচিত নহে। ৮ সর্গে মহাকাব্য হইতে পারে না বিশ্বাসে কোনও পরবর্তী কবি নিজের রচনা উহাতে সংযোগ করিয়া দিয়াছেন! কিন্তু ঐ কবির কাব্যকুশলতা কালিদাস অপেক্ষা ন্যূন তাহা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের শ্লোকে কখনও যতিপতন হয় না কিন্তু এই সর্গগুলিতে বহুবার যতিপতন হইয়াছে। কালিদাস পাদপূরণের জন্য অব্যয়ের বৃথা প্রয়োগ করেন নাই কিন্তু এই সকল সর্গে ঐ প্রকার অর্থশূন্য অব্যয়ের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পরন্তু কোনও আলঙ্কারিকই ঐ সকল সর্গ হইতে কোনও শ্লোক উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করেন নাই। সাহিত্যজগতে ঐ সর্গগুলি কালিদাসের রচিত নহে বলিয়া জনপ্রবাদ আছে।/ কালিদাস অষ্টমসর্গের পর আর কেন রচনা করেন নাই তাহার কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ঐরূপ উদাহরণ বিরল নহে। তারকাসুরের বধের জন্য কুমারের (কার্তিকেয়ের) জন্যই কুমারসম্ভবের বিষয়। প্রথম সর্গে হিমালয়ের মনোরম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। উহাতে হিমালয়ের ভীষণতার লেশও নাই। দ্বিতীয় সর্গে দেবতাগণ তারকাসুর-প্রপীড়িত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন কিন্তু ব্রহ্মা "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম্ অসাম্প্রতম্" বলিয়া তাহাদিগকে অন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। পার্বতীর সহিত শিবের পরিণয় হইলে যে কুমার জন্মগ্রহণ করিবে সেই তারকাসুর নিধন করিবে। ইন্দ্র কামদেবের শরণাপন্ন হইলেন। কামদেব বসন্তের সহায়তা পাইয়া হরের যোগভঙ্গ করিতে সাহসী হইলেন। বসন্তাগমে প্রকৃতি মনোহর মূর্তি ধারণ করিলেন। প্রকৃতির মোহনসাজে তরুলতা, ভ্রমর-ভ্রমরী, করী-করেণু, মৃগ-মৃগী, চক্রবাক-চক্রবাকী, বিশ্বজগৎ নব অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এই বসন্তাগমবর্ণনে কালিদাসের অপূর্ব শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। কালিদাস স্বভাবসিদ্ধ নাট্যকবি। কাব্যের যে অংশে কথোপকথন বা ঘটনাবিন্যাস থাকে

সেই স্থলেই কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা স্ফুরিত হয়। বসন্তাগমের ও মদনভস্মের শ্লোকগুলিতে আমাদিগের মনে হয় নাটকের কোনও অঙ্ক অনুষ্ঠিত হইতেছে। নন্দী প্রকৃতির এই অকালজাগরণে মুখার্পিত অঙ্গুলিদ্বারা চপলতা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিল। তাহার শাসনে সমস্ত কানন স্তব্ধ হইল। "চিত্রার্পিতা-রম্ভমিবাবতস্থে।" পার্বতী আসিয়া পৌঁছিলেন। "পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" কামদেব এই অবস্থায় পুষ্পশায়ক ছাড়িলেন। হর কিঞ্চিৎ বিলুপ্তধৈর্য্য হইলেন। তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইল। হঠাৎ তাঁহার ললাটস্থিত তৃতীয় চক্ষু হইতে দীপ্যমান কৃশানু বহির্গত হইল। আকাশ হইতে দেবগণ বলিতে লাগিলেন "প্রভো! ক্রোধ সম্বরণ করুন" "ক্রোধ সম্বরণ করুন।" কিন্তু ঐ বাক্য উচ্চারিত হইতে না হইতেই ঐ অগ্নি মদনকে ভস্মীভূত করিল।

"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্‌গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি
তাবৎ বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥ ৩।৭২

পদ্যকাব্যে নাটকের অভিনয় হইয়া গেল। দৃশ্যপটের পর দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া চরম উৎকর্ষে বিদ্যুৎ ঝলসিল। রঘুবংশেও দিলীপের সহিত সিংহের কথোপকথনেও এইপ্রকার নাট্যপ্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে। ৩য় সর্গের শেষভাগে মদন ভস্মীভূত হইলেন। ৪র্থ সর্গে রতিবিলাপ। ৫ম সর্গে পার্বতীর তপস্যা ও হরকর্তৃক পার্বতীর পরীক্ষা। ৬ষ্ঠ সর্গে পার্বতীর বিবাহ-প্রস্তাব। ৭ম সর্গে পার্বতীর পরিণয়। ৮ম সর্গে নবদম্পতীর রসালাপ ও রসক্রীড়া।

কোনও কোনও সমালোচক বলেন যে কুমারগুপ্তের জন্মোপলক্ষে কুমার-সম্ভব রচিত হইয়াছিল।

রঘুবংশ।

রঘুবংশই কালিদাসের সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য। এইখানি তাঁহার পরিপক্ক হস্তের সর্বশেষ রচনা। কিন্তু দেশীয় পণ্ডিতসমাজে উহার সমালোচনাব্যঞ্জক যে শ্লোক আছে তাহা যে অতীব অনুদার সমালোচনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্লোকটি এই :—

"রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যম্
তস্যাপি টীকা সাপি চ পাঠ্যা ।"

"সূর্য্যপ্রভব বংশ" আশ্রয় করিয়াই কালিদাস রঘুবংশ রচনা করিয়াছেন। মহাভারতে ও পুরাণ প্রভৃতিতে সূর্যবংশের যে সকল রাজার বিবরণ আছে তাহাই কবি সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে।* কবি দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশে ১৯টি সর্গ আছে। ৬ষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরের বর্ণনা আছে। কিরূপে এই প্রথা নির্বাহিত হইত তাহার একটি উজ্জ্বল চিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন। কালিদাস মানবহৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দৌবারিকী সুনন্দা, রাজসুতা ইন্দুমতী ও রাজন্যবৃন্দের মনোভাব যুগপৎ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের ধ্বনি অতি মধুর। যাহা প্রকাশ্যে বলিয়াছেন তাহার অন্তরালে বহু অধিক রহিয়াছে। বিধাতার ললিত সৃষ্টি রাজদুহিতা রাজমার্গে প্রবেশ করিলেন। রাজগণের দেহমাত্রই কেবল রাজমার্গে আসনে রহিল, তাহাদিগের মন "নেত্রশতৈকলক্ষ্যে" রাজকন্যাতে পতিত হইল।

"তস্মিন্ বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ কন্যাময়ে নেত্রশতৈকলক্ষ্যে।
নিপেতুরন্তঃকরণৈর্নরেন্দ্রা দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেষু॥"

দৌবারিকী সুনন্দা রাজনন্দিনীকে এক রাজার নিকট হইতে রাজান্তরে লইয়া যাইতেছেন :—মানসরাজহংসী যেন বাজপদ্মান্তরে যাইতেছেন :—

"তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা রাজান্তরং বাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীম্।" ৬।২৬

সুনন্দা রাজসমীপে লইয়া গিয়া রাজার পরিচয়, রাজধানীর ও রাজপ্রাসাদের অবস্থানাদি বলিলেন; তন্বী রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, নত হইলে দূর্বাঙ্কমধুকমালা বক্ষঃ হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হইল :—

"এবং তয়োক্তে তম্ অবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্‌বিস্রংসিদূর্বাঙ্কমধুকমালা।
ঋজুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা॥" ৬।২৫॥

---

* কালিদাস রঘুবংশ রচনায় পদ্মপুরাণ অবলম্বন করিয়াছেন বিশ্বাস হয়। Padmapurana and Kalidas by H. Sarma with Introduction by Winternitz (1925.)

রাজসুতা এইরূপ রাজান্তরে নীত হইতে লাগিলেন ; যাঁহাকে যাঁহাকে রাজতনয়া অতিক্রম করিয়া গেলেন তাঁহাদের মুখের বৈবর্ণ্য লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন :—

"সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥"*

সুনন্দা আসন্ন নৃপতিগণের প্রত্যেকেরই গুণ বর্ণনা করিতে ত্রুটি করে নাই। তাহার উপর যে ভার ন্যস্ত ছিল তাহা যথাসাধ্য সম্পাদন করিতে অবহেলা করে নাই। সুনন্দা কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা এবং মনোভাববোধে নিপুণা। অজের নিকট গিয়া অজের বংশ সুনন্দা বর্ণনা করিলে রাজকন্যা অমলদৃষ্টি-দ্বারাই রাজকুমারকে বরণ করিলেন, সুনন্দা সব বুঝিল। সুনন্দা পরিহাস পূর্বক বলিল "আর্যে আমরা অন্যত্র যাইব কি ?"

বধূ কুটিলকটাক্ষে কৃত্রিম রোষবর্ষণ করিলেন। রাজকন্যাকে কালিদাস "বধূ" বলিলেন :—

"তথাগতায়াং পরিহাসপূর্বং সখ্যাং সখী বেত্রভৃদাবভাষে।
আর্যে ব্রজামোঽন্যত ইত্যথৈনাং বধূরসূয়াকুটিলং দদর্শ ॥"

অষ্টমসর্গে কালিদাস ইন্দুমতীর শোকে "অজবিলাপ" বর্ণনা করিয়াছেন। এই অজবিলাপের সহিত "কুমারসম্ভবের" রতিবিলাপ তুলনা করা যাইতে পারে। কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ মানবহৃদয়স্পর্শী নহে। ঐ প্রকার বিলাপ কুসুমধ্বজপত্নীর পক্ষেই সম্ভব; বিশেষতঃ ভস্মীভূত মদনের সহিত পরে মিলন হইবে এই আশ্বাসবাক্য তাহার দুঃখের তীব্রতার অনেক লাঘব করিয়াছে। কিন্তু অজবিলাপ অতি করুণ ও মর্মস্পর্শী।

ত্রয়োদশে রাবণবধের পর শ্রীরামচন্দ্রের পুষ্পকরথে অযোধ্যায় প্রত্যা-বর্তন। উহাতে কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা ও স্বাভাবিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা যেন বিমানে আরোহণ করিয়াই সেতুবন্ধ হইতে দণ্ডকারণ্য হইয়া প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল দিয়া অযোধ্যাপ্রদেশে

---

* বহুভাষাবিৎ সুপণ্ডিত ই. বি. কাউয়েল সাহেব বলিতেন এরূপ উপমা কাব্য সাহিত্যে দুর্লভ। এই উপমার জন্য কালিদাসকে দীপশিখা কালিদাস বলা হয়।

প্রবেশ করিতেছি। কালিদাস বাল্মীকির রামায়ণ হইতেই উহা গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু "তনুবাগ্‌বিভবোঽপি" কালিদাস তাঁহাকে সর্বাংশে অতিক্রম করিয়াছেন। ছায়াপথবিভক্ত নক্ষত্রপুঞ্জখচিত শরৎপ্রসন্ন আকাশের ন্যায় সেতুবিভক্ত ফেণিল সমুদ্র, সেই বনস্থলী যথায় রামচন্দ্র জানকীর চরণারবিন্দভ্রষ্ট বদ্ধমৌন নূপুর দেখিয়াছিলেন, জনস্থানের প্রাচীন স্মৃতি, ঋষিগণের আশ্রম একে একে সব শ্রীরামচন্দ্র দেখাইতেছেন। ভবভূতির সহিত কালিদাসের কবিত্বের পার্থক্যই এইস্থানে; উত্তররামচরিতের ঐরূপ অনেক দৃশ্য ভবভূতি আলেখ্যে দেখাইয়াছেন। তিনি বাচ্যার্থের কবি কিন্তু কালিদাস ঐগুলি আলেখ্যে অঙ্কন করেন নাই। তিনি যাহা ব্যঞ্জনা করিয়াছেন তাহার গভীর ধ্বনি আমাদিগকে সেই দৃশ্যই মানসপটে অঙ্কন করিয়া দেখাইল। ভবভূতি শ্রীরামচন্দ্রের যে দুঃখের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়, কিন্তু কালিদাসের কাব্যে জড়প্রকৃতিও দুঃখে মৌনী হইয়া যায়।

"সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং ভ্রষ্টং ময়া নূপুরমেকমুর্ব্যাম্।
অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্॥

ত্রয়োদশের বহু শ্লোক সুধীসমাজ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। কালিদাস বিমান হইতে প্রয়াগের গঙ্গা যমুনা সঙ্গম দেখাইয়াছেন। "ক্বচিৎ প্রভালেপি" হইতে আরম্ভ করিয়া "ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ" শ্লোকগুলি অতুলনীয় চিত্র। যাঁহারা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম দেখিয়াছেন তাঁহারাই ইহার সার্থকতা অনুভব করিবেন। চতুর্দশসর্গে সীতার বনবাস। রামায়ণ করুণরসপ্রধান। আজন্ম-দুঃখিনী সীতার মহত্ত্ব সীতার বনবাসেই চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। সীতা মূর্তিময়ী ক্ষমা, কল্যাণময়ী লক্ষ্মী। লক্ষ্মণ সীতাকে রাজাজ্ঞা বলিলেন, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক আশঙ্কায় এই বনবাস, ইহা শুনিয়া সীতা "কিঞ্চিদ্‌বিলুপ্তধৈর্য" হইতেছিলেন :—

"বাচ্যস্ত্বয়া মদ্‌বচনাৎ স রাজা বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ শ্রুতস্য কিং তৎসদৃশং কুলস্য॥

কিন্তু সীতা কি রামের চরিত্রে কামাচার আশঙ্কা করিতে পারেন?— তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়া বলিলেন :—

"কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং বিপাকবিস্ফূর্জথুরপ্রসহ্যঃ॥"

কালিদাস এখানেই তূলিকা উত্তোলন করেন নাই ; সীতা ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া প্রসূতির পর তপশ্চর্যা করিয়া জীবন শেষ করিবেন, তবুও তপশ্চর্যার এই ফলই কামনা করিবেন :—

"ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।"

হিন্দুর এই আদর্শ কালিদাসের কাব্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। সীতার এই দুঃখভারে ভারতের বহু নরনারী অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে কিন্তু কালিদাস মানবহৃদয়ের দুঃখের সহিত সকল স্থাবরজঙ্গমের দুঃখও অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার নিকট সমস্ত প্রকৃতিই প্রাণময় ও অনুভবশীল ও "সমদুঃখস্বভাব।" এ দুঃখে বৃক্ষ, লতা, ময়ূর, হরিণী সকলই কাঁদিয়াছে :—

"নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবমত্যন্তমাসীদ্ রুদিতং বনেঽপি॥"

ভারবি।

পদ্যকাব্যসাহিত্যে কালিদাসের পরেই ভারবিকে স্থাপন করা যায়। কাশিকাবৃত্তিতে ভারবির শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারও পূর্বে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের আইহোল লিপিতে কালিদাস ও ভারবির যশোগাথা আছে। "স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্তিঃ॥" ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারবির কবিতাগৌরব প্রশস্তিতে লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহা অনুমিত হয় যে তাঁহার যশঃ সেই সময় দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল, এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের অন্ততঃপক্ষে ৫০।৬০ বর্ষের প্রাচীন ধরিলেও ভারবিকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। ইতিহাসে দৃষ্ট হয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাঞ্চীপুরে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু ও দুর্বিনীতের রাজসভায় ভারবি সভাকবি ছিলেন। কাঞ্চিপুর বর্তমান কাঞ্জিবরম্। ভারবির প্রপৌত্র দণ্ডাচার্য। ভারবি বাণভট্টের পূর্ববর্তী কারণ বাণভট্টের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারবির যশঃ দিগন্তবিশ্রুত হইয়াছিল।

ভারবির **কিরাতার্জ্জুনীয়** কাব্যের বিষয়টী মহাভারতের বনপর্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে। মহর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে দ্বৈতবন পরিত্যাগ করিতে

উপদেশ দিলে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে দিব্যাস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টা করিতে বলেন। অর্জুন হিমালয়প্রদেশে কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যায় ইন্দ্র প্রভৃতি উদ্বিগ্ন হইলেন। অপ্সরাগণ অর্জুনের তপস্যাভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল, অর্জুনের তপস্যা অক্ষুণ্ণ রহিল। ইন্দ্র স্বয়ং ছদ্মবেশে আসিলেন তথাপি অর্জুনের প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল। ইন্দ্র বর দিলেন এবং শিবের প্রসন্নতা লাভ করিতে উপদেশ দিলেন। শিব কিরাতের বেশে উপস্থিত হইলেন। একটী শূকরকে কে হনন করিয়াছে এই বিষয় লইয়া তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। কিরাতের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে শিব প্রসন্ন হইয়া অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিলেন। এই ঘটনা লইয়াই কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্য। কিরাতার্জুনীয় সম্বন্ধে দেশীয় মতে ঐ কাব্যে "অর্থগৌরব" আছে।

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।"

তাঁহার নিজ ভাষায় বলিতে গেলে "প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী"। প্রকৃত-প্রস্তাবে ভারবির কাব্যে অর্থগৌরব ও যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। মল্লিনাথ ঘণ্টাপথ ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলিয়াছেন :—

"নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ
সপদিতৎ বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং
সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্॥

কিরাতার্জুনীয় বীররসপ্রধান। চতুর্থসর্গে শরদ্বর্ণনে ও পঞ্চমসর্গে হিমালয় বর্ণনে ও নবমসর্গে সন্ধ্যা, চন্দ্রোদয়, প্রভাতবর্ণনে ভারবির কবিত্বশক্তি স্ফুরিত হইয়াছে। এইগুলি কালিদাসের সমকক্ষ না হইলেও কালিদাসের সহিত তুলনাসাপেক্ষ। কিন্তু কালিদাসের কাব্যাপেক্ষা ভারবির কাব্যে বর্ণচিত্র ও শব্দালঙ্কারের ছটার আধিক্য দৃষ্ট হয়। ভারবির সময় হইতে কাব্যাংশের ন্যূনতা ও বর্ণ ও শব্দবৈচিত্র্যের আধিক্য লক্ষিত হয়। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে যে সকল শব্দ ও বর্ণবৈচিত্র্যের উদাহরণ আছে তাহার অধিকাংশই ভারবির ১৫শ সর্গে দৃষ্ট হয়। ১৫শ সর্গে এরূপ শ্লোক আছে যাহা উভয়দিক হইতে পাঠ করিলে একই পাঠ দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও শ্লোকে বহুবিধ শ্লেষ আছে।

একই শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। ১৪শ শ্লোকে কেবল "ন" কারই আছে, কেবলমাত্র শ্লোকের শেষপাদান্তে একটী "ৎ" আছে।

"ন নোনয়ুন্নো য়ুন্নোনো ননা নানাননা নয়ু
য়ুন্নো য়ুন্নো নয়ুন্নেনো নানেনা য়ুন্নয়ুন্নয়ুৎ॥"

এই সকল বর্ণবৈচিত্র্য ও শব্দচিত্র প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত কাব্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু যে কাব্যশিল্পের বা কারিগরির যুগে এই কাব্য রচিত হইয়াছে তৎকালে উহা কাব্যের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। ঐ যুগের অলঙ্কার শাস্ত্র দণ্ডীর কাব্যাদর্শ। ঐ অলঙ্কার শাস্ত্রেও ঐ প্রকাব শব্দচিত্র ও বর্ণচিত্র উদাহৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন এই যুগ হইতেই সংস্কৃত কাব্যেব অবনতি সূচিত হইয়াছে। কাব্য-শিল্পেব প্রাচুর্যসত্ত্বেও ভারবির কাব্যগৌবব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তজ্জন্যই ভারবি একজন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ভারবির টীকাকারগণের মধ্যে মল্লিনাথ ছাড়া প্রকাশবর্ষ, জোনরাজ, একনাথ, ধর্মবিজয়, বিনয়সুন্দর ও নবহরিব নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভট্টিকাব্য।

এই শব্দ ও বর্ণবৈচিত্র্যের যুগেই সম্ভবতঃ ভট্টিকাব্য রচিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় আচার্যগণ ভট্টিকাব্যকে ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু কেহই এ পর্যন্ত স্থিরনিশ্চয় হইতে পারেন নাই। কিন্তু ভট্টিকাব্যকে ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্ত্যভাগের পুর্বেই স্থাপন করিবার বলবৎ প্রমাণ আছে। প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গল বা জটীশ্বর গ্রন্থকারের পরিচয় দিতে তাঁহাকে "বল্লভীপুরী-বাস্তব্য-গোবিন্দ-ভট্টসূনু মহাবৈয়াকরণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জয়মঙ্গলা টীকা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী, কারণ দুর্ঘটবৃত্তিতে উহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার কে তদ্বিষয়ে আধুনিক টীকাকার ভরতমল্লিক গুরুতর সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন এবং বহু দেশীয় বিদেশীয় আচার্যগণ উক্ত সন্দেহ যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। ভরতমল্লিক বলেন "ভর্তৃহরি"ই ভট্টিকাব্যের প্রণেতা। "ভর্তৃ" শব্দ প্রাকৃতভাষায় "ভট্টি" শব্দরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু "হরি" শব্দটি কোথায় গেল তাহার কোনও সদুত্তর নাই। সংস্কৃতব্যাকরণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃগণ ভর্তৃহরিকে "ভর্তৃহরি"

অথবা সংক্ষেপে "হরি" এবং ভট্টিকে "ভট্টি" চিরকালই অভিহিত করিয়াছেন। ন্যাসকার ৭ম শতাব্দীর লোক। তিনি পাণিনির বৃত্তিকারগণ মধ্যে ভট্টির উল্লেখ করিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীতে মহাভাষ্যপ্রদীপরচয়িতা কৈয়ট ভর্তৃহরিকে "হরিবদ্ধেন সেতুনা" বাক্য দ্বারা "হরি" বলিয়াছেন। ১৪শ শতাব্দীতে সায়ণাচার্য মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতেও ঐরূপ বলিয়াছেন।* বৈয়াকরণ-কেশরী ভট্টোজিদীক্ষিতও তাঁহার মনোরমা টীকায় "ভর্তৃহরি" ও "ভট্টি" পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল আনুমানিক প্রমাণ অপেক্ষা অতীব সন্তোষজনক মুখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভর্তৃহরি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে (৬২৫ খৃঃ) পাণিনীয় শাস্ত্রের "বাক্যপদীয়" নামক পাণিনীয় দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যু ৬৫১ খৃষ্টাব্দ। তিনি ভট্টির একটি প্রয়োগকে প্রামাদিক বলিয়াছেন।† উহা দ্বারা ইহাই অকাট্য-রূপে প্রমাণিত হয় যে ভর্তৃহরির সময়ে ভট্টির মত (সম্ভবত তাঁহার বৃত্তির মত) প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল এবং ভর্তৃহরি ঐ মতটিকে প্রামাদিক বলিয়াছেন। উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভট্টি ও ভর্তৃহরি পৃথক্ ব্যক্তি এবং ভট্টি ভর্তৃহরি অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থকার। ভট্টিতে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে এই কাব্য তিনি বল্লভীপুরীতে রাজা শ্রীধরের রাজত্বকালে রচনা করিয়াছেন—

কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাম্ শ্রীধর সেন-নরেন্দ্র পালিতায়াম্ ;
কীর্তিরতো ভবতাৎ নৃপস্য তস্য প্রেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥

যদিও বল্লভীরাজবংশে একাধিক শ্রীধর সেন ছিলেন তথাপি বল্লভীপুরী ধ্বংসের পূর্বেই যে উহা বল্লভীনগরীতে রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বল্লভীপুরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও ভাওনগরের অনতিদূরে ওয়ালা

* সপ্তম্যাঞ্চোপপীড়রুধকর্ষঃ ।৩।৪।৮৯ অত্র ণমুল্‌বিধৌ উপসর্গগ্রহণং পীডেরের বিশেষণমিতি ভাগবৃত্তৌ। ভট্টিকারস্তু অতন্ত্রং মন্যতে যদাহ ধনুররিভিরসহ্যং মুষ্টিপীড়ং দধান ইতি"—মাধবীয় ধাতুবৃত্তিঃ।

† আঙোযমহনঃ ১।৩।২৮ "কথং তর্হি আজয়ে বিষমবিলোচনস্য বক্ষঃ ইতি ভারবিঃ ; আহধ্বং মা রঘুত্তমম্ ইতি ভট্টিশ্চ। প্রমাদ এবায়ং ইতি ভাগবৃত্তিঃ।

নামক স্থানে বর্তমান আছে। এই সকল প্রমাণ ও অবস্থা বিবেচনা করিলে ভট্টিকাব্যকে ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে স্থাপন করা সম্ভবপর মনে হয় না। "সেন" পাঠ গ্রহণ করিয়াই এই বিচার হইয়াছে। এই শ্লোকে "শ্রীধরসেন" পাঠ গ্রহণ করায় ও বল্লভীরাজবংশে পরবর্তীকালে শ্রীধরসেন নামক একাধিক রাজা থাকায় ভট্টির কাল ঐ দৃষ্টিতেই নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। জয়মঙ্গলা টীকা ভট্টির সর্বপ্রাচীন টীকা। উহা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত। কারণ শরণ-দেবের দুর্ঘট বৃত্তিতে উহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। জয়মঙ্গলা টীকায় "শ্রীধরসেন" পাঠ উল্লিখিত না হইয়া "শ্রীধর সূনু" পাঠ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে ইহাই প্রতীতি হয় "শ্রীধর সূনু" পাঠই প্রকৃত পাঠ। "শ্রীধরসেন" পাঠ অপপাঠ।

গুপ্ত রাজগণের রাজত্ব কালে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে সেনাপতি ভটার্ক বা ভট্টারক বল্লভী শাসন আরম্ভ করেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র রাজা উপাধি গ্রহণ করেন নাই। ভটার্ক ও তাঁহার পুত্র সেনাপতি উপাধি ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের শাসনকাল ৫০ বৎসর ধরিলেও ভটার্কের পৌত্র মহারাজ শ্রীধর (ধরপট্ট) ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই বিদ্যমান ছিলেন। এই শ্রীধর সূনুর রাজত্বকালেই বল্লভীপুরে শ্রীস্বামিসূনু মহা বৈয়াকরণ ভট্টি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই "সূনু", "নরেন্দ্র", "নৃপস্য", "ক্ষিতিপ" কথার পূর্ণ সার্থকতা সুস্পষ্ট হয়। ভৌম কবির অনুকরণও তাহাই সমর্থন করে।

ভট্টিকাব্যে ২২টি সর্গ আছে। সূর্যবংশতিলক দশরথ হইতে রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত উহাতে বর্ণিত আছে। কাব্যের ছলে ব্যাকরণের উদাহরণগুলি প্রদর্শন করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নান্তে যখন ছাত্রেরা ভট্টিকাব্য পাঠ করে তখন তাহারা ভট্টির অসামান্য ব্যাকরণপ্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হয়। উহাতে ব্যাকরণ, ছন্দঃ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, রস, গুণ, শব্দচিত্র, বর্ণচিত্র প্রভৃতি সকল বিষয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে ভট্টি তাঁহার ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ অধ্যাপনাকালে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের ব্যবধানস্থান দিয়া হস্তী গমন করিয়া-ছিল। তাহার ফলে এক বৎসর কাল ব্যাকরণের অধ্যাপনা বন্ধ থাকায় ঐ

সকল ছাত্রগণকে গৌণভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার জন্য এই ভট্টিকাব্য প্রণীত হয়। ঐ জনশ্রুতি সত্য না হইলেও ভট্টিকাব্য যে মুখ্যতঃ ব্যাকরণ শিখাইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভট্টিকাব্য ব্যাকরণনাগপাশেই জড়িত কিন্তু তাহাতে যে আদৌ কবিত্ব নাই, তাহা নহে। যেখানেই গ্রন্থকার ব্যাকরণের বাগুরা ছাড়াইয়াছেন সেখানেই কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরদ্বর্ণনের অনেক শ্লোক প্রথম শ্রেণীর কবিগণের বর্ণনার তুলনাসাপেক্ষ। কবি ধূর্ত ব্রহ্মচারীবেশী রাবণের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ কবিনৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানের শ্লেষও প্রীতিপ্রদ। কেহ কেহ মনে করেন অলঙ্কার-শাস্ত্রবিদ্ ভামহ ভট্টিকাব্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াই তাঁহার অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ভট্টিকাব্যের অনুকরণে ৭ম শতাব্দীতে ভীম বা ভৌম কবি "রাবণার্জুনীয়" ও দশম শতাব্দীতে হলায়ুধ "কবিরহস্য" প্রণয়ন করেন। এই হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট নৃপতি কৃষ্ণের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন।

অগস্ত্যমুনিজ্যোৎস্নাপবিত্রে দক্ষিণাপথে।
কৃষ্ণরাজ ইতি খ্যাতো রাজা সাম্রাজ্যদীক্ষিতঃ॥
তোলয়ত্যতুলং শক্ত্যা যো ভাবং ভুবনেশ্বরঃ।
কস্তং তুলয়তি স্থাম্না রাষ্ট্রকুলোদ্ভবম্॥

রাষ্ট্রকূট নৃপতিগণ ৭৪৮ হইতে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। ওয় কৃষ্ণের সময়ে হইলেও হলায়ুধ ১০ম শতাব্দীর পরে নহে।

কিন্তু ঐ উভয় কাব্যই যশস্বী হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈন আচার্য হেমচন্দ্র ভট্টিকাব্যের অনুকরণে "দ্ব্যাশ্রয়মহাকাব্য" নামক একখানি কাব্য রচনা করেন। উহাও কোনও আদর লাভ করে নাই।

কুমারদাস।

ভারবি ও ভট্টির পরে কবি কুমারদাস জানকীহরণকাব্য রচনা করেন। জনশ্রুতি কুমারদাসকে সিংহলের রাজা ও কালিদাসের বন্ধু এবং সমসাময়িক

---

* ভাগবৃত্তিকার ভর্তৃহরির পরবর্তী। এরূপ অবস্থায় ভট্টিকে ২য় শ্রীধরের সময়ের (৫৭১—৫৮৯ খৃঃ) পূর্বে স্থাপন যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না।

বলিয়া উল্লেখ করে ; কিন্তু ঐ প্রবাদের কোনও সুদৃঢ় ভিত্তি নাই। কথিত আছে কুমারদাস ৫১৭—৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহলের রাজা ছিলেন। নবম শতাব্দীতে কবি রাজশেখর বলিয়াছেন কুমারদাস জন্মান্ধ ছিলেন। তিনি কুমারদাসের "জানকীহরণ"কে কালিদাসের রঘুবংশের সহিত একত্র উল্লেখ করিয়াছেন :—

"জানকীহরণং কর্তুং রঘুবংশে স্থিতে সতি।
কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমঃ॥"

কুমারদাস সম্ভবতঃ কাশিকাবৃত্তিগ্রন্থ জানিতেন, তাহা হইলে কুমারদাসকে সপ্তমশতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করা যায় কারণ কাশিকাবৃত্তি ৬৫০ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হওয়ার প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি কাশিকাবৃত্তিই জানিতেন ইহা নিঃসংশয়রূপে বলা দুরূহ, কাশিকাবৃত্তিকারদ্বয়ও তাঁহাদের পূর্ববর্তী আচার্যগণের মতই কাশিকাবৃত্তিতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

"জানকীহরণ"কাব্য রাবণকর্তৃক সীতাহরণ ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ২৫শ সর্গে এই কাব্য ছিল কিন্তু বর্তমানে মাত্র ১ম সর্গ—১৫শ সর্গের কতকভাগ সিংহলদেশীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। রাজশেখর কুমারদাসের কাব্যকে কালিদাসের রঘুবংশের সহিত তুলনা করিয়া বিশেষ অবিবেচনার কার্য করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কুমারদাসের ১ম সর্গে অযোধ্যাবর্ণন, ৩য়সর্গে রাজার জলকেলি, সন্ধ্যা, রজনী ও প্রভাত বর্ণন, ৮মসর্গে নবদম্পতীর রহস্যালাপ বর্ণিত আছে। এগুলিকে কালিদাসের সহিত স্বচ্ছন্দে তুলনা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ কুমারদাসের ললিত অনুপ্রাস ও শ্রুতিমধুর পদবিন্যাস তাঁহার শ্লোকগুলিকে অতি মধুর করিয়াছে। তাঁহার বর্ণনাগুলিও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

শিশুপালবধ বা মাঘকাব্য।

শিশুপালবধরচয়িতা মাঘের পিতামহ সুপ্রভদেব বর্মলাত রাজার মন্ত্রী ছিলেন। মাঘের পিতার নাম দত্তকসর্বাশ্রয়। মাঘ যে দশম শতাব্দীর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। ক্ষোদিত প্রস্তরলিপি যদি তাঁহার জ্ঞাতিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে তাহা হইলে মাঘকে ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থাপন করা যায়। গুজরাটের

প্রাচীন রাজধানী শ্রীমালে ৭ম শতাব্দীর মাঘকবি মাঘকাব্য রচনা করিয়াছিলেন এই প্রসিদ্ধি বিদ্যমান আছে। মাঘ ভট্টিকাব্য ও জানকীহরণকাব্য জানিতেন এরূপ বিশ্বাস হয় এবং তিনি কালিদাস ও ভারবির নিকট অশেষভাবে ঋণী। মাঘ কাব্যের ২০শ সর্গের ৪৪শ শ্লোকে নাগানন্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মাঘের কাব্যে কাশিকাবৃত্তিপঞ্জিকা বা ন্যাসবিবরণের উল্লেখ আছে।* ঐ ন্যাসগ্রন্থ সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ৮ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল। আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার ধ্বন্যালোকে এবং ধনঞ্জয় তাঁহার দশরূপকে মাঘের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। (আনন্দবর্দ্ধন কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মণের (৮৫৫-৮৮৩ খৃঃ) রাজত্ব কালে বিদ্যমান ছিলেন।) ধনঞ্জয় ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে দশরূপক রচনা করেন। এই সকল প্রমাণ বিবেচনা করিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে ৭ম-৮ম শতাব্দীতেই মাঘ কাব্য রচিত হইয়াছিল।

শিশুপালবধে ২০টি সর্গ আছে। মহাভারতের চেদিরাজ শিশুপালবধ ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এই কাব্য রচিত হইয়াছে। মগধরাজ জরাসন্ধ বিনাশের পর যুধিষ্ঠির একচ্ছত্র ভূপতি হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ করেন। ঐ যজ্ঞ সমাপনান্তে কে সর্বোচ্চ সম্মান পাইবেন ইহা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। ভীষ্ম কৃষ্ণকেই ঐ সম্মান দিলেন; তাহাতে চেদিরাজ শিশুপাল প্রতিবাদ করেন। ইহা লইয়া কলহ উপস্থিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করেন।

যে বিষয়টি লইয়া এই কাব্য তাহা অতি সংকীর্ণ কিন্তু মাঘের হস্তে ঐ সংকীর্ণ বিষয়টিই এরূপভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে যে তিনি ২০টি সর্গ প্রণয়ন করিয়াছেন। মাঘের বর্ণনাপ্রতিভা পূর্ববর্তী মহাকবিগণের বর্ণনা ও ভাবগুলিকে আরও উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট করিয়াছে। দেশীয়মতে মাঘের শিশুপালবধে, কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব এবং নৈষধের পদলালিত্য এই তিনটি গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে।

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥"

এই শ্লোকটিদ্বারা যদি কালিদাস ও ভারবি অপেক্ষা মাঘের উৎকৃষ্টতা

* অনুৎসূত্রপদন্যাসা সদ্বৃত্তিঃসন্নিবন্ধনা।
শব্দবিদ্যেব নো ভাতি রাজনীতিরপস্পশা॥

উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা অতি অনুপাদেয় সমালোচনা। কিন্তু কালিদাস ও ভারবি হইতে ভাবগুলি লইয়া মাঘ তাহা পরিস্ফুটতর করিয়াছেন এরূপ অর্থ হইলে তাহা সঙ্গত বোধ হয়। কিন্তু নৈষধ মাঘের পরবর্তী বিধায় ঐরূপ অর্থ সমীচীন নহে। কাব্যাংশে মাঘের অনেক মৌলিকতা আছে কিন্তু তিনি ভাবসম্পৎ অপেক্ষা ছন্দোনৈপুণ্য, শব্দবৈচিত্র্য ও বর্ণচ্ছটাকেই অধিকতর কবিত্বশক্তিব্যঞ্জক মনে করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের অবনতিকালে উহাই কবিত্বের মূলীভূত উপাদান বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এই সকল কাব্যকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা "কাব্যশিল্প" নামে অভিহিত করিয়াছেন। পরবর্তীকালের প্রতিভাশালী কবিগণও শব্দনৈপুণ্য ও বর্ণচিত্রে যে পরিমাণ শক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন তাহা দেখিলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখের উদয় হয়। মাঘ ১৯শ সর্গে শব্দচিত্র ও বর্ণচিত্র দেখাইয়াছেন। ঐ সর্গের ২৯শ শ্লোক ও ৩৪শ শ্লোক তাহার নিদর্শন। ৩৪শ শ্লোকটি বিপরীতভাবে পাঠ করিলে পূর্ববর্তী শ্লোক হয়। মাঘের যুগে এই সকলই আদরণীয় ছিল। তজ্জন্যই সম্ভবতঃ মাঘ পণ্ডিতসমাজে এত আদরণীয় হইয়াছিলেন। ছন্দোব্যবহারে মাঘের অসীম কুশলতা দৃষ্ট হয়। কালিদাস মাত্র ১৯টি ও ভারবি ২৪টি ছন্দঃ ব্যবহার করিয়াছেন; মাঘ ৪১টি ছন্দঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। শব্দসংখ্যা ও অলঙ্কারসংখ্যাও মাঘের অধিক। এই সকল দৃষ্টে ইহাই বোধ হয় মাঘ যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তৎকালে শব্দচ্ছটা বর্ণ ও বাক্য চিত্র এবং অলঙ্কারনিপুণতাই কাব্যের প্রধান উপাদান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই ভাব-সম্পদের ন্যূনতা ঘটিতেছিল।

কবিরাজ—এই কাব্যশিল্পযুগে কবিরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বক্রোক্তিমার্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিগণিত। কবিরাজ স্বয়ং গর্বোক্তি করিয়াছেন :—

　　সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
　　বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা॥"

　　　　রাঘবপাণ্ডবীয়। ১।৪১॥

কবিরাজ কোন্ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে।

অধ্যাপক ম্যাকডোনেল্ বলেন কবিরাজ সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্দীর কবি। ৯ম শতাব্দীর কবি রাজশেখর রাঘবপাণ্ডবীয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ "রাঘবপাণ্ডবীয়" ধনঞ্জয় কবির গ্রন্থও হইতে পারে। অধ্যাপক কীথ বলেন কবিরাজ সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে কাদম্ববংশীয় রাজা কামদেবের সময় বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন কবিরাজ ৯ম শতাব্দীর লোক। কবিরাজের প্রতিভার অভাব ছিল না। রাঘবপাণ্ডবীয় সংস্কৃত সাহিত্যে এক অদ্ভুত সৃষ্টি, বক্রোক্তিমার্গের শীর্ষস্থানীয় কাব্য। একই শ্লোকদ্বারা একপক্ষে পাণ্ডবগণের ইতিবৃত্ত অপরপক্ষে রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত যুগপৎ কথিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় একই শব্দের বহু অর্থ আছে। বিশেষতঃ সমাসযুক্তপদের বিভিন্নরূপ পদচ্ছেদদ্বারা এবং শ্লোকপাদের পদচ্ছেদ বিভিন্ন করিয়া দ্ব্যর্থসংগঠন সম্ভবপর। কবিরাজ এই সকল শক্তির সাহায্যে এই অশ্রুতপূর্ব কাব্যশিল্প সৃজন করিয়াছেন।

সুবন্ধু, ভারবি ও বাণভট্টের গ্রন্থে বহু শ্লেষ আছে কিন্তু ঐ শ্লেষদ্বারা কি অভূতপূর্ব কাব্য সৃষ্ট হইতে পারে রাঘবপাণ্ডবীয় তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

রাঘবপাণ্ডবীয়ে কবিরাজ যে শক্তি, শ্রম ও ধৈর্য প্রদর্শন করিয়াছেন সংস্কৃতসাহিত্যে তিনি তদনুরূপ যশোভাজন হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার শক্তির ও প্রতিভার অপব্যবহারই করিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থের নাগপাশে আবদ্ধ থাকিয়াও স্থানে স্থানে তাঁহার কবিপ্রতিভা বিকশিত হইয়াছে।

ধনঞ্জয় কবিও ঐ প্রকার আর একখানি **রাঘবপাণ্ডবীয়** (দ্বিসন্ধান) নামক কাব্যরচনা করিয়াছেন। ঐ কাব্যের উল্লেখ গণরত্নমহোদধিতে (১১৪০ খৃঃ) আছে। অধ্যাপক ম্যাকডোনেল মনে করেন যে কবিরাজের গ্রন্থের অনুকরণেই উহা রচিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ধনঞ্জয় কবিরাজের পরবর্তীকালের কবি।

হরবিজয়কাব্য। নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরদেশে **রাজানক রত্নাকর** বাগীশ্বর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীররাজ চিপ্পটজয়াপীড় ও অবন্তিবর্মণের রাজত্বকালে (৮৫০ খৃষ্টাব্দ) বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার হরবিজয়কাব্য ৫০ সর্গে সম্পূর্ণ। উহাতে প্রায় ৪০০০ শ্লোক আছে। শিবকর্তৃক অন্ধকবধই এই কাব্যের বিষয়। পার্বতী

লীলাচ্ছলে শঙ্করের চক্ষু হস্তদ্বারা আবরণ করিলে অন্ধক উদ্ভূত হয়। অন্ধক জন্মান্ধ ছিল। দিতির পুত্র তাহাকে লালন পালন করেন। পরে অন্ধক তপস্যাদ্বারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া দেবতাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া ত্রিভুবন-পতি হয়। পরিশেষে দেবগণের রক্ষাহেতু শিব অন্ধককে বিনাশ করেন। এই সামান্য ঘটনা অবলম্বনে ৫০টি সর্গ ও ৪০০০ চারি সহস্র শ্লোক রচিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ রচনায় প্রকৃত কাব্য দুর্লভ। কৈলাসবর্ণন, তাণ্ডবনৃত্য-বর্ণন, ঋতুবর্ণন, মন্দারবর্ণন প্রভৃতিতেই ৪টি সর্গ ব্যয়িত হইয়াছে। ১৬শ সর্গে কবির অর্থশাস্ত্রের বিদ্যা প্রকটিত হইয়াছে। ৩১ হইতে ৩৮ সর্গে স্বর্গ বর্ণিত হইয়াছে। পরে যুদ্ধাদিতে কাব্য শেষ হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কাব্যপথে কবি, বাণভট্ট ও মাঘের অনুপ্রাস, যমক শ্লেষাদি অনুকরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার শব্দচ্ছটা, অর্থ ও ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

শিবস্বামী। রাজা অবন্তিবর্মণের রাজত্বকালে রাজকবি শিবস্বামী **কপ্‌ফণাভ্যুদয়** নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি ২০টি সর্গে এই কাব্যখানি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। দক্ষিণা-পথের রাজা কপ্‌ফণ শ্রাবস্তীরাজকে আশঙ্কান্বিত করিয়াছিলেন কিন্তু অবশেষে কপ্‌ফণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাই এই কাব্যের বিষয়। ইনি অনেক স্থলে মাঘকবির পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন এবং মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের কোনটিই পরিত্যাগ করেন নাই।

ক্ষেমেন্দ্র। একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরদেশে ক্ষেমেন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি **ভারতমঞ্জরী** ও **রামায়ণমঞ্জরী** নামে মহাভারতের ও রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কাব্যের দিক্ হইতে উহা মূল্যবান নহে। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে মহাভারতের ও রামায়ণের মূল গ্রন্থে কিরূপ পাঠ ছিল তাহা ঐ সংক্ষিপ্তসার হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে **সন্ধ্যাকর** নন্দী **রামচরিত** রচনা করেন। তিনি গৌড়াধীপ রামপাল (১০৫৭-১০৮৭ খৃঃ) ও মদনপালের রাজত্বকালে (১১১২-১১৩২ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন। রামচরিত রাজা রাম-পালের চরিত্র অবলম্বনে প্রণীত হইয়াছে। এই কাব্যখানিতে প্রকৃত কাব্য শক্তির প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কবিত্বের জন্য তিনি "কলিকালের

বাল্মীকি" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ঐ কাব্যখানির ঐতিহাসিক মূল্যও খুব অধিক।

মংখদাস। দ্বাদশশতাব্দীর প্রথমার্ধে মংখদাস **শ্রীকণ্ঠচরিত** প্রণয়ন করেন (১১৩৫-৪৫ খৃঃ)। শ্রীকণ্ঠচরিতে ২৫টি সর্গ আছে। শিবকর্তৃক ত্রিপুর-বধই ঐ কাব্যের বিষয়। এই সংক্ষিপ্ত বিষয় লইয়াই কবি ২৫টি সর্গ রচনা করিয়াছেন। কৈলাস, কৈলাসপতি, বসন্ত, পুষ্পচয়ন, জলকেলি, সন্ধ্যা, চন্দ্রোদয় বর্ণনাতেই প্রথম দ্বাদশ সর্গ ব্যয়িত হইয়াছে। পরে যুদ্ধের উদ্যোগ ও শিবের সেনা ও যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। ২৫শ অধ্যায়ে কবির ভ্রাতা অলঙ্কারের সভা বর্ণিত হইয়াছে। অলঙ্কার রাজা জয়সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। তৎকালে মন্ত্রণাসভার কার্য কিরূপে অনুষ্ঠিত হইত তাহার উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

বিহ্লন, বিক্রমাঙ্কচরিত। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাশ্মীরদেশে বিহ্লন কবি উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বিক্রমাঙ্কচরিতের ১৮শ সর্গে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কাশ্মীরের প্রবরপুরের নিকটে জয়বন নামক স্থান ছিল। ঐ জয়বনের নিকট খোনমুখ গ্রামে কৌশিকগোত্রে মুক্তিকলশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র রাজকলশ মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। রাজকলশের ঔরসে ও নাগদেবীর গর্ভে বিহ্লনের জন্ম হয়। বিহ্লন নিজ পরিচয়ে বহু আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। বিহ্লন কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া মথুরা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি কর্ণরাজসভার সভাসদ্ গঙ্গাধরকে পরাজিত করিয়া সোমনাথ, সেতুবন্ধ প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করেন। পরে ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাঙ্ক বা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী কল্যাণনগরে অবস্থান করেন। ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাঙ্কদেবের রাজত্বকাল ১০৭৬—১১২৬ খৃঃ। এই স্থানেই তিনি "বিদ্যাপতি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আত্মগরিমা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন :—

"সহস্রশঃ সন্তু বিশারদানাং বৈদর্ভলীলানিধয়ঃ প্রবন্ধাঃ।
তথাপি বৈচিত্র্যরহস্যলুব্ধাঃ শ্রদ্ধাং বিধাস্যন্তি সচেতসোঽত্র॥"

এই বিহ্লন কবিই "চৌরপঞ্চাশিকা" নামক আদিরসাত্মক কাব্যের রচয়িতা। কিন্তু মতান্তরে উহা চৌরকবিপ্রণীত বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।

কথিত আছে গুজরাটাধিপতি বীরসিংহের তনয়া শশিলেখার শিক্ষকতাকার্যে বিহ্লন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিহ্লন শশিলেখাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। বীরসিংহ উহা জানিতে পারিয়া বিহ্লনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। বধ্য-ভূমিতে নীত হইলে বিহ্লন এক একটি করিয়া শ্লোক বলিতে আরম্ভ করেন। বীরসিংহ তাঁহার কবিত্বে প্রসন্ন হইয়া জীবন দান করেন এবং নিজ কন্যাকে অর্পণ করেন। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। বিহ্লন সম্বন্ধে ঐ গল্পটি চৌরপঞ্চাশিকার পরে রচিত হইয়াছে। চৌরপঞ্চাশিকা রচনার বহু পরে উহাতে একটি পূর্বপীঠিকা সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতেই ঐ প্রণয় কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ কিংবদন্তী ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। গুজরাটাধিপতি বীরসিংহ দশম শতাব্দীর প্রথম পাদে বিদ্যমান ছিলেন। বিক্রমাঙ্কচরিতে কল্যাণনগররাজ ত্রিভুবনমল্লবিক্রমের চরিত্রকাহিনী। উহা বৈদর্ভীরীতিতে রচিত এবং সুললিত কাব্য। চৌর-পঞ্চাশিকাতে আদিরসই প্রধান কিন্তু আদিরস প্রবাহ শিষ্টতা ও সুরুচি অতিক্রম করায় কামলিপ্সায় পরিণত হইয়াছে।

শ্রীহর্ষ।

দ্বাদশশতাব্দীর শেষভাগে নৈয়ায়িক ও কবি শ্রীহর্ষ আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীহরী ও জননীর নাম মামল্লদেবী। ইনি রাজা হর্ষদেব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। ইনি ভরদ্বাজগোত্রসম্ভূত ছিলেন। "নৈষধীয়কাব্য" ও "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" নামক বেদান্তদর্শন গ্রন্থ ইঁহার রচিত। কান্যকুব্জেশ্বর জয়চন্দ্র ইঁহাকে সমাদর করিয়া তাম্বুল ও আসন দিয়াছিলেন।

"তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ"

কবি রাজশেখর প্রবন্ধকোষে শ্রীহর্ষের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। হর্ষদেব বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। তথাকার নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের তনয় জয়চন্দ্রের আদেশে নৈষধীয়কাব্য রচনা করেন। উক্ত জয়চন্দ্র অনিহীলবাড়াপত্তনের অধীশ্বর কুমারপালের সমকালবর্ত্তী। জয়চন্দ্র ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত নলরাজার ইতিবৃত্ত লইয়াই এই কাব্য রচিত হইয়াছে। দেশীয় পণ্ডিতসমাজে নৈষধীয়কাব্য সম্বন্ধে

অতিবর্ণিত সমালোচনা আছে। ঐ মতে ইহা প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্য বলিয়া পরিচিত।

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যম্ মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥"

পুনশ্চ :—

"উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ"

নৈষধীয়কাব্য ২২সর্গে সম্পূর্ণ। যমক, অনুপ্রাস ও শ্লেষের অভাব নাই। কামশাস্ত্রের জ্ঞানগর্বে কাব্যটি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। অত্যুক্তিদোষ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। কথিত আছে শ্রীহর্ষের মাতুল মম্মটভট্ট প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার "কাব্যপ্রকাশ" প্রণয়ন করিবার পূর্বে নৈষধীয়কাব্য রচিত হইলে তাঁহাকে দোষপরিচ্ছেদের উদাহরণগুলি সংগ্রহ করিতে বহু কাব্য অনুসন্ধান করিতে হইত না। এক নৈষধীয় হইতে সকল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

পদলালিত্যগৌরব নৈষধীয়ে বস্তুতই আছে। কিন্তু কবি স্বাভাবিক কাব্যমার্গ অনুসরণ না করিয়া "কাব্যশিল্প" মার্গ অনুসরণ কবিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার কাব্য প্রকৃত কাব্যাংশে হীন হইয়াছে।

নলোদয়কাব্যেও মহাভারতের নলদময়ন্তীর ইতিবৃত্ত কথিত হইয়াছে। কিম্বদন্তী আছে যে উহা কালিদাস রচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী উহা রঘুবংশরচয়িতা কালিদাসের বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। সংস্কৃত সাহিত্যে একজনমাত্র কালিদাস ছিলেন না। অন্ততপক্ষে প্রাচীনকালেই আদিরসপ্রধান কালিদাস নামে তিনজন কবি ছিলেন, তাহা রাজশেখরের একটি শ্লোকে দৃষ্ট হয়। রাজশেখর নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

"একোঽপি জীয়তে হন্ত কালিদাসো ন কেনচিৎ।
শৃঙ্গারে ললিতোদ্গারে কালিদাসত্রয়ী কিমু॥"

গৌড়কবি চতুর্ভুজ। ইহার বাসস্থান গৌড়নগর রামকেলিতে। ইহার পিতার নাম শিবদাস ও পিতামহের নাম নিত্যানন্দ কবীন্দ্র। ১৪১৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে "হরচরিতকাব্য" প্রণয়ন করেন।

"শরবিধুমনুভিঃ শকস্য বর্ষে পরিগণিতে খনভস্য শুক্লপক্ষে।
প্রতিপদি শশিবাসরে সম্পূর্ণং হরচরিতাহ্বয়-নবকাব্যমেতৎ॥"

এই অধ্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকাব্যগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল মহাকাব্যের বর্ণিত বিষয় কি ও তাহাদের লক্ষণ কি তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক। এই সম্বন্ধে প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ড্যাচার্য যাহা কাব্যাদর্শের ১ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত হইল :—

"সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্।
আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দেশো বাপি তন্মুখম্॥ ১।১৪॥
ইতিহাসকথোদ্ভূতমিতরদ্বা সদাশ্রয়ম্।
চতুর্বর্গফলোপেতং চতুরোদাত্তনায়কম্॥ ১।১৫॥
নগরার্ণবশৈলর্ত্তুচন্দ্রার্কোদয়বর্ণনৈঃ।
উদ্যানসলিলক্রীড়ামধুপানরতোৎসবৈঃ॥ ১।১৬॥
বিপ্রলম্ভৈর্বিবাহৈশ্চ কুমারোদয়বর্ণনৈঃ।
মন্ত্রদূতপ্রয়াণাজিনায়কাভ্যুদয়ৈরপি॥ ১।১৭॥
অলঙ্কৃতমসংক্ষিপ্তং রসভাবনিরন্তরম্।
সর্গৈরনতিবিস্তীর্ণৈঃ শ্রব্যবৃত্তৈঃ সুসন্ধিভিঃ॥ ১।১৮॥
সর্বত্র ভিন্নবৃত্তান্তৈরুপেতম্ লোকরঞ্জনম্।
কাব্যং কল্পান্তরস্থায়ি জায়তে সদলঙ্কৃতি॥ ১।১৯॥"

রীতি সম্বন্ধে দণ্ড্যাচার্য বলিয়াছেন :—

"শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।
অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃকান্তিসমাধয়ঃ॥ ১।৪১॥
ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশগুণাঃ স্মৃতাঃ।
এষাং বিপর্যয়ঃ প্রায়ো দৃশ্যতে গৌড়বর্ত্মনি॥ ১।৪২॥

অলঙ্কারশাস্ত্রের এই নিয়ম কবিমাত্রেই প্রতিপালন করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি স্বাভাবিক কবিগণ "অলঙ্কৃতমসংক্ষিপ্তং রসভাবনিরন্তরম্" এই বিধির উপর গুরুত্ব স্থাপন করিয়া ও বৈদর্ভরীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা কাব্যের স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু অবনতিযুগে কাব্যশিল্পি কবিগণ কেবল বর্ণনাকুশলতা, অর্থশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য, শব্দবৈচিত্র্য ও বর্ণবৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করিয়াছেন এবং কেহ কেহ

গৌড়রীতি অবলম্বন করায় তাঁহাদের কাব্যশিল্প কেবলমাত্র বৃথা বাগাড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে।

কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, ভারবির কিরাতার্জুনীয়, মাঘের শিশুপাল বধ, ভট্টির ভট্টিকাব্য ও শ্রীহর্ষের নৈষধীয় এই ছয়খানি কাব্য মহাকাব্য নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় কোলাচল মল্লিনাথসূরি ঐ কয়েকখানি মহাকাব্যেরই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। **মল্লিনাথ** খৃঃ ১৪শ শতাব্দীতে কোলাচলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার টীকায় কাশিকাবৃত্তি, ন্যাস, পদমঞ্জরী, ভোজরাজের ও মুগ্ধবোধের ব্যাকরণমত ও গণরত্নমহোদধির (১১৪০ খৃঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। মুগ্ধবোধের উল্লেখ করায় তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্তী ও পঞ্চদশের পূর্ববর্তী। কোলাচলের অবস্থান স্থিরীকৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে উহা বর্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। মান্দ্রাজ প্রদেশের কোনও কোনও বংশ মল্লিনাথের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। তিনি রঘুবংশের, কুমারসম্ভবের ও মেঘদূতের সঞ্জীবনী টীকা, কিরাতের ঘণ্টাপথ, শিশুপালবধের সর্বংকষা ও নৈষধের জীবাতু এবং ভট্টিকাব্যের সর্বপথীনা, বিদ্যাধরকৃত একাবলীর "তরল" নামক টীকা, তন্ত্রবার্তিকের "সিদ্ধাঞ্জন" নামক টীকা, স্বরমঞ্জরীর "স্বরমঞ্জরী পরিমল" টীকা, তার্কিকরক্ষার "নিষ্কণ্টক" নামক টীকা ও প্রশস্তপাদভাষ্য টীকা রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "রঘুবীর চরিত" নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার টীকায় তাঁহার পূর্ববর্তী, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কোষ, কামশাস্ত্র, গজায়ুর্বেদ ও প্রাচীন টীকাকারগণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার টীকাগুলি প্রকৃতপক্ষে কবিদিগের কবিত্ব সঞ্জীবিত করিয়াছে।

মল্লিনাথের পাণ্ডিত্য ও গভীরত্ব সর্বজনবিদিত। তাঁহার পূর্ববর্তী বহু টীকাকার বিদ্যমান ছিলেন। কুমারসম্ভব ও রঘুবংশেরই ২০খানির অধিক টীকা আছে। মল্লিনাথ তাঁহার টীকায় বল্লভ, দক্ষিণাবর্ত ও নাথের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। দিনকরমিশ্রের সুবোধিনী টীকা (১৩৮৫ খৃঃ) উল্লেখযোগ্য। দিনকর তাঁহার টীকা জৈনটীকাকার চরিত্রবর্ধনকৃত টীকার উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছিলেন।

এইস্থলে ভরতমল্লিকের নাম উল্লেখ করা সঙ্গত। তিনি ভূরিশ্রেষ্ঠ

(ভুরস্থট) পরগণার অধীন পিণ্ডিবা গ্রামেব অধিবাসী ছিলেন। উহা বর্তমানে হুগলী জেলায় অবস্থিত। তিনি বিনায়কের ১১ একাদশ পুরুষ অধস্তন। তাঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ। ইঁহাব রচিত টীকা-টিপ্পনীগুলিতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐগুলির রচনাকাল ১৬৫০ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ। তাঁহাব রচিত টীকাগুলি বহুলভাবে মুগ্ধবোধসেবীগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ টীকাগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য (গদ্য, পদ্যগদ্যমিশ্র)

সংস্কৃত কাব্য (গদ্য)

ঋগ্বেদের কাল হইতেই সংস্কৃত ভাষায় পদ্যেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। পরবর্তী যুগে এমন কি যাহা আদৌ কাব্য নহে তাহাতেও ছন্দঃপ্রয়োগ হইয়াছে। দর্শন, বৈদ্যকশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, অভিধান প্রভৃতিও পদ্যে রচিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া গদ্য প্রাচীনকালে উপেক্ষিত হয় নাই। যজুর্বেদে আমরা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন দেখিতে পাই। যজুর্বেদের পরেই অথর্ববেদের গদ্যাংশ রচিত হওয়া সম্ভব। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে ব্রাহ্মণাংশ যজুঃগুলির সহিত মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান আছে কিন্তু শুক্লযজুর্বেদে ব্রাহ্মণাংশ যজুঃগুলি হইতে পৃথক্‌কৃত হইয়াছে। যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের গদ্যের পরেই ঋগ্বেদের, সামবেদের ও অথর্ববেদের ব্রাহ্মণগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণগুলিও অপৌরুষেয় শ্রুতি বলিয়া পরিগণিত। ঐ ব্রাহ্মণ-যুগেও বৈদিককালের ন্যায় শব্দগুলি উদাত্তাদি স্বরভেদে উচ্চারিত হইত। কোনও কোনও ব্রাহ্মণে স্বরগুলি চিহ্নিত আছে।

বৈদিকযুগের শেষভাগেই যাস্কাচার্যের নিরুক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তিনি পাণিনির পূর্ববর্তী। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব সপ্তমশতাব্দীর আচার্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যদি উহাই পাণিনির কাল বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে যাস্কাচার্যকে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে স্থাপন করিতে কোনও দ্বিধা বোধ হয় না। যাস্কাচার্য তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে অতি প্রসাদগুণবিশিষ্ট সরল গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন। সূত্রযুগের সূত্রগুলি যদিও গদ্যে রচিত তথাপি ঐগুলিকে গদ্যসাহিত্যমধ্যে পরিগণনা না করিলেও চলিতে পারে কিন্তু দর্শন-যুগের সূত্রগুলির প্রাচীনবৃত্তি ও ভাষ্যগুলি অতি সরল গদ্যে রচিত। পতঞ্জলি

পাণিনীয়মহাভাষ্য এই যুগে রচনা করিয়াছিলেন। তিনি রাজা পুষ্যমিত্র বা পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে ঐ মহাভাষ্য রচনা করেন। পুষ্পমিত্রের রাজত্বকাল ১৮৪—১৭২ পূর্ব খৃষ্টাব্দ। মহাভাষ্যের ভাষা অতি প্রাঞ্জল, তাহাতে সমাস-বাহুল্য নাই। অতি সরল ভাষায় পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ ও সিদ্ধান্তগুলি কথিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল গভীর ও জটিল বিষয় অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতেই তাহার দুরূহত্ব সংঘটিত হইয়াছে। মহাভাষ্যের গদ্যকে আদর্শ সংস্কৃত গদ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থের কোনও কোনও অংশ গদ্যে রচিত এবং কোনও কোনও পুরাণের কোনও কোনও অংশ গদ্যে রচিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে পুরাণগুলির গদ্যাংশ বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরাণের গদ্যাংশ অতি প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছে।

গদ্যকাব্যমধ্যে যে সকল কাব্য বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে দণ্ড্যাচার্যের **দশকুমারচরিতই** প্রাচীন বলিয়া খ্যাত। দণ্ড্যাচার্যের পূর্ববর্তীযুগের আখ্যান ও উপাখ্যানমূলক কোনও সংস্কৃত মূলগ্রন্থ বিদ্যমান নাই। সম্ভবতঃ পরবর্তী যুগেব কাব্য ও নাট্যগ্রন্থসকল পূর্ববর্তী যুগের গ্রন্থের যশঃ অপহরণ করায় কালক্রমে তাহারা বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভাসের নাম কেবল কালিদাস ও বাণভট্ট প্রভৃতির উল্লেখেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল! বিদ্বদ্বর গণপতি শাস্ত্রীর চেষ্টায় দক্ষিণ ভারতের প্রান্তদেশ হইতে ভাসের নাটকগুলির উদ্ধার সাধিত হইয়াছে।

দণ্ডী

দণ্ড্যাচার্যের কাল লইয়া বিষম মতভেদ আছে। কাব্যাদর্শরচয়িতা দণ্ড্যাচার্যই দশকুমারচরিতের গ্রন্থকার তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তিনি কাব্যাদর্শে যে আদর্শ স্থাপিত করিয়াছেন, দশকুমারচরিতে তাহা পালন করিতে পারেন নাই বলিয়া একটা সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু একথা আমাদিগের সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে নিয়ম প্রচার অপেক্ষা নিয়ম প্রতিপালন বহুতর কঠিন কার্য। অন্ধ্র, চোল ও কাবেরী নদীর উল্লেখ এবং কাঞ্চীর (কঞ্জিবেরম্) পল্লবগণের উল্লেখ ও বৈদর্ভীরীতির প্রশংসা দ্বারা অনুমিত হয় যে দণ্ডী দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। কাঞ্চিপুরে পল্লব

রাজসভায় রাজকবি ছিলেন কিন্তু উহা ব্যতীত আর কোনও অসন্দিগ্ধ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন দণ্ডী ভট্টিকাব্যের অলঙ্কারভাগ অনুসরণ করিয়াই কাব্যাদর্শ প্রণয়ন করিয়াছেন। উহা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে প্রবরসেনের উল্লেখ করিয়াছেন :—

"সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্।"

রাজতরঙ্গিণীর উক্তি অনুসারে প্রবরসেন ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে দণ্ডীকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে স্থাপন করা সঙ্গত বোধ হয় না। (অলঙ্কার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। দণ্ডী ও সুবন্ধুর ভাষা ও রীতির তুলনা করিলে দণ্ডীকে সুবন্ধুর পূর্বে স্থাপন করা সঙ্গত বোধ হয়। দণ্ডীর "অবন্তীসুন্দরী" নামক আর একখানি আখ্যায়িকা থাকা দৃষ্ট হয়। এই আত্মপরিচয় দিতে দণ্ডী বলিয়াছেন যে তিনি কবি ভারবির প্রপৌত্র।

দশকুমারচরিত আখ্যায়িকাশ্রেণীর কাব্য। এই কাব্যখানি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। যাহা বিদ্যমান আছে তাহাও সংগ্রহমাত্র এবং কিয়দংশ অন্যরচিত বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের নামানুসারে দশটি রাজকুমারের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে থাকা আবশ্যক। আটটি উচ্ছ্বাসে আটটি রাজকুমারের কাহিনী আছে। সম্ভবতঃ এই আটটি উচ্ছ্বাসই দণ্ডিবিরচিত। ইহার একটি পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা আছে। পূর্বপীঠিকার পাঁচটি উচ্ছ্বাসে দুইটি রাজকুমারের বৃত্তান্ত আছে এবং উত্তরপীঠিকায় বিশ্রুতের অসম্পূর্ণ কাহিনীটি পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই পূর্বপীঠিকায় ও উত্তরপীঠিকায় পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। বহু কারণে অনুমান হয় যে ঐ পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা দণ্ডীর রচিত নহে। সম্ভবতঃ বাণভট্টের ন্যায় দণ্ডীও গ্রন্থ সমাপ্ত করেন নাই। এইপ্রকার কাব্যগ্রন্থের সম্পূর্ণতা বিধানজন্য পরবর্তী কোনও কোনও কবি ঐ দুইটি পীঠিকা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।

মগধরাজ রাজহংস মালবরাজকর্তৃক পরাজিত হইয়া বিন্ধ্যগিরিতে আশ্রয় লইলেন। রাজ্ঞীও ঐ বিন্ধ্যগিরিতে আশ্রয় লইয়া এক পুত্র প্রসব করিলেন, তাহার নাম হইল রাজবাহন। ঐ অটবীমধ্যে মগধরাজের নিকট ৯টি মন্ত্রী-পুত্র ও ৯টি রাজপুত্র ক্রমে আনীত হইল। এই দশটি একত্রে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইল। তাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর

অন্বেষণে বিদেশ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণবেশী কিরাতের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

কিরাত বলিলেন যে তিনি দস্যু ছিলেন। তাঁহার দলভুক্ত দস্যুগণ একদিন এক ব্রাহ্মণকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে বধ করিতে নিষেধ করেন। তাহার ফলে দস্যুগণ তাহাকে বিষম প্রহার করে এবং তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি যমলোক দর্শন করিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করায় যমরাজ তাঁহাকে পুনরায় নরলোকে আসিতে দিলেন। তাঁহার তপস্যায় আশুতোষ সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন যে তিনি যদি গভীর-পর্বতকন্দরস্থিত তাম্রশাসনের নির্দেশ প্রতিপালন করেন তাহা হইলে নরলোক-পতি হইবেন। তিনি রাজকুমার রাজবাহনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাজবাহন তাঁহার সঙ্গে গেলেন ও তাম্রশাসন পাঠ করিলেন; ঐ যাদু-বিদ্যাবলে দৈত্যরাজকুমারীকে আনয়ন করিলেন। কিরাতের সহিত ঐ দৈত্যরাজকুমারীর পরিণয় হইল। কিরাত রাজবাহনকে একটি রত্ন দিলেন। ঐ রত্ন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্লেশ দমন করিতে পারে। রাজবাহন পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন অপর নয়জন সে স্থানে নাই। অবশেষে সকলে একত্রিত হইয়া প্রত্যেককেই নিজ নিজ কাহিনী বলিলেন। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা কাহিনীই অদ্ভুত।

এই কাব্য অদ্ভুতরসপ্রধান। কাহিনীগুলি আরব্যোপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত-রসমূলক। অদ্ভুত চৌর্যবিদ্যা, রমণীহরণ, গুপ্তপ্রণয়, দূতিকাপ্রেরণ প্রভৃতি বহু দুর্নীতিমূলক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল দৃষ্টে অনুমান হয় তৎকালের সামাজিক চিত্র অতি কদর্য ছিল।

দণ্ডীর কাব্যশক্তি উচ্চশ্রেণীর। তাঁহার বর্ণনাশক্তি চমৎকারিণী। তাঁহার বসন্তবর্ণন, সন্ধ্যাবর্ণন, যমলোকের বর্ণনা, রাজবাহনের সহিত অবন্তীসুন্দরীর সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে দণ্ডীর কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। যদিও দণ্ডীর দশকুমারচরিতে বৈদর্ভীরীতিই প্রধান কিন্তু গদ্যকাব্যের সাধারণ রীতি অনুসারে স্থানে স্থানে গৌড়ীরীতি অবলম্বিত হইয়াছে। দীর্ঘ সমাসাদি স্থানে স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। উপমা ও রূপকাদি অলঙ্কারগুলি সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক। দণ্ডীতে পদলালিত্য-গৌরব যথেষ্ট দৃষ্ট হয়।

সুবন্ধু, বাণভট্ট।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাণভট্ট হর্ষচরিত প্রণয়ন করেন। ঐ হর্ষচরিতের প্রারম্ভশ্লোকগুলিতে তাঁহার পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ আছে। তন্মধ্যে "ভট্টারহরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে" এই যশঃকীর্তন আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থ এপর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ভারতের অবসাদযুগে সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। ধর্মনাথনামক এক মহাত্মাকে অবলম্বন করিয়া "ধর্মশর্মাভ্যুদয়" নামক একখানি পদ্যকাব্য আছে। উহা হরিচন্দ্ররচিত। উহা মাঘকাব্যের আদর্শে রচিত হইয়াছে। ঐ হরিচন্দ্র যে বাণভট্টের কথিত ভট্টারহরিচন্দ্র নহেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাণভট্ট সুবন্ধুর বাসবদত্তারও যশঃকীর্তন করিয়াছেন :—

"কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া"।*

বাসবদত্তা শ্লেষ-প্রধান-কাব্য। উহাতে বহু রাজা, রাজমহিষী, ভিক্ষু গ্রন্থকার ও গ্রন্থ, দেশ, গিরি ও অরণ্যের নাম দৃষ্ট হয়। গুণাঢ্যের ও কালিদাসের শকুন্তলার উল্লেখ আছে। ঐ কাব্যের এক স্থানে "ন্যায়স্থিতি-মিবোদ্দ্যোতকরস্বরূপম্" এই বাক্যটি আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকরকে লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। পুনশ্চ "বৌদ্ধসঙ্গতিমিবালঙ্কারভূষিতাম্" এই কথা দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ ধর্মকীর্তি-রচিত "বৌদ্ধসঙ্গত্যলঙ্কার" গ্রন্থকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরকে ও ধর্মকীর্তিকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপন করা যাইতে পারে। সুবন্ধু দণ্ড্যাচার্যের "ছন্দোবীচিতি"র উল্লেখ করিয়াছেন এবং দণ্ডী তাঁহার অবন্তীসুন্দরীতে সুবন্ধুর উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়েই সমসাময়িক ছিলেন এরূপ অনুমিত হয়। এরূপ অবস্থায় সুবন্ধুকে ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তভাগে অথবা সপ্তমশতাব্দীর প্রারম্ভে স্থাপন করিলে কোন অসঙ্গতি উপস্থিতি হয় না। বাসবদত্তা আখ্যায়িকা বা কথাশ্রেণীর গ্রন্থ। উহা "বিক্রমাদিত্য" নরপতিযুগ বিগত হইলে রচিত হইয়াছে ও উহার মল্লনাগ ঘটিত কামশাস্ত্র রচনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজপুত্র কন্দর্পকেতু স্বপ্নে এক লাবণ্যময়ী রাজকুমারীকে দর্শন

* সরস্বতীদত্তবরপ্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ।
প্রত্যক্ষরশ্লেষময়প্রবন্ধবিন্যাস বৈদগ্ধ্যনিধির্নিবন্ধম্॥

করেন। তিনি এই স্বপ্নদৃষ্ট রাজকন্যার অনুসন্ধানে মকরন্দের সহিত বহির্গত হইলেন। পাটলীপুত্রের রাজদুহিতা বাসবদত্তাও স্বপ্নে এক রাজকুমারকে দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানে দূতী প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদ, কন্দর্পকেতু বিন্ধ্যগিরির অরণ্যে এক পক্ষিদম্পতির আলাপে শুনিতে পাইলেন। কন্দর্প-কেতু বাসবদত্তার সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু পাটলীপুত্ররাজ বাসবদত্তার বিবাহ অনতিবিলম্বে অন্যত্র দিতে স্থির করায় কন্দর্পকেতু ও বাসবদত্তা এক বিমানবিহারী অশ্বারোহণ করিয়া বিন্ধ্যগিরিতে পলায়ন করিলেন। ঊষা-কালে রাজপুত্র দেখিলেন রাজকন্যা নাই, বহুস্থানে অনুসন্ধানে অবশেষে রাজপুত্র বাসবদত্তাকে পাইলেন, কিন্তু তিনি পাষাণ হইয়া রহিয়াছেন। রাজপুত্রের স্পর্শে তিনি জীবিত হইলেন। রাজকন্যা তাঁহার পাষাণ হইবার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। এই সামান্য কথা আশ্রয় করিয়াই এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের কবির নিকট বিষয়টি কাব্যের কেবল-মাত্র আশ্রয়স্থান। কাব্যনৈপুণ্যই উহার দেহ বলা যাইতে পারে। সুবন্ধু অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধানানুসারে বর্ণনাতেই তাঁহার সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন :—

"নগরার্ণবশৈলর্তুচন্দ্রার্কোদয়বর্ণনৈঃ।
উদ্যানসলিলক্রীড়ামধুপানরতোৎসবৈঃ ॥
বিপ্রলম্ভবিবাহৈশ্চ কুমারোদয়বর্ণনৈঃ।
মন্ত্রদূতপ্রয়াণাদিনায়কাভ্যুদয়ৈরপি ॥"

তাঁহার বাসবদত্তা অতি শ্লেষপ্রধান গ্রন্থ। ইহা বক্রোক্তিমার্গের একখানি প্রাচীন কাব্য। কবিরাজ তাঁহার রাঘবপাণ্ডবীয়কাব্যে এই কাব্যের যশঃকীর্তন করিয়াছেন :—

"সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা ॥

রাঘবপাণ্ডবীয় ১।৪১

সুবন্ধু স্বয়ং তাঁহার শ্লেষপ্রাধান্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"প্রত্যক্ষরশ্লেষময়প্রবন্ধবিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধিনিবন্ধম"

প্রকৃত প্রস্তাবে এই বাসবদত্তায় সর্বত্রই শ্লেষ বিদ্যমান। অতি সরলশ্লেষ হইতে অতি দুরূহশ্লেষ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। উপাখ্যান, ঐতিহ্য, গ্রন্থ,

গ্রন্থকার, নাটক, অলংকার, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি সর্বত্র হইতেই এই সকল শ্লেষের উপাদানগুলি গৃহীত হইয়াছে। তাহার ফলে অতি বিচক্ষণ টীকাকারেরাও সময় সময় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। অনুপ্রাস, শব্দপ্রাচুর্য, দ্ব্যর্থসম্বলিত দীর্ঘসমাস সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। সুবন্ধু গৌড়ী-রীতির সকল শক্তিরই ব্যবহার করিয়াছেন। দণ্ড্যাচার্যও দশকুমারচরিতে প্রাঞ্জল রীতি অবলম্বন করেন নাই। তাহাতেও বহু কাঠিন্য আছে কিন্তু দণ্ডীর দশকুমারচরিতের তুলনায় সুবন্ধুর বাসবদত্তা অতি দুরূহ কাব্য। ইহার প্রত্যেক "ইব" এর অন্তরালে কি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ লুক্কায়িত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাসবদত্তার শ্লেষ বিশ্লেষণ করিতে পণ্ডিতগণের দর্পও চূর্ণীকৃত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় বাণভট্টের শ্লোকেও এই শ্লেষই রহিয়াছে :

"কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া"।

ডাক্তার হল্ সুবন্ধুর রীতিসম্বন্ধে বলিয়াছেন, "প্রাচীন কাব্যবস্তুগুলি তাঁহার সুপরিচিত, সংস্কৃতশব্দশাস্ত্রে, অলংকার শাস্ত্রে, ছন্দঃশাস্ত্রে ও ব্যাকরণে তাঁহার অগাধজ্ঞান—তাঁহার টীকাকারগণ স্থানে স্থানে বিষম ধাঁধায় পড়িয়াছেন।" জগদ্ধরকৃত তত্ত্বদীপিনী (দক্ষিণ ভারতীয়), মহারাষ্ট্রী শিবরাম ত্রিপাঠিকৃত কাঞ্চনদর্পণ, বঙ্গদেশীয় কবিরাজ নরসিংহ ও কাশিবাসী কৃষ্ণভট্ট কৃত টীকাই প্রধান।

বাণভট্ট

সুবন্ধুর পরেই বাণভট্টকে স্থাপন করা যায়। হর্ষচরিতে তাঁহার জীবন-চরিত কতক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু হর্ষচরিতের প্রারম্ভে প্রাচীন যশস্বী কবি ও গ্রন্থের নাম উল্লেখ আছে, উহাই প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রের দিগ্দর্শনযন্ত্র স্বরূপ। ঐ প্রারম্ভ শ্লোকগুলি হইতে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল :—

"কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।

* * *

ভট্টারহরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে।

* * *

কীর্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥

সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥
নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষিব জায়তে॥

এই শ্লোকগুলি হইতে দৃষ্ট হয় ভাস. কালিদাস, প্রবরসেনের সেতুকাব্য, সাতবাহন, ভট্টার হরিচন্দ্র ও বাসবদত্তা তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও যশঃ লাভ করিয়াছিল। বাণভট্ট কান্যকুব্জাধিপতি শিলাদিত্য হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৭ খৃঃ) বাল্যবন্ধু ও সভাসদ্ ছিলেন। হর্ষবর্ধনও স্বয়ং পণ্ডিত ও কবি ছিলেন এবং তিনি কবিবন্ধু ছিলেন। তিনি নাগানন্দ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধনের রাজ্যকালের কিয়দংশ বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে বাণভট্টের জীবনচরিতও আছে। কাদম্বরীর প্রারম্ভে তিনি স্বীয় বংশের পরিচয় দিয়াছেন। বাণভট্ট বাৎসায়নগোত্রসম্ভূত কুবেরের প্রপৌত্র। এই কুবের গুপ্তরাজগণকর্তৃক অর্চিত হইতেন।* অর্থপতির পৌত্র ও চিত্রভানুর পুত্র। তাঁহার মাতার নাম মধ্যরাজদেবী ও পুত্রের নাম ভূষণবাণভট্ট। তাঁহার জন্মস্থান শোণনদতটে পৃথুকূটে (প্রীতিকূটে)। অতি শৈশবকালে বাণভট্টের মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতাই তাঁহাকে লালন পালন করেন। বাণভট্টের চতুর্দশ বৎসরে পিতারও মৃত্যু হয়। পরে বাণভট্ট দেশান্তরে গিয়া বিদ্যালাভ করেন। তাঁহার গুরুর নাম ভৎ্সু। তিনি মৌখরীরাজগণ† কর্তৃক সম্মানিত। প্রবাদ আছে তাঁহার শ্বশুর ময়ূরভট্ট ছিলেন। ময়ূরভট্ট ও বাণভট্টের কবিমর্যাদা লইয়া ঈর্ষা ছিল। কিম্বদন্তী আছে উভয়ে কাশ্মীরগমনকালে সরস্বতীদেবী এক সমস্যা পূরণ করিতে দেন। তদ্দ্বারা ময়ূরভট্টের গর্ব ক্ষুণ্ণ হয়। কথিত আছে বাণভট্ট অতি স্ত্রৈণ ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী অতি কোপনস্বভাবা ছিলেন। বাণভট্টের স্ত্রী অভিমানমগ্না হইলে বাণভট্ট বহু প্রকারে তাঁহার মানভঞ্জন করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কিছুতেই তাহার কোপ অপনোদন না হওয়ায় ময়ূরভট্ট কন্যাকে তিরস্কার করেন। কন্যা রোষান্বিতা হইয়া ময়ূরভট্টের গাত্রে চর্বিত তাম্বুল ফুৎকার করিয়া

* "অনেকগুপ্তার্চিতপাদপঙ্কজঃ কুবেরনামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ"
† হর্ষবর্ধনের ভগিনীপতি গ্রহবর্মা মৌখরীবংশীয় রাজা ছিলেন।

ফেলেন ও অভিশাপ প্রদান করেন। ঐ অভিশাপে ময়ূরভট্টের অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি হয়। ময়ূরভট্ট সূর্যশতক প্রণয়ন করিয়া তাহা সূর্যমন্দিরে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। বাণভট্ট ও ময়ূরভট্ট উভয়েই অবন্তীবাসী ছিলেন। বাণভট্টের যশঃ বিস্তারিত হইলে হর্ষবর্ধন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ রাজধানী কান্যকুব্জে লইয়া যান।

বাণভট্টের **হর্ষচরিতই** প্রথম গ্রন্থ। ইহাতে বাণভট্টের বাল্যজীবনের ইতিহাস, হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের হত্যাকাণ্ড, তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মণের হন্তা মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজের শশাঙ্কদেবের বিরুদ্ধে অভিযান, রাজ্যশ্রীর উদ্ধার প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

বাণভট্ট কাদম্বরীর ন্যায় এ গ্রন্থখানিও সমাপ্ত করিয়া যান নাই; বিশেষতঃ শেষ করা সম্ভবপরও ছিল না। হর্ষচরিত হর্ষবর্ধনের রাজত্বের ইতিহাস নহে। ইতিহাসের অভিপ্রায়েও উহা লিখিত হয় নাই। হর্ষের জীবনের কয়েকটী ঘটনা অবলম্বনে রচিত একখানি গদ্যকাব্য। অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কাদম্বরীর ন্যায় সুদীর্ঘ বর্ণনা ও মধুর বিচিত্রতাতেই তাঁহার অসীম শক্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীরীতির সমাসবহুলতা ও কুটিলশ্লেষ প্রভৃতি ক্লান্তিজনক দোষগুলি সর্বত্রই বিদ্যমান আছে। বাণভট্টের যুগে এই কাব্যশিল্পেরই সমধিক আদর ও যত্ন হইয়াছিল এবং গদ্যকাব্যশিল্পের চরমোৎকর্ষ আমরা বাণভট্টের কাদম্বরীতে দেখিতে পাই।

বাণভট্টের শেষকাব্য কাদম্বরী। ইহাও বাণভট্ট সম্পূর্ণ করিয়া যান নাই। তাঁহার পুত্র ভূষণবাণভট্ট উহার উত্তরভাগে শেষ কয়েকটি অধ্যায় লিখিয়া গ্রন্থসমাপ্তি করিয়াছেন।

"যাতে দিবং পিতরি তদ্‌বচসৈব সার্ধম্‌
বিচ্ছেদমাপ ভুবি যস্ত কথা-প্রবন্ধঃ।
দুঃখং সতাং তদসমাপ্তিকৃতং বিলোক্য
প্রারব্ধ এষ সময়ো ন কবিত্বদর্পাৎ॥"

কাদম্বরী কথাশ্রেণীর কাব্য। উপাখ্যানটি বাণভট্টের কল্পনা নহে। তিনি গুণাঢ্যের বৃহৎকথা হইতে উহা গ্রহণ করিয়া কবিত্বচ্ছটায় মণ্ডিত

করিয়াছেন। শূদ্রক রাজার সভায় এক চণ্ডালকন্যা একটি শুকপক্ষী আনয়ন করিল। ঐ শুকপক্ষী এক করুণ কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। শুকপক্ষীর কাহিনীতে সম্ভবতঃ বাণের বাল্যজীবনের ছায়াই আছে। ঐ শুকপক্ষীকেও তাঁহার পিতা লালনপালন করিয়াছিল ও পিতার মৃত্যুর পর জাবালি মুনি তাহাকে রক্ষা করেন। শুক ঐ জাবালির উপাখ্যান বর্ণনা করিল।

উজ্জয়িনীরাজ তারাপীড়ের শুকনাস নামে মন্ত্রী ছিল। তাঁহার রাজ্ঞীর নাম ছিল বিলাসবতী। মহাকালের অনুগ্রহে রাজদম্পতী চন্দ্রাপীড় নামে এক পুত্র লাভ করেন। শুকনাসেরও বৈশম্পায়ন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন উভয়ে একত্রে নগরের বহির্ভাগে এক প্রাসাদে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইলেন। উভয়ে বয়স্থ হইলে নগরে আনীত হইলেন। চন্দ্রাপীড় ইন্দ্রাযুধ নামে একটি অশ্ব পাইলেন। তারাপীড় যুদ্ধে একটি রাজকুমারীকে বন্দিনী করিয়াছিলেন, তাহার নাম পত্রলেখা। ঐ পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী সখী হইলেন। শুকনাস চন্দ্রা-পীড়কে নীতিশাস্ত্র শিক্ষাদান করিলে তাঁহার বিদ্যা শেষ হইল। তিনি যুবরাজ হইয়া দেশ বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি কিরাতদিগের হেমকূটস্থ দুর্গ অধিকার করিলেন।

চন্দ্রাপীড় একদিন দুইটি কিন্নরের অনুসরণে দলচ্যুত ও পথশ্রান্ত হইয়া এক সরোবরতীরে এক কিশোরীকে তপোনিমগ্না অবস্থায় দেখিতে পাইলেন ও ঐ তপস্বিনী মহাশ্বেতার নিকট তাঁহার করুণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন। তিনি পুণ্ডরীককে ভালবাসিয়াছিলেন। পুণ্ডরীক দেহত্যাগ করিলেন। তিনি পুণ্ডরীকের সহিত সহমরণে যাইতে উদ্যত হইলেন। এক দেবতা পুণ্ডরীকের দেহ লইয়া অন্তর্ধান করিলেন এবং দৈববাণী হইল, উভয়ের মিলন হইবে। এই মহাশ্বেতার সখীর নাম কাদম্বরী। চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীকে দেখিয়া আসক্ত হইলেন, কাদম্বরীও মুগ্ধা হইলেন। চন্দ্রাপীড় রাজাদেশে উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া গেলেন কিন্তু যাইবার কালে কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের নিকট মিলনের কোনও আশা ভরসা পাইলেন না। এই পর্যন্তই বাণভট্টের রচনা। ভূষণবাণভট্ট পরিশিষ্ট রচনা করিয়া উপাখ্যান শেষ করিয়াছেন। কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের এবং মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের মিলনে ভূষণবাণভট্ট কাব্য সমাপ্তি করিয়াছেন।

কাদম্বরী গৌড়ীরীতির চরম নিদর্শন। বাঙ্‌নৈপুণ্য ও বর্ণচিত্র ও শ্লেষ

সর্বত্রই বিদ্যমান। সমাসবহুলতায় বহু অংশ বাগাড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে এক একটি সমাসবদ্ধ পদ বহু পংক্তি জুড়িয়া বসিয়াছে। বাণভট্টের ন্যায় ধুরন্ধর কবিই কেবল ঐ বিপুল রীতির সমতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। পরবর্তী যে সকল কবি বাণভট্টকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা বাণভট্টের দোষগুলির অধিকারী হইয়াছেন কিন্তু কোনও গুণসম্পদই প্রাপ্ত হন নাই। হরধনুতে জ্যারোপণ করিতে বহু ধনুর্ধরই বিতথপ্রযত্ন হইয়াছেন।

কাদম্বরীতে ভাষায় জটিলতা, সমাসবহুলতা ও প্রচ্ছন্ন শ্লেষ প্রভৃতি বহু দোষ আছে। দীর্ঘসূত্রিতার জন্য পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কথাই যাহার মূল উদ্দেশ্য তাহার এরূপ মন্থর ও জটিল গতি হইলে কাহার ধৈর্যচ্যুতি হয় না? বর্তমান ত্বরিতগতির যুগে ঐ প্রকার গ্রন্থ আদরণীয় হইতে পারে না। কবি রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীর সমালোচনায় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত কাব্যগুলি রাজসভার জন্যই রচিত হইত। অধ্যাপক কীথও সেই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত কবিগণ সাধারণতঃ রাজসভায় থাকিতেন এবং রাজা ও সুপণ্ডিত সভাসদ্‌গণের রুচি অনুসারে তাঁহাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তই কাব্য রচিত হইত। তাঁহারাই উহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেন। জনসাধারণের তৃপ্তির জন্য কাব্য রচিত হইত না। ঐ সভাসদ্‌পরিবেষ্টিত রাজা ত্বরিতজীবন অতিবাহন করিতেন না। তাঁহারা বিশ্রামসময়ে সুখাসনে কাব্যরস আস্বাদ করিতেন—কবির সৃষ্টিকুশলতা, ভাষার লালিত্য, শব্দচিত্র ও বাঙ্‌নৈপুণ্য প্রভৃতি অবসরকালে ধীরে ধীরে চিবাইয়া রসগ্রহণ করিয়া আস্বাদ করিতেন। এই চিত্তবিনোদন বর্তমান জীবনের উপযোগী নহে। বাস্তবজীবনের সহিত ঐরূপ কাব্যের যে বিশেষ সংশ্রব ছিল তাহা নহে। গজদন্ত অথবা চন্দনকাষ্ঠ নির্মিত ব্যজন, তালবৃন্ত অপেক্ষা অধিক সুশীতল বায়ু সঞ্চালন করে না কিন্তু তথাপি গজদন্ত-নির্মিত বা চন্দনকাষ্ঠনির্মিত ব্যজন যে এক অপূর্ব উপভোগের অবতারণা করে তাহা কেবল উপভোগীমাত্রেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। সংস্কৃতকাব্যে কাদম্বরী প্রভৃতি বক্রোক্তিখচিত কাব্য সুপণ্ডিত কাব্যরসামোদী রাজা ও সভাসদ্‌গণের মনোরঞ্জনের জন্য ঐ প্রকার গজদন্ত বা চন্দনকাষ্ঠনির্মিত ব্যজন। উহার উপভোগ আমাদিগের ন্যায় ত্বরিতজীবনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। উহা

আমাদিগের তোষাখানায় থাকিতে পারে কিন্তু আমরা উপভোগ করিতে পারি না। তজ্জন্যই কাদম্বরী আমাদিগের নিকট ক্লান্তিজনক বাগ্‌বিন্যাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

খৃঃ নবম শতাব্দীতে কাশ্মীরবাস্তব্য জয়ন্তভট্টের পুত্র **অভিনন্দ** কাদম্বরীর **কাদম্বরীকথাসার** নামক এক সারসংগ্রহ মনোরম পদ্যে রচনা করিয়াছেন। ললিতাদিত্যের মন্ত্রী শক্তিস্বামিন্‌ বা মুক্তাপীড়। তাহার পুত্র কল্যাণস্বামী। কল্যাণস্বামীর পুত্র জয়ন্তভট্ট ন্যায়মঞ্জরীকার। তাঁহার পুত্র অভিনন্দ। ইনি গৌড় অভিনন্দ হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি। গৌড় অভিনন্দ "রামচরিত" কাব্যের রচয়িতা। তাঁহার পিতার নাম শতানন্দ। কোঙ্কন রাজসভার সোঢ্‌ঢল কবি (১১ শতাব্দী) "উদয়সুন্দরী" চম্পূকাব্যে এই গৌড় অভিনন্দের প্রশংসা করিয়াছেন। আলঙ্কারিকেরাও অনেক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ধনপালের তিলকমঞ্জরী ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুঞ্জের রাজত্বকালে রচিত হয়। ঐ কাব্যের নায়িকা তিলকমঞ্জরী। ধনপাল প্রতিস্তরে বাণভট্টের কাদম্বরীর আখ্যান অনুসরণ করিয়াছেন ও বাণভট্টের ভাষা অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু উহাতে বাণভট্টের সকল দোষই বিদ্যমান কিন্তু কোনও গুণই দৃষ্ট হয় না।

চম্পূকাব্য

পদ্যগদ্যমিশ্রিত কাব্য সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে চম্পূকাব্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে*। প্রাচীন কোনও চম্পূকাব্য বিদ্যমান নাই। ১০ম শতাব্দীর প্রথমভাগে ত্রিবিক্রমভট্ট "নলচম্পূ" বা "দময়ন্তীকথা" ও "মদালসাচম্পূ" প্রণয়ন করিয়াছেন। ত্রিবিক্রমভট্ট রাষ্ট্রকূটনৃপতি ইন্দ্রের রাজত্বকালে (৯২৫ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন। হরিচন্দ্রকৃত "জীবন্ধর চম্পূ" নামক একখানি কাব্য আছে। উহাও সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর গ্রন্থ। এই হরিচন্দ্র, বাণভট্টের উল্লিখিত হরিচন্দ্র নহেন। এই হরিচন্দ্র ৯ম শতাব্দীর পরে বিদ্যমান ছিলেন। সোমদেব রচিত (৯৫৯ খৃঃ) "যশস্তিলক" রাষ্ট্রকূটনৃপতি

* "গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে"।

কৃষ্ণের সময়ে রচিত হয়। ১১শ শতাব্দীতে ভোজরাজ "রামায়ণচম্পূ" প্রণয়ন করিয়াছেন। অধ্যাপক কীথ বলেন ঐ রামায়ণচম্পূ ভোজরাজের রাজত্বকালের পরে রচিত হইয়াছে। চিত্তরাজ কোঙ্কণ রাজকবি সোঢ্ঢল ১১শ শতাব্দীতে "উদয়সুন্দরী" নামক চম্পূকাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে পূর্বকবিগণের ধারাবাহিক নাম ও যশোগাথা আছে। জীবগোস্বামিরচিত "গোপালচম্পূ" উল্লেখযোগ্য। উহা ১৬শ শতাব্দীতে রচিত। নীলকণ্ঠ-বিরচিত (১৬৩৭ খৃঃ) "নীলকণ্ঠবিজয়" নামক চম্পূকাব্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৪শ শতাব্দীর পরে অভিনব-কালিদাস রচিত "চম্পূভাগবত" এবং ১৭শ শতাব্দীতে বেঙ্কটধ্বরিরচিত "বিশ্বগুণাদর্শ" ও "হস্তিগিরিচম্পূ" ও ১৮শ শতাব্দীতে নবদ্বীপনিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকৃত "চিত্রচম্পূ" প্রভৃতি আরও কতকগুলি অপ্রসিদ্ধ চম্পূকাব্য আছে।

কথা, আখ্যায়িকা বা রূপকথা।

চিত্তবিনোদনের জন্য কথা, উপকথা প্রভৃতি সকল দেশের সাহিত্যেই বিদ্যমান আছে। ভারতীয় সাহিত্যেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই কথা ও উপকথাদি বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যদেশের অপূর্ব কল্পনাশক্তিতে ঐ কাব্যাংশ আরও মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। আরব্যোপন্যাস ও পঞ্চতন্ত্র জগতের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। দণ্ড্যাচার্য, কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে কোনও জাতিগত পার্থক্য উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ভামহাচার্য কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে পার্থক্য থাকা উল্লেখ করেন (১।২৫।৯)। ভামহ বলেন আখ্যায়িকাতে অধ্যায়গুলি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত হয় এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে বক্ত্র ও অপরবক্ত্র শ্লোক থাকে এবং নায়কই উহার বক্তা হইয়া থাকে। এই পার্থক্য জাতিগত নহে। কিন্তু কোনও কোনও আলঙ্কারিক বলেন আখ্যায়িকার মূলভিত্তি পূর্ব ঐতিহ্য বা জনশ্রুতি, কিন্তু কথা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। তাঁহাদের মতে "হর্ষচরিত" আখ্যায়িকা এবং "বৃহৎকথা" কথা বলিয়া পরিগণিত। পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিতেরা সংস্কৃত কথা ও আখ্যায়িকাগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন (১) মানবোপাখ্যান, (২) মানবেতর (পশুপক্ষী) জীবোপাখ্যান। উভয়ই কল্পনাপ্রসূত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস থাকায় এবং পশুপক্ষীরও মানবের ন্যায় ভাষা ও চিন্তাশক্তির বিদ্যমানতা

স্বীকার করায় মানবেতর জীবজন্তুর কথা বা উপাখ্যান ভারতবর্ষে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। মহাভারতে জীবজন্তুর আখ্যানের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ জাতক-গুলিতেও বহু জীবজন্তুর উপাখ্যান আছে। ঐগুলি প্রাচীনকাল হইতেই শিক্ষার ও উপদেশের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচিত হওয়াতেই বৌদ্ধেরা জাতকে ঐ সকল উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কথাসাহিত্যের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থের নাম গুণাঢ্যের **বৃহৎকথা।** ঐ গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। ঐ মূলগ্রন্থ পৈশাচী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে গুণাঢ্য দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠানপুরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাতবাহন নৃপতি সংস্কৃতে অভিজ্ঞ ছিলেন না। জলকেলিকালে রাণীর "মোদকৈঃ দেহি মে রাজন্" এই বাক্য বুঝিতে না পারিয়া তিনি লজ্জিত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য সহজে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিবার আদেশ রাজা শর্ববর্মণের উপর ন্যস্ত করেন এবং তিনি কাতন্ত্রব্যাকরণ রচনা করেন। ঐ শর্ববর্মণের সহিত পণ রাখায় গুণাঢ্য সংস্কৃতভাষা ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়া-ছিলেন, তজ্জন্য তিনি পৈশাচীভাষায় বৃহৎকথা রচনা করেন। দণ্ড্যাচার্য কাব্যাদর্শে এই বৃহৎকথাকে "ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাম্" বলিয়াছেন এবং বাণভট্টও হর্ষচরিতে বৃহৎকথা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা"।

সম্ভবতঃ ভাসকবিও উদয়ন প্রভৃতির আখ্যায়িকা বৃহৎকথা হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাতবাহন যদি হালরাজা হইতে অভিন্ন না হন তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খৃঃ ১ম শতাব্দীতে গুণাঢ্যকে স্থাপন করা যায়। পৈশাচীভাষা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণপাদদেশে ঐ ভাষা প্রচলিত ছিল এবং প্রাকৃতভাষা অপেক্ষা পৈশাচীভাষা সংস্কৃতের বেশী অনুরূপ ছিল।

গুণাঢ্যের ঐ বৃহৎকথা বিদ্যমান না থাকিলেও তাঁহার বৃহৎকথার মর্ম পরবর্তী গ্রন্থকারেরা সংগ্রহ করিয়াছেন।

"সেয়ং হরমুখোদ্গীর্ণা কথানুগ্রহকারিণী।
পৈশাচবাচি পতিতা সঞ্জাতা বিঘ্নদায়িনী ॥

অতঃ সুখনিষেব্যাসৌ কৃতা সংস্কৃতয়াগিরা।
সমাং ভুবমিবানীতা গঙ্গা শ্বভ্রাবলম্বিনী ॥"

—বৃহৎকথামঞ্জরী।

বৃহৎকথার সারাংশ তিনজন গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্রের **বৃহৎকথামঞ্জরী**, সোমদেবের **কথাসরিৎসাগর** এবং বুধস্বামীর **শ্লোক-সংগ্রহ**। **ক্ষেমেন্দ্র** সম্ভবতঃ ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার "বৃহৎকথা-মঞ্জরী" ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করেন। উহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭৫০০। ক্ষেমেন্দ্র অধিক সংক্ষেপ করিতে গিয়া বহুস্থানে কাহিনীর শৃঙ্খলা হারাইয়াছেন এবং অনেক স্থলে গল্প দুর্বোধ্য হইয়াছে।

ক্ষেমেন্দ্রের "বৃহৎকথামঞ্জরী" রচনার ২৫।৩০ বৎসর পরেই **সোমদেবভট্ট** তাঁহার "কথাসরিৎসাগর" রচনা করেন। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২২০০০ হাজার। সোমদেব মূল গ্রন্থের তাৎপর্য ও পৌর্বাপর্য রক্ষা করিয়াছেন। সোমদেব তাঁহার কথাসরিৎসাগরে বলিয়াছেন :—

"যথামূলংতথৈবৈতন্ন মনাগপ্যতিক্রমঃ।
গ্রন্থবিস্তরসংক্ষেপমাত্রং ভাষা চ ভিদ্যতে।
ঔচিত্যান্বয়রক্ষা চ যথাশক্তি বিধীয়তে।
কথারসাবিঘাতেন কাব্যাংশস্য যোজনা ॥
বৈদগ্ধখ্যাতিলোভায় মম নৈবায়মুদ্যমঃ।
কিন্তু নানাকথাজালস্মৃতিসৌকর্য্যসিদ্ধয়ে ॥"

সোমদেবের গ্রন্থ সম্ভবতঃ ১০৬৩—১০৮৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে রচিত হয়। তিনি গ্রন্থের নামের সুসঙ্গতি রক্ষা করিয়া উহা ১২৪টি তরঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ ১৮টি লম্বকে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে কথাপীঠে গুণাঢ্যের ইতিহাস উক্ত হইয়াছে।

এই উভয় গ্রন্থই গুণাঢ্যের মূলগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে এরূপ উক্তি আছে। কিন্তু **বুধস্বামীর** রচিত "শ্লোকসংগ্রহ" দেখিলে ঐ বিশ্বাস শিথিল হয়। বুধস্বামীর গ্রন্থ সম্ভবতঃ নেপাল প্রদেশে খৃঃ অষ্টম কিম্বা নবম শতাব্দীতে রচিত হয়। ঐ সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিদ্যমান না থাকিলেও যে অংশ বিদ্যমান আছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কাশ্মীরদেশে ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেবভট্ট

গুণাঢ্যের মূলগ্রন্থ অনুসরণ করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারাও বৃহৎকথার সারসংগ্রহ অনুসরণ করিয়াছেন এবং ঐ সারসংগ্রহে বহু নূতন কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইযাছিল। কারণ কথাসরিৎসাগরের ৬০-৬৪ তরঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের বীজগ্রন্থ তন্ত্রাখ্যায়িকার কতকাংশ কাশ্মীরগ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত দৃষ্ট হয়। তন্ত্রাখ্যায়িকার আখ্যায়িকা গুণাঢ্যের বৃহৎকথার অঙ্গ নহে। এতদ্ব্যতীত বেতালপঞ্চবিংশতি ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগরের ১২শ লম্বকে সন্নিবেশিত আছে। তন্ত্রাখ্যায়িকা ও বেতালপঞ্চবিংশতি বুধস্বামীর শ্লোকসংগ্রহে দৃষ্ট হয় না।

বেতালপঞ্চবিংশতি।

বেতালপঞ্চবিংশতিও প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু উহার প্রকৃত কাল নির্ণয় সম্ভবপর নহে। কথাসরিৎসাগরে ঐ কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ক্ষেমেন্দ্রের "বৃহৎকথামঞ্জরী"তে উহা দৃষ্ট হয়। শিবদাস সরল গদ্যেও একখানি "বেতালপঞ্চবিংশতি" রচনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পদ্য ও গদ্যমিশ্রিত একখানি সংস্করণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ আখ্যায়িকা সর্ব্ব-প্রদেশেই আদৃত হওয়ায় কোনও প্রদেশের পাঠের সহিত অপর প্রদেশের পাঠের ঐক্য দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষে এমন ভাষা নাই যাহাতে "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" অনূদিত হয় নাই।

শুকসপ্ততি। এই কথাগ্রন্থও কোন্ সময়ের রচিত তাহা নির্ণয় করা যায় না। গৃহে রক্ষিত শুকপক্ষী ৭০টি কাহিনী বলিয়াছে। গৃহপতির অনুপস্থিতিতে গৃহপত্নীর অভিসারিণী হইবার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। শুকের উদ্দেশ্য, গৃহপতির প্রত্যাবর্তনসাপেক্ষে ঐ অভিসারপথের বিপৎকাহিনী ক্রমে বলিয়া বলিয়া গৃহপত্নীকে ভুলাইয়া রাখিবে। এক গল্প শেষ না হইতেই তাহার শাখা অপর গল্পের সূচনা এইরূপে ৭০টি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা। এই কথাগ্রন্থও বহুদিন হইল প্রচলিত আছে। ইহারও ৪ প্রকার পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। জৈনদিগেরও একটি পাঠ আছে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বেতালপঞ্চবিংশতির ন্যায় ইহা বিক্রমাদিত্যের নামের সহিত জড়িত। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের নিম্নস্থ ৩২টি পুত্তলিকা, প্রত্যেকেই এক একটি সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ। পশুপক্ষীর রূপকথাই সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিশেষত্ব। যেরূপ সরল ভাষায় ও মনোরমভাবে ঐ সকল রূপকথাগুলি রচিত হইয়াছে তাহা চিত্তাকর্ষক না হইয়াই পারে না। ষষ্ঠ শতাব্দীতেই পঞ্চতন্ত্র প্রাচীন পারসিক ভাষায় (পহ্লবী) অনূদিত হইয়াছিল। ঐ পহ্লবী-অনুবাদ বিদ্যমান না থাকিলেও তাহা হইতে সিরীয় ভাষায় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে অনুবাদ হইয়াছিল তাহা বিদ্যমান আছে। অষ্টম শতাব্দীতে আরবী ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছিল। ১১শ শতাব্দীতে হিব্রু ভাষায় ও ১৩শ শতাব্দীতে স্পেনদেশীয় ভাষায় এবং পরে লাটিন ভাষায়ও অনুবাদিত হয়। ১৬শ শতাব্দীতে সার্ টমাস নর্থ (Sir Thomas North) উহা লণ্ডনে ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। ক্রমে নানাপ্রকার রঙে রঞ্জিত হইয়া সমস্ত ইয়োরোপে প্রচারিত হয়।

পঞ্চতন্ত্র কোন্ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কাশ্মীরদেশে প্রচলিত গুণাঢ্যের বৃহৎকথায় সম্ভবতঃ ইহা প্রথম প্রবেশলাভ করিয়াছিল। ঐ অংশ তন্ত্রাখ্যায়িকা নামে অভিহিত। কিন্তু বুধস্বামীর শ্লোকসংগ্রহদৃষ্টে বোধ হয় তন্ত্রাখ্যায়িকা অংশ গুণাঢ্যের মূল বৃহৎকথায় ছিল না। ঐ তন্ত্রাখ্যায়িকাই প্রচলিত পঞ্চতন্ত্রের মূল। সম্ভবতঃ রাজকুমারদিগের মনোরঞ্জনপূর্বক সহজে সংস্কৃতভাষা ও নীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্তই পঞ্চতন্ত্র রচিত হইয়াছিল। পঞ্চতন্ত্রে চাণক্যের উল্লেখ আছে ও কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রের জ্ঞান লক্ষিত হয়। কথিত আছে দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্যের নৃপতি অমরশক্তির সভাসদ্ বিষ্ণুশর্মা রাজপুত্রগণের জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু অমরশক্তি কে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন খসরু আনুশীর্বান উহা পহ্লবীভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন তখন উহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অধ্যাপক কীথ মনে করেন যে ইহা গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে রচিত হওয়া সম্ভব। ইহা অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রচলিত পঞ্চতন্ত্রের কোনও কোনও পাঠে কালিদাসের কুমারসম্ভবের ২য় সর্গের ৫৫ শ্লোকাংশ দৃষ্ট হয়।

"বিষবৃক্ষোপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ংছেত্তুম্ অসাম্প্রতম্"

যদি ঐ শ্লোক পরে প্রক্ষিপ্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে পঞ্চতন্ত্র কালিদাসের পরবর্তী বলিয়া বোধ হয়। দাক্ষিণাত্যের পঞ্চতন্ত্রের সহিত অন্যান্য প্রাদেশিক পঞ্চতন্ত্রের পাঠের কিছু পার্থক্য আছে।

হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রেরই পরিবর্তিত সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। নারায়ণ পণ্ডিত উহার রচয়িতা। তিনি রাজা ধবলচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। তিনি পাটলীপুত্ররাজ সুদর্শনের পুত্রগণের শিক্ষার জন্য হিতোপদেশ রচনা করেন এরূপ উক্তি ঐ গ্রন্থে আছে। পঞ্চতন্ত্রের ৪৩টি গল্পের মধ্যে ২৫টি হিতোপদেশে গৃহীত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার ১৭টি নূতন গল্পও উহাতে সন্নিবেশ করিয়াছেন। কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র হইতে বহু শ্লোক গৃহীত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের চতুর্থ অধ্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র ঐ অধ্যায়ের একটি গল্প "ব্যাঘ্রচর্মাবৃত গর্দভ" গৃহীত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের তৃতীয় অধ্যায় দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে এবং ঐ দুই খণ্ডে পঞ্চতন্ত্রের ৫ম অধ্যায় ও ১ম অধ্যায়ের কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় অধ্যায়গুলির আকার ও গল্পসমষ্টি প্রায় তুল্য হইয়াছে। হিতোপদেশ গ্রন্থ বঙ্গদেশে বহুলভাবে পঠিত হয়।

নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কতকগুলি কাহিনী **দিব্যাবদান** নামে আখ্যাত হয়। ঐ অবদান কাহিনীগুলিও সরল সংস্কৃতে রচিত। ১৫শ শতাব্দীতে শ্রীবর **কথাকৌতুক** নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি জোনরাজের ছাত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থ মুসলমান কবি আব্দুররহমানের রচিত ইউসুফ জুব্‌খা অবলম্বনে রচিত। আলাউদ্দিনকর্তৃক রাজপুতনা আক্রমণের কথা ইহাতে উল্লিখিত আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

খণ্ডকাব্য।

গীতি, নীতি ও সংগ্রহ বা চয়নিকা।

কালিদাসের **মেঘদূত** উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। ইতিপূর্বেই কালিদাসের কাব্যের আলোচনায় উহা উল্লিখিত হইয়াছে। গেটে, শিলার প্রভৃতি জার্মান কবিগণ উহার সৌন্দর্যে ও মধুরতায় মোহিত হইয়াছিলেন। ঐ কাব্যের অনুকরণে **হংসদূত, পদাঙ্কদূত** প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। কালিদাসের **ঋতুসংহার**ও একখানি মনোরম কাব্য। ইউরোপীয় সমালোচকগণ ঐখানিকে উচ্চশ্রেণীর নৈসর্গিক বর্ণনামূলক কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (কাব্যপঞ্চ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কালিদাসের **শৃঙ্গারতিলকে** আদিরসাশ্রিত ২৩টি শ্লোক আছে। শৃঙ্গারতিলক কালিদাসকৃত কিনা তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। হিলেব্রাণ্ট বলেন উহা কালিদাস রচিত।

ঘটকর্পরকাব্য ঘটকর্পরকবিরচিত। উহাতে ২২টি শ্লোক আছে। সবগুলিই আদিরসসিক্ত। প্রত্যেক শ্লোকই যমক ও অনুপ্রাস খচিত। প্রবাদ আছে এই কবি বিক্রমাদিত্যনবরত্নসভার একতম রত্ন।

অমরুকবির **অমরুশতক** এই শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহাতে প্রীতিরসের পূর্বরাগ, আকাঙ্ক্ষা, মিলন, অভিমান প্রভৃতি ভাবের সন্নিবেশ আছে। বামনাচার্য ও আনন্দবর্ধন (৮৫০ খৃঃ) এবং ধনিক (১০০০ খৃঃ) অমরুকবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাকার তাঁহাকে "বিশ্বপ্রখ্যাতনাস্তিধমকুল-তিলকো বিশ্বকর্মাদ্বিতীয়ঃ" বলিয়াছেন। ইহাতে বোধহয় তিনি স্বর্ণকার ছিলেন। ভর্তৃহরিরচিত **শৃঙ্গারশতক** (৭ম শতাব্দী) অতি হৃদয়গ্রাহী কাব্য। উহার ভাবগুলি সুসংযত ও পরিপুষ্ট এবং ভাষাও প্রাঞ্জল। ভর্তৃহরি ৬৩১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। কথিত আছে তিনি তাঁহার পত্নীর মর্মান্তিক ব্যবহারে সংসারধর্মে বীতরাগ হইয়া বৌদ্ধসন্ন্যাস অবলম্বন

করেন। আবার কিছুকাল পরে সংসারাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রসিদ্ধি আছে তিনি চুণারদুর্গে (চরণাদ্রি) সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি একাধারে মহাবৈয়াকরণ, দার্শনিক ও কবি ছিলেন। তাঁহার **নীতিশতক** ও **বৈরাগ্যশতক** সংস্কৃতকাব্যসাহিত্যে অতি মনোরম সৃষ্টি। সম্ভবতঃ ঐ উভয় কাব্যে তাঁহার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার ছায়া রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার সংযত ভাবে, ভাষার মাধুর্যে ও চিন্তার গভীরতায় ঐ দুইখানি কাব্য সংস্কৃতকাব্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের ন্যায় শঙ্করাচার্যের **মোহমুদ্গর** (৮ম শতাব্দী) ও শিহ্লন কবি রচিত **শান্তিশতক**ও সংস্কৃতসাহিত্যে যশোলাভ করিয়াছে।

ময়ূরকবি বাণভট্টের সমসাময়িক। তিনি বাণভট্টের শ্বশুর (মতান্তরে শ্যালক) ছিলেন। প্রবাদ আছে বাণভট্ট ও ময়ুরকবির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ময়ূরকবি তাঁহার কন্যাকে প্রখরতার জন্য ভৎর্সনা করায় কন্যা রোষবশতঃ চর্বিত তাম্বুল ময়ূরভট্টের অঙ্গে ফুৎকার করিয়া নিক্ষেপ করেন, তজ্জন্য ময়ূরভট্টের শরীরে কুষ্ঠরোগ জন্মে। ময়ূরভট্ট **সূর্যশতক** রচনা করিয়া তদ্বারা সূর্যদেবের উপাসনা করিয়া ঐ ব্যাধি হইতে নির্মুক্ত হন।

"বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" রচয়িতা **বিহ্লনকবিরচিত চৌরপঞ্চাশিকা** (১১শ শতাব্দী) আদিরসভারাক্রান্ত। বিহ্লনের ঐ শ্লোকগুলির রচনা সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহা অমূলক বলিয়া বোধ হয় (কাব্য অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভায় পঞ্চরত্নের একতম গোবর্ধন সাতবাহনের প্রাকৃতভাষায় রচিত গাথাসপ্তশতীর শ্লোকগুলির ভাবানুকরণে ৭৩১টি শ্লোক রচনা করেন। ঐ কাব্যের নাম **আর্য্যাসপ্তশতী**। গোবর্ধনের শিষ্য ও সোদর উদয়ন ও বলভদ্র আর্য্যাসপ্তশতী প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছিলেন।

"উদয়ন-বলভদ্রাভ্যাং সপ্তশতী শিষ্যসোদরাভ্যাং নঃ।
দ্যৌরিব রবিচন্দ্রাভ্যাং প্রকাশিতা নির্মলীকৃত্য॥" ৭৩০

ঐ শ্লোকগুলিতে আদিরস বিদ্যমান কিন্তু অন্যান্য কবি ও কাব্যসম্বন্ধে তিনি যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহাও অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সপ্তশতী ৩০-৩৬ শ্লোক।

শম্ভু রচিত **অন্যোক্তিমুক্তালতা** (১১০০ খৃঃ) এবং **বীরেশ্বর** রচিত **অন্যোক্তিশতক** এই শ্রেণীর কাব্য।

জয়দেব। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ধোয়ী, গোবর্ধন, শরণ, উমাপতিধর ও জয়দেব বিদ্যমান ছিলেন।* (১২শ শতাব্দী)। জয়দেব রাঢ়দেশে বর্তমান বীরভূমজেলার অন্তঃপাতী কেন্দুবিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, জননীর নাম বামাদেবী ও পত্নীর নাম পদ্মাবতী। জয়দেব বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। উজ্জ্বলরসমন্দাকিনী তাঁহার পার্থিবদেহ পূত করিয়াছিল এবং রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনাতেই তিনি "সিদ্ধ" হইয়াছিলেন।

কথিত আছে তিনি ঐ উজ্জ্বলরসের মানভঞ্জনলীলা রচনা কালে ভাবাবেশে বিভোর হইয়া "দেহি পদপল্লবমুদারম্" চরণ লিখিতে গিয়া অর্দ্ধবাহ্য হইয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠেন এবং ঐ চরণটি লেখা অকর্তব্যজ্ঞানে তাহা না লিখিয়া স্নানাদি করিতে যান। তিনি আসিয়া দেখেন কে ঐ চরণটি তাঁহার হস্তলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

তাঁহার গীতগোবিন্দের ন্যায় "কান্ত-মধুর-কোমল" পদাবলী সংস্কৃত-সাহিত্যে কেন পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। ভাবের বিচিত্রতায়, পদলালিত্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে, অলঙ্কারমাধুর্যে, যমক ও অনুপ্রাসের ললিতলহরীতে উহা এক অভূতপূর্ব আনন্দপ্রবাহের সৃষ্টি করে। গীতগোবিন্দের বহু শ্লোক ভারতের নরনারীর কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে এবং যখনই উহার কোনও শ্লোক গীত বা উচ্চারিত হয় উহা শ্রোতার মরমে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আবিষ্ট করে। ইউরোপীয় সমালোচকগণও গীতগোবিন্দের মধুরতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। গীতগোবিন্দের পর সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে এরূপ মৌলিক বিচিত্র সৃষ্টি আর দৃষ্ট হয় নাই। গীতগোবিন্দের বহু টীকা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মৈথিল কৃষ্ণদত্তরচিত টীকাই সর্বপ্রাচীন। উদয়নকৃত ভাববিভাবিনী, রাণাকুম্ভকৃত রসিকপ্রিয়া, কমলাকরকৃত রত্নমালা, নারায়ণদাসকৃত সর্বাঙ্গসুন্দরী, ভগবদ্দাস-কৃত রসকদম্বকল্লোলিনী (১৫৫০-১৬০০ খৃঃ) ও শঙ্করমিশ্রকৃত রসমঞ্জরী সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লীশ্বর শাহজাহানের রাজত্বকালে **জগন্নাথ কবি**

* "গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ।

বিদ্যমান ছিলেন (অলঙ্কার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তাঁহার জন্ম মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পশ্চিম গোদাবরী জেলার মুঙ্গণ্ডী নামক স্থানে। তিনি কোনও রূপবতী যবনীর মোহে দিল্লীশ্বর শাহজাহানের রাজসভায় বহুদিন ছিলেন। তিনি বৈয়াকরণ, দার্শনিক, আলঙ্কারিক ও কবি ছিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁহার "রসগঙ্গাধর" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁহার কবিপ্রতিভাও উচ্চশ্রেণীর। তাঁহার রচিত গঙ্গালহরী (বা পীযূষলহরী), সুধালহরী, অমৃতলহরী, করুণা-লহরী প্রভৃতি স্তোত্র ও ভামিনীবিলাস এবং জগদাভরণ প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্য আছে। তন্মধ্যে "ভামিনীবিলাস" কাব্যসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ভাষার লালিত্যে, ভাবের নবীনতায় এবং অলঙ্কারের ভাস্বরতায় উহা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি নীলকণ্ঠ দীক্ষিত। ইনি পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের সমসাময়িক পণ্ডিতমূর্ধন্য অপ্পয়দীক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার রচিত সভারঞ্জনশতক, কণিবিড়ম্বন, শান্তিবিলাস, শিবোৎকল্প প্রভৃতি লঘুকাব্যও সহৃদয় সুধীগণের আদরণীয়।

শ্লোকসংগ্রহ বা চয়নিকা

সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিকতার অবসানে কাব্যোদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমগুলি আহরণ করিয়া কোনও কোনও গ্রন্থকার "চয়নিকা" বা শ্লোক-সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। **কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়** সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। উহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বটু-দাসের পুত্র শ্রীধরদাস ১২০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে **সদুক্তি-কর্ণামৃত** রচনা করেন। ইহাতে ৪৪৬ জন কবির রচিত শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। পাঁচটি প্রবাহে, ৪৭৪ বীচিতে ২৩৮০ শ্লোক আছে। ঐ সকল কবির অধিকাংশই বঙ্গদেশীয়। এই শ্রীধরদাস বারেন্দ্রকায়স্থকুলোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। দেবগিরির কৃষ্ণরাজের সময়ে (১২৪৭-১২৬০ খৃঃ) লক্ষ্মী-দেবের পুত্র জহ্লণ **সূক্তিমুক্তাবলী** রচনা করেন—

"তস্যাস্তে তনয়ো নয়োদধিবিধুর্বন্ধুর্বুধানাং সুধীঃ।
সারাসারবিচারণাসু চতুরঃ শ্রীজহ্লণাখ্যঃ ক্ষিতৌ ॥
তেনেয়ং ক্রিয়তে বীক্ষ্য সৎ-সুভাষিতসংগ্রহাম্।
সূক্তিমুক্তাবলী কণ্ঠকদলীভূষণং সতাম্ ॥

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যকচিকিৎসক শার্ঙ্গধরকর্তৃক সংগৃহীত। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে (১৩৬৩ খৃঃ) উহা রচিত হয়। উহাতে ২৬৪ জন কবি রচিত ৬০০০ শ্লোক আছে। ১৫শ শতাব্দীতে বল্লভদেব **সুভাষিতাবলী** রচনা করেন তাহাতে ৩৫০ জন কবিরচিত ৩৫০০ শ্লোক আছে। ঐ সকল সংগ্রহগ্রন্থে বহু লুপ্ত কবির রচিত শ্লোক দৃষ্ট হয়। অনেক কবির মূল গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের রচিত দুই চারিটি শ্লোক ঐ সকল সংগ্রহগ্রন্থে রক্ষিত হইয়া তাঁহাদের কবিযশঃ ঘোষণা করিতেছে। **বৃহৎস্তোত্ররত্নাকর** ও **মহিম্নস্তব**ও এই স্থানে উল্লেখযোগ্য। উহাতে বহু প্রসিদ্ধ স্তোত্র ও স্তব সংগৃহীত হইয়াছে। "মহিম্নস্তব" পুষ্পদন্তকৃত। ন্যায়মঞ্জরীতে পুষ্পদন্তের উল্লেখ আছে (৯ম শতাব্দী)।

দ্বিতীয় খণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাটক

নাটকের উৎপত্তি কিরূপে এবং কোন্ যুগে হইয়াছে তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষিগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রই নাটক সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু ঐ গ্রন্থেরও পাঠ কালক্রমে বহুধা বিকৃত হইয়াছে। ঐ নাট্যশাস্ত্রেব ১ম অধ্যায়ে নাটকের উৎপত্তির কথা আছে। "সত্যযুগে নাটকের আবশ্যকতা ছিল না। পরে মানবের প্রীত্যর্থে ঋগ্‌বেদ হইতে পাঠ, সামবেদ হইতে গান, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হইতে রস গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মা এই পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেন।"

"জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্‌বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি॥"

শিব "তাণ্ডব নৃত্য" ও পার্বতী "লাস্য" এবং বিষ্ণু "নাট্যরীতি" দান করেন এবং ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্র প্রণয়নপূর্বক তাহা নরলোকে প্রচার করেন। আদিকাল হইতেই এই প্রবৃত্তি মানবহৃদয়ে নিহিত আছে, তাহা ক্রমে বিকশিত হইয়াছে ইহাই অনুমিত হয়। ঋগ্‌বেদে যম এবং যমীর মধ্যে (১০।১০) পুরূরবা ও উর্বশীর মধ্যে (১০।১৫) অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার মধ্যে (৪।১৭৯) বিশ্বামিত্র ও নদীগণমধ্যে (৬।৩৩) বশিষ্ঠ ও ভরতগণমধ্যে যে বাক্-প্রত্যুবাক্ আছে তাহাতেই নাটকের মূলভাব লক্ষিত হয়। কালক্রমে উহার সহিত অভিনয়, নৃত্যগীতাদিসংযুক্ত হইয়া তৃপ্তিপ্রদ নাটকে পরিণত হইয়াছে।

সিলভেন লেভির মত এই যে কালিদাসের দীপ্তিতে তাঁহার পূর্ববর্তী জ্যোতিষ্কসমূহ বিলীন ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু বেদ-সংহিতাতে, ব্রাহ্মণাংশে, প্রাচীন মহাকাব্যে, পাণিনিতে ও পাতঞ্জল মহাভাষ্যে প্রাচীন নাটকের বহু নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। বাজসনেয়সংহিতায় ও রামায়ণে

"শৈলূষ" শব্দের প্রয়োগ আছে এবং মহাভারতে দ্রৌপদীও শৈলূষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। রামায়ণে 'ব্যামিশ্রক' শব্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত নাটক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পাণিনিতে শিলালি ও কৃশাশ্ব নটসূত্রের উল্লেখ আছে। (৪।৩।১১০-১১১) মহাভাষ্যে "শৌভিক" "শৌভিকা" শোভনিকা" (৩।১।২৬) প্রভৃতি কথাদ্বারা নাট্যরঙ্গের বিদ্যমানতা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। মহাভাষ্যে "বলিবন্ধ" ও "কংসবধ" প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন উহা নাটক নহে উহা পাঞ্চালী (পুত্তলিকা রঙ্গ)। যে ব্যক্তি সূত্রদ্বারা পুত্তলিকা নাচাইত সেই পুত্তলিকার কার্য ও ব্যাখ্যা করিত তজ্জন্য তাহাকে সূত্রধার বলিত। নাটকে এখনও সূত্রধার আছে। এই সকল উক্তির কোন ভিত্তি আছে কি না বিবেচ্য। নাটক যে প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান ছিল তাহার বহু প্রমাণ আছে। মগধরাজ বিম্বিসার নাগরাজদিগের সম্মানার্থে নাটক রচনা করাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহার অনুশাসনে নাট্যাভিনয়ে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন গ্রীকদিগের নিকট হিন্দুগণ নাটক গ্রহণ করিয়াছেন এবং "যবনিকা" শব্দ দ্বারা উহা প্রতীয়মান হয়। "যবনিকা" শব্দদ্বারা নাটক গ্রীকগণেব নিকট গৃহীত হওয়া প্রমাণিত হয় না। সম্ভবতঃ "যবনিকা"টি গ্রীকগণের নাটক হইতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দু-নাটক স্বাধীনভাবে উদ্ভুত হইয়াছে।

সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। গ্রীকনাটকের ন্যায় উহাতে দেশ বা কালের একত্ব নাই। সংস্কৃত নাটকের ঘটনাটি বহুকালব্যাপী হইতে পারে ও বহুস্থানে ঐ ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে। তজ্জন্য সুদীর্ঘ-কালের সকল ঘটনাগুলি অভিনীত না হইয়া কেবল মুখ্য ঘটনাগুলি মাত্রই অভিনীত হয়। মধ্যবর্তী ঘটনাশৃঙ্খলগুলি নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মুখে আবশ্যকানুসারে বিবৃত হইয়া থাকে। ভবভূতির মহাবীরচরিত ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। দ্বাদশবৎসরেরও অধিককালব্যাপী ঘটনাবলী ঐ একখানি নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ তাহাদের পদ ও মর্যাদা অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজা, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করেন, স্ত্রীলোক, ভৃত্য ও অন্ত্যজপ্রভৃতি প্রাকৃতভাষা ব্যবহার করিয়া

থাকে। নাটক বাস্তবজীবনের অনুকারক বলিয়াই সম্ভবতঃ ঐ প্রকার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। সংস্কৃতনাটকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে **বিদূষক।** বিদূষক সাধারণতঃ নাটকের নায়কের প্রিয়বয়স্য, মিষ্টান্নলোলুপ ও আমোদ-প্রিয় ব্রাহ্মণ। বিদূষক তাহার হাবভাব, রহস্যপূর্ণ বাক্য ও নির্বুদ্ধিতার ভানদ্বারা কেবল রসেরই পুষ্টি সাধন করিয়া নাটকের সজীবতা রক্ষা করে ও দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করে এরূপ নহে, কখনও কখনও নায়কের নর্মসুহৃৎ-স্বরূপে অভীষ্টসাধনে সহায়তা করিয়া থাকে ও বিদূষকই নায়কের মনোভাব-গুলির অভিব্যক্তি সম্পাদন করে। প্রাচীনকালের যে সকল নাটকাদি ছিল তাহা কালগহ্বরে বিলীন অথবা প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও নাট্যকবি **ভাস** কেবল নামেই বিদ্যমান ছিলেন। কালিদাস, বাণভট্ট, রাজশেখর, বাক্‌পতি প্রভৃতির শ্লোকেই তাঁহার যশঃ নিবদ্ধ ছিল এবং আলঙ্কারিকগণের গ্রন্থে তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোকমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইত। ১৯০৯ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গণপতিশাস্ত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে ভাসের কতকগুলি নাটক মুদ্রিত হইয়াছে। গণপতিশাস্ত্রী ভাসকে পাণিনি ও বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্র ভাসের নাটকের দুই একটি শ্লোক প্রসিদ্ধ উল্লেখে গ্রহণ করিয়াছে ও ভাস পাণিনীয় অনুশাসন মানেন নাই, ইহাই গণপতিশাস্ত্রী মহাশয়ের অবধারণের প্রধান ভিত্তি। কিন্তু ভাসের নাটকে পাটলীপুত্রের উল্লেখ আছে। ঐ নগর বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর কালাশোকের সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে অর্থশাস্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহা মতান্তরে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পরবর্তী বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ভাসের রচিত নাটকগুলি কালিদাসের যুগে যে বিশ্ব-বিশ্রুত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ভাস ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুসরণ করেন নাই।* কালিদাস ও তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারগণ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কোনও অনুশাসনের রেখামাত্রও ব্যতিক্রম করেন নাই। ইহা হইতে মনে হয় ভাসের কালে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব

* ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গমঞ্চে নিদ্রা, যুদ্ধ, মৃত্যু ও বিয়োগান্ত নাটক নিষিদ্ধ। ভাস এই সবগুলিরই ব্যতিক্রম করিয়াছেন। স্বপ্নবাসবদত্তে নিদ্রা, বালচরিতে যুদ্ধ, উরুভঙ্গে মৃত্যু অভিনীত হইয়াছে।

সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে ভাস খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর কবি এবং তিনি বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের পরবর্তী। তাঁহাদের বলবৎ প্রমাণ এই যে ভাসের নাটকের প্রাকৃতভাষা অশ্বঘোষের নাটকের প্রাকৃতভাষা অপেক্ষা অর্বাচীন ও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের উপর লক্ষ্য করিয়াই "প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণে"র একটি শ্লোক রচিত হইয়াছে। কোনও নাটকেরই অতি প্রাচীন হস্তলিপি নাই। বিশেষতঃ প্রাকৃতভাষার প্রাদেশিক ভেদ ছিল। অনেক সময়েই দর্শকবৃন্দের বোধসৌকর্য্যার্থে প্রাদেশিক প্রাকৃতভাষায় নাটকের প্রাকৃতভাষার কথোপকথনগুলি পরিবর্তিত হইত। বিশেষতঃ ভাস ও অশ্বঘোষের গ্রন্থের বহু প্রাদেশিক হস্তলিপি না থাকায় কেবল একই হস্তলিপির ভাষার উপর নির্ভর করিয়া ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অধ্যাপক কীথ ভাসকে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতেই স্থাপন করিয়াছেন। ভাসের নাটকগুলির ভরতবাক্যে যে রাজসিংহের উল্লেখ আছে তিনি কে তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

ভাসের যে নাটকগুলি গণপতিশাস্ত্রী প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রসিদ্ধ ভাসকবি বিরচিত কি না তাহাতেই কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন। বার্ণেট ব্যতীত সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই ঐ নাটকগুলি ভাসরচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক কীথ বলেন যে ঐ প্রকার সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। বাক্‌পতির গৌড়বহে "জলনমিত্তে" বাক্যের ও বাণভট্টের হর্ষচরিতের "সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ" বাক্যের সার্থকতা দৃষ্টে ঐ নাটকগুলি যে ভাসরচিত তৎসম্বন্ধে কোনও ন্যায্য সন্দেহ থাকে না। বিশেষতঃ রাজশেখর উল্লিখিত "অগ্নি-পরীক্ষায় বাসবদত্তা দগ্ধ হয় নাই'* বাক্যে যে শ্লোক আছে তদ্বারা মুদ্রিত স্বপ্নবাসবদত্ত নাটক যে ভাসরচিত তাহা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। মান্দ্রাজের অধ্যাপক পিশোরতি ও কুপ্পুস্বামী আয়ার ঐ নাটকগুলি ভাসরচিত নহে বলেন। ঐ নাটকগুলির হস্তলিপিতে ভাসরচিত বলিয়া উল্লেখ নাই। তাঁহাদের বলবৎ প্রমাণ এই যে অভিনবগুপ্তপাদাচার্য স্বপ্নবাসবদত্তা হইতে যে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা মুদ্রিত বাসবদত্তায় নাই বিশেষতঃ ঐ শ্লোকটি বাসবদত্তার কোনও স্থানেই সঙ্গতভাবে স্থান পাইতে পারে না।

* ভাসনাটকচক্রেঽপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥

অভিনবগুপ্তাচার্য অভিনবভারতীতে ঐ নাটকখানি ক্রীড়াপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু গণপতিশাস্ত্রীর মুদ্রিত নাটক ক্রীড়াপ্রধান নহে। অধ্যাপক ভিণ্টারনিস্ সমস্ত বিষয় ধীরভাবে সমালোচনা করিয়া ঐ নাটকগুলি ভাস-রচিত কিনা তৎসম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়াও ঐ নাটকগুলি ভাসের ন্যায় মহাকবিরচিত বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

ভাসের নাটকগুলির উপাদানসমূহ ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা রামায়ণ, মহাভারত, বৃহৎকথা ও উপকথা। "প্রতিমানাটক" ও "অভিষেকনাটকের" ঘটনা রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। **প্রতিমা-নাটকে** দশরথের মৃত্যু হইতে রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে এবং **অভিষেকনাটকে** শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক বর্ণিত আছে। ভাস মহাভারত হইতেই অধিকাংশ নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। **মধ্যমব্যায়োগ, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার** (১ অঙ্ক) **উরুভঙ্গ** (১ অঙ্ক) **পঞ্চরাত্র** (৩ অঙ্ক) **দূতবাক্য** (ব্যায়োগ) এ সকল-গুলিরই উপাদান মহাভারত হইতে গৃহীত। মধ্যমব্যায়োগ মহাভারতের ব্রাহ্মণ ও হিড়িম্বার উপাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বালচরিতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং কংসবধ বর্ণিত আছে। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা হইতে অবিমারকের উপাখ্যান ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের আখ্যান গৃহীত হইয়াছে। স্বপ্ন-বাসবদত্তা বা স্বপ্ননাটক প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের পরিশিষ্ট। অবিমারক নাটকের গল্পটি সংক্ষেপে এই :—কুন্তিভোজকন্যা কুরঙ্গীকে হস্তীর আক্রমণ হইতে এক যুবক রক্ষা করিলেন। ঐ যুবক সৌবীররাজপুত্র বলিয়া পরিজ্ঞাত। মহর্ষি চণ্ডভার্গবের অভিশাপবশতঃ তাঁহার পিতা চণ্ডালরূপে বর্ষভোগ্য পাতিত্য ভোগ করিতেছিলেন। কুরঙ্গী ও যুবকের নব অনুরাগ ও পরে গোপনে রাজান্তঃপুরে পরস্পরের মিলন হইল। উভয়েই পুর্ণমিলনে হতাশ্বাস হইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিল। উভয়েই রক্ষা পাইল। অবিমারক মেঘনাদ নামক বিদ্যাধর-প্রদত্ত অঙ্গুরীয়কের বলে অদৃশ্যভাবে পুনরায় রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গান্ধর্ববিধানে কুরঙ্গীর সহিত মিলিত হইল। পরে জানা গেল ঐ যুবকের নাম অবিমারক, সে সৌবীররাজপুত্র নহে। সে সুদর্শনার গর্ভে অগ্নির পুত্র। **স্বপ্নবাসবদত্তই** ভাসের শ্রেষ্ঠ নাটক। কথিত আছে ভাসের নাটকগুলির অগ্নিপরীক্ষা করা হইয়াছিল। সকলগুলিই দগ্ধ হইয়াছিল কিন্তু

স্বপ্ন-বাসবদত্তা দগ্ধ হয় নাই। রাজশেখর সম্ভবতঃ ঐ "অগ্নিপরীক্ষা" কথায় একটি মনোরম শ্লেষ ব্যবহার করিয়াছেন।

"ভাসনাটকচক্রেপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্ঃ
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥"

রাজ্ঞী বাসবদত্তাও কল্পিত অগ্নিতে দগ্ধ হন নাই। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ মগধরাজদুহিতা পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ দিয়া রাজশক্তির প্রসার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উদয়ন রাজমহিষী বাসবদত্তার মর্মে ব্যথা দিতে সম্মত হইলেন না। মন্ত্রী বাসবদত্তার শরণাপন্ন হইলেন। বাসবদত্তার সাহায্যে লাবাণকে অগ্নিদাহের ভান করাইয়া রটনা করাইলেন যে রাজমহিষী বাসবদত্তা ও মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ অগ্নিতে কেহই দগ্ধ হইলেন না। বাসবদত্তা পরিব্রাজক-বেশধারী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের ভগিনী এই পরিচয়ে মগধরাজান্তঃপুরে রক্ষিত হইলেন। তাঁহার নাম হইল আবন্তিকা। পদ্মাবতীকে উদয়ন বিবাহ করিলেন কিন্তু তিনি বাসবদত্তাকে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। এই চিন্তায় পদ্মাবতীর শিরঃপীড়া হইল। রাজা পদ্মাবতীর নিকটে গেলেন, তাহাকে না পাইয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন। ইতিমধ্যে বাসবদত্তা আসিয়া পদ্মাবতীভ্রমে নিদ্রিত রাজার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। স্বপ্নঘোরে রাজার কথা শুনিয়া বাসবদত্তা চলিয়া যাইতেই রাজা বাসবদত্তার ছায়া দেখিতে পাইলেন।

রাজা রাজধানীতে গেলেন। সংবাদ আসিল শত্রুগণ পরাজিত হইয়াছে। মহাসেন ও সম্রাজ্ঞীর নিকট হইতে বাসবদত্তার পরিণয়ের চিত্রফলক আসিল। পদ্মাবতী রাজপরিণয়ের চিত্রফলক দেখিয়া বলিলেন ঐ চিত্রের বাসবদত্তা জীবিত আছেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ আসিয়া সকল ব্যাপার নিবেদন করিল।

ভাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক **চারুদত্ত**। এই নাটকখানির প্রারম্ভ ও শেষ শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ভাসের চারুদত্তের আখ্যায়িকাটি এই :—চারুদত্ত উজ্জয়িনীর একজন সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণবণিক্ ছিলেন। তাঁহার উদারতা ও মুক্তহস্ততার জন্য সমস্ত বিভব ক্ষীণ হয়। বসন্তসেনা নাম্নী গণিকা পথে দুর্বৃত্তদিগের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া চারুদত্তের

গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহার অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখে। চারুদত্তের উদার ব্যবহারে ও কার্যকলাপে তাহার প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সজ্জলক নামক এক চোর চারুদত্তের গৃহে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করিয়া ঐ গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়া লইয়া বসন্তসেনার পরিচারিকা মদনিকার দেহক্রয়ার্থে মূল্যস্বরূপে দিতে গেল। মদনিকা ও বসন্তসেনা ঐ অলঙ্কার চিনিতে পারিলে সজ্জলক তাহা চারুদত্তের ভবন হইতে চুরি করা স্বীকার করিল। ইতিমধ্যে চারুদত্ত ঐ অলঙ্কার চুরির বিষয় অবগত হইয়া ভাবিলেন যে ন্যস্ত অলঙ্কার চুরি গিয়াছে প্রকাশ করিলে কেহ প্রত্যয় করিবে না। ঐ অলঙ্কারগুলি চারুদত্ত দ্যূত-ক্রীড়ায় হারিয়াছেন প্রকাশে উহাদের মূল্যস্বরূপ চারুদত্তের স্ত্রীর মুক্তামালা চারুদত্তের নর্মসুহৃৎ মৈত্রেয়দ্বারা বসন্তসেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বসন্তসেনা তাহা রাখিল। বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলি মদনিকার গায়ে দিয়া সজ্জলকদ্বারা মদনিকাকে চারুদত্তকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য পাঠাইল। বসন্তসেনা মুক্তাবলী ধারণ করিয়া চারুদত্তের ভবনে অভিসারে যাইবে এরূপ স্থির হইল। সম্ভবতঃ এই চারুদত্তই পরিবর্দ্ধিত হইয়া "মৃচ্ছকটিক" নাটক হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মৃচ্ছকটিক নাটক ভাস অপেক্ষাও প্রাচীন। ঐ মৃচ্ছকটিকের সারাংশ লইয়া চারুদত্ত প্রণীত হইয়াছিল (অধ্যাপক ক্ষেত্রেশচন্দ্র)। কিন্তু এই অনুমান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

ভাসের নাটকগুলি বৈদর্ভীরীতিতে রচিত। ভাষা সরল ও দীর্ঘসমাস-বিহীন। শব্দগুলি ভাবানুকারী ও অলঙ্কারগুলি সরল ও স্বচ্ছ। ভাষা ব্যাকরণসম্মত কিন্তু আর্যপ্রয়োগও আছে; চরিত্রগুলি নির্মল, সন্নীতিপরায়ণ ও অশ্লীলতাদোষবর্জিত।)

● **অশ্বঘোষ**। সুবর্ণাক্ষির পুত্র, বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষ প্রসিদ্ধ কাব্য "বুদ্ধচরিত" রচনা করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা কণিষ্কের গুরু ছিলেন এবং কণিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। তুরফান নামক স্থানে অতি প্রাচীন তালপত্র হস্তলিপিতে অশ্বঘোষবিরচিত **শারিপুত্রপ্রকরণ** বা **শারদ্বতীপুত্র-প্রকরণ** নামক এক অসম্পূর্ণ নাটক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা একখানি প্রকরণ, ৯টি অঙ্ক আছে। ইহাতে নাট্যরীতি অনুসৃত হইয়াছে। বুদ্ধ,

শারিপুত্র, মৌদ্গলায়ন, কৌণ্ডিন্য, ও শ্রমণ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করে। নাটকীয় বিদূষক প্রাকৃতভাষা ব্যবহার করে ও হাস্যরসের প্রবর্তক। শেষে ভরতবাক্যও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রকরণে অশোকস্তম্ভের অর্ধমাগধী-প্রাকৃত ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সবগুলি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় ভরত নাট্যশাস্ত্রের মতানুসারেই এই নাটক রচিত হইয়াছে। এই প্রকরণের আখ্যানটি সংক্ষেপে এই :—বুদ্ধদেব কর্তৃক মৌদ্গলায়ন ও শারিপুত্র উপনীত হইলেন। শারিপুত্র অশ্বজিতের সহিত সাক্ষাত করিলেন। ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা ইহা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইল। বিদূষক বলিলেন ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের দীক্ষা প্রতিলোম ব্যবহার। শারিপুত্র বলেন ঔষধ নিম্নজাতির হস্তেও ফলপ্রদ। শারিপুত্রের মুখে আনন্দচ্ছটা দেখিয়া মৌদ্গলায়নও তৃপ্ত হইলেন, পরে উভয়ে বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

অন্যান্য প্রাচীন নাট্যকারগণ।

ভাসের নাটক ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভাস ব্যতীত সৌমিল্ল, কবিপুত্র প্রভৃতি অন্য নাট্যকারের নাম কালিদাস মালাবিকাগ্নিমিত্রের প্রারম্ভে বলিয়াছেন। তাহাদিগের কোনও নাট্যগ্রন্থ বিদ্যমান নাই। সৌমিল্ল, রামিল, কবিপুত্র, রচিত দুই একটি শ্লোক মাত্র প্রাচীন শ্লোক-সংগ্রহ শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ও সুভাষিতাবলিতে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ কালিদাসের বিমল শারদচন্দ্রালোকে বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র বিলীন হইয়া গিয়াছে।

"**কৌমুদী মহোৎসব**" জনৈক স্ত্রীকবি কর্তৃক ৩৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। তিনি উহা বাকাটক সম্রাটের রাজসভায় রচনা করেন। বর্ণাশ্রমধর্ম ও হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা উহাতে দৃষ্ট হয়।

মৃচ্ছকটিক। ভাসের চারুদত্ত মুদ্রিত হইবার পূর্বে শূদ্রকের **মৃচ্ছকটিক** অতি প্রাচীন নাটক বলিয়া গণ্য হইত। সকলেই মনে করিতেন "মৃচ্ছকটিক" কালিদাসের বহু পূর্ববর্তী নাটক। কিন্তু ভাসের চারুদত্ত প্রকাশিত হইবার পর ঐ মত ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে। কালিদাস ভাসের নাম করিয়াছেন কিন্তু শূদ্রকের নাম করেন নাই। মৃচ্ছকটিকের যে কয়টি শ্লোক আলঙ্কারিকেরা উদ্ধার করিয়াছেন তাহা ভাসেও আছে। সর্বপ্রথমে বামন শূদ্রক কবির

নামোল্লেখ করিয়াছেন (অলঙ্কারসূত্র ৩।২।৪)। দণ্ডাচার্য "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি" শ্লোক উদ্ধার করায় তিনিই মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা বলিয়া পিশেল যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অমূলক বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু শূদ্রক নামক কবি কে তাহার সন্তোষজনক ইতিবৃত্ত জানা যায় না। মৃচ্ছকটিকে শূদ্রক বহুশাস্ত্রবিশারদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তিনি রাজপুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞান্তে ১১০ বৎসর বয়সে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এরূপ বর্ণনা আছে। ঐ শ্লোকটি পরে প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব ·কারণ শূদ্রক রাজা ঐ নাটক রচনা করিয়া থাকিলেও ঐ শ্লোকটিতে তাঁহার অগ্নিপ্রবেশের উক্তি থাকায় তাহা তাঁহার রচিত হওয়া সম্ভবপর নহে। শূদ্রকনামক এক নৃপতির নাম রাজতরঙ্গিণী, স্কন্দপুরাণ, কথাসরিৎসাগর ও অন্যান্য কাব্যে দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও গ্রন্থে তিনি শালিবাহন রাজার মন্ত্রী ছিলেন এবং পরে প্রতিষ্ঠাননগরের অধিপতি হইয়াছিলেন এরূপ উল্লেখ আছে। অধ্যাপক কনো বলেন আভীররাজপুত্র শিবদত্তকই শূদ্রক।

ফ্লীট বলেন এই শূদ্রকের পুত্র ঈশ্বরসেনই অন্ধ্ররাজদিগকে বিতাড়িত করিয়া চেদি অব্দ প্রতিষ্ঠা করেন (২৪৮খৃঃ)। ভাসের প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের মতানুসারে ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে বুদ্ধদেবের তিরোভাবের কিয়ৎকালপরেই শূদ্রকের কাল ধরা যাইতে পারে। বাণভট্ট মৃচ্ছকটিকের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রে মৃচ্ছকটিকের উল্লেখ আছে।

এইপ্রকার বৈষম্যদৃষ্টে অধ্যাপক কীথ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মনে করেন যে ভাসের চারুদত্তের অধিকাংশ সম্পদ্ অপহরণ করিয়া কোনও পরবর্তী গ্রন্থকার প্রাচীনকাহিনীর শূদ্রক রাজাকে গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কারণ রাজতরঙ্গিণীর গ্রন্থকার কহ্লনকবি শূদ্রককে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় যশস্বী রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৃচ্ছকটিকের গ্রন্থকার যিনিই হউন না কেন তিনি ভাসের চারুদত্তের সহিত আর একটি রাজসভার ঘটনার সংমিশ্রণে একখানি উপাদেয় নাটকের অবতারণা করিয়াছেন। সংস্কৃতসাহিত্যে বাস্তবজীবনের চিত্রের সহিত রাজসভার চিত্র একই তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। বৃহৎকথার "কৌমুদিকা"র ছায়া অবলম্বনে বসন্তসেনার চরিত্র অঙ্কিত হওয়া সম্ভব। বৃহৎকথা অথবা

তৎকালে প্রচলিত কোনও কাহিনী হইতে ভাস ও পরে শূদ্রক এই নাটকের উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবহৃদয়ের চিত্র অঙ্কনে গ্রন্থকার অতি নিপুণ। রাজসভার চিত্র ও সামাজিক চিত্র দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন বাস্তব জীবনের ও রাজপরিষদের চিত্র একত্র সমাবেশিত হওয়ায় এই নাটকখানি তৎকালীন জীবনের উজ্জ্বল চিত্র ; সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ আর নাই।

কালিদাস।

কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁহাব নাটকগুলি সংস্কৃতসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কতকগুলি অবিশ্বাস্য কিম্বদন্তী ব্যতীত আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না। এমন কি তিনি কোন যুগে বিদ্যমান ছিলেন তাহা লইয়াই পণ্ডিত সমাজে বিশেষ বিরোধ আছে (কাব্য অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

মালবিকাগ্নিমিত্র। মালবিকাগ্নিমিত্রই কালিদাসেব প্রথম জীবনের রচনা। ইহার প্রস্তাবনায় ভাস, সৌমিল্ল, কবিপুত্র প্রভৃতিব প্রসিদ্ধ নাট্য-গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিতে কালিদাসের নাটকরচনার প্রবৃত্তি ধৃষ্টতা মাত্র, এই দীনতাই লক্ষিত হয়।) শকুন্তলা ও বিক্রমোর্বশীয় এই দুইখানি নাটকের ভাষা ও কাব্যকুশলতার সহিত তুলনাতেও মালবিকাগ্নিমিত্রই যে প্রথম রচনা তাহাই অনুমিত হয়। (এই নাটকখানিতে কালিদাসের কবিত্বের প্রথম উন্মেষ ও প্রথমযৌবনের প্রেমের প্রখরতা অনুভূত হয়।)

উজ্জয়িনীতে বসন্তোৎসবে এই নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল, বলিয়া অনুমান হয়। ৫টি অঙ্কে বিদর্ভরাজদুহিতা মালবিকার ও রাজা অগ্নিমিত্রের প্রণয়কাহিনী অভিনীত হইয়াছে। বিদর্ভরাজ মাধবসেন যজ্ঞসেনকর্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়ায় তাঁহার ভগিনী মালবিকাকে বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য পাঠাইতেছিলেন। পথিমধ্যে দস্যুতে আক্রমণ করিলে অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন দস্যুহস্ত হইতে মালবিকাকে উদ্ধার করেন এবং তাহাকে বিদিশামহিষী ধারিণীর পরিচারিকাস্বরূপ রাজান্তঃপুরে রাখেন। মালবিকার চিত্র দেখিয়া অগ্নিমিত্র মুগ্ধ হন। নাট্যাচার্য গণদাস ও হরদত্তের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহাই মীমাংসার জন্য মালবিকার নাট্যকুশলতা

পরীক্ষাস্থলে রাজা মালবিকাকে সন্দর্শন করিয়া মোহিত হন। রাজ্ঞী ধারিণী মালবিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কারারুদ্ধ করিলেন। বিদূষক সর্পদষ্ট হইয়াছে প্রকাশে রাজ্ঞীর নিকট হইতে সর্পাঙ্গুরীয়কমুদ্রা লইয়া গিয়া তাহাদ্বারা মালবিকাকে উদ্ধার করিল। যজ্ঞসেন বীরসেন কর্তৃক পরাজিত হইল, মাধবসেন মুক্ত হইলেন। মালবিকা মাধবসেনের ভগিনী জানিতে পারিয়া রাজ্ঞী ধারিণী রাজার সহিত মালবিকার পরিণয় সম্পাদন করাইলেন। এই নাটকে শুঙ্গবংশীয় রাজা পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র ও বসুমিত্রের উল্লেখ আছে (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী)। মালবিকাগ্নিমিত্র কালিদাসের প্রথম জীবনের রচনা হইলেও উহার স্ত্রীচরিত্রগুলিতে কালিদাসের প্রতিভার উন্মেষ দৃষ্ট হয়। রাজ্ঞী ধারিণী স্থির, ধীর, সহিষ্ণু ও উদার। তিনি কখনই তাঁহার পদমর্যাদা বিস্মৃত হন না। ইরাবতী তাহার বিপরীত। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যশীলতা নাই ; রাজাকে অকথ্য বলিতে মুখে বাধে না, তিনি যে রাজমহিষী সে দিকে লক্ষ্য নাই। মালবিকা স্নেহার্দ্রহৃদয়া ; তাঁহার সহচরী কৌশিকীর চরিত্র অতি উদার প্রকৃতির। বহুদুঃখে তিনি সংসার ছাড়িয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। তিনি বহু বিদ্যার অধিকারিণী। তিনি রোগে শোকে দুঃখে শান্তিদায়িনী।

বিক্রমোর্বশীয়। বিক্রমোর্বশীয় মালবিকাগ্নিমিত্রের পর ও অভিজ্ঞান শকুন্তলার পূর্বে রচিত হওয়া সম্ভব। পুরূরবা রাজার সহিত অপ্সরা উর্বশীর প্রণয় কাহিনী এই নাটকের ভিত্তি। কুবেরালয় হইতে প্রত্যাবর্তন কালে কেশী নামক এক অসুর বলপূর্বক উর্বশীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাঁহার সঙ্গিনীগণের চীৎকার শুনিয়া পুরূরবা আসিয়া উর্বশীকে রক্ষা করেন। উভয়ের প্রণয় জন্মিল। উর্বশী সরস্বতীকৃত ও ভরতমুনিশিক্ষিত "লক্ষ্মীস্বয়ম্বর" নাটকে লক্ষ্মীর অভিনয় সুচারুরূপে করিতে পারে নাই এবং অভিনয়কালে "সে কাহাকে ভালবাসে" তদুত্তরে "পুরুষোত্তম" স্থলে হঠাৎ "পুরূরবা" বলিয়া ফেলিয়াছিল, তজ্জন্য ভরতমুনি তাহাকে অভিশাপ দিলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে উর্বশী মর্ত্যলোকে পুরূরবার সহিত বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল। এই গল্পটি বেদমূলক এবং পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত আছে। কালিদাস সম্ভবতঃ মৎস্যপুরাণ অবলম্বন করিয়াই এই নাটক রচনা করিয়াছেন। বিক্রমোর্বশীয়ের দুই রকম পাঠ দৃষ্ট হয়। উত্তরভারতীয় পাঠ (বঙ্গীয় ও

দেবনাগর) ও দাক্ষিণাত্যের পাঠের পার্থক্য আছে। দাক্ষিণাত্যপাঠের রাজা কুমারগিরির মন্ত্রী কাটয়বেমকৃত ব্যাখ্যা আছে (১৪০০ খৃঃ)। উত্তর-ভারতীয় পাঠের রঙ্গনাথকৃত ব্যাখ্যা আছে (১৬৫৬ খৃঃ)।

বিক্রমোর্বশীয় নাটকে পুরূরবা ও উর্বশীর উন্মত্ত প্রেমের চিত্রপট আছে। উভয়েরই অসীম তীব্র লালসা ; উর্বশীতেই ঐরূপ প্রেমোন্মাদ শোভা পায়। মানবজীবনে ঐরূপ উন্মত্ততা শোভা পায় না। কার্তিকেয়ের অকলুষবনে রমণীগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পুরূরবা উদয়বতী নামক বিদ্যাধরবালার প্রতি সোৎসুক দৃষ্টিপাত করায় উর্বশী অভিমানভরে অকলুষবনে প্রবেশ করিবামাত্র একটি লতিকায় পরিণত হইল। পুরূরবা উর্বশীর জন্য দিগদিগন্তে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে পুরূরবা উন্মত্তপ্রায় হইয়া সকলের নিকট উর্বশীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাজা করুণ গাথা গাহিয়া গাহিয়া ময়ূর, কোকিল, হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, হস্তী, পর্বত, নদী, হরিণ সকলকেই উর্বশীর অনুসন্ধান চাহিলেন। ঐ প্রমত্তগাথা সংস্কৃতসাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। পুরূরবার ঐ করুণগাথা ভাগবতের দশমস্কন্ধের কৃষ্ণবিরহে রাধিকা-বিলাপের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রাজ্ঞী ঔশীনরীর চরিত্র অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। রাজ্ঞীর ন্যায় তাঁহার পদমর্যাদাগৌরব আছে। তাঁহার অম্লানজ্যোতিতে ব্যভিচারী রাজা দীপ্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

অভিজ্ঞানশকুন্তল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাসের কবিত্বের চরমোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই নাটকখানি তিনি শেষ জীবনে রচনা করিয়াছিলেন। শকুন্তলা কেবল ভারতেই শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া আদরণীয় হয় নাই, উহা জার্মানদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক গেটে ও শিলার প্রভৃতির মর্ম স্পর্শ করিয়াছে এবং তাঁহারা মুক্তহৃদয়ে শকুন্তলার যশঃ কীর্তন করিয়াছেন।

ভরতবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়াউপলক্ষে মালিনীতীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়া কণ্বমুনির পালিতাকন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। কণ্বের অনুপস্থিতিকালে রাজা শকুন্তলাকে গান্ধর্ববিবাহ করিয়া তাঁহাকে একটি অঙ্গুরীয় (অভিজ্ঞানস্বরূপে) দিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। শকুন্তলা অনন্যমানসা হইয়া দুষ্মন্তের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। কোপনস্বভাব দুর্বাসা অতিথিসৎকারের ত্রুটিতে শকুন্তলাকে অভিশাপ দিলেন।

ঐ অভিশাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইলেন। কণ্বমুনি ঐ গান্ধর্ববিবাহ ও শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার জানিয়া শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইলেন। রাজা দুর্বাসার অভিশাপে শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না ও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পথিমধ্যে অভিজ্ঞানঅঙ্গুরীয়ক হারাইয়া গিয়াছিল। এক মৎস্য তাহা উদরস্থ করে। মৎস্যজীবীর নিকট ঐ অঙ্গুরীয়ক পাওয়া গেলে তাহা রাজসমীপে আনীত হয়। তখন রাজা পূর্বস্মৃতি লাভ করিয়া মর্মাহত হন। পরে ইন্দ্রালয় হইতে ফিরিবার সময় হেমকূটে কশ্যপমুনির আশ্রমে শকুন্তলার পুত্রকে দেখিয়া নিজসন্তান বলিয়া অনুমান করেন। তথায় শকুন্তলার সহিত মিলন হয়। সম্ভবতঃ কালিদাস পদ্মপুরাণ-বর্ণিত আখ্যানই গ্রহণ করিয়াছেন। এই আখ্যানই কালিদাসের তুলিকাস্পর্শে শ্রেষ্ঠতম নাটকে পরিণত হইয়াছে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির অমূল্যরত্ন শকুন্তলারও পাঠের বৈষম্য আছে। ৪টি পৃথক পাঠ দৃষ্ট হয়, বঙ্গীয়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয়, কাশ্মীরীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয়। ইহা ব্যতীত প্রাদেশিক পাঠের মধ্যেও কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। বঙ্গীয় পাঠের শঙ্কর, চন্দ্রশেখরকৃত ব্যাখ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় পাঠের রাঘবভট্টকৃত ব্যাখ্যা, দক্ষিণভারতীয়পাঠের কাটয়বেমকৃতব্যাখ্যা, ও অভিরামকৃত ব্যাখ্যা আছে। কাশ্মীরীয় পাঠে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় পাঠ অপেক্ষা ৭ম অঙ্কের প্রারম্ভে কিছু বেশী আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্ পাঠ প্রকৃত তাহা নির্ণয় করা যায় না।

একটি প্রচলিত শ্লোকে শকুন্তলার দেশীয়মতে সমালোচনা আছে।

"কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্
তত্রাপি চ চতুর্থাঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা"

এই শ্লোকটির রচয়িতা একদেশদর্শী হইয়া কেবল করুণরসেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। স্নেহপালিতা কন্যাকে বিদায় দিবার সময় একদিকে কর্তব্য, অপরদিকে অবরুদ্ধ মর্মান্তিক বেদনা এই উভয়ের সংঘাতে যে বিপ্লব উপস্থিত হয় তাহা ভারতীয় নরনারীর হৃদয়স্পর্শ না করিয়াই পারে না। কিন্তু শকুন্তলার বিদায়কালে সমস্ত প্রকৃতি ব্যাপিয়া এই মর্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। মৃগ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, পুষ্পগুচ্ছ আজ সকলেই শকুন্তলার এই বিদায়ে জাগরিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সংসারবিরাগী কণ্বঋষির স্নেহসিন্ধু আজ উথলিয়া উঠিয়াছে। তিনি ব্যথিতহৃদয়ে সকল বনবাসি-

বন্ধুদিগকে বিদায় দিতে বলিতেছেন, তাহার প্রতিধ্বনিতে "কোকিলরবং সূচয়িত্বা" অশ্রুবন্যাসিক্ত কোকিলও বিদায় সঙ্গীত গাহিতেছে। সমস্ত মূক প্রকৃতিতে আজ অনুভূতি-জাগরিত হইয়াছে।

কেবল এই করুণরসেই যে কালিদাস কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা নহে। শকুন্তলার প্রত্যেকটি চরিত্র এরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে যে তাহার সমালোচনা এই স্থলে সম্ভবপর নহে। সবগুলি চিত্রই আলোকচিত্রের ন্যায় স্বাভাবিক। সমশ্রেণীর যুগ্মচিত্রে উহা আরও মনোহর হইয়াছে। কণ্ব ও দুর্বাসা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত এইগুলির মধ্যে পরস্পরের তুলনায় চিত্রগৌরব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দিঙ্‌নাগ। রামকৃষ্ণকবি ও রামনাথশাস্ত্রী **কুন্দমালা** নামক একখানি প্রাচীন নাটক মুদ্রিত করিয়াছেন। ঐ নাটকখানি বৌদ্ধাচার্য কবি দিঙ্‌নাগ রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহীশূরের রাজপুস্তকাগারে প্রাপ্ত হস্তলিপিগ্রন্থে রচয়িতা কবির নাম দিঙ্‌নাগ ও তাঁহার নিবাসস্থান অরাবালপুর লিখিত আছে। কিন্তু তাঞ্জোর পুস্তকাগারে প্রাপ্ত হস্তলিপি-গ্রন্থে কবির নাম "ধীরনাগ" ও নিবাসস্থান "অনূপরাধ" লিখিত আছে। বল্লভদেবের সুভাষিতাবলীতে ইহার একটি শ্লোক দিঙ্‌নাগের বলিয়া উল্লেখ আছে। সাহিত্যদর্পণাদিতে কুন্দমালার উল্লেখ আছে। মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায় দিঙ্‌নাগকে কালিদাসের প্রতিপক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মল্লিনাথের ঐ মত দক্ষিণাবর্তের (১১শ শতাব্দী) মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক উই (Ui) বলেন দিঙ্‌নাগ ৫ম শতাব্দীর প্রথমপাদে বিদ্যমান ছিলেন। রামকৃষ্ণকবি ও রামনাথ শাস্ত্রী দিঙ্‌নাগকে কালিদাসের সমকালীন বলিতে চাহেন।

কুন্দমালা নাটকের ৬টি অঙ্ক আছে। সীতার বনবাসই ঐ নাটকের বিষয়। নির্বাসিতা সীতা বাল্মীকির আশ্রমে যাইবার সময় ভাগীরথীর নিকট প্রার্থনা করেন, কুশলে পুত্রপ্রসব হইলে তিনি প্রতিদিন কুন্দপুষ্পমালা ভাগীরথীকে উপহার দিবেন। তদনুসারে নাটকের নাম হইয়াছে কুন্দমালা। দিঙ্‌নাগ ও ভবভূতি উভয়েই সীতার বনবাস ঘটনাবলম্বনে নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। উভয় নাটকেই সীতার "দুঃখমূর্তি" অঙ্কিত হইয়াছে এবং করুণরসই প্রধান উপাদান। ভবভূতির সীতার সহিত পার্থিব বা বাস্তব-

জীবনের বিশেষ সৌসাদৃশ্য নাই কিন্তু কুন্দমালার সীতার চরিত্রে মানবজীবনের প্রতিকৃতি আছে। এই দিঙ্নাগ কালিদাসের সমকক্ষ না হইলেও উচ্চশ্রেণীর কবি। তাঁহার তুলিকা সূক্ষ্মরেখা চিত্র না করিলেও "স্থূলহস্তাবলেপ" নহে।

শ্রীহর্ষ।

কালিদাস ও ভবভূতির মধ্যকালে শ্রীহর্ষই নাট্যকাব্যে নিপুণ কবি। এই শ্রীহর্ষ বা হর্ষদেবই কান্যকুব্জের ও স্থাণ্বীশ্বরের ভূপতি। তাঁহার রাজত্বকাল ৬০৫ হইতে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ। তিনিই বাণভট্টের হর্ষচরিতের নায়ক। তিনি সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁহার সভায় বহু কবি সম্মানিত হইতেন। তাঁহার রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্ ভারতে ছিলেন এবং শ্রীহর্ষের রাজত্বকালের বহু সংবাদ তাঁহার বর্ণনায় আছে। "রত্নাবলী" "প্রিয়দর্শিকা" ও "নাগানন্দ" নামক তিনখানি নাটক শ্রীহর্ষরচিত বলিয়া পরিজ্ঞাত। এই তিনখানি নাটক যে একই কবির সম্পদ্ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কেহ কেহ বলেন যে হর্ষদেবের সভাসদ্ ধাবক ঐ নাটকগুলি রচনা করিয়া হর্ষদেবের নিকট বহু অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ধাবকের রচিত নাটক পৃষ্ঠপোষক রাজার নামসংযোগে প্রচলিত হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্ নাগানন্দনাটক হর্ষদেবকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টম শতাব্দীতে দামোদরগুপ্তের কুট্টনীমত-গ্রন্থেও রত্নাবলী জনৈক রাজার বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু বহু পরবর্ত্তী যুগের আলঙ্কারিক মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশে 'অর্থকৃতে' কথার উদাহরণ দিতে বাণভট্ট বা (পাঠান্তরে) ধাবককবির হর্ষদেবের নিকট অর্থপ্রাপ্তির উক্তি আছে। ঐ কিম্বদন্তীর কোন ভিত্তি থাকিলে ইহাই সমীচীন বোধ হয় যে সুপণ্ডিত হর্ষদেব ঐ নাটক কয়েকখানির রচনায় সভাসদ্ কবির বা কবিগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ নাটকগুলি যশোলাভ করিলে তিনি কবিগণকে মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়াছিলেন।

রত্নাবলী। রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা এই দুইখানিই ৪ অঙ্কের নাটিকা। দুই খানিরই নায়ক বৎসরাজ উদয়ন এবং দুইখানিতেই তাঁহার প্রণয়-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সিংহলরাজদুহিতার সহিত বৎসরাজ উদয়নের

পরিণয় এই নাটকের বিষয়। রাজ্ঞী বাসবদত্তার আকস্মিক অগ্নিদাহ সর্বত্র প্রচারিত হইল। সিংহলরাজ তাঁহার দুহিতাকে বৎসরাজের করে সমর্পণ জন্য পাঠাইলেন কিন্তু সমুদ্রপথে তরণী ডুবিয়া গেল। কৌশাম্বীর এক বণিক্ তাহাকে উদ্ধার করিয়া বাসবদত্তার হস্তে অর্পণ করিলেন। তাহার নাম হইল "সাগরিকা"। সাগরিকা বাসবদত্তার অনুচারিণী হইলেন। ক্রমে সাগরিকা ও বৎসরাজ পরস্পর অনুরক্ত হইলেন। রাজ্ঞী বাসবদত্তা সাগরিকাকে কারাগারে বন্দিনী করিলেন। যৌগন্ধরায়ণ কৌশলে এক যাদুকরের সাহায্যে কারাগারে কৃত্রিম অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। রাজা সেই অগ্নি হইতে সাগরিকাকে উদ্ধার করিলেন। সিংহলমন্ত্রী বসুভূতিও সমুদ্রপথে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তিনিও সেই সময় বৎসরাজসভায় আসিয়া সাগরিকাকে সিংহলরাজকন্যা বলিয়া পরিচয় দিলেন। সাগরিকারই প্রকৃত নাম রত্নাবলী।

প্রিয়দর্শিকা। কলিঙ্গরাজ রাজা দৃঢবর্মণের কন্যা প্রিয়দর্শিকার পাণি-গ্রহণপ্রার্থী ছিলেন। দৃঢ়বর্মণ তাহা উপেক্ষা করিয়া বৎসরাজ উদয়নকে কন্যা সমর্পণ করিতে ইচ্ছা কবিলেন। কলিঙ্গবাজ দৃঢ়বর্মণকে যুদ্ধে পবাজিত করিয়া বিতাড়িত করিলেন। রাজদুহিতাকে বিন্ধ্যকেতু আশ্রয় দিলেন। বৎসরাজ-সেনাপতি বিজয়সেন বিন্ধ্যকেতুকে বিনাশ করিলেন। প্রিয়দর্শিকা বৎসরাজের অন্তঃপুরে আনীতা হইলেন। তাঁহার নাম হইল "আরণ্যিকা"। বৎসরাজ ও আরণ্যিকার প্রণয় জন্মিল। (শকুন্তলার ন্যায়) একটি ভ্রমর আরণ্যিকাকে পদ্ম আহরণকালে আক্রমণ করিল। রাজা ঐ আক্রমণ হইতে আরণ্যিকাকে ত্রাণ করিলেন। বৎসরাজ ও বাসবদত্তার বিবাহ ঘটনা অবলম্বনে রচিত একখানি নাটকের অভিনয়ে প্রিয়দর্শিকা বাসবদত্তা সাজিবেন ও মনোরমা বৎসরাজ সাজিবেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে মনোরমার স্থলে বৎসরাজই নিজ পাঠ গ্রহণ করিলেন। অভিনয়কালে বাসবদত্তা উহা বুঝিতে পারিয়া আরণ্যিকাকে কারাগারে পাঠাইলেন। দৃঢ়বর্মণ স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। কারাগারে আরণ্যিকা বিষপান করিলেন। কেবল বৎসরাজই বিষচিকিৎসা জানিতেন। আরণ্যিকাকে বাসবদত্তা রাজসমীপে লইয়া গেলেন। বৎসরাজ তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। বাসবদত্তা পরে জানিতে পারিলেন যে আরণ্যিকা বা প্রিয়-দর্শিকা তাঁহারই ভগিনী। বৎসরাজ প্রিয়দর্শিকার পাণিগ্রহণ করিলেন।

নাগানন্দ। নাগানন্দ ৫ অঙ্কের নাটক। ইহাতে বৌদ্ধ কাহিনী জীমূতবাহনের আত্মত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। বৃহৎকথা হইতে ইহার উপাদান গৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাধররাজপুত্র জীমূতবাহনের সিদ্ধরাজপুত্র মিত্রাবসুর সহিত বন্ধুতা জন্মিল। মিত্রাবসুর ভগিনী মলয়াবতী ও জীমূতবাহনের ভালবাসা জন্মিল। মলয়াবতীকে জীমূতবাহন জানিতেন না। পরে জানিতে পারিয়া মলয়াবতীকে বিবাহ করিলেন। একদিন জীমূতবাহন অস্থিস্তূপ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে সেগুলি গরুড়কে প্রদত্ত নাগ-গণের অস্থিসমূহ। যে দিন শঙ্খচূড় গরুড়ের আহার্য হইয়া গেলেন, মন্দিরে গিয়া জীমূতবাহন শঙ্খচূড়ের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। গরুড় জীমূতবাহনকে বিনাশ করিয়াছিলেন। গৌরী আসিয়া জীমূতবাহনকে পুনর্জীবিত করিলেন। স্বর্গ হইতে অমৃতধারা বর্ষিত হইল, নাগগণও পুনর্জীবিত হইল।

কালিদাসের পূর্ণচন্দ্রদ্যুতিতে শ্রীহর্ষ নিষ্প্রভ নক্ষত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু নাটিকাত্রয়ে শ্রীহর্ষের নিপুণতা দৃষ্ট হয়। তিনি ভাসের নায়ক এবং তাহাতে কালিদাসের ছায়া গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সেগুলির সংমিশ্রণে উপাদেয় বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার হস্তে উদয়ন ধীর-ললিত নায়ক এবং বাসবদত্তা স্ত্রীজনসুলভ ঈর্ষান্বিতা কিন্তু তাঁহার চরিত্রে অনুদারতা নাই। বৌদ্ধযুগপ্রভাবে অলৌকিক ঘটনা কেহ তৎকালে অবিশ্বাস করিতেন না তজ্জন্য অলৌকিকেরও সমাবেশ আছে। হাস্যরসের বিন্যাসে শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি। তাঁহার বিদূষকও উজ্জ্বল মূর্তি। রত্নাবলীতে পিঞ্জরাবদ্ধ বানরের পলায়ন ও শুকপক্ষীব মুক্তি কেহই বিস্মৃত হইতে পারেন না।

নাগানন্দে জীমূতবাহনেব আত্মত্যাগ ও মহত্ত্ব হৃদয় আকর্ষণ করে। বর্ণনাতেও শ্রীহর্ষের বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। তিনি আলঙ্কারিকদিগের মতানুসারে, উদ্যান, আশ্রমপদ, সন্ধ্যা ও গিরিচূড়া ও অরণ্য প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ এবং সুসংযত।

মহেন্দ্রবিক্রম। দাক্ষিণাত্যের পল্লবরাজ মহেন্দ্রবিক্রম হর্ষদেবের সমসাময়িক। তিনি সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে "মত্তবিলাস" নামক একখানি প্রহসন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যেও প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মত প্রচলিত ছিল তাহা মহেন্দ্রবিক্রমের গ্রন্থে লক্ষিত হয়।

ভবভূতি।

"বিদর্ভের কবি তুমি বন্দ্য বসুধার"।

ভবভূতি ভট্টগোপালের পৌত্র এবং নীলকণ্ঠ ও জাতুকর্ণীর পুত্র এবং ভবভূতির সম্পূর্ণ নাম শ্রীকণ্ঠনীলকণ্ঠ। তিনি কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখা-ভুক্ত কাশ্যপগোত্রীয় ঔদুম্বর ব্রাহ্মণ। তিনি জ্ঞাননিধির শিষ্য এবং পদবাক্য-প্রমাণজ্ঞ। কিম্বদন্তী আছে যে তিনি কুমারিলভট্টের শিষ্য ছিলেন কিন্তু ঐ মত ভ্রান্তিমুলক বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাপক কাণে মনে করেন ভবভূতি ও উম্বেকাচার্য একই ব্যক্তি। চিৎসুখী (১৩শ শতাব্দী) তাহাই বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি দক্ষিণাপথের পদ্মপুরবাসী ছিলেন, পরে উজ্জয়িনী ও কান্যকুব্জ রাজসভায় গিয়াছিলেন। মহাবীরচরিতে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। ...তত্র কেচিৎ তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিন উদুম্বর-নামানো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়-যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্তে র্নীলকণ্ঠস্য-আত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণী-পুত্রঃ।

এই পদ্মপুর ভাণ্ডারা জেলায় আমগাঁওন রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ২॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে যে কান্যকুব্জেশ্বর যশোবর্মনদেবের অভিযানকালে ভবভূতি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন,। কাশ্মীর-রাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য যশোবর্মণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন (৭৩৬ খৃঃ)। বাণভট্ট ভবভূতির নাম করেন নাই। বাণভট্ট ভবভূতির পূর্ববর্তী। হর্ষদেবের পুত্র বাক্‌পতিরাজ গৌড়বাহ গ্রন্থকর্তা ভবভূতির সমসাময়িক। তাঁহার গৌড়বহে (৫।৭৯৯) ভবভূতির উল্লেখ করিয়াছেন :—"ভবভূতি-জলনিধি-নির্গত-কাব্যময়-রসকণা ইব স্ফুরন্তি"। আলঙ্কারিকগণের মধ্যে বামনাচার্য ভবভূতির শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তত্ত্বসংগ্রহে মুখবন্ধে ভবভূতির কাল ৬৫৫ হইতে ৭২৫ খৃঃ স্থাপিত হইয়াছে। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে ভবভূতি ৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগ কালে বিদ্যমান থাকা সম্ভব।

তাঁহার তিনখানি নাটকই কালপ্রিয়নাথের উৎসবে অভিনীত হইয়াছিল। ঐ কালপ্রিয়নাথ উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর বলিয়াই বোধ হয়।

মালতীমাধব। মালতী মাধব একখানি প্রকরণ, ১০ অঙ্কে সমাপ্ত। এই প্রকরণখানি উত্তররামচরিতের পূর্বে রচিত তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু মহাবীরচরিতের পূর্বে রচিত কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। মালতীমাধবের মূল উপাখ্যানটি তিনি বৃহৎকথা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু উহাতে কবিও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। পদ্মাবতীর রাজমন্ত্রী ভূরিবসু ও বৈদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাত বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহারা পরস্পর পুত্রকন্যার বিবাহ দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। মালতী ভূরিবসুর কন্যা এবং মাধব দেবরাতের পুত্র। ভূরিবসু মাধবের সহিত মালতীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রাজনর্মসুহৃদ্ নন্দন মালতীকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। মাধবের বন্ধু ছিলেন মকরন্দ এবং নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকা মালতীর সখী হইতেন। মালতী ও মাধবের শিবমন্দিরে সাক্ষাৎ হইল; তথায় মদয়ন্তিকাকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিল, মকরন্দ তাহাকে রক্ষা করিলেন। তাঁহারাও প্রণয়াসক্ত হইলেন। কাপালিক অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা মালতীকে চামুণ্ডা দেবীর নিকট বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিল। মাধব মালতীকে রক্ষা করিলেন ও অঘোরঘণ্টকে বধ করিলেন। কপালকুণ্ডলা প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। নন্দন মালতীকে বিবাহ করিবে স্থির হইল। মালতী বিবাহের পূর্বে শিবমন্দিরে অর্চনা করিতে গেলেন, তথায় মকরন্দ মালতী সাজিলেন এবং মালতী মাধবের সহিত পলাইলেন। বধূ মকরন্দের সহিত নন্দনের বিবাহ হইল। নববধূ নন্দনকে অনাদর করিলেন। ননান্দা মদয়ন্তিকা নববধূকে ভর্ৎসনা করিতে আসিয়া নিজ প্রণয়ীকে চিনিতে পারিলেন ও তাঁহার সহিত পলায়ন করিলেন।

মালতী শিবমন্দির হইতে পলাইতে কপালকুণ্ডলা তাহাকে আহরণ করিল। মাধব খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবসন্ন হইলেন। পরে কামন্দকীশিষ্যা সৌদামিনী মালতীকে কপালকুণ্ডলার হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। উভয় যুগলের শুভমিলন হইল।

মহাবীরচরিত। মহাবীরচরিত রামায়ণের ১৪ বৎসরের ঘটনা অবলম্বনে রচিত ও ৭ অঙ্কে সম্পূর্ণ। রাম ও লক্ষ্মণের তাড়কানিধন হইতে

লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাল্মীকির বর্ণনা ভবভূতি সর্বত্র গ্রহণ করেন নাই। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাম ও লক্ষ্মণ, সীতা ও উর্মিলাকে প্রথম দর্শন করেন, রাবণ সীতার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া মিথিলায় দূত প্রেরণ করেন। ঐ দূত অকৃতকার্য হইয়া আসিলে রাবণ রামের সর্বনাশ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, পরশুরামকে রাবণ উত্তেজিত করে, শূর্পণখা মন্থরা মূর্তিধারণ করে, এইগুলি ভবভূতির কল্পনা। বালিবধঘটনা যে আকারে ভবভূতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও রামায়ণে নাই। ভবভূতি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র অকলঙ্ক রাখিয়াছেন। দেশীয় পণ্ডিতসমাজে এই জনশ্রুতি আছে যে ভবভূতি মহাবীরচরিতের ৫ অঙ্কের ৪৬ শ্লোক পর্যন্ত রচনা করিয়াছেন, অবশিষ্ট অংশ সুব্রহ্মণ্যকবির রচনা।

জামদগ্ন্যপরশুরামের সহিত রামচন্দ্রের, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের, শতানন্দ ও জনক প্রভৃতির সুদীর্ঘ তর্ক ও বাক্‌বিতণ্ডা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। লঙ্কা হইতে পুষ্পকবিমানে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে সেতুবন্ধ হইতে সিদ্ধাশ্রম পর্যন্ত পথে জনস্থান ও দণ্ডকারণ্যের পূর্বস্মৃতি-বিজড়িত বনবাসজীবনের দৃশ্যগুলি একে একে সন্দর্শন, অতি মনোরম চিত্র। কালিদাস ও ভবভূতি দুই মহাকবিই এই দৃশ্য মনোরম তূলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যজগতে উহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

উত্তররামচরিত। উত্তররামচরিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড হইতে গৃহীত। এই নাটকখানি মহাবীরচরিতের শেষাংশ বলিয়াই উহার নাম উত্তরচরিত হইয়াছে। ইহাতেও ভবভূতির কবিকল্পনা আছে। আলেখ্য-দর্শন, আত্রেয়ী ও বনদেবতা বাসন্তীর, তমসা ও মুরলার কথোপকথন, তমসার সহিত সীতার অতীত জীবনের স্থলগুলি পুনরায় দর্শন, আশ্রমপদে জনক ও কৌশল্যার সন্দর্শন, ভরতমুনিকর্তৃক রামায়ণ নাটকাভিনয়, শেষ অঙ্কে রামসীতার মিলন ইত্যাদি এই সকলই ভবভূতির নিজ কৃতিত্ব। ভবভূতি এই নাটকে ১২ বৎসরের ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। অলঙ্কার-রীতি অনুসারে কবিকে বাধ্য হইয়া কথোপকথন স্থলেই বহু ঘটনা শ্রোতৃবর্গের নিকট উপস্থিত করিতে হইয়াছে। উত্তররামচরিত করুণরসের আধার "এতৎকৃতকারুণ্যে কিমন্যথারোদিতিপ্রথা" আলেখ্যদর্শনে বনবাস-জীবনের করুণস্মৃতির রোমন্থন এবং সীতাবিসর্জনের পর শম্বুকবধ উপলক্ষে

দণ্ডকারণ্যে গিয়া সীতাদেবীর স্মৃতিময় দৃশ্যগুলি সন্দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের মর্মভেদী বিলাপ, ভবভূতির করুণরসকে করুণতর করিয়া উঠাইয়াছে।

কালিদাস ও ভবভূতি

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতিই শ্রেষ্ঠ কবি; উভয়েরই কবিত্বশক্তি অতুলনীয়। উভয়েরই নাটকে গভীর ধ্বনি আছে, কিন্তু সাধারণতঃ কালিদাস ব্যঞ্জনাপ্রধান। ভবভূতি শব্দের মুখ্যশক্তিপ্রভাবেই এরূপ চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন যে তাহার তুলনা নাই। কালিদাস যে যুগে ও যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি জীবনের কেবল উজ্জ্বল অংশই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ভারতের সমৃদ্ধিযুগে (গুপ্তরাজগণের সময়ে) কালিদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজানুগ্রহে বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই অনুমান সত্য হউক বা না হউক তাঁহার কাব্যে ও নাটকে যে এক অবিরাম বিমল আনন্দ ও শান্তিধারা প্রবাহিত হয়, তাহাতে স্বতঃই মনে হয় আনন্দ ও সুখই তাঁহার অন্তরের ভিত্তিভূমি ছিল; তাঁহার হৃদয়ে দুঃখ গভীর চিহ্ন রাখিতে পারিত না। সময়োচিতভাবে দুঃখ বা কারুণ্য আগন্তুকের ন্যায় আসিত, তাহার বিকাশ হইত, চলিয়া যাইত কিন্তু মর্মে মর্মে ক্ষোদিত শিলালিপির ন্যায় চিহ্ন রাখিত না। তিনি দুঃখের বোঝা ফেলিয়া দিয়া বিদূষকের সহিত হাসিতে পারিতেন তাই তাঁহার বিদূষক আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে। কিন্তু ভবভূতির জীবনের ভিত্তি দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কখনই দুঃখের ভার এড়াইতে পারেন না। দুঃখ ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁহাকে অনুসরণ করে। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ভারতের অবনতিযুগ, রাষ্ট্রীয়গগন মেঘাচ্ছন্ন, বৌদ্ধধর্মের অবসাদযুগে নানাপ্রকার ভীষণ ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য উপস্থিত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ ভবভূতি জীবনে যথোচিত সম্মান, আদর, সহানুভূতি এবং সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। কখনও উজ্জয়িনীতে, কখনও কান্যকুব্জে ছিলেন কিন্তু কোনও সুখাবহ পরিণামই দর্শন করেন নাই। তাঁহার "জীবনকুসুম" সম্ভবতঃ চিরদিনই "ম্লান" রহিয়া গিয়াছিল। তিনি সহানুভূতি না পাইয়া মালতিমাধবে গভীর দুঃখসহকারে বলিয়াছেন;—

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

ভবভূতি দুঃখলেশশূন্য বিমল সুখ অনুভব করেন নাই, তাঁহার অতি তৃপ্তিপ্রদ সুখের অন্তরালেও দুঃখের ছায়া আছে, সেইজন্য ভবভূতি মুখ্যতঃ করুণরসের প্রধান কবি। তাঁহার অঙ্কিত তৃপ্তি, সুখ ও আনন্দের মধ্যেও বিষাদচিহ্ন থাকিয়া যায়। আর এই বিষাদচিত্রেই তিনি সিদ্ধহস্ত। সুদীর্ঘ ক্লিষ্ট জীবনের পর রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। জনক-তনয়ার সহিত বিশ্রামসুখের মধ্যেও রামচন্দ্রের মুখে আমরা শুনিতে পাই "সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা", "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

উত্তরচরিতের আলেখ্যদর্শনাঙ্ক সংস্কৃতসাহিত্যে অতুলনীয় ও অভিনব সৃষ্টি। কৈশোরজীবনের মর্ম্মভেদী দুঃখময় দৃশ্যপটগুলি একে একে আস্তৃত হইয়াছে। সুখময় জীবনভূমিতেও দুঃখ বারিধারায় অভিষেক। ভবভূতির স্নেহ, প্রেম ও বন্ধুত্ব বড় গভীর। আর যাঁহারা যত স্নেহশীল তাঁহাদিগের হৃদয় ততই দুঃখ ও আশঙ্কার আগার হইয়া দাঁড়ায়।

বাল্মীকির সীতাবিসর্জন পাঠ করিয়াই কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। ভবভূতি ঐ কারুণ্যের বিশ্লেষণে তাঁহার সকল সামর্থ্য কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। পুঞ্জীভূত পাষাণ বিদীর্ণ করিয়া রামচন্দ্রের অগাধ পত্নীপ্রেম ও অতল দুঃখপ্রবাহ নিঃসৃত হইয়াছে। বাসন্তীর তিরস্কারে, লব-কুশের কথোপকথনে রামচন্দ্রের বিষাদসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশে এই কারুণ্যমন্দাকিনীস্রোত উভয় কূল ভাসাইয়া চলিয়াছে কিন্তু ভবভূতির উত্তালসিন্ধুর ন্যায় তাহা অতলস্পর্শী হয় নাই। উত্তররামচরিতের "দুঃখমূর্তি" সীতার দুঃখে পাষাণও গলিয়া যায়—"এতৎকৃতকারুণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা।"*

* ভবভূতেঃ সম্বন্ধাদ্ ভূধরভূরেব ভারতী ভাতি।
এতৎকৃতকারুণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা॥
—গোবর্দ্ধনাচার্য।

কালিদাস নগর, রাজসভা, স্বয়ম্বর সিন্ধু, বিমানযাত্রা, ষড়ঋতু, শকুন্তলা-বিদায় প্রভৃতি সকলই বর্ণনা করিয়াছেন এবং সে বর্ণনা অতি মনোহর। কালিদাস প্রকৃতিদেবীর মনোরম মূর্তিই অনাবৃত করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু ভবভূতি প্রকৃতির ভীষণ ও প্রশান্ত গম্ভীরমূর্তি সন্দর্শন করিয়াছেন। দণ্ডকারণ্যের দৃশ্যগুলির বর্ণনায় ঐ প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি প্রতিফলিত হইয়াছে।

কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে বৈদর্ভীরীতি অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ সূক্ষ্মার্থপ্রকাশার্থী ভবভূতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরার্থ-দ্যোতক গৌড়ীরীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি যে স্থানে বৈদর্ভীরীতি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও মনোরম হইয়াছে।

ভবভূতির পৃষ্ঠপোষক কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মণের রচিত "রামাভ্যুদয়" নামক নাটকের নাম আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন, ধনিক ও বিশ্বনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ নাটকখানি এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

বিশাখদত্ত বা বিশাখদেব

বিশাখদত্ত বা বিশাখদেব মহারাজ ভাস্করদত্তের পুত্র ও বটেশ্বর দত্তের পৌত্র। তিনি কোন শতাব্দীর কবি তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। ভরতবাক্যে চন্দ্রগুপ্তের নাম আছে কিন্তু চন্দ্রগুপ্তই ঐ নাটকের নায়ক এরূপ অবস্থায় উহা হইতে কোন অনুমানই সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু এই পাঠ লইয়াই বৈষম্য আছে। পাঠান্তরে চন্দ্রগুপ্ত স্থলে অবন্তিবর্মন্, দন্তিবর্মন ও রন্তিবর্মন্ পাঠ দৃষ্ট হয়। অবন্তিবর্মন্ পাঠ শুদ্ধ হইলে তিনি মৌখরীরাজ অবন্তিবর্মণ হওয়া সম্ভব। তাঁহার রাজত্বকাল ৮৫৫-৮৮৩ খৃঃ। জেকবি বলেন মুদ্রারাক্ষসে যে গ্রহণের উল্লেখ আছে তাহা ৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বরের গ্রহণ। অবন্তিবর্মন্‌পাঠের সহিত উহার ঐক্য আছে। ঐ মত বিশেষ বিবেচ্য। অধ্যাপক কনো বলেন, চন্দ্রগুপ্ত পাঠই শুদ্ধ এবং এই চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তবংশীয় বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত এই অনুমানের কোন ভিত্তি নাই।

মুদ্রারাক্ষস। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস সংস্কৃতসাহিত্যে এক নূতন শ্রেণীর নাটক। এক রাজনৈতিক বিপ্লব অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। চাণক্যপণ্ডিতের কূট রাজনৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মৌর্য্যবংশ স্থাপন করেন। তাহাই এই নাটকের বিষয়।

ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে বিশাখদত্ত এই নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। ৭ অঙ্কে সম্পূর্ণ। কবির ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও ওজস্বী। চরিত্রগুলি পরিস্ফুট। চাণক্য, রাক্ষস ও চন্দ্রগুপ্ত এ সকলই যেন জীবন্ত চিত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ রাজনৈতিক নাটক আর নাই।

ভট্টনারায়ণ। **বেণীসংহার।** কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন ভট্টনারায়ণ তাঁহার অন্যতম। তাঁহার "মৃগরাজ" উপাধি ছিল। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, "শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃকবিঃ।" ভট্টনারায়ণের কাল সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা কঠিন। অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বলেন যে একটি তাম্রশাসন অনুসারে তাঁহার কাল ৮৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ণয় করা যায়। আদিশূর ৬৭১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।* আলঙ্কারিক বামনাচার্য্য ও আনন্দবর্ধন (৯ম শতাব্দী) ভট্টনারায়ণের বেণী-সংহার হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ভট্টনারায়ণ নিশ্চয়ই অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী ; বঙ্গীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী দ্বারাও উহাই সমর্থিত হয়। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়া লাঞ্ছনা করায় ভীম যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহাই প্রতিপালন করিয়া দুঃশাসনের রক্তাক্তহস্তে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন (সংহার) করিয়া দিয়াছিলেন মহাভারতের এই ঘটনা অবলম্বনে ৬টি অঙ্কে এই নাটক রচিত। ইহা সংস্কৃত-সাহিত্যে বীররসপ্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আলঙ্কারিকগণ সর্বান্তঃকরণে এই নাটকের প্রশংসা করিতে পারেন নাই। ভবভূতির ন্যায় দীর্ঘসমাসবহুলতা ও বাগাড়ম্বরের অভাব নাই।

অনঙ্গহর্ষ

৮ম শতাব্দীতে অনঙ্গহর্ষ **তাপসবৎসরাজ** নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ধ্বন্যালোকে ও ধ্বন্যালোকলোচনে ঐ নাটকের উল্লেখ আছে। বৎসরাজ উদয়নের আখ্যান অবলম্বনে রচিত। বাসবদত্তা দগ্ধ হইয়া মরিয়াছেন সংবাদে বৎসরাজ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই অতিরিক্ত ঘটনা সন্নিবেশিত হওয়ায় ঐ নাটকের নাম "তাপসবৎসরাজ" হইয়াছে।

* প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন আদিশূরের অভ্যুদয়কাল ৭৩২—৭৮২ খৃষ্টাব্দ। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১০৭—১০৮ পৃষ্ঠা।

মায়ুরাজ

কালাচুরিরাজ মায়ুরাজ "উদাত্তরাঘব" নামে এক নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ নাটকে তিনি রামচন্দ্রের গুপ্তভাবে বালিবধ ঘটনাটি অবলম্বন না করিয়া তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়াছেন।

মুরারি

মুরারি, শ্রীবর্দ্ধমানক ও তন্তুমতী দেবীর পুত্র। তিনি সগর্বে নিজেকে "বালবাল্মীকি" অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ভবভূতির পরবর্তী ও কাশ্মীরি কবি রত্নাকরের পূর্ববর্তী। রত্নাকর নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। রত্নাকর কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মণের রাজত্বকালে (৮৫৫—৮৮৪ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন। মুরারির অর্বাচীন সীমা উহাই ধরা যাইতে পারে। তাঁহার রচিত **অনর্ঘরাঘব** নাটক প্রসিদ্ধ। উহাতে মুরারি ভবভূতির মহাবীরচরিতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্তু আদৌ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

রাজশেখর।

রাজশেখর মহারাষ্ট্রীয় যাযাবর ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম দুহিক এবং মাতার নাম শীলাবতী। তাঁহার সহধর্মিণীর নাম অবন্তিসুন্দরী। রাজশেখর তাঁহাকে "চৌহানকুলমুকুটমণি" অভিধা দিয়াছেন। তিনি অতি বিদুষী মহিলা। রাজশেখর কাব্যমীমাংসা নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে তাঁহার স্ত্রী অবন্তিসুন্দরীর অলঙ্কারমতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর অনুরোধেই র্বপ্রথম কর্পূরমঞ্জরী নাটক প্রণয়ন করেন। তিনি নির্ভয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই নির্ভয়ই কান্যকুব্জেশ্বর প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল (৮৯৩-৯০৭ খৃঃ)। ম্ভবতঃ কিছুকালের জন্য তিনি মহেন্দ্রপালের রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া গিয়া কালাচুরিরাজের সভায় ছিলেন এবং তথায় তিনি বিদ্ধশালভঞ্জিকা চনা করিয়াছিলেন এবং পুনরায় তিনি মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপালের রাজভায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। মহীপালের অনুরোধেই বাল-ভারত রচনা আরম্ভ করেন কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই।

বালরামায়ণ। অতি বিস্তীর্ণ নাটক। ১০ অঙ্কে সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি

অঙ্কই একখানি ক্ষুদ্র নাটিকার তুল্য। এরূপ অমিতভাষী কবি আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামায়ণ অবলম্বনে এই নাটক রচিত। গ্রন্থকার বহু আত্মশ্লাঘা করিয়াছেন কিন্তু কবিসম্পদের তিনি কোনও গৌরব করিতে পারেন না।

বালভারত। এই নাটকখানি অসম্পূর্ণ। মহাভারত হইতে নাটকটি গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও কৌরব-সভায় অক্ষক্রীড়া ও দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

কর্পূরমঞ্জরী। নাটিকাখানি সম্পূর্ণ প্রাকৃতভাষায় রচিত। তজ্জন্য ইহাকে সট্টক বলা যায়। এই নাটিকাখানি তাঁহার স্ত্রী **অবন্তিসুন্দরীর** অনুরোধে রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা। চন্দ্রবর্মণের কন্যা মৃগাঙ্কাবলীর শালভঞ্জিকা (ক্ষোদিত প্রস্তরমূর্তি) বিদ্যাধরমল্ল দেখিয়াছিলেন তদনুসারেই এই নাটিকার নাম হইয়াছে। এই নাটিকাতেও কোন নৈপুণ্য দৃষ্ট হয় না।

চরিত্র অঙ্কনে বা নাট্যকুশলতায় রাজশেখরের কোন বিশেষত্ব নাই। তাঁহার অমিতভাষিতায় নাটকগুলি অতিশয় ক্লান্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু নানাবিধ ছন্দের ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত। শার্দূলবিক্রীড়িত, বসন্ত-তিলক, স্রগ্ধরা প্রভৃতি দুর্লভ ছন্দ তিনি অবলীলাক্রমে বিন্যাস করিয়াছেন। তিনি নাট্যপ্রতিভায় বিশেষ সম্পদশালী না হইলেও তাঁহার বহু শ্লোক, ছন্দঃ ও কবিত্ব হিসাবে যশঃ অর্জন করিয়াছে।

ক্ষেমীশ্বর।

কান্যকুব্জরাজ মহীপালের জন্য ক্ষেমীশ্বর "চণ্ডকৌশিক" নাটক রচনা করেন। উহা ব্যতীত তিনি "নৈষধানন্দ" নামক ৭ অঙ্কে আর একখানি নাটক রচনা করেন। মহীপাল ৯১৪ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষেমীশ্বরের কাল দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়া অবধারণ করা যায়। চণ্ডকৌশিকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান গৃহীত হইয়াছে।

দামোদর মিশ্র।

১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দামোদর মিশ্র **মহানাটক** বা "হনুমন্নাটক" রচনা করেন। দামোদর মিশ্র ভোজরাজের সভাসদ্ ছিলেন। কিম্বদন্তী

আছে অঞ্জনানন্দন হনুমান্ এই নাটক প্রণয়ন করেন ও প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত হয়। বাল্মীকির আশঙ্কা হইল যে ঐ নাটক বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার রামায়ণ কেহ পাঠ করিবে না, তজ্জন্য হনুমান্ ঐ প্রস্তরগুলি জলধিগর্ভে ফেলিয়া দেন। মৎস্যজীবিগণ ঐ প্রস্তরগুলি প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে দামোদরমিশ্র মহানাটক সংগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ মহানাটক কোনও প্রাচীন নাটকের ধ্বংসাবশেষ। মহানাটকের দুইপ্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়। মধুসূদনকৃতপাঠ ৯ অঙ্কে ৭৩০ শ্লোকে পরিসমাপ্ত এবং দামোদর মিশ্রের পাঠে ১৪ অঙ্ক ও শ্লোকসংখ্যা ৫৮১। উভয় পাঠে প্রায় ৩০০ শ্লোকের ঐক্য আছে।

কৃষ্ণমিশ্র।

কৃষ্ণমিশ্রের **প্রবোধচন্দ্রোদয়** সংস্কৃত সাহিত্যে এক অভিনব নাটক গ্রন্থ। চন্দেলবংশীয় রাজা কীর্তিবর্মণের সময়ে (১০৪২—১০৯৮ খৃঃ) এই নাটক রচিত হয়। অদ্বৈত বৈষ্ণবমত সমর্থন করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার চরিত্রগুলি দেবতা কিম্বা মানুষ নহে। মানবচিত্তের বৃত্তি বা গুণগুলি যথা বিবেক, মোহ, প্রবোধ, বিদ্যা প্রভৃতি এই নাটকের চরিত্ররূপে অবস্থিত।

পার্থপরাক্রমনাটক। প্রহ্লাদন দেবকৃত (১২শ শতাব্দী)।

কৃষ্ণমিশ্রের অনুকরণে (১৫৫০ খৃঃ) কবিকর্ণপুর "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাতে চৈতন্যদেবের ধর্মমতের প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার যশোলাভ করিতে পারেন নাই।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিক প্রণীত "সঙ্কল্প-সূর্য্যোদয়" নাটক এই নাটকের অনুকরণে রচিত।

বিহ্লন কবি।

বিহ্লন অনিহিলবার বৃদ্ধ রাজা কর্ণদেবের সহিত কর্ণাটরাজ জয়কেশীর দুহিতা মিয়াণল্লদেবীর পরিণয় উপলক্ষে **কর্ণসুন্দরী** নাটিকা প্রণয়ন করেন (১০৮০—১০৯০ খৃঃ)।

জয়দেব।

নৈয়ায়িক জয়দেব কৌণ্ডিন্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মহাদেব এবং মাতার নাম সুমিত্রা। ইনি গীতগোবিন্দের জয়দেব হইতে পৃথক্। কেহ কেহ বলেন পক্ষধরমিশ্রের অপর নাম জয়দেব এবং তিনিই

প্রসন্নরাঘব নাটক রচনা করেন। কিন্তু ঐ মত সমীচীন বোধ হয় না। **প্রসন্নরাঘব** রচয়িতা জয়দেব ১২শ শতাব্দীর কবি। তিনি মুরারির পরবর্তী কিন্তু সিংহভূপালকৃত (১৩৩০ খৃঃ) রসার্ণবসুধাকর ও শার্ঙ্গধরপদ্ধতি এবং সাহিত্যদর্পণের পূর্ববর্তী। পক্ষধর মিশ্র ১৫শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার অসংদিগ্ধ প্রমাণ বিদ্যমান আছে। (দর্শন অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্রহ্লাদনদেবকৃত "পার্থপরাক্রম" নাটক (১২শ শতাব্দী) উল্লেখযোগ্য।

রূপগোস্বামী।

বঙ্গদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের সময় বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থানে যে সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছিল তাহাব ফলে রূপগোস্বামী রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবিষয়ক **বিদগ্ধমাধব** ও **ললিতমাধব** নামে দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত দানকেলীকৌমুদী ভাণশ্রেণীর নাট্যগ্রন্থ।

বামনভট্টবাণ।

বামনভট্টবাণ (১৪০০ খৃঃ) **পার্বতী-পরিণয়** নাটক রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু "বাণ" নাম সংযুক্ত হওয়ায় উহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঐ নাটক কাদম্বরীরচয়িতা বাণভট্টকৃত নহে।

উদ্দণ্ডি।

উদ্দণ্ডিকৃত (১৭০০ খৃঃ) "**মল্লিকামারুত**"ও "দণ্ডি" নামসংযোগে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। উহা কাব্যাদর্শের গ্রন্থকার দণ্ডিবিরচিত নহে।

সংস্কৃত কথ্যভাষা না থাকিলেও যুগে যুগে কবিগণ কাব্য, নাটক ও চম্পূ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি সাদরে গৃহীত হইয়াছে। অধুনাতম অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় এম এ. কবিভূষণ কতকগুলি কাব্য ও মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার "পাণ্ডববিজয়", "হৈহয়বিজয়", "রুক্মিণীহরণ", "সুভদ্রাহরণ", "পরশুরামচরিত" এবং সত্যভামাপরিগ্রহ" উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম গোপন করিয়া ঐ কাব্যগুলি পাঠ করিলে মনে হয় ভারবি বা মাঘের কোন শ্লোক পাঠ করা হইতেছে ও প্রাচীন কাব্যধ্বনি পুনর্জীবিত হইতেছে।

ইহা ছাড়া বর্তমান কালেও মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, কালীপদ তর্কাচার্য, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ বহু কাব্য নাটক রচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

বৈষ্ণব ও তন্ত্রসাহিত্য

বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব কাব্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। ভারতে ৪টি প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে ; (১) শ্রীসম্প্রদায়, (২) হংসসম্প্রদায়, (৩) ব্রহ্মসম্প্রদায় এবং (৪) রুদ্রসম্প্রদায়। শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য রামানুজ। এই সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। হংসসম্প্রদায়ের মুখ্য আচার্য নিম্বার্ক, ইঁহারা দ্বৈতাদ্বৈত মতাবলম্বী। ব্রহ্মসম্প্রদায়ে মধ্বাচার্যই প্রধান আচার্য, ইঁহারা দ্বৈতমতাবলম্বী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ও চৈতন্যদেবের মত এই সম্প্রদায়েরই শাখাভেদ। রুদ্রসম্প্রদায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, বিষ্ণুস্বামী ও বল্লভাচার্য ইঁহাদের প্রধান আচার্য। কিন্তু সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের অনুসরণ-শীল। মহাভারতেব শান্তি-পর্বের নারদীয় অধ্যায়ে এই পাঞ্চরাত্র ধর্মমত আলোচিত হইয়াছে। ভীষ্মপর্বের ৬৬ অধ্যায়ে সাত্বতবিধিব উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতও পাঞ্চরাত্র মতানুসরণশীল। মূলে পাঞ্চরাত্রের ও ভাগবতীয় ধর্মের মতের মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু পরে উভয় মত সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। এই ধর্ম ভক্তিপধান। কথিত আছে শাণ্ডিল্য ঋষি ৪ বেদে পরমশ্রেয়স প্রাপ্ত না হইয়া পাঞ্চরাত্র মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাঞ্চরাত্র মত মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন। সম্ভবতঃ এই মত আর্যাবর্তে উদ্ভূত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র প্রদেশে পাঞ্চরাত্র উপাসনা প্রচলিত ছিল। বাণভট্টেব হর্ষচরিতে ও ভাগবতে পাঞ্চরাত্র-দিগের উল্লেখ আছে। "পৌরাণিকৈঃ সাপ্তন্তবৈঃ শাব্দৈঃ পাঞ্চরাত্রিকৈ রনৈশ্চ" হর্ষচরিত (নির্ণয় সাগর) ২৩৭ পৃঃ। সম্ভবতঃ পাঞ্চরাত্র নামটি নারায়ণের "পঞ্চরাত্র সত্র" কথা হইতে গৃহীত হইয়াছে। অতি প্রাচীন মহাসনৎকুমার সংহিতাতেও ৫টি বিভাগ দৃষ্ট হয়—ব্রহ্ম, শিব, ইন্দ্র, ঋষি ও রাত্র। "রাত্র" শব্দের অর্থ "জ্ঞান" "তন্ত্র" বা "সংহিতা"। তজ্জন্যই বোধ হয় পাঞ্চরাত্রমতানুযায়ী ব্যূহ, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও বিকাশপ্রণালী অধিকাংশ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে **জ্ঞানামৃতসার** বা "নারদীয়পঞ্চরাত্র" প্রকাশিত হইবার পর উহাই পাঞ্চরাত্রমতে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল কিন্তু অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেন ঐ গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ। তিনি "সাত্বতসংহিতা"কে মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিছুদিন পূর্বে মান্দ্রাজ আদিয়ার লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ অটো শ্রেডার **অহির্বুধ্ন-সংহিত** প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অষ্টোত্তরশত সংহিতার উল্লেখ আছে এবং তিনি সর্বশুদ্ধ ২.০ খানি সংহিতার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে **ভাগবতপুরাণই** অতি মান্য গ্রন্থ। পুরাণগুলির মধ্যে কাব্যাংশে ভাগবত পুরাণখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কেহ কেহ মনে করেন ভাগবত পুরাণ আধুনিক গ্রন্থ এবং বোপদেবগোস্বামী (মুগ্ধবোধবর্চয়িতা) উহা রচনা করিয়াছেন; ঐ মত যে ভিত্তিহীন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।* সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই ভাগবতপুরাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় ভাগবতপুরাণের মাধ্বভাষ্য, চিৎসুখভাষ্য, নিম্বার্কভাষ্য ও হনুমদ্‌ভাষ্য ছিল। বোপদেব গোস্বামিকৃত "বিদ্বৎকামধেনু" নামে একখানি ব্যাখ্যা ছিল। তাঁহার "হরিলীলা," "মুক্তাফল" ও "পরমহংসপ্রিয়া" ভাগবতব্যাখ্যা বলিয়া গণ্য। জীবগোস্বামী এই সকল ভাষ্য ও ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহা সম্ভবতঃ কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। ভাগবতপুরাণের "সুবোধিনী", "চূর্ণিকা", "বিজয়ধ্বজ", "বীররাঘব", "শুকপক্ষ" ও বল্লভভট্টরচিত "বালবোধিনী" প্রভৃতি বহু ব্যাখ্যা আছে। শ্রীধরস্বামীর "ভাবার্থদীপিকা" ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর "সারার্থদর্শিনী" নামক টীকা বৈষ্ণব সমাজে অতি আদরণীয় গ্রন্থ। শ্রীধরস্বামীর টীকার উপরেও "ব্যাখ্যালেশ" ও "বুধরঞ্জিনী" নামক টীকা ছিল এরূপ অবগত হওয়া যায়। শ্রীধরস্বামী ভগবদ্গীতার ১৬।৮ শ্লোকে সর্বদর্শনসংগ্রহের শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকা গৌরাঙ্গদেব বিশেষ সম্মান করিতেন এরূপ

---

* রামাশ্রমকৃত "দুর্জনমুখচপেটিকা" "দুর্জনমুখপদ্মপাদুকা" প্রভৃতি প্রবন্ধে ও বালমভট্ট পুরাণ শব্দের টীকায় ভাগবতপুরাণ ঋষিপ্রণীত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কাশীনাথ ভট্ট কৃত "দুর্জন মুখমহাচপেটিকা" উহার প্রত্যুত্তর।

উল্লেখ আছে। তিনি এই উভয় কালের মধ্যবর্তী হইবেন। সর্বদর্শন-সংগ্রহ সায়ণাচার্যের পুত্র মাধবাচার্য প্রণীত। সায়ণাচার্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাধব রচিত নহে। সর্বদর্শন সংগ্রহ ১৪ শতাব্দীর অন্তভাগে অথবা ১৫শ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত হইয়াছিল। শ্রীধর স্বামীর কাল ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হইতে পারে। রাধারমণদাসগোস্বামিকৃত "দীপিকাদীপন" শ্রীধরস্বামীর ভাবার্থদীপিকার উপর সুপ্রসিদ্ধ টীকা। সনাতন গোস্বামীর **বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী** ও জীবগোস্বামীর **ক্রমসন্দর্ভ** ও রূপ গোস্বামীর **বৈষ্ণবতোষণী** ভাগবতপুরাণের দশমাধ্যায়ের অতি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যান। ভাগবতপুরাণে পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের রসময়ী মূর্তি "রাধিকা"র নাম দৃষ্ট হয় না কিন্তু ভাগবত উজ্জ্বলরসে পরিপূর্ণ ও রাধিকার মহাভাবমূর্তি উহাতে প্রকটিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে রাধিকার ও তাঁহার সখীগণের নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপে ক্রমবিকাশ দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব লীলারসের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। রাঢ়দেশের পুংস্কোকিল গীতগোবিন্দে ঐ মধুর রসের সঙ্গীত-লহরী তুলিয়াছেন, উহা সংস্কৃত সাহিত্যে এক ললিত সৃষ্টি। মৈথিল বিদ্যাপতি ও "রাঢ়ী" চণ্ডীদাস ঐ রসভাবে ভরপুর। বিল্বমঙ্গল বা বা লীলাশুক রচিত **শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত** গ্রন্থ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে উহার উল্লেখ আছে। অলঙ্কারমহোদধির উপর গ্রন্থকার নরেন্দ্র প্রভাসুরি স্বয়ং যে টীকা করিয়াছেন তাহাতে কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে অদ্ভুত রসের উদাহরণ দিয়াছেন। নরেন্দ্রপ্রভাসুরি ঐ গ্রন্থ ১২২৬ খৃষ্টে রচনা করেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত সম্ভবতঃ ১২শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকর্ণামৃতের তিনখানি টীকা আছে। গোপাল ভট্টকৃত "কৃষ্ণবল্লভা", চৈতন্যদাসকৃত "সুবোধিনী" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত "সারঙ্গরঙ্গদা"। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই মিথিলার ন্যায়-গৌরবভাস্কর অস্তমিত হইতেছিল। বাসুদেব সার্বভৌমের উজ্জ্বল প্রতিভায় ন্যায়শাস্ত্রের কেন্দ্র নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বেদ ও উপনিষদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল না। ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাগ্‌বিতণ্ডা ও শুষ্কতর্ক বঙ্গের উর্বর মস্তিষ্কগুলিকে সর্বদা আলোড়িত করিতেছিল এবং কতকগুলি স্মার্তনিয়মপ্রতিপালন ও শুচিত্বই মানবধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল। অপরদিকে শাক্ততন্ত্রের বামাচারের বিকৃতিতে শাক্ত উপাসকদিগের বীভৎস তাণ্ডবলীলা জনসমাজের ভীতি ও ঘৃণা উৎপাদন করিতেছিল। লোকসাধারণ

তুস্তর বিষয়পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া কেবলমাত্র স্মার্তদিগেব আদেশ শিবোধার্য করাই ধর্মেব প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণনা কবিত। উপাসনায় কোনও আন্তবিকতা ছিল না। ধর্মের সহিত ভাবজগতেব সংস্পর্শ একবাবে তিবোহিত হইয়া গিয়াছিল। এই গ্লানিব সময়েই **চৈতন্যদেব** (১৪৮৬—১৫৩৩ খৃঃ) নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমজীবনেই সন্ন্যাস অবলম্বন কবিয়া বৈষ্ণব ধর্ম আচবণপূর্বক উহাব প্রচাব আবন্ত কবেন। চৈতন্যদেবেব পূর্বেও গৌডদেশে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসকল বিদিত ছিল, কিন্তু তিনিই তাহাদেব সমষ্টিভূত দেহেব প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনিই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তগুলিকে অনুপ্রাণিতকবিয়া জীবন্তধর্মে পবিণতকবিয়াছিলেন। অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিবাজেব ভাষায় বলিতে গেলে :—"মায়িক দেশ, কাল ও কার্য-কাবণভাবেব উর্ধ্বে, বিবজাব পবপাবে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় চিন্তামণিভূমিতে, নিত্যলীলামণ্ডপমধ্যে, সহস্রকুঞ্জেব অন্তবালে নিভৃতকুঞ্জে, যোগমায়া চক্রেব কেন্দ্রস্থ শূন্যমধ্যে, যে গুহ্যাতিগুহ্য বসতত্ত্ব সহস্রপুটে পুটিত হইয়া ঐশী দৃষ্টিবও অগোচবভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তিনি জগতেব সমক্ষে উন্মুক্ত কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন"। চৈতন্যদেব দক্ষিণাপথ হইতে ব্রহ্মসংহিতা আনয়নপূবক বৈষ্ণবমত দৃঢ কবিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবেব বচিত কোনও গ্রন্থ নাই। তাঁহাব অন্ত্যলীলায় স্বরূপ দামোদবের কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক যে সকল খেদোক্তি কবিয়াছিলেন তাহাই "রসকল্পবল্লী" নামে সংগৃহীত হইয়াছে।

ভক্তিবাদেব এই পুনরুত্থানে চৈতন্যদেবেব পার্ষদেবাও বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। মুখ্যতঃ সনাতনগোস্বামী, তাঁহাব সহোদব রূপগোস্বামী এবং তাঁহাদেব সহোদব বল্লভের (অনুপম) পুত্র জীবগোস্বামী এই ভক্তি-দর্শনশাস্ত্রেব বিশ্লেষণ কবিযাছিলেন। এই অভ্যুত্থানেব দুইটি বিশিষ্টতা দৃষ্ট হয়। প্রথমটি এই যে চৈতন্যদেবেব প্রচাবিত ধর্ম জাতিনির্বিশেষে আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেই গ্রহণ কবিবাব অধিকাবী। দ্বিতীয়তঃ এই ধর্ম জনসাধাবণেব ধর্ম বলিয়া পবিগণিত হওয়ায় প্রত্যেক ধর্মেব অভ্যুত্থানেই যে কাব্যেব স্ফুবণ হইয়া থাকে তাহা প্রাদেশিক ভাষায় হইয়াছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেব পব এবং আধুনিক কাব্যেব পূর্বে একপ মর্মস্পর্শী ভাবপ্রবণ কাব্যযুগ বঙ্গীয় সাহিত্যে নাই। কিন্তু সংস্কৃতভাষা সমগ্র ভারতেব ধর্মগ্রন্থেব ভাষা বলিয়া পবিগণিত হওয়ায় সংস্কৃত মন্দাকিনীতেও এই বিপুল প্রেমবন্যা প্রবাহিত

হইয়াছিল। তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ব্যাকরণ ও দর্শন সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের পরিকর মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার জীবনের ঘটনা ও তাঁহার উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐগুলি কড়চা নামে অভিহিত। মুরারি, স্বরূপ ও রঘুনাথের কড়চা প্রসিদ্ধ। সনাতনের **বৃহদ্ভাগবতামৃত**, জীবগোস্বামীর **সর্বসম্বাদিনী**, **সংকল্প-কল্পদ্রুম** (তাঁহার রচিত শ্রীগোপালচম্পূর অনুক্রমণিকা) ও **ভাগবত-সন্দর্ভ**, জীবগোস্বামীর **ষট্সন্দর্ভ*** ও রূপগোস্বামীর **ভক্তিরসামৃতসিন্ধু** (১৫৪১ খৃঃ) এবং **লঘুভাগবতামৃত**, কৃষ্ণদাস কবিরাজের **গোবিন্দ-লীলামৃত** বৈষ্ণবধর্মের দর্শনশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত। গোপালভট্ট বৈষ্ণব-মতানুযায়ী যে স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহার নাম **হরিভক্তিবিলাস** (১৫৫২ খৃঃ)। উহার "দিগ্দর্শিনী" নামক একখানি টীকা আছে। **ক্রমদীপিকা** ও তাহার টীকা "আনন্দবৃন্দাবন" বৈষ্ণব সাধনতন্ত্র। রূপগোস্বামী **উজ্জ্বলনীলমণি** নামক অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জীবগোস্বামী উহার "লোচনরোচনী" নামে টীকা ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "আনন্দচন্দ্রিকা" নামক টীকা ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রূপগোস্বামী **নাটকচন্দ্রিকা** নামক অলঙ্কারগ্রন্থে দশরূপকের ন্যায় নাট্যালঙ্কারশাস্ত্র বিবৃত করিয়াছেন। **কবিকর্ণপুর** চৈতন্যদেবের পরমভক্ত শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। (১৫১২—১৫৮০ খৃঃ) তিনি **অলঙ্কারকৌস্তুভ** ও তাহার উপর স্বয়ং "কিরণ" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কবিকর্ণপুর "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা", "আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ", "চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য" (১৫৪২ খৃঃ), ও "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটক (১৫৪০ খৃঃ) রচনা করিয়াছেন।

রূপগোস্বামীর **বিদগ্ধমাধব** (১৫৩২ খৃঃ), **ললিতমাধব** (১৫৩৭ খৃঃ), **দানকেলিকৌমুদী** (ভাণিকা) নামক তিনখানি নাটক ও রামানন্দের **জগন্নাথবল্লভ** প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব নাটক।

জীবগোস্বামীরচিত **গোপালচম্পূ** ও কবিকর্ণপুররচিত **আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ** দুইখানি সুদীর্ঘ চম্পূকাব্য।

* জীবগোস্বামীর ভাগবতসন্দর্ভে ৭টি সন্দর্ভ আছে তাহারই ৬টি সন্দর্ভ ষট্সন্দর্ভ নামে খ্যাত।

রূপগোস্বামীর **উদ্ধবসন্দেশ ও হংসদূত** এবং কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌমের **পদাঙ্কদূত** কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে রচিত বৈষ্ণব গীতিকাব্য। কোকিলদূত ও অনিলদূতও ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ। রঘুনাথদাস বিরচিত **দান-চন্দ্রিকা** (খণ্ডকাব্য) ও **মুক্তাচরিত** বৈষ্ণব কাব্যশাস্ত্রে উপাদেয় গ্রন্থ। শেষোক্ত কাব্যে গোপিকাদিগের এক নবীন ভাবের পরিপুষ্টি লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পিতৃধন মণিমুক্তাদিতে ভূষিত হইয়া গোপিকাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা ঐ মুক্তারাশির দুই একটি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সে বাঞ্ছা পূরণ করিলেন না। গোপিকাগণ ক্ষুব্ধ হইয়া মুক্তাসংগ্রহ করিয়া তাহা রোপণপূর্বক মুক্তাফললতা জন্মাইয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। মুর্শিদাবাদ বালুচরের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদেব সার্বভৌম এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার কাল মোটামুটি ১৬২৩ হইতে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দ। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ আছে। "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত", "সংকল্পকল্পদ্রুম", "ঐশ্বর্য-কাদম্বিনী", "মাধুর্যকাদম্বিনী", "রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা", "ভক্তিরসামৃত সিন্ধুবিন্দু", "গৌরাঙ্গলীলামৃত", "স্তবলহরী", "গীতাবলী", "সুবামৃতলহরী", "চমৎকার-চন্দ্রিকা", "প্রেমসম্পুট" ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ভাগবত টীকা, ভগবদ্গীতা টীকা, চৈতন্যচরিতামৃত টীকা, বিদগ্ধমাধব টীকা, ললিতমাধব টীকা, দানকেলিকৌমুদী টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকা, বৈষ্ণব সাহিত্যকে প্রোজ্জ্বল করিয়াছে।

বলদেব বিদ্যাভূষণ। ইনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য উড়িষ্যার রেমুণার নিকটবর্তী খাণ্ডাইত বৈশ্য কুলোদ্ভব। তাঁহার রচিত "গোবিন্দভাষ্য", "গীতাভূষণ", "সিদ্ধান্তরত্ন" (ভাষ্যপীঠক), "চন্দ্রালোক" (গীতগোবিন্দের টীকা), "কাব্যকৌস্তভ", "সিদ্ধান্তদর্পণ" প্রভৃতি গৌড় বৈষ্ণব দর্শনের স্তম্ভ স্বরূপ। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু টীকা রচনা করিয়াছেন (১৭ শতাব্দী শেষপাদ)।

রামকৃষ্ণবিলোমকাব্য বৈষ্ণব সাহিত্যের কাব্যশিল্পের উদাহরণ। উহাতে মাঘ প্রভৃতির ন্যায় ছন্দোনৈপুণ্য ও বর্ণচিত্র লক্ষিত হয়। **শুকরম্ভা-সংবাদ** শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। ইহাতে একদিকে রম্ভার প্রবৃত্তিমার্গের ভোগবিলাসের লুব্ধচিত্র, অপর দিকে শুকের নিবৃত্তিমার্গের চরম কঠোরতা, ত্যাগ ও বৈরাগ্য অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবধর্ম আত্মনিবেদন ও আত্মশ্লাঘবমূলক হওয়ায় উহাতে বহু স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা ও মাহাত্ম্য প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। রূপগোস্বামিকৃত "বৃন্দাদেব্যষ্টক", "শ্রীনন্দনাষ্টক", চাটুপুষ্পাঞ্জলি", "শ্রীমুকুন্দমুক্তাবলী স্তব", "গোবিন্দবিরুদাবলী" ও "মথুরামাহাত্ম্য", সনাতন গোস্বামী রচিত "গীতাবলী", রঘুনাথদাসকৃত "বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তোত্র" প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। শেষ গ্রন্থখানির "রসিকাস্বাদিনী" নামে একখানি টীকা আছে।

তন্ত্র সাহিত্য।

পুরাণগুলির ন্যায় তন্ত্র নামে এক বিস্তীর্ণ সাহিত্য সংস্কৃতে বিদ্যমান আছে। বঙ্গদেশে তন্ত্রের বামাচার মত প্রতিষ্ঠিত থাকায় ও ঐ মতে পঞ্চ "ম"কার (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন) উদ্দেশ্যবিচ্যুত হইয়া বিকৃত ও কুৎসিতভাব ধারণ করায় বহুকাল হইতে তান্ত্রিকধর্ম বঙ্গদেশে ও অন্যান্য স্থানে দুর্নীতিপরায়ণ ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি সার জন উড্রফ প্রভৃতি কতিপয় মনীষী তান্ত্রিক ধর্মের মর্ম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করায় ঐ সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হইয়াছে এবং ভারতীয় ধর্মমতের ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায় পুনর্গঠিত হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ১৩১৭ সালের আশ্বিন সংখ্যক "সাহিত্য সংহিতা"তে তন্ত্রের প্রাচীনত্ব নির্দেশ করেন। "তন্ত্র" শব্দের অর্থ লইয়াই একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। পাণিনিসূত্রের বৃত্তিকার কাশিকাবৃত্তির আরম্ভে বলিয়াছেন "বিপ্রকীর্ণস্য তন্ত্রস্য ক্রিয়তে সারসংগ্রহঃ।" ঐ স্থানে "তন্ত্র"শব্দ "শাস্ত্র"অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ "তন্ত্র"শব্দের ব্যাখ্যায় ন্যাসকার বলিয়াছেন "অথবা তন্ত্র্যন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেনেতি তন্ত্রং ব্যাকরণম্"। কাশিকাকার উণাদিসূত্রের "সর্বধাতুভ্যষ্ট্রন্" ৭।২।৯ সূত্রে "তন্ত্র" শব্দ "তন বিস্তারে ট্রন্" প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়াছেন কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র, আনন্দগিরি, গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি "তন্ত্রি" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। "তন্ত্রি" ধাতু তনধাতুরই প্রসার মাত্র। তাঁহারাও ন্যাসকারের ন্যায় "তন্যতে বিস্তার্য্যতে জ্ঞানমনেন" ইতি "তন্ত্রম্" এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাগমেও ঐ অর্থই স্বীকৃত হইয়াছে :—

"তনোতি বিপুলানর্থান্ তত্ত্বমন্ত্রসমন্বিতান্।
ত্রাণঞ্চ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥"

কালিকাগম। ১

কিন্তু সর্বত্রই "তন্ত্র"শব্দ প্রক্রিয়াবিশিষ্ট শাস্ত্র এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাক্ততন্ত্র বলিলে প্রক্রিয়াসম্বলিত শাক্ত দর্শন বুঝায়। ভারতীয় প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই একখানি দর্শন আছে এবং ঐ দর্শনমত কার্যে পরিণত করিবার একটি আচরণপদ্ধতি বা প্রক্রিয়া আছে। শাক্ততন্ত্রেও ঐরূপ প্রক্রিয়া নির্দেশিত আছে এবং আবশ্যক অনুসারে দর্শনাংশও উক্ত হইয়াছে।

তন্ত্রগুলি বৈদিক কি বেদবাহ্য তাহা লইয়া গুরুতর তর্ক আছে। কেহ কেহ বলেন বৈদিকযুগের অবসানে ও বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে তন্ত্রমত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তন্ত্রমত অশ্রৌত ও বেদবাহ্য। তাঁহারা বলেন যে বৈদিক যুগের অবনতিকালে বহু ব্যয় ও আয়াসসাধ্য দীর্ঘকালব্যাপী সত্রাদি লোকে সম্পাদন করিতে পারিত না, তৎকালেই তান্ত্রিকমত প্রথমে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। একথা সত্য যে বৌদ্ধযুগে বহু তন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছিল এবং সবশেষে বৌদ্ধধর্মে মহাযান মত প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দু ধর্মের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া পুনরায় হিন্দুধর্মে সম্মিলিত হইতেছিল এবং বৌদ্ধতন্ত্র রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিল ও ঐ সকল তন্ত্রাদি হিন্দুসাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তী যুগে হিন্দুতন্ত্র ছিল না এরূপ বলা যায় না। বরং শ্রুতিসিদ্ধ তন্ত্র ছিল এরূপ বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ স্মার্তশিরোমণি কুল্লুকভট্ট তান্ত্রিকমত শ্রৌত নির্দেশ করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিকীর্তিতা"।

শ্রৌত তন্ত্র বিদ্যমান থাকিলেও বহু অশ্রৌত তন্ত্রও বিদ্যমান ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পাঞ্চরাত্র আগম শ্রৌত কিনা তাহা লইয়াই গুরুতর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। শঙ্করাচার্য উহাকে অশ্রৌত বলিয়াছেন, রামানুজ প্রভৃতি উহাকে শ্রৌত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অথর্ববেদের মাত্র পূর্বকাণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহারই উপর সায়ণাচার্য ভাষ্য লিখিয়াছেন। অথর্ববেদের উত্তরকাণ্ড বা সৌভাগ্যকাণ্ড এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত

হয় নাই। উহা আবিষ্কৃত হইলে সাম্প্রদায়িক ধর্মের আচরণ প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের বহু লুপ্ত শৃঙ্খল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যে বেদবিভাগ করিয়াছিলেন তাহাতে সম্ভবতঃ শ্রৌত কর্মকাণ্ডই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং তদনুযায়ী ঋক্, সাম ও যজুঃগুলি সংহিতাকারে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ শ্রৌত কর্মকাণ্ডের বহির্ভূত যে শ্রুতি ছিল তাহা তিনি সম্যক্ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শ্রৌত কর্মকাণ্ডের বহির্ভূত কতকগুলি জীবনের আবশ্যকীয় সূক্ত অথর্ববেদরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল কেবল তাহার পূর্বকাণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রৌত ক্রিয়াকাণ্ডে স্ত্রীশূদ্রাদির কোনও অধিকার দৃষ্ট হয় না। আগমাদিতে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"তেনোক্তং সাত্বতং তন্ত্রং যজ্‌জ্ঞাত্বা মুক্তিভাগ্‌ভবেৎ।
যত্র স্ত্রীশূদ্রদাসানাং সংস্কারো বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ॥"

তন্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ ২ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—আস্তিক (বৈদিক) ও নাস্তিক (বেদবাহ্য)। বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্রগুলি নাস্তিক তন্ত্রের অন্তর্গত, শাবরতন্ত্রও নাস্তিক তন্ত্রের অন্তর্গত। আস্তিক তন্ত্রগুলিকে উপাস্য-দেবতাভেদে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) শাক্ততন্ত্র (২) শৈবতন্ত্র (৩) সৌরতন্ত্র (৪) গাণপত্য ও (৫) বৈষ্ণবতন্ত্র।

তন্ত্রের তিনটি প্রস্থান আছে, (১) দ্বৈত, (২) অদ্বৈত ও (৩) দ্বৈতাদ্বৈত। শাক্ততন্ত্র অদ্বৈতপ্রধান, শৈবতন্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় মতই আছে ; বৈষ্ণব-তন্ত্রে দ্বৈতভাবই প্রধান।

শাক্ততন্ত্রগুলিকে দশমহাবিদ্যা অনুসারে বিভাগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে কালী, তারা ও ষোড়শীতন্ত্রই প্রধান ; অন্যান্য মহাবিদ্যার স্বতন্ত্র কোনও বিশেষ গ্রন্থাদি দৃষ্ট হয় না। কালী, তারা ও ষোড়শী মতের মধ্যে ষোড়শী মতই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, উহার নামান্তর ত্রিপুরাসুন্দরী, ললিতা বা শ্রীবিদ্যা*। এই শ্রীবিদ্যা মতেরই সূত্র, ভাষ্য, দর্শনাদি ও আচার-পদ্ধতির বহু মান্য গ্রন্থ আছে। গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও বল্লভাচার্য ইঁহারা সকলেই শ্রীবিদ্যামতের উপাসক ছিলেন।

*বাৎস্যায়নের কামসূত্রে শ্রীবিদ্যাতন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৭।১।১২।

শাক্ততন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ প্রাচীন আগমগুলি। অগস্ত্যমুনি কৃত **শক্তিসূত্র** মূলগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। দক্ষিণদেশবাসিগণ ২৮খানি আগম স্বীকার করেন তন্মধ্যে মৃগেন্দ্র, মতঙ্গ ও রুরু ইত্যাদি প্রধান। শাক্ত তান্ত্রিকদিগের মধ্যে ২টি মত আছে (১) কৌল ও (২) সময়াচার। চতুঃষষ্টিতন্ত্র কৌলদিগের প্রধান গ্রন্থ। ভাস্কর রায়, রামেশ্বর কবি প্রভৃতি কৌলগণ বাহ্য-ত্রিকোণ বা প্রত্যক্ষ ত্রিকোণে উপাসনা করেন। সময়াচার মতাবলম্বিগণ বাহ্য বা প্রত্যক্ষ ত্রিকোণে উপাসনা করেন না, তাঁহারা সহস্রারে উপাসনা করেন। শাক্ত তান্ত্রিকগণের মধ্যে তিনটি ভাব আছে (১) দিব্য (২) পশু ও (৩) বীরাচার।

কাশ্মীর। তন্ত্রশাস্ত্র কাশ্মীরদেশেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কাশ্মীরে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব তন্ত্র মত প্রচলিত ছিল। কাশ্মীরে শাক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা মতই শৈব মতকে গঠন বা পরিপোষণ করিয়াছে এবং তথায় ঐ দুই মতের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। শ্রীবিদ্যামত সর্বত্রই এক, উহাই প্রাচীন হাদিবিদ্যা।* বামকেশ্বর তন্ত্রের ৫টি অধ্যায় **যোগিনীহৃদয়** নামে খ্যাত। অমৃতানন্দ নাথ (১২শ অথবা ১৩শ শতাব্দী) যোগিনীহৃদয়ের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। পুণ্যানন্দ **কামকলাবিলাস** রচনা করিয়াছেন। ঐ কামকলাবিলাসের উপর নটনানন্দনাথকৃত প্রাচীন টীকা আছে। ভাস্কররায় (১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) **বরিবস্যারহস্য** নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি বরিবস্যা প্রকাশ ও বামকেশ্বর তন্ত্রের অন্তর্গত নিত্য-ষোড়শিকার্ণবের উপর টীকা প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ললিতাসহস্র-নামের, কৌল উপনিষদ্ ও ভাবনা উপনিষদের উপর টীকা রচনা করিয়াছেন। গৌড়পাদকৃত **শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র** ও **সুভগোদয়,** শঙ্করাচার্যকৃত **প্রপঞ্চসার,** পরশুরামকৃত **কল্পসূত্র,** উমানন্দ নাথের **যৌবনোল্লাস,** বিদ্যারণ্য স্বামীর **শ্রীবিদ্যার্ণব** শ্রীবিদ্যামতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পরশুরামের কল্পসূত্রের উপর রামেশ্বরের টীকা আছে। **দক্ষিণামূর্তিসংহিতাও** শ্রীবিদ্যাতন্ত্রের গ্রন্থ। বিমলানন্দের **তারাভক্তিতরঙ্গিণী** উল্লেখযোগ্য।

*প্রাচীনকালে হাদিবিদ্যা ও কাদিবিদ্যা নামে ২ বিদ্যা প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে হাদিবিদ্যাই শ্রীবিদ্যা নামে খ্যাত।

কালীবিদ্যার **কালীতন্ত্র, মহাকালসংহিতা** ও **শ্যামারহস্য** প্রধান গ্রন্থ। এইগুলি বৌদ্ধযুগে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

তারাতন্ত্রের **তারারহস্য, তারাভক্তিসুধার্ণব** ও নিত্যানন্দ বা নারায়ণ-ভট্টকৃত **তারাকল্পলতাপদ্ধতি** প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তারারহস্যের শঙ্করাগমাচার্য কৃত তারারহস্যবৃত্তি নামক টীকা আছে। ইনি বঙ্গদেশবাসী ছিলেন।

দশমহাবিদ্যা বিভাগানুসারে অন্যান্য তন্ত্রের কোনও পৃথক্ দর্শন দৃষ্ট হয় না, কেবলমাত্র পদ্ধতি দৃষ্ট হয়।

বঙ্গদেশ। চতুঃষষ্টিতন্ত্র মধ্যে বঙ্গদেশে কুলার্ণব, ফেৎকারিণী, চীনাচার, কুব্জিকা ও মহানির্বাণ তন্ত্র এবং প্রাণতোষিণী সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কাশ্মীরদেশবাসী অভিনব গুপ্তাচার্যের পরম গুরু ও উৎপলাচার্যের শিষ্য লক্ষ্মণাচার্যকৃত **শারদাতিলক** বঙ্গদেশেও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ পূর্ণানন্দের গুরু ছিলেন। ব্রহ্মানন্দের **শাক্তানন্দতরঙ্গিণী** ও পূর্ণানন্দের **শ্যামারহস্য, তারারহস্য, সময়াচার** বঙ্গীয় তান্ত্রিকসমাজে আদরণীয় গ্রন্থ। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার রচিত **বৃহৎতন্ত্রসার** বঙ্গদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে। রঘুনাথ তর্কবাগীশ (১৬০৯ শক) ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে **আগমতত্ত্ববিলাস** নামক একখানি সংগ্রহ সঙ্কলন করেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পৌত্র গোবিন্দ (শঙ্করস্বামী) **প্রপঞ্চসার, প্রত্যক্ষোক্তি** ও **শাক্তামোদ** রচনা করিয়াছেন। ত্রিপুরারাজ কর্তৃক **সর্বোল্লাস** নামক গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। নাগভট্টের **ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়** বঙ্গে প্রচলিত আছে। রাজা দেবনন্দন সিংহ কর্তৃক সংগৃহীত **শাক্তপ্রমোদ** ও নেপালরাজ প্রতাপসিংহকৃত **পুরশ্চর্য্যার্ণব** বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে।

দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে মহীধরকৃত **মন্ত্রমহোদধি, মন্ত্রমুক্তাবলী** ও **মন্ত্রমহার্ণব** অন্যান্য গ্রন্থের সহিত সমাদৃত হইয়া থাকে।

শৈবতন্ত্র।

কাশ্মীর ও দক্ষিণ দেশে শৈবতন্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ হইয়াছিল। উহাতে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রস্থানই আছে। শ্রীবিদ্যামতই শৈবমত গঠন করায় কাশ্মীরে শৈবতন্ত্রের সহিত শ্রীবিদ্যামতের বিশেষ পার্থক্য নাই। শৈবদর্শনের

উপর শৈবতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। প্রধানতঃ কাশ্মীরে (১) শৈব, (২) বীরশৈব, (৩) সিদ্ধান্তশৈব ও (৪) পাশুপত এই চারিটি সম্প্রদায় ভেদ দৃষ্ট হয়।

শৈবগণের বহু গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে **শিবসূত্রই** মূল গ্রন্থ। উহার ক্ষেমরাজ-কৃত (১১শ শতাব্দী) **শিবসূত্রবিমর্শিনী** নামক টীকা আছে। বসুগুপ্তকৃত (৮ম কি ৯ম শতাব্দী) **স্পন্দামৃত** শৈবসম্প্রদায়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কল্লট (৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ) "স্পন্দকারিকা" ও "স্পন্দবৃত্তি" প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ সময়েই সোমদেব **শিবদৃষ্টি** রচনা করেন। ৯ম শতাব্দীর শেষে অথবা ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎপলাচার্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ **প্রত্যভিজ্ঞাকারিকা** ও ১০ম শতাব্দীতে তাঁহার শিষ্য লক্ষ্মণাচার্য "শারদাতিলক" প্রণয়ন করেন। ১১শ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ **স্পন্দবিবৃতি** ও উৎপলবৈষ্ণব **স্পন্দপ্রদীপিকা** রচনা করিয়াছেন। ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে আলঙ্কারিক ও দার্শনিক আচার্য অভিনবগুপ্তপাদ **মালিনীবিজয়বার্তিক, পরাত্রিংশিকাবিবরণ, শিবদৃষ্ট্যালোচনা, প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী** ও **তন্ত্রালোক** প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। অভিনবগুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ (১১শ শতাব্দী) **শিবসূত্রবৃত্তি, শিবসূত্রবিমর্শিনী, প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়, স্পন্দসন্দোহ** ও **স্পন্দনির্ণয়** প্রণয়ন করিয়াছেন। জয়রথকৃত তন্ত্রালোকের টীকা ও শিবোপাধ্যায়কৃত বিজ্ঞানভৈরবতন্ত্রের টীকা উল্লেখযোগ্য।

বীরশৈবাগম।

১১শ শতাব্দীতে শ্রীকরাচার্য বীরশৈবাগম মতানুসারে **ব্রহ্মসূত্রভাষ্য** ও ১২শ শতাব্দীতে মায়ীদেব **অনুভবসূত্র** রচনা করেন।

সিদ্ধান্তশৈব।

সিদ্ধান্তশৈব সম্প্রদায়মতে শ্রীকণ্ঠশিবাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও তদুপরি অপ্পয্যদীক্ষিত টীকা রচনা করিয়াছেন।

পাশুপতশৈব।

পাশুপতশৈবসম্প্রদায়ে ভাসর্বজ্ঞকৃত **গণকারিকা** উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। উপরোক্ত সকল সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলিই তাঁহাদের দার্শনিক গ্রন্থ এবং ঐ দার্শনিকমতের উপরই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শৈবমত প্রতিষ্ঠিত।

বৈষ্ণবতন্ত্র।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের **ক্রমদীপিকা** অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবমতে **রাধাতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র** ও **কৃষ্ণযামলতন্ত্র** মূলগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়।

বঙ্গদেশে বৈষ্ণবতন্ত্রের সমাদর না থাকায় উহা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে।* মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দপ্রভু ও তাঁহাদের পরিকরগণ অনেকেই শ্রীবিদ্যামতের উপাসক ছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দর্শনগুলিতে ঐ শ্রীবিদ্যামত পূর্ণভাবে বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজে তন্ত্রের বিলোপে ঐ সকল দর্শনতত্ত্ব নিবর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ঐ সকল দর্শনতত্ত্বের নানাপ্রকার কুৎসিত ব্যাখ্যার ব্যবহার হইয়া থাকে।

*বিক্রমপুরের অন্তর্গত বুতনীনিবাসী রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু তন্ত্র গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তজ্জন্য বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় খণ্ড

অষ্টম অধ্যায়

অলঙ্কারশাস্ত্র

অলঙ্কারশাস্ত্রের বীজ বৈদিক যুগেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যাস্কের নিরুক্তে উপমা ও রূপকের শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়। তিনি উপমা সম্বন্ধে পূর্বাচার্য গার্গ্যের মত উল্লেখ করিয়াছেন। "তদ্রূপঃ তদ্বর্ণঃ তদ্বৎ তথেত্যুপমা" ৩।১৩। "অথাত উপমা। যদেতৎ তৎসাদৃশ্যমিতি গার্গ্যঃ।" ৩।২২। উপমার শ্রেণীভেদ, কর্মোপমা ভূতোপমা, রূপোপমা, সিদ্ধোপমা, লুপ্তোপমা প্রভৃতি যাস্ক ঋগ্‌বেদ হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্তিকালের প্রসিদ্ধ পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর সমাসপ্রকরণে রূপক ও উপমালঙ্কারের মূল উপাদানগুলির উল্লেখ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ঐ অলঙ্কারগুলির বিশেষ চর্চা ও ভেদবিচার তৎকালে প্রচলিত ছিল। "উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে ২।১।৫৬", "উপমানানি সামান্যবচনৈঃ ২।১।৫৫।" ঐ সূত্রগুলিতে "উপমান", "উপমেয়", "সামান্যধর্ম" প্রভৃতি উপাদানগুলির বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। ঐ শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না থাকায় পাণিনি তাহাদের কোনও সংজ্ঞা দেন নাই। কিন্তু বৈদিকযুগের কোনও অলঙ্কারশাস্ত্র বিদ্যমান নাই।

অগ্নিপুরাণে অলঙ্কারের বিশদ চর্চা দৃষ্ট হয়। ঐ পুরাণে অলঙ্কারের মূল তত্ত্বগুলি সরলভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ৩৪৩ ও ৩৪৪ অধ্যায়ে অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার, উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থালঙ্কার, কাব্যের লক্ষণ (কাব্যং স্ফুরদলঙ্কারং গুণবদ্‌দোষবর্জিতম্‌) আলম্বন, উদ্দীপন বিভাবাদির বিভাগ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। ঐ পুরাণে বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ী ও লাটজা এই চতুর্বিধ রীতির উল্লেখ আছে। কোনও প্রাচীন আলঙ্কারিক অগ্নিপুরাণের উল্লেখ না করায় ঐ অংশ আধুনিক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

ভরতমুনির নাম রামায়ণে দৃষ্ট হয়। তিনিই অলঙ্কার ও নাট্যশাস্ত্রের গুরু। তাঁহার অপর নাম ভরতাচার্য। তাঁহার প্রণীত **নাট্যশাস্ত্র** ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র বলিয়া খ্যাত। ভরতাচার্য তাঁহার পূর্ববর্তী মহাত্মা দ্রুহিণের

মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পূর্বাচার্যগণের মত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ নাট্যশাস্ত্রের যে সংস্করণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা প্রকৃত মূল গ্রন্থ কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। উহাতে পুনরুক্তি প্রভৃতি দোষ আছে। আর্ষগ্রন্থে ঐ সকল দোষ বিদ্যমান থাকে না। কোনও কোনও স্থলের ভাষা প্রাচীন। কোনও অংশের ভাষা নবীন। এই সকল কারণে স্বতঃই বিশ্বাস হয় যে নাট্যশাস্ত্রের যথালব্ধ সংস্করণের বহু স্থান বিকৃত ও স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তথাপি মূল উপাদানগুলি উহাতে নিহিত রহিয়াছে। কোহল, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি আচার্যগণ প্রভ্রষ্ট ও বিচ্ছিন্ন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; সংস্কৃতসাহিত্যে নাটক ও কাব্যের মূলতঃ কোনও পার্থক্য নাই। নাটক দৃশ্যকাব্য। ভরতাচার্যের নাট্যশাস্ত্র কেবল নাটকাধিকারের গ্রন্থ হইলেও উহাতে অলঙ্কারশাস্ত্রের বীজসূত্রগুলি সূচিত হইয়াছে। "স্থায়ীভাব" ও "রস"এর মূলগত পার্থক্য ঐ গ্রন্থে সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

"তত্র রসানেব তাবদ্ ব্যাখ্যাস্যামঃ। নহি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে। তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ"। অলঙ্কারলক্ষণ ১৬শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। "অলঙ্কারৈর্গুণৈশ্চৈব বহুভিঃ সমলঙ্কৃতম্। ভূষণৈরিব বিন্যস্তৈস্তদ্ ভূষণমিতি স্মৃতম্॥" ১৭শ অধ্যায়ে "কাকুস্বর" উক্ত হইয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের মৌলিক তত্ত্বগুলি পরবর্তী রীতিযুগে ছায়ামলিন ও অনাদৃত হইলেও সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষায় ও মণিকারের কষ্টিপাথরে উহার হিরণ্যজ্যোতি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ভট্টলোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক যথাক্রমে মীমাংসা, ন্যায় ও সাংখ্যমতে নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে অভিনবগুপ্ত ঐ নাট্যশাস্ত্রের **"অভিনবভারতী"** নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন।

পরবর্তিকালের আলঙ্কারিকগণকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। দণ্ড্যাচার্য, ভামহ, ভট্টোদ্ভট, রুদ্রট ও বামনকে প্রাচীন আলঙ্কারিক বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের মতে অলঙ্কারই কাব্যের প্রধান অঙ্গ। তন্মধ্যে কেহ কেহ রীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। মধ্যযুগে ধ্বনিকার ব্যঞ্জনাবৃত্তির উপর কাব্যলক্ষণ স্থাপনা করিয়া ধ্বনিনামক কারিকাগ্রন্থ রচনা করেন। আনন্দবর্ধন ঐ ধ্বনিকারিকার "ধ্বন্যালোক" নামক বৃত্তি রচনা করেন এবং অভিনবগুপ্ত "ধ্বন্যালোকলোচন" টীকা রচনা করেন। "ব্যক্তি-

বিবেক”কার নৈয়ায়িক মহিমভট্ট আনন্দবর্ধনের ঐ মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীকে মধ্যযুগের আলঙ্কারিক বলা যাইতে পারে। কাব্য-প্রকাশরচয়িতা মম্মটভট্ট, বিশ্বনাথ কবিরাজ ও জগন্নাথপণ্ডিত প্রভৃতিকে নব্যযুগের আলঙ্কারিক বলা যায়। প্রত্যেক যুগেই আরও বহু আলঙ্কারিক আছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থকারের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

ভামহ।

কেহ কেহ বলেন দণ্ড্যাচার্যের পরেই ভামহকে স্থাপন করা সঙ্গত। ভামহ বৌদ্ধাচার্য ছিলেন। দিঙ্‌নাগের “কল্পনাপোঢ়ম্” এই প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ভামহ “**কাব্যালঙ্কার**” রচনা করিয়াছেন। উদ্ভটভট্ট ভামহের টীকাকার। প্রতীহারেন্দুরাজ উদ্ভটালঙ্কারসারসংগ্রহ লঘুবৃত্তি নামক টীকায় লিখিয়াছেন “স্পষ্টমিদং ভামহবিবরণে ভট্টোদ্ভটেন।” বিদ্যানাথ, রুয্যক, অভিনবগুপ্ত, মম্মটভট্ট প্রভৃতি ভামহকে সসম্মানে উল্লেখ করিয়াছেন। ভট্টোদ্ভট কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের রাজত্বকালে (৭৭৯-৮১৩ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন। ভামহের অলঙ্কার বিভাগ ও ভট্টির ১০ম সর্গের অলঙ্কারগুলির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। পরন্তু পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়াছেন অনুমান হয়।

“ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যম্ উৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া॥ —ভট্টি।
“কাব্যান্যপি যদীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ।
উৎসবঃ সুধিয়ামেব হন্ত দুর্মেধসো হতাঃ॥ —ভামহ।

কিন্তু ভামহ সম্ভবতঃ কাশিকা ন্যাসের মতের উল্লেখ করেন নাই। উহা অপর কোনও ন্যাসের মত হইতে পারে। কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালায় ভামহের মুখবন্ধে অধ্যাপক ধ্রুব বলেন যে ভামহের শ্লোক

“স্বাদুকাব্যরসোন্মিশ্রং শাস্ত্রমপ্যুপযুজ্যতে।
প্রথমালীঢমধবঃ পিবন্তি কটুভেষজম্॥ ৫।৩

লক্ষ্য করিয়াই দণ্ডী বলিয়াছেন “বিচারকর্কশঃ প্রায়স্তেনালীঢেন কিং ফলম্।” এরূপ অবস্থায় ভামহ দণ্ডীর পূর্ববর্তী হইবেন। ভামহের তিনটি শ্লোক শান্তরক্ষিত লক্ষ্য করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ভামহ ৭ম শতাব্দীতে বিদ্যমান থাকিতে পারেন।

রসই কাব্যের মূল তাহা ভামহ অঙ্গীকার করেন না। তাঁহার টীকাকার ভট্টোদ্ভট ও প্রতীহারেন্দুরাজ (৯৫০ খৃঃ) কোনও বিশেষ নূতন তত্ত্বের অবতারণা করেন নাই। দণ্ডাচার্য্যের ন্যায় ভামহও "গুণ" ও "অলঙ্কার"এর কোনও বিশেষ পার্থক্য উপলব্ধি করেন নাই, পি, ভি কাণে ইহাই বলেন; কিন্তু দণ্ড্যাচার্য্য শ্লেষাদি দশ গুণকে বৈদর্ভ মার্গের প্রাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

রুদ্রট, রাজশেখর, বাভট। রুদ্রটের **"রুদ্রটালঙ্কার"** বা **"কাব্যালঙ্কার"** নামক গ্রন্থ আছে। রুদ্রটই অলঙ্কারকে কাব্যের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি রস অস্বীকার করেন না। "তস্মাৎ তৎ কর্ত্তব্যং যত্নেন মহীয়সা রসৈর্যুক্তম্"। রাজশেখর (৯০০ খৃঃ) "কাব্য-মীমাংসা" রচনা করিয়াছেন। বাভট "বাভটালঙ্কার" গ্রন্থের রচয়িতা। বাগ্‌ভট, বাভট হইতে পৃথক ব্যক্তি। বাগ্‌ভটের "কাব্যানুশাসন" নামে অলঙ্কার গ্রন্থ আছে।

দণ্ড্যাচার্য্য।

কাহারও কাহারও মতে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পর দণ্ডাচার্য্যের **কাব্যাদর্শ**ই প্রচলিত অলঙ্কারশাস্ত্রের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন ভামহ দণ্ডাচার্য্যের পূর্ববর্তী। দণ্ড্যাচার্য্যের সময়েও আলঙ্কারিকগণের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদ ছিল। দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে পরমত খণ্ডন করিয়াছেন এবং পূর্বাচার্য্যগণের মতের উল্লেখ করিয়াছেন; ভামহ দণ্ডী অপেক্ষা প্রাচীনতর কিনা তৎসম্বন্ধে গুরুতর বিবাদ আছে। ভিণ্টারনিস্ ভামহকে দণ্ড্যাচার্য্য অপেক্ষা প্রাচীন বলেন কিন্তু ঐ বিষয়ে সকল যুক্তি ও তর্ক অধ্যাপক পি, ভি, কানে উপস্থিত করিয়াও পরিশেষে বলিয়াছেন সম্ভবতঃ দণ্ডী ভামহ অপেক্ষা প্রাচীন। ভামহ মেধাবীর মত অনুসরণ করিয়াছেন, দণ্ডী সম্ভবতঃ মেধাবীর মতই খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা দ্বারাও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ভামহ কর্তৃক ন্যাস হইতে গৃহীত একটি ব্যাকরণমতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উহা কাশিকা ন্যাস বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক কীথও দণ্ড্যাচার্য্যকে ভামহের পূর্ববর্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভামহ ৭০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

দণ্ডী ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোতকরের পরবর্তী। দণ্ডী দশকুমারচরিতে "ন্যায়স্থিতিমিব উদ্দ্যোতকরস্বরূপম্" এই বাক্যদ্বারা স্পষ্টরূপে উদ্দ্যোতকরের উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোতকরকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থাপন করা যায়। দণ্ডী কালিদাস হইতে "লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতীতি" (১।৪৫) ও মৃচ্ছকটিক অথবা ভাস হইতে "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি (২।৩৬২) শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ভূতভাষা-ময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাম্' (১।৩) শ্লোকে গুণাঢ্যের বৃহৎকথার উল্লেখ ও

"মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্॥ ১।৩৪"

শ্লোকে প্রবরসেনের সেতুকাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবরসেন কর্তৃক বিতস্তানদীর উপর সেতুনির্মাণ উপলক্ষে ঐ সেতুকাব্য রচিত হয়। রাজতরঙ্গিণীর মতে প্রবরসেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অবন্তিসুন্দরীকথা দণ্ডিবিরচিত। তাহাতে বাণভট্ট ও ময়ূরের উল্লেখ আছে। পরিচয়স্থলে "কবি ভারবির প্রপৌত্র" বলিয়া উল্লেখ আছে। ভারবি সিংহবিষ্ণু ও দুর্বিনীত রাজদ্বয়ের রাজ্যকালে কাঞ্চীপুরে বিদ্যমান ছিলেন। এরূপ অবস্থায় দণ্ডীর কাল ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালায় ভামহের কাব্যালঙ্কারের মুখবন্ধে অধ্যাপক বটুকনাথ ও বলদেব দেখাইয়াছেন যে ভামহ কাশিকান্যাসের মত উল্লেখ করেন নাই। উহা অপর কোন ন্যাসের মত। ভামহের কয়েকটি শ্লোক দণ্ডী গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক ধ্রুব বলেন যে ভামহের "প্রমথালীঢ়-মধবঃ পিবন্তি কটুভেষজম্" বাক্যের উপর কটাক্ষ করিয়াই দণ্ডী "বিচার কর্কশপ্রায়স্তেনালীঢেন কিং ফলম্" এই তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় দণ্ডাচার্যকে ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করিলে কোনও বৈষম্য দৃষ্ট হয় না।

দণ্ডী কোন্ দেশবাসী ছিলেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার বৈদর্ভী-

রীতির প্রশংসা ও ঐ মতানুসরণ দ্বারা তাঁহাকে মধ্যভারতের বিদর্ভ (বর্তমান বেরার) প্রদেশবাসী বলিয়া অনুমান করা যায়।

রাজশেখর (৯০০ খৃঃ) একটী শ্লোকে দণ্ডিকৃত তিনখানি গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন। ("ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ')। এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে "কাব্যাদর্শ' ও "দশকুমারচরিত' দণ্ডিকৃত। অপর গ্রন্থখানি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ঐ তৃতীয় গ্রন্থ "মৃচ্ছকটিক' কিন্তু উহার কোনও দৃঢ় ভিত্তি নাই। পরন্তু কাব্যাদর্শের শ্লোক—

"ছন্দোবিচিত্যাং সকলস্তৎপ্রপঞ্চো নিদর্শিতঃ।
সা বিদ্য নৌস্তিতীর্ষূণাম গম্ভীরং কাব্যসাগরম্॥'

হইতে স্পষ্টই অনুমান হয় তিনি "ছন্দোবিচিতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বলেন "ছন্দোবিচিতি" কোনও বিশেষ গ্রন্থ নহে, উহা ছন্দঃ-শাস্ত্রের সাধারণ নাম মাত্র। সম্ভবতঃ সুবন্ধুও দণ্ড্যাচার্য্যের এই ছন্দোবিচিতিরই উল্লেখ করিয়াছেন।

দণ্ড্যাচার্যের মতে অলঙ্কার কাব্যের মূলীভূত অঙ্গ নহে। উহা কাব্য-শোভাকর। তিনি বলিয়াছেন, "কাব্যশোভাকরান ধর্মান অলঙ্কারান প্রচক্ষতে"।

রীতি সম্বন্ধে তাঁহার মত নিম্ন শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

"অস্ত্যনেকেগিরাম্ মার্গ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম।
তত্র বৈদর্ভ্যগৌড়ীযৌ বর্ণ্যেতে প্রস্ফুটান্তরৌ॥

বামন।

বামন রীতিসম্প্রদায়ের প্রধান আলঙ্কারিক। তিনি **কাব্যালঙ্কার সূত্র** ও তাহার বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। "কাব্যালঙ্কারসূত্রাণাং স্বেষাংবৃত্তি বিধীয়তে।' বামন ভবভূতির "দোদণ্ডাঞ্চিতচন্দ্রশেখর—' শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত প্রথমোদ্যোতে "বামনাভিপ্রায়েণ অয়মাক্ষেপঃ, ভামহাভিপ্রায়েণ তু সমাসোক্তিরিত্যমুম্ আশয়ং হৃদয়ে গৃহীত্বা সমাসোক্ত্যা-ক্ষেপয়োরিদম্ একম্ এব উদাহরণং ব্যতরদ্ গ্রন্থকৃৎ" উল্লেখদ্বারা আনন্দবর্ধন অপেক্ষা বামনকে প্রাচীনতর বলিয়াছেন। একপ অবস্থায় বামন নবম

শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে বামন কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। "বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ"। কাশিকাকার বামন পৃথক্ ব্যক্তি। তিনি আলঙ্কারিক বামন অপেক্ষা প্রাচীন। বামন-স্থত্রবৃত্তির ৩।২ অধ্যায়ে মৃচ্ছকটিকরচয়িতা শূদ্রকের নাম, অমরুশতকের পদ্যাংশ "দৃষ্টৈকাসনসঙ্গতে (সংস্থিতে) প্রিয়তমে" এই উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বেণীসংহার নাটক হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি কামন্দকী নীতি, কামশাস্ত্র ও ছন্দোবিচিতির নামোল্লেখ করিয়াছেন।

বামন রীতিকেই কাব্যের প্রাণ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" ২।৬ "বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ" ২।৭। অলঙ্কার দ্বারাই কাব্য গ্রাহ্য এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ" ১।১।

মুকুল, প্রতীহারেন্দুরাজ।

মুকুল ও প্রতীহারেন্দুরাজ উভয়ই কাশ্মীরবাসী। মুকুল কল্লটের পুত্র ও প্রতীহারেন্দুরাজের গুরু। মুকুল **"অভিধাবৃত্তিমাতৃকা"** গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের শেষভাগে বলিয়াছেন:—

"ভট্টকল্লটপুত্রেণ মুকুলেন নিরূপিতা।
সূরিপ্রবোধনায়েয়ম্ অভিধাবৃত্তিমাতৃকা॥"

প্রতীহারেন্দুরাজ (৯৫০ খৃঃ) মুকুল সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

"বিদ্বদগ্র্যান্ মুকুলকাদধিগম্য বিবিচ্যতে।
প্রতীহারেন্দুরাজেন কাব্যালঙ্কারসংগ্রহঃ॥"

প্রতীহারেন্দুরাজ কোঙ্কণবাস্তব্য কিন্তু কাশ্মীরে মুকুলের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি "কৌঙ্কণ" বলিয়া পরিচয় কাব্যালঙ্কারসংগ্রহের লঘুবৃত্তির শেষভাগে দিয়াছেন।

"শ্রুত্বা সৌজন্যসিন্ধোর্দ্বিজবর মুকুলাৎ কীর্তিবল্যালবালাৎ।
কাব্যালঙ্কারসারে লঘুবিবৃতিম্ অধাৎ কৌঙ্কণঃ শ্রীন্দুরাজঃ॥"

ধ্বনিকার, আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত।

ধ্বনিকারের প্রকৃত নাম কি তাহা স্থির করা যায় না। অধ্যাপক সোভানি বলেন ধ্বনিকারের প্রকৃত নাম "সহৃদয়"। অভিনবগুপ্ত ১ম উদ্দ্যোতের ১ম শ্লোকের টীকায় কারিকাকারের নাম সহৃদয় চক্রবর্তী উল্লেখ করিয়াছেন। "সহৃদয় চক্রবর্তী খল্বয়ং গ্রন্থকৃদিতি ভাবঃ।" পরন্তু প্রত্যেক উদ্দ্যোতের শেষে "অভিনবগুপ্তোন্মীলিতে সহৃদয়ালোকলোচনে" এবং আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকের চতুর্থ উদ্দ্যোতের শেষে "তদ্‌ব্যাকরোৎ-সহৃদয়োদয়-লাভহেতোরানন্দবর্দ্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ" উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে সোভানির মত সমর্থিত হয়। ধ্বনিগ্রন্থে ১২৯টি কারিকা আছে। ঐ কারিকাগুলির বৃত্তির নাম **ধ্বন্যালোক**। ধ্বনি ও ধ্বন্যালোক একই গ্রন্থকারকৃত কিনা তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। জহ্লনের সূক্তিমুক্তাবলীতে রাজশেখরকৃত উল্লেখ একটি শ্লোকে আছে :—

"ধ্বনিনাতিগম্ভীরেণ কাব্যতত্ত্বনিবেশিনা।
আনন্দবর্দ্ধনঃ কস্য নাসীদানন্দবর্দ্ধনঃ ॥"

এই শ্লোকটি রাজশেখর কর্তৃক রচিত হইলে ধ্বনি ও ধ্বন্যালোক উভয়ই আনন্দবর্দ্ধনকৃত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ধ্বন্যালোকলোচন-রচয়িতা অভিনব-গুপ্ত ১ম উদ্দ্যোত ২২ কারিকা ও ৩য় উদ্দ্যোত ৩৪ কারিকার ব্যাখ্যায় কারিকাকার ও বৃত্তিকারকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ধ্বনিকার ও বৃত্তিকারকে পৃথক্ গ্রন্থকার বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন বোধ হয়। ধ্বনিকার ৯ম শতাব্দীর ১ম ভাগে (৮২০ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন। ব্যঞ্জনাধ্বনিই কাব্যের মূল ইহাই ধ্বনিগ্রন্থের প্রতিপাদ্য। "কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ"। স্ফোটবাদই ধ্বনি সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি। ৯ম শতাব্দীর শেষার্ধে আনন্দবর্দ্ধন কাশ্মীরদেশে অবন্তিবর্মণের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম নোণভট্ট, তাহা আনন্দবর্দ্ধনকৃত দেবীশতকে দৃষ্ট হয়। ধ্বন্যালোকে বেণীসংহার নাটকের নাম দৃষ্ট হয়। ধ্বন্যালোক ধ্বনিকারিকার বৃত্তি। আনন্দবর্দ্ধনের কাল ৮৫৫—৮৮৩ খৃঃ বলা যাইতে পারে।

অভিনবগুপ্তাচার্য (৯৯০—১০২০ খৃঃ) তাঁহার বৃহৎ প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী গ্রন্থের সমাপ্তিবাক্যে "ইতি নবতিতমেঽস্মিন্ বৎসরেঽন্ত্যে যুগাংশে তিথিশশিজলধিস্থে (৪১১৫) মার্গশীর্ষাবসানে" এই শ্লোকে ঐ গ্রন্থের

রচনাকাল ১০১৩ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন। অভিনবগুপ্তের পিতামহের নাম বরাহগুপ্ত এবং পিতার নাম চুখল। তাঁহার পরম গুরু উৎপলাচার্য। অভিনবগুপ্তও লক্ষ্মণগুপ্তের ও প্রতীহারেন্দুরাজের শিষ্য। অভিনবগুপ্ত **ধ্বন্যালোকলোচন** নামক ধ্বন্যালোকব্যাখ্যা রচনা করেন। ধ্বন্যালোকের চন্দ্রিকা নামক একখানি ব্যাখ্যা ছিল উহা অভিনবগুপ্তের পূর্বপুরুষ রচিত।

"কিং লোচনং বিনা লোকে ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি।
তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলন ব্যধাৎ" ॥

চন্দ্রিকার সহিত মতপার্থক্যস্থলে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন "অলং পূর্ববংশ্যৈঃ সহ বিবাদেন"। ধ্বন্যালোকলোচনের উপর উদয়োত্তুঙ্গ কৌমুদী নামক টীকা ১৫শ শতাব্দীতে প্রণয়ন করিয়াছেন। ১১শ শতাব্দীতে বহু গ্রন্থরচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র "**ঔচিত্যবিচারচর্চা**' ও "**কবিকণ্ঠাভরণ**" গ্রন্থে ধ্বনিসম্প্রদায়ের মতই পরিস্ফুট করিয়াছেন।

কুন্তক। কুন্তক (৯৫০-১০২৫ খৃ.) অভিনবগুপ্তের সমসাময়িক। তাহার অপর নাম কুন্তল। তিনি **বক্রোক্তিজীবিত** নামে কারিকাগ্রন্থ এবং তাহার বৃত্তি রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ ৪টি উন্মেষে বিভক্ত। উহাতে কারিকা বৃত্তি ও উদাহরণ তিনটি অংশ আছে। কুন্তকের মতে ব্যঞ্জনাধ্বনিই কাব্যের একমাত্র লক্ষণ নহে। তাঁহার মতে বক্রোক্তিই কাব্যলক্ষণ—"বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গী-ভণিতিরুচ্যতে'। ব্যঞ্জনাধ্বনি ঐ বক্রোক্তিরই একাংশ মাত্র। সম্ভবতঃ তিনি বক্রোক্তি শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কুন্তক পূর্বাচার্য ভামহকে অনুসরণ করিয়াছেন।

মহিমভট্ট। মহিমভট্ট ধ্বনিসম্প্রদায়ের মত খণ্ডন জন্য "**ব্যক্তিবিবেক** গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ তিনটি বিমর্শে বিভক্ত। তাঁহার মতে "অর্থোপি দ্বিবিধো বাচ্যোঽনুমেয়শ্চ"। তিনি কোনও কোনও স্থানে কুন্তকের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

ধ্বনিসম্প্রদায়ের পর ও মম্মটভট্টের আবির্ভাবের পূর্বে ধারাধিপতি **ভোজরাজ** ও **হেমচন্দ্রের** নাম উল্লেখযোগ্য। এই দুই গ্রন্থকারই অলঙ্কার শাস্ত্রের পূর্বাচার্যগণের মতের সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা অলঙ্কার সম্বন্ধে কোনও নূতন মতের অবতারণা করেন নাই। হেমচন্দ্রের কাল ১০৮৮ হইতে ১১৭২ খৃষ্টাব্দ নির্ণীত হইয়াছে। ভোজরাজ হেমচন্দ্রের

পূর্ববর্ত্তী। তাঁহার রাজত্বকাল ৯৯৬—১০৫১ খৃষ্টাব্দ। কহ্লন ভোজরাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"স চ (অনন্তরাজ) ভোজনরেন্দ্রশ্চ দানোৎকর্ষেণ বিশ্রুতৌ।
সূরী তস্মিন্ ক্ষণে তুল্যং যাবাস্তাং কবিবান্ধবৌ॥",

ভোজরাজের স্বহস্তলিখিত গোবিন্দভট্টকে প্রদত্ত দানপত্র দ্বারাও ভোজরাজের কাল একাদশ শতাব্দী স্থিরীকৃত হয়। তিনি অন্যান্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে **সরস্বতীকণ্ঠাভরণ** তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ ৫টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তিনি রীতিকে শব্দালঙ্কার মধ্যে পরিগণনা করিয়াছেন।

ক্ষেমেন্দ্র। ক্ষেমেন্দ্র ১১শ শতাব্দীতে **"কবিকণ্ঠাভরণ"**, **"ঔচিত্য-বিচার** চর্চা" ও " **কবিকর্ণিকা** প্রণয়ণ করিয়াছেন।

নব্যালঙ্কারিক।

মম্মটভট্ট। নব্য আলঙ্কারিকগণের মধ্যে মম্মটভট্টের **কাব্যপ্রকাশ** অতি প্রসিদ্ধ ও মান্য গ্রন্থ। তিনি সরস্বতীকণ্ঠাভরণপ্রণেতা ভোজরাজের অর্বাক্তন ও মাণিক্যচন্দ্রের প্রাক্তন। ১০৫১ খৃষ্টাব্দে ভোজরাজের রাজ্য সমাপ্তিকাল এবং মাণিক্যচন্দ্র ১১৬০ খৃষ্টাব্দে কাব্যপ্রকাশের "সংকেত" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। মম্মটভট্ট সম্ভবতঃ ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ১০১০ খৃষ্টাব্দে রচিত নবসাহসাঙ্কচরিত গ্রন্থ হইতে উদাহরণ দিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশগ্রন্থে মম্মট ধ্বনিসম্প্রদায়ের মতই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার মত এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে তিনি নব্য আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

অন্যান্য প্রাচীন আলঙ্কারিকের ন্যায় তিনিও কাশ্মীরদেশবাসী ছিলেন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার কাব্যপ্রকাশদর্পণে "চিক্কুপদং কাশ্মীরাদিভাষায়াম্ অশ্লীলার্থবোধকম্" এই উক্তি দ্বারাও মম্মটভট্টকে কাশ্মীরবাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম জৈয়ট ও ভ্রাতার নাম কৈয়ট এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশের পরিকরালঙ্কার পর্যন্ত রচনা করেন। অবশিষ্ট ভাগ অল্লটসূরি পরিপূরণ করিয়াছেন ঃ—

"কৃতঃ শ্রীমম্মটাচার্য্যবর্য্যৈঃ পরিকবাবধিঃ।
প্রবন্ধঃ পূরিতঃ শেষো বিধায়াল্লটসূরিণা॥"

কাব্যপ্রকাশের কাবিকাগুলি মম্মটরচিত কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হয়। কিন্তু "মালা তু পূর্ববৎ" ঐ কারিকাংশে বৃত্তিস্থ মালোপমার দৃষ্টান্ত থাকায় কারিকা ও বৃত্তির রচয়িতা এক মম্মটাচার্য্যই প্রতিপন্ন হন। অধিকাংশ স্থানে তাঁহার পূর্ববর্তীকালেব প্রাচীন কারিকাগুলি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। কাবিকাগুলিব ব্যাখ্যা মম্মটরচিত তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থে পূর্বাচার্য্যগণের মতের সমালোচনামূলক সিদ্ধান্তগুলি থাকায় ঐ গ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। এক ভগবদ্গীতা ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থেবই এত অধিক সংখ্যক টীকা টিপ্পনী দৃষ্ট হয় না। মাণিক্যচন্দ্রেব "সঙ্কেত", সবস্বতীতীর্থেব "বালচিত্তানুরঞ্জিনী" ও জয়ন্তেব "দীপিকা", বিশ্বনাথেব "কাব্যপ্রকাশদর্পণ", নাগেশভট্টের "উদ্দ্যোত" প্রসিদ্ধ টীকা। কাব্যপ্রকাশ দশটি উল্লাসে বিভক্ত। নবম উল্লাসে শব্দালঙ্কাব ও দশমে অর্থালঙ্কার বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে নাট্যশাস্ত্রের বিষয়গুলি উক্ত হয নাই। মম্মটভট্টেব মতে কাব্যলক্ষণ—"তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি"।

তাঁহাব মতে অলঙ্কার কাব্যেব লক্ষণ নহে উহা কাব্যেব উৎকর্ষ বিধায়ক। ব্যঞ্জনাই কাব্যের মূল।

জয়দেব। মম্মট ভট্ট ও বিশ্বনাথ কবিরাজের মধ্যে নৈয়ায়িক জয়দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অপর নাম পীযূষবর্ষ। তিনি "**চন্দ্রালোক**" নামক অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ ১০টি ময়ূখে বিভক্ত ও উহাতে ৩৫০টি শ্লোক আছে। ইনিই "প্রসন্নরাঘব" রচয়িতা। তাঁহার কাল ১২০০—১২৫০ খৃঃ ধরা যাইতে পারে (নাটক দ্রষ্টব্য)। কেহ কেহ তাঁহাকে পক্ষধরমিশ্র বলিয়া মনে করেন কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক কারণ শিঙ্গভূপালকৃত রসার্ণবসুধাকবে ও শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে তাঁহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিশ্বনাথ কবিরাজ। মম্মটভট্টের পরেই বিশ্বনাথ কবিরাজ সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক। তাঁহার **সাহিত্যদর্পণ** অলঙ্কারশাস্ত্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থ। মম্মট ভট্টের কাব্যপ্রকাশে নাট্যশাস্ত্রের বিচার নাই। সাহিত্যদর্পণে নাট্যশাস্ত্রের

বিচারও আছে। অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বলেন যে বিশ্বনাথ কবিরাজ বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। কিন্তু ঐ মত সমীচীন নহে। বঙ্গদেশের কোন বংশই তাঁহাকে পূর্বপুরুষ বলিয়া দাবী করেন না। তাঁহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর, পিতামহের নাম নারায়ণদাস। ঐ নারায়ণদাস কাব্য-প্রকাশের টীকাকার চণ্ডীদাসের জ্ঞাতি ছিলেন। তাঁহার পিতামহ "কলিঙ্গ-ভূমণ্ডলাখণ্ডল-মহারাজাধিরাজ—শ্রীনরসিংহদেবসভায়াম্" সভাসদ্ ছিলেন। পরন্তু বিশ্বনাথ কাব্যপ্রকাশদর্পণ গ্রন্থে "চিক্কু"পদ ব্যাখ্যা কারতে গিয়া "উৎকলাদিভাষায়াং ধৃতবাওকদ্রব" কথা লিখিয়াছেন। এই উভয় প্রমাণেই তাঁহার বাসস্থান উৎকলপ্রদেশে ছিল ইহাই স্থিরীকৃত হয়।

বিশ্বনাথ কবিরাজের কাল ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শেষভাগ ধরা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্যপ্রকাশের "কাব্যপ্রকাশদর্পণ" নামক টীকা ও **সাহিত্যদর্পণ** অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বিশ্বনাথ, জয়ন্ত ও আলাবুদ্দিন বাদসাহের নামোল্লেখ করিয়াছেন। জয়ন্ত ১৩৫০ সম্বতে (১২৯৩ খৃঃ) কাব্যপ্রকাশের টীকা প্রণয়ন করেন এবং ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে আলাবুদ্দিন বিষপ্রয়োগে নিহত হন। (সাহিত্যদর্পণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে "সন্ধৌ সর্বস্বহরণমিতি" শ্লোকে আলাবুদ্দিনের নাম আছে)*। সাহিত্যদর্পণের যে প্রাচীন হস্তলিপি প্রাপ্ত হওয়া যায় ও অন্যান্য প্রমাণে সাহিত্যদর্পণ ১৩৬০ হইতে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে রচিত হওয়া সম্ভব। সাহিত্যদর্পণের টীকা মধ্যে রামচরণ তর্কবাগীশকৃত সাহিত্যদর্পণবিবৃতি (অক্ষিপক্ষরসচন্দ্র) ১৬২৩ শকাব্দে =১৭০০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। দুর্গাপ্রসাদ দ্বিবেদী "সাহিত্যদর্পণ ছায়া" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন।

রূপগোস্বামী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মের উত্থানে বৈষ্ণবসাহিত্যে বহু কাব্য রচিত হইয়াছিল। মধুররসের প্রাধান্যই বৈষ্ণবসাহিত্যের বিশিষ্টতা। ঐ সময়ে চৈতন্যদেবের সহচরগণমধ্যে শ্রীমদ্রূপগোস্বামী "উজ্জ্বল-নীলমণি", নামক অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে কেবল উজ্জ্বলরস অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রীতিরসের বিশ্লেষণ আছে। ঐ রসের সর্বপ্রকার ভেদ,

* "সন্ধৌ সর্বস্বহরণং বিগ্রহে প্রাণনিগ্রহঃ।
অল্লাপদীন নৃপতৌ ন সন্ধির্ন চ বিগ্রহঃ॥"

নায়িকাদি ভেদ, সখীগণের ভাব, মহাভাব প্রভৃতির অতি সূক্ষ্ম বিচার আছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের দর্শনের সহিত উজ্জ্বলনীলমণি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অপ্পয্য দীক্ষিত। অপ্পয্যদীক্ষিত ১৫৫৪—১৬২৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি মান্দ্রাজপ্রদেশের কাঞ্চীনগরের নিকটবর্তী অদয়প্পলম্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপস্তম্বশাখাভুক্ত ভরদ্বাজবংশীয় ছিলেন। তিনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ভট্টোজিদীক্ষিত তাঁহার নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থের টীকা টিপ্পনী করিয়াছিলেন। অলঙ্কার সম্বন্ধে তিনি "**বৃত্তিবার্তিক**", "**কুবলয়ানন্দ**", "**চিত্রমীমাংসা**" রচনা করেন।

জগন্নাথ পণ্ডিত (১৬২০—১৬৬০ খৃ.)। তিনি তৈলঙ্গ জনপদস্থ রাজমহেন্দ্রবাসী, পরে কাশীধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। পিতার নাম পেরুভট্ট, জননীর নাম লক্ষ্মীদেবী) তিনি সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকাকার জ্ঞানেন্দ্রভিক্ষুর ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজ পরিচয়ে বলিয়াছেন :—

"শ্রীমজ্‌জ্ঞানেন্দ্রভিক্ষোরধিগতসকলব্রহ্মবিদ্যাপ্রপঞ্চঃ"। ইনি সর্ববিদ্যা-বিশারদ ছিলেন পরন্তু একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইঁহার বহু কাব্য আছে তন্মধ্যে ভামিনীবিলাসে তাঁহার দিল্লীশ্বরের সভায় প্রথম বয়স অতিবাহন করার উল্লেখ আছে। তিনি সাজাহানের রাজসভায় কিছুকাল ছিলেন। "দিল্লীবল্লভপাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ।" প্রথম বয়সে দিল্লীতে, পরে মথুরাতে ও শেষ জীবনে কাশীধামে অতিবাহন করেন। জনশ্রুতি আছে তিনি কোনও রূপবতী যবনরমণীর মোহে দিল্লীতে বাস করিতেন ও দিল্লীশ্বর তাঁহার প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজসভাতে রাখেন। তাঁহার ঐ মোহ অপনীত হইলে পরে তিনি মথুরা ও কাশী প্রভৃতি স্থানে গমন করেন।

জগন্নাথ পণ্ডিত ১৬৪১—১৬৫০ খৃষ্টাব্দ কালের মধ্যে **রসগঙ্গাধর** রচনা করেন। উহা অলঙ্কারশাস্ত্রে অতি মান্য গ্রন্থ। ইহাতে সর্বত্রই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। রচনার কোনও কাঠিন্য নাই কিন্তু বিষয়ের কাঠিন্য ও বিচারের গভীরতাতেই অনেক স্থল দুর্বোধ্য হইয়াছে। উদাহরণগুলি তিনি নিজে প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য নাগেশভট্ট রসগঙ্গাধরের "গুরুমর্মপ্রকাশ" নামক একখানি ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন।

কেশবমিশ্রকৃত "অলঙ্কারশেখর" উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহা শৌদ্ধোদনির অলঙ্কারসূত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ। পরবর্তী বিশ্বেশ্বর পাণ্ডে রচিত **"অলঙ্কারমুক্তাবলী"** ও **"রসচন্দ্রিকা"** সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্তী বিশ্বেশ্বর সূরির "অলঙ্কারকৌস্তুভ" অলঙ্কার সাহিত্যের কৌস্তুভ রত্ন। এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ অতি বিরল। প্রভাকরভট্টের **"রসপ্রদীপ"** রস সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নিবন্ধ।

নাট্যশাস্ত্র।

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য ও নাটকের রস ও অলঙ্কার বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। নাটক দৃশ্যকাব্য মধ্যে পরিগণিত। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রেও রসের বিচার আছে। ধ্বনিকার সর্বপ্রথমে ধ্বনিই কাব্যের আত্মা এই মত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত ঐ মতের পূর্ণতা সম্পাদন করেন। মহিমভট্ট তাহার "ব্যক্তিবিবেক" গ্রন্থে (১০৫০ খৃঃ) ঐ মত নিরসন করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু মম্মটভট্ট পুনরায় ধ্বনিকারের মত উজ্জীবিত করেন। বিদ্যানাথ, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি ঐ মতই অবলম্বন করিয়াছেন।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রই নাট্যশাস্ত্রের আদিম গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের পাঠ কালক্রমে প্রভ্রষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়াছিল পরে কোহল, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি আচার্যেরা শাস্ত্র পুনরুদ্ধার করেন। বর্তমানে যে পাঠ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও বহুধা বিকৃত। কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্তকৃত একখানি টীকা ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। শঙ্কুক "ভুবনাভ্যুদয়" নামক টীকা রাজা অজিতপীড়ের রাজত্বকালে (৮১৩—৮৫০ খৃঃ) রচনা করেন। শঙ্করবর্মণের রাজত্বকালে (৮৮৩—৯০২ খৃঃ) ভট্টনায়ক একখানি ব্যাখ্যা রচনা করেন। অভিনবগুপ্ত (১০০০ খৃঃ) **"অভিনবভারতী"** নামক সুপ্রসিদ্ধ টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। **ধারানগরাধিপতি মুঞ্জের রাজত্বকালে (৯৭৪—৯৯৫ খৃঃ) বিষ্ণুপুত্র ধনঞ্জয় "দশরূপক" নামক নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।** দশরূপক ভরতের নাট্যশাস্ত্র অবলম্বনে রচিত। বিষ্ণুপুত্র ধনিক "অবলোক" নামে দশরূপকের এক

টীকা রচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ধনঞ্জয় ও ধনিক দুই সহোদর। অবলোক মুঞ্জের রাজত্বকালের পরে রচিত হওয়া সম্ভব কারণ উহাতে পদ্মগুপ্ত রচিত নবসাহসাঙ্কচরিতের উল্লেখ আছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১২৭৫—১৩২৩ খৃঃ) ওয়ারাঙ্গলের রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে (১২৯৮—১৩১৪ খৃঃ) বিদ্যানাথ "**প্রতাপরুদ্রীয়**" বা "**প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ**" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে দশরূপক ও কাব্যপ্রকাশের মত গৃহীত হইয়াছে। মল্লিনাথ-পুত্র কুমারস্বামী উহার "রত্নাপণ" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। প্রায় ঐরূপ কালেই উড়িষ্যারাজ নরসিংহের রাজত্বকালে (১২৮০—১৩১৪ খৃঃ) বিদ্যাধর "**একাবলী**" রচনা করেন। তিনি কবি হরিহর ও রাজা অর্জুনের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা ১৩শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। শিঙ্গভূপাল রচিত রসার্ণবসুধাকরে একাবলীর উল্লেখ আছে। মল্লিনাথ সূরি একাবলীর উপর "তরল" নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। শিঙ্গভূপাল কৃত (১৩৩০ খৃঃ) "**রসার্ণবসুধাকর**" উল্লেখযোগ্য। বিশ্বনাথ কবিরাজরচিত সাহিত্যদর্পণের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে নাট্যশাস্ত্রের বিচার আছে। তিনিও উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। সাহিত্য দর্পণ ১৩৬০—১৩৭০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

সমুদ্রমিশ্র (১৬১৩ খৃঃ "**নাট্যপ্রদীপ**" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

নবম অধ্যায়

দর্শন

প্রকৃতিদেবী যেরূপ মুক্তহস্তে ভারতকে তাঁহার সম্ভারাদি প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে জীবনসংগ্রামের জন্য কাহাকেও উদ্বিগ্ন হইতে হইত না। স্বচ্ছন্দবনজাত ফলমূল, অপর্য্যাপ্ত শস্য, ঘৃত, দুগ্ধাদি, প্রসন্ন সলিল ও নির্মল বায়ু দ্বারা জীবনের অভাব পরিপূরিত হইত। ঊর্দ্ধে অগণিত নক্ষত্রখচিত সুনীল চন্দ্রাতপ, নিম্নে শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা, বিহঙ্গমমুখরিত বনরাজি, প্রসন্নসলিলা নদী, নির্জন আশ্রমপদ—এই সকলই কাব্য ও চিন্তাশীলতার অনুকূল। পাশ্চাত্য জগতে জীবনসংগ্রাম অতি কঠোর। নির্মম প্রকৃতির সহিত সর্বদা যুদ্ধ করিয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। তজ্জন্য ঐ নির্মম প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানবের শক্তিনিচয়ের ব্যবহার শিক্ষাই জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। জীবনের অভাব পরিপূরিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীন চিন্তার অবকাশ থাকে না। এই পার্থক্যহেতুই ভারত আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতার পথে ও পাশ্চাত্য দেশ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারমার্গে অগ্রসর হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশ জীবনের অভাব মোচন করিতে গিয়া প্রকৃতিদেবীর সুকৌশল আধিভৌতিক মূর্তি সন্দর্শন করিয়াছে। ভারতীয় প্রতিভা ঐ কার্যরূপ আধিভৌতিক মূর্তির অন্তরালে অবস্থিত কারণতত্ত্বের অনুসন্ধানে নিমগ্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন জীবনের অভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রকৃতির সহিত সংস্পৃষ্ট; ভারতীয় দর্শন প্রকৃতির পরপারের গবেষণায় নিমগ্ন। পাশ্চাত্য দর্শন বাস্তব জীবনের অনুকূল ও পরিপূরক; ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মিক জগতের অনুকূল ও বাস্তব জীবনের প্রতি উদাসীন।

বেদ আর্য সভ্যতার মূল ভিত্তি। উহার প্রামাণিকতা কেহই অস্বীকার করিতে সাহসী নহেন। ঋগ্বেদের কোনও কোনও সূক্তে বিশেষতঃ দশম মণ্ডলে এবং অথর্ববেদে ঋষিগণ এই বিচিত্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও প্রসার সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক দার্শনিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এই

বিচিত্র সৃষ্টির ও তাহার অভিমানিনী দেবতাগণের অন্তরালে যে এক মহাশক্তি বিরাজ করিতেছেন তাহা ঋষিগণ সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলেন।

বেদের প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও হিন্দু ঋষিগণ স্বাধীনভাবে দর্শনরাজ্যের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। ভারতীয় আস্তিক যে কোনও দর্শন হউক না কেন প্রত্যেকেই বেদের কোনও না কোনও অংশের উপর তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে এবং পরস্পর বিবদমান দর্শনগুলি কখনও কখনও একই অংশের মধ্যে স্বীয় মতের অনুকূলতা দর্শন করিয়াছে। বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুইটি বিভাগ। কর্মকাণ্ডে হিন্দুর ধর্ম (বেদ বিহিত কর্ম), যাগ-যজ্ঞাদি, যজ্ঞপ্রণালী ও বিধিনিষেধাদির বিচার আছে। ঐ সকল বিধি ও নিষেধ পালন দ্বারাই অভিলষিত স্বর্গাদি প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। জ্ঞানকাণ্ড এই বিশ্বজগতের মূলীভূত কারণ মহান সৃষ্টিকর্তার তত্ত্বানুসন্ধানে পরিপূর্ণ। ঐ জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়। এই উভয় কাণ্ডের মধ্যে প্রকৃতিগত গুরুতর পার্থক্য ও বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু উহা একই বেদের বিভিন্ন বিভিন্ন অংশ বটে।

যদিও হিন্দু দর্শনগুলির মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্য রহিয়াছে তথাপি হিন্দু দর্শনগুলির মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের সামঞ্জস্য আছে। সকল দর্শনগুলিই নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত বা ঐগুলি অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে:

১। আত্মা অবিনশ্বর;
২। এই বিচিত্র বিশ্বের মূলীভূত কারণ অবিনশ্বর;
৩। জন্মান্তরবাদ ও কর্মবিপাক;
৪। আত্মার দেহাশ্রয়ই সুখ-দুঃখের কারণ;
৫। মুক্তিই চরম উদ্দেশ্য; মুক্তির পথপ্রদর্শনই দর্শনের লক্ষ্য।

জন্মান্তরবাদ আত্মার অবিনশ্বরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মা অবিনশ্বর, তাহার জন্ম বা মৃত্যু নাই। আত্মা দেহকে আশ্রয়মাত্র করিয়া থাকে। কৌমার, যৌবন, জরা প্রভৃতি যেমন জীবনের অবস্থাভেদ, দেহান্তরপ্রাপ্তিও তেমনি একটি অবস্থান্তর মাত্র। দেহের জন্ম ও মৃত্যু আছে কিন্তু দেহীর (আত্মার) জন্ম ও মৃত্যু নাই।

"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"। গীতা। ২০।

উহাকে ছেদন করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না—

"অচ্ছেদ্যোয়মদাহ্যোয়মক্লেদ্যোঽয়মশোষ্য এব চ'। গীতা ২।২৪। আত্মা মৃত্যুকালে কর্মসমষ্টির সমবেত শক্তি লইয়া দেহান্তরে প্রবেশ করে এবং তথায় প্রাক্তনজন্মের কর্মফল ভোগ করে। এইরূপে প্রারব্ধকর্মের ফল শেষ না হইতেই পুনর্বায় নবীন কর্ম সঞ্চিত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ জন্ম সংঘটিত হয়।

কর্মের মূল কারণ "অজ্ঞান" বা "অবিদ্যা"। যতদিন বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হয় ততদিন নবীন কর্মের উৎপত্তি অনিবার্য। অবিদ্যানাশের ফলে কর্ম বা অদৃষ্ট বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কর্ম হইতেই তাহার ফল সুখদুঃখের ভোগের জন্য দেহসম্বন্ধ বা জন্ম সংঘটিত হয়। সুতরাং কর্ম না থাকিলে জন্মও থাকে না।' অতএব আত্মার দেহসম্বন্ধহীন স্বরূপস্থিতি বা মুক্তির জন্য কর্মনিবৃত্তি ও তাহার কারণ আত্মতত্ত্বজ্ঞান একান্ত আবশ্যক।

বাসনা দ্বারাই লোক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কর্ম করিলেই উহার ফলোদয় অবশ্যম্ভাবী। এই কর্মস্রোত বিরামবিহীন; এই কর্মবন্ধ হইতে নিষ্কৃতিই মুক্তি; তাহা হইলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। সকল দর্শনগুলিই এই মুক্তিপথের প্রদর্শক। কার্য্যের সহিত কারণের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া হিন্দুদর্শনে প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন মত স্থাপিত হইয়াছে: আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। আরম্ভবাদীরা বলেন বস্ত্রের তন্তুগুলি তাহার উপাদান কারণ কিন্তু তন্তুগুলির যথাযথ সন্নিবেশ দ্বারা বস্ত্রের আবির্ভাব হয়। বস্ত্রখানি নূতন দ্রব্য হইল, তাহা তন্তুতে ছিল না। পরিণামবাদীরা বলেন, কার্য কারণের রূপান্তরমাত্র। বৃষ্টি মেঘের অবস্থান্তর মাত্র। দধি দুগ্ধের অবস্থান্তর মাত্র। বৃষ্টি ও দধি যথাক্রমে মেঘ ও দুগ্ধ হইতে পৃথক বস্তু নহে। যাহা নিহিত অবস্থায় ছিল তাহা ব্যক্ত হইল মাত্র। বিবর্তবাদীরা বলেন, একই অনাদি অব্যয় সর্বব্যাপী পরমাত্মা অচিন্ত্য মায়া-প্রভাবে এই বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হন। তাঁহার আরম্ভও নাই পরিণামও নাই।

হিন্দু দর্শনগুলি মুখ্যতঃ ইহার কোনও একটি মত গ্রহণ করিয়াছে এবং তজ্জন্যই দর্শনগুলিকে তিনটি ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে:

(ক) ন্যায় ও বৈশেষিক—আরম্ভবাদী,

(খ) সাংখ্য ও পাতঞ্জল—পরিণামবাদী,

(গ) বেদান্ত (শঙ্করাচার্যের মতে) বিবর্তবাদী।

হিন্দু দর্শনের মধ্যে ৬ খানি প্রধান।

কপিলস্য কণাদস্য গৌতমস্য পতঞ্জলেঃ।
জৈমিনে র্ব্যাসদেবস্য দর্শনানি ষড়েব হি ॥

সেগুলিকে নিম্নোক্তভাবে বিভাগ করা যাইতে পারে ঃ

১। (ক) কপিলের সাংখ্যদর্শন বা নিরীশ্বরসাংখ্য। এই মতে নিত্য ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই। দ্বৈতমত।

(খ) পতঞ্জলির যোগদর্শন বা সেশ্বরসাংখ্য। ইহাতে নিত্য ঈশ্বরের স্থান আছে। দ্বৈতমত। যোগদর্শন ও সাংখ্য দর্শন অনেক অংশেই একমত।

২। (ক) গৌতমের ন্যায়দর্শন।

(খ) কণাদের বৈশেষিকদর্শন।

বৈশেষিকদর্শন এবং ন্যায়দর্শনও অনেক অংশে একমত।

৩। (ক) জৈমিনিব পূর্বমীমাংসা বা কর্মমীমাংসা। উহাতে বেদেব ব্যাখ্যাপ্রণালী, বিধিনিষেধ প্রভৃতির বিচার ও ধর্মতত্ত্ব আছে। ঈশ্বব সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে কোনও বিচার নাই। পূর্বমীমাংসা বেদের কর্মকাণ্ডেব দর্শন।

(খ) উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন। উহা বেদেব জ্ঞানকাণ্ডেব দর্শন। শঙ্করাচার্যেব ব্যাখ্যানুসারে উহা অদ্বৈতবাদ।

সকলগুলি দর্শনের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এক অর্থাৎ মোক্ষ। ঐ মোক্ষের স্বরূপ বিষয়েও হিন্দুদর্শনে মতভেদ আছে। দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি মাত্রই মুক্তি, ইহাই ন্যায়, বৈশেষিক এবং সাংখ্যপাতঞ্জল দর্শনের প্রচলিত মত। অন্যমতে মুক্তিতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির ন্যায় নিত্যানন্দেব অনুভূতি হয়। কপিল পতঞ্জলি প্রভৃতির দুঃখের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল, ঐ দুঃখেব আত্যন্তিক নিবৃত্তিই তাঁহাদেব লক্ষ্য ছিল, তাঁহাবা সুখেব স্পৃহা করেন নাই। কিন্তু ব্যাস ও জৈমিনি আনন্দকে নিববচ্ছিন্ন কবিবাব প্রয়াসী ছিলেন।

হিন্দু দর্শনগুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম সায়ণপুত্র মাধবাচার্য তাঁহার সর্বদর্শন সংগ্রহে লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন (১৪শ শতাব্দী)।

সাংখ্যদর্শন।

প্রাচীনকালে "সাংখ্য" শব্দ দ্বারা কপিলের নিরীশ্বরসাংখ্য ও পতঞ্জলির সেশ্বরসাংখ্য এই উভয় দর্শনই বোঝা যাইত। কিন্তু কালক্রমে "সাংখ্য" শব্দটি কপিলের সাংখ্য অর্থে যোগরূঢ় হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যদর্শনই সর্বপ্রাচীন দর্শন বলিয়া পরিগণিত এবং এই সাংখ্যমতই ভারতে বহু সাম্প্রদায়িক ধর্মমত সংগঠনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈন মতও এই সাংখ্যমত দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। "সাংখ্য" শব্দটি "সংখ্যা" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "সংখ্যা"র অর্থ পরিসংখ্যান।

"সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যানদর্শনম্"

মহাভারত। ১২।১১৩৯৩

সাংখ্যদর্শনের বক্তা কপিল কোন্ কপিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ বলেন তিনি কর্দমমুনির পুত্র। কেহ বলেন তিনি ধর্ম ও হিংসার পুত্র। শঙ্করাচার্য বলেন তিনি সগরবংশধ্বংসকারী কপিল হইতে পৃথক্। "অন্যস্য চ কপিলস্য-সগরপুত্রানাম্ প্রতপ্তুর্বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ"। বেদান্তভাষ্য অধ্যায় ২ পাদ ১ সূত্র ১। কিন্তু ভাগবতপুরাণ বলেন সগরবংশধ্বংসকারী কপিলই সাংখ্যদর্শনের স্রষ্টা। সাংখ্যদর্শন দ্বৈতবাদী। সাংখ্যের মতে "পুরুষ" ও "প্রকৃতি" উভয়ই অনাদি। সাংখ্যোক্ত পুরুষ অনাদি, চেতন, অপ্রসবধর্মী, নিত্য ও নির্গুণ দ্রষ্টা মাত্র। এই পুরুষই শাস্ত্রান্তরে "আত্মা" বা গীতায় "ক্ষেত্রজ্ঞ" নামে অভিহিত হইয়াছে। পুরুষের কোন বিকৃতি হয় না, তজ্জন্য "পুরুষ" জগতের উপাদান কারণ নহে।

"প্রকৃতি" পুরুষের বিপরীত স্বভাববিশিষ্ট। প্রকৃতি চেতনবিপরীত ও পরিণামশীল এবং বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন। প্রকৃতির অপর নাম "প্রধান" বা "অব্যক্ত"। এই প্রকৃতিই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্বের মূল কারণ। মনু এই প্রধানকে "তমঃ" সংজ্ঞা দিয়াছেন, "আসীদিদং তমোভূতম্"। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ মূল প্রকৃতির বিকার বা পরিণাম আরম্ভ হয়, উহাকে "বিকার" বা "বিকৃতি" বলে। আবার ঐ বিকৃতিও অন্য বিকারের প্রসূতি হইতে পারে। ঐ প্রসূতিবিকারকে "প্রকৃতিবিকৃতি" বলে।

পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি হইতে "মহৎ", মহৎ হইতে "অহঙ্কার", অহঙ্কার হইতে "পঞ্চতন্মাত্র" উদ্ভূত হয়। মহৎ, অহঙ্কার, ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি "প্রকৃতিবিকৃতি"। "একাদশ ইন্দ্রিয়" অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে ও "পঞ্চভূত" পঞ্চতন্মাত্র হইতে উদ্ভূত হয় কিন্তু এই ষোড়শ পদার্থ হইতে আর কিছুই উদ্ভব হয় না, তজ্জন্য এই ষোড়শ পদার্থ কেবল বিকৃতিমাত্র।

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ."
সাংখ্যকারিকা ৩।

সাংখ্য পরিণামবাদী ও সৎকার্যবাদী।

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাৎ চ সৎকার্য্যম্॥

কারণগর্ভেই অব্যক্ত আকারে কার্য লুক্কায়িত বা নিহিত থাকে। পরে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা কার্যের আবির্ভাব হয়। কারণে কার্য নিহিত না থাকিলে কার্যের উদ্ভব সম্ভবপর নহে। তৈল জন্মাইতে হইলে তিল পেষণ না করিয়া বালুকাপেষণ করিলে তৈলের উদ্ভব হইতে পারে না। কারণ, যাহা নাই বা অসৎ, তাহার উদ্ভব সম্ভব নহে। "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ।" কারণে, যাহা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে তাহাই কার্যরূপে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। ঐ ব্যক্তাবস্থার নামই উৎপত্তি বা আবির্ভাব।

সাংখ্যসূত্র।

১। প্রাচীনকালে একখানি **সাংখ্যসূত্র** ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীতে ধারাধিপতি ভোজরাজ ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন এবং **রাজবার্তিক** নামে একখানি ভোজরাজকৃত সাংখ্যবার্তিক ছিল। ১৪শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য সূতসংহিতার উপর তাৎপর্য-দীপিকায় সাংখ্যসূত্রের "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি." এই সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন। ঐ সূত্রটি সাংখ্যপ্রবচনসূত্রেও আছে। সম্ভবতঃ প্রাচীন সাংখ্যসূত্রের কতকগুলি সূত্র ও সাংখ্যশাস্ত্রের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞান পরবর্তীকালে কোনও গ্রন্থকার নবীন সূত্রাকারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং

তাহাই **সাংখ্যপ্রবচনসূত্র** নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রাচীন সাংখ্যসূত্র বিলুপ্ত হইয়াছে।

ষষ্টিতন্ত্র।

২। **ষষ্টিতন্ত্র**। ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে ষষ্টিতন্ত্র পঞ্চশিখাচার্যকৃত। জৈনদিগের অনুযোগদ্বারসূত্রেও ষষ্টিতন্ত্রের উল্লেখ আছে। টীকাকার বলরাম ও বাচস্পতিমিশ্র বলেন ষষ্টিতন্ত্র বাষগণ্যকৃত। বাচস্পতিমিশ্রের সময়ে ঐ ষষ্টিতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছিল। চীনদেশে পরমার্থকৃত সাংখ্যকারিকা ব্যাখ্যায় (৬ শতাব্দী) উহা পঞ্চশিখকৃত বলিয়া উল্লেখ আছে। অহির্বুধ্ন্য সংহিতাতেও ঐরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষষ্টিতন্ত্রে মোট ৬০টি অধ্যায় ছিল, তন্মধ্যে ৩২টি অধ্যায়ে প্রাকৃতমণ্ডল (তন্ত্র)ও অবশিষ্ট ২৮ অধ্যায়ে বৈকৃতমণ্ডল (কাণ্ড) ছিল।

প্রাচীন মত ও সাংখ্যকারিকা।

৩। মহাভারতে তিন প্রকার সাংখ্যমত দৃষ্ট হয়। কোনও মতে ২৪ তত্ত্ব, কোনও মতে ২৫ তত্ত্ব ও কোনও মতে ২৬ তত্ত্ব। চরকসংহিতাতে যে সাংখ্যমত কথিত হইয়াছে তাহার সহিত ঈশ্বরকৃষ্ণের মতের পার্থক্য আছে। গুণরত্ন (১৪ শতাব্দী) ষড়্দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থের টীকা তর্করহস্য-দীপিকাতে প্রাচীন (মৌলিক) ও নবীন (উত্তর) এই দুই প্রকার সাংখ্য-মতের উল্লেখ করিয়াছেন। আসুরি কপিলের শিষ্য ছিলেন। কপিল করুণাপূর্বক আসুরিকে এই ষষ্টিতন্ত্র (সাংখ্যদর্শন) বলিয়াছিলেন। "আদি-বিদ্বান্ নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ" (যোগসূত্র ১।২৫ ব্যাসভাষ্য)। সাংখ্যকারিকা হইতে জানা যায় আসুরি, পঞ্চশিখ, সনাতন, সনন্দন গুরুপরম্পরায় শিষ্য ছিলেন। আসুরি কপিলের মুখ্য শিষ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ কপিল নির্মাণচিত্ত অধিষ্ঠান করিয়া আসুরিকে উপদেশ দিয়াছিলেন। পঞ্চশিখ আসুরির শিষ্য ছিলেন। (মহাভারত ১২।৭৮৯০—৭৮৯৫)। তিনি কপিলের নিকটও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয়। পঞ্চশিখ জনকরাজাকে সাংখ্য-শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন (শান্তিপর্ব ২১৮)। সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ ছিল। কোনও কোনও আচার্য তাঁহার দুই একটি বাক্য উদ্ধার

করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কোনও গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। সনাতনের যোগদর্শন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ছিল এরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সাংখ্যকারিকা। পঞ্চশিখাচার্যের শিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার রচয়িতা। সাংখ্যকারিকার নামান্তর "সাংখ্যসপ্ততি" বা "সুবর্ণসপ্ততি', অথবা "কনকসপ্ততি"। উহাতে মূল ৭০টি আর্যা ছিল, তজ্জন্য "সপ্ততি" বলে। প্রচলিত কারিকার ৭০ হইতে ৭২ শ্লোক পরে সংযোজিত হইয়াছে। ৬২ সংখ্যক শ্লোক বা কারিকাটি বিলুপ্ত হইয়াছিল, উহার পাঠ লোকমান্য তিলক উদ্ধার করিয়াছেন। গৌড়পাদভাষ্যে উহার ভাষ্য বিদ্যমান আছে। কিন্তু কারিকাটি কোনও কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তিলক ঐ ভাষ্য হইতে কারিকাটি উদ্ধার করিয়াছেন।

কারিকাটি এই :—

"কারণমীশ্বরমেকে ব্রুবন্তি কালং পরে স্বভাবং বা।
প্রজাঃ কথং নির্গুণতো ব্যক্তঃ কালঃ স্বভাবশ্চ ॥ ৬২"

অধ্যাপক টাকাকুসু বলেন যে ঈশ্বরকৃষ্ণ ও বিন্ধ্যবাসিন্ বা বিন্ধ্যবাস একই ব্যক্তি ও তিনি খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু ঐ অনুমানের কোনও ভিত্তি নাই। গুণরত্ন (১৪ শতাব্দী) তাঁহার তর্করহস্যদীপিকাতে ঈশ্বরকৃষ্ণ ও বিন্ধ্যবাসিকে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়াছেন। কমলাক্ষও উভয়কে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় জনশ্রুতি অনুসারে বিন্ধ্যবাসী বসুবন্ধুর গুরু বুদ্ধমিত্রকে বিচারে পরাভূত করেন। বসুবন্ধু নিজ গুরুর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পরমার্থসপ্ততি রচনা করেন। চীনদেশীয় অনুবাদ (৪র্থ শতাব্দী) সাংখ্যকারিকার **মাঠরভাষ্যের** উপর প্রতিষ্ঠিত। মাঠর কুশানবংশীয় রাজা কনিষ্কের সময় বিদ্যমান ছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা খৃঃ ১ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী। অধ্যাপক কীথ ও দাসগুপ্ত এবং গার্বে ঈশ্বরকৃষ্ণকে যথাক্রমে তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম শতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু উহা সমীচীন বোধ হয় না। জৈনদিগের "অনুযোগদ্বারসূত্র" খৃঃ ১ম শতাব্দীর গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বহু গ্রন্থের সূচীপত্র আছে। তাহাতে "অনগসত্তরির" (অর্থাৎ কনকসপ্ততির বা সুবর্ণসপ্ততির) নাম আছে। ইহা দ্বারাও নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে,

তৎকালে কনকসপ্ততি বা সুবর্ণসপ্ততি বিদ্যমান ছিল। খৃঃ ৭ম শতাব্দীর শেষে অথবা ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়পাদাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। গৌড়পাদ শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু অর্থাৎ গোবিন্দপাদের গুরু ছিলেন। তিনিই মাণ্ডুক্যকারিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় গৌড়পাদ একই ব্যক্তি কিনা তৎসম্বন্ধে একটি সন্দেহ উপস্থিত হয়।* ৯ম শতাব্দীতে বাচস্পতিমিশ্র সাংখ্যকারিকার **সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী** নামে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। **যুক্তিদীপিকা** নামে একটি টীকাও সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। নারায়ণতীর্থ (১৭শ শতাব্দী) সাংখ্যকারিকার উপর **সাংখ্যচন্দ্রিকা** নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের **"সাংখ্যকৌমুদী"** আধুনিক গ্রন্থ (১৮শ শতাব্দী)।

তত্ত্বসমাস।

তত্ত্বসমাস। তত্ত্বসমাস সাংখ্যশাস্ত্রের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহার গ্রন্থকার কে তাহা স্থির হয় নাই। উহাতে অতি সংক্ষিপ্তভাবে সাংখ্যতত্ত্বগুলি উক্ত হইয়াছে। ম্যাক্সমূলার তত্ত্বসমাসকে সাংখ্যকারিকার পূর্ববর্তী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের ভূমিকায় তত্ত্বসমাসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহা সাংখ্যসূত্রকাররচিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। অধ্যাপক কীথ ও দাসগুপ্ত তত্ত্বসমাসকে ১৪শ শতাব্দীতে স্থাপন করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহে তত্ত্বসমাসের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ঐ মত সমীচীন বোধ হয় না। তত্ত্বসমাসের ঐ তত্ত্বগুলির উপর **"সর্বোপকারিণী"** ও **"সাংখ্যসূত্রবিবরণ"** ও **"সাংখ্যক্রমদীপিকা"** নামক বিবরণ আছে, তন্মধ্যে সাংখ্যক্রমদীপিকাই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ঐ বিবরণ তিনখানির রচয়িতার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভাবাগণেশ দীক্ষিতের "তত্ত্বযাথার্থ্যদীপন" আধুনিক গ্রন্থ। ভাবাগণেশ বিজ্ঞানভিক্ষুর শিষ্য ছিলেন।

---

* গৌড়পাদ যে শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু ছিলেন তাহা শঙ্করাচার্য্য পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ কারিকার ভাষ্যশেষে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন:—"যস্তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্ন তোস্মি"। কিন্তু যে গৌড়পাদ ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন তিনিই মাণ্ডুক্যকারিকারচয়িতা কিনা তাহা লইয়াই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্র।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্র। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র কপিলপ্রণীত নহে। গৌড়পাদাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র, গুণরত্ন (১৪ শতাব্দী) ও মাধবাচার্য্য (১৪শ) কেহই সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের উল্লেখ করেন নাই। গুণরত্ন ও মাধবাচার্য্য প্রত্যেক দর্শনেরই প্রামাণিক গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সাংখ্যপ্রবচন তৎকালে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিদিত থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ থাকিত। সম্ভবতঃ প্রাচীন সাংখ্যসূত্রের কতকগুলি সূত্র ও সাংখ্যশাস্ত্রের কতকগুলি উপাখ্যান এবং বহুকালের সাংখ্যশাস্ত্রের সঞ্চিতজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া কোনও গ্রন্থকার সূত্রাকারে ঐগুলি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু উহা প্রামাণিকরূপে গৃহীত হয় নাই। উহার **অনিরুদ্ধকৃত** একখানি বৃত্তি আছে। তাহাও উপরোক্ত কারণে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে স্থাপন করা যায় না। সম্ভবতঃ ১৬শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানভিক্ষু **সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য** রচনা করিয়াছেন। ঐ ভাষ্য বিস্তৃত ও সুচিন্তিত। যদিও উহা আধুনিক তথাপি উহাতে ভাষ্যলক্ষণগুলি বিদ্যমান আছে।* বেদান্তী মহাদেব ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও নাগেশভট্ট ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঐ সূত্রের টীকা রচনা করিয়াছেন।

অন্যান্য গ্রন্থ।

সাংখ্যসার। বিজ্ঞানভিক্ষু "সাংখ্যসার" নামে ও কবিরাজ যতি **সাংখ্যতত্ত্বপ্রদীপ** নামে একখানি সাংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ক্ষেমানন্দকৃত **সাংখ্যতত্ত্ববিবেচনা** ও মাধবাচার্য্যকৃত **সর্বদর্শনসংগ্রহ** উল্লেখযোগ্য। সর্বদর্শনসংগ্রহে তৎকালে প্রচলিত সাংখ্যশাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে মতামত উদ্ধৃত হইয়াছে। "সর্বদর্শনসংগ্রহ" সায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধবের নহে। সায়ণের পুত্র মাধব উহা রচনা করিয়াছেন। তিনি আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন

"শ্রীমৎসায়ণদুগ্ধাব্ধিকৌস্তুভেন মহৌজসা।
ক্রিয়তে মাধবাচার্য্যেণ সর্বদর্শন-সংগ্রহঃ॥"

* কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরং।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥"

এই মাধবই স্মৃতিবত্ন গ্রন্থে নিজ পরিচয়ে লিখিয়াছেন :—

"তমেকদা সায়ণমন্ত্রিবর্য্যস্তনূদ্ভবং স্বপ্রতিবিম্বরূপম্।
প্রিয়ো বিশেষাস্পদমার্য্যবর্য্যং মধ্যেসভং মাধবমিত্যবোচৎ ॥
এবং পিত্রা সমাদিষ্টো মাধবঃ কৃতবান্ কৃতী।
অতিনূনং প্রযত্নেন স্মৃতিরত্নমনুত্তমম্ ॥"

যোগদর্শন।

পাতঞ্জল ও যোগদর্শনের মত সাংখ্যের মতের অনুরূপ। প্রাচীন কালে যোগদর্শনকেও "সাংখ্যপ্রবচন" বলিত কিন্তু পরবর্তীকালে "সাংখ্য" শব্দটি যোগরূঢভাবে "কপিলদর্শন" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই কিন্তু যোগদর্শনে "ঈশ্বরতত্ত্ব" আছে। সেইজন্য কপিল-সাংখ্যকে "নিরীশ্বরসংখ্যা" বলে এবং যোগদর্শনকে "সেশ্বরসাংখ্য" বলে। যোগদর্শনও অতি প্রাচীন দর্শন। বুদ্ধদেব স্বয়ং বহুদিন যোগশাস্ত্রের মত অবলম্বন করিয়া তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বের যোগদর্শনের কোনও গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন, "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ"। তাঁহার মতে পতঞ্জলি প্রাচীন যোগের শৃঙ্খলা মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্যই তিনি প্রথম সূত্রে 'যোগশাসনং" না বলিয়া "যোগানুশাসনং" বলিয়াছেন।* পতঞ্জলি মুনির কাল খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। তিনি শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের সময় বিদ্যমান ছিলেন। এই পতঞ্জলিই পাণিনীয়-মহাভাষ্যরচয়িতা ও চরকসংহিতার প্রতিসংস্কর্তা। তিনিই বর্তমান "যোগসূত্রের" রচয়িতা। ভোজরাজ ও চক্রপাণিদত্তও তাহাই বলিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঐ বিষয়ে একমত নহেন। অধ্যাপক কীথ ও জেকবি বলেন যে যোগসূত্রকার পতঞ্জলি পৃথক্ ব্যক্তি; তিনি খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। পতঞ্জলির **যোগসূত্র** ৪টি পাদে বিভক্ত ও মোট সূত্রসংখ্যা ১৯৫টি। প্রথম পাদে "সমাধি", দ্বিতীয় পাদে "সাধন",

* প্রতিমা নাটকের ৫ম অঙ্কে অধীতবিদ্যা মধ্যে রাবণ মাহেশ্বরযোগশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছে।

তৃতীয় পাদে "বিভূতি" ও চতুর্থপাদে "কৈবল্য" বিবৃত হইয়াছে। যোগ-সূত্রের প্রারম্ভেই "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" যোগের এই সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। একাগ্রতা প্রভৃতি দ্বারা কৈবল্যপ্রাপ্তিই যোগদর্শনের উদ্দেশ্য এবং সমাধি দ্বারা কৈবল্যপ্রাপ্তির প্রণালী ঐ দর্শনে বিবৃত আছে।

যোগদর্শনের পদার্থবিভাগ সাংখ্যেরই অনুরূপ। তজ্জন্য যোগদর্শনে প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতিব লক্ষণবোধক সূত্র নাই। কিন্তু অতিরিক্ত ঈশ্বরতত্ত্বের লক্ষণ আছে। সাংখ্য পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছে, যোগদর্শন ষড়্‌বিংশতিতত্ত্ববাদী। যোগদর্শনের যোগপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ থাকাতেই উহা পৃথক্ দর্শন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যোগদর্শনেব ব্যাসরচিত প্রসিদ্ধ **ভাষ্য** আছে। এই ব্যাস সম্ভবতঃ বাদরায়ণ ব্যাস হইতে পৃথক্ কিন্তু মতান্তরে একই ব্যক্তি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই ব্যাসভাষ্য খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীব গ্রন্থ। নবম শতাব্দীতে বাচস্পতিমিশ্র ব্যাসভাষ্যের উপর **তত্ত্ববৈশারদী** নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র "রাজবার্ত্তিক" নামক বার্ত্তিকেব উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। দশম শতাব্দীতে ধারাধিপতি ভোজরাজ যোগসূত্রের **রাজমার্ত্তণ্ড** নামে একটি বৃত্তি প্রণয়ন করেন। নারায়ণতীর্থকৃত যোগসূত্রের বৃত্তি "**যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা**" যোগসূত্রের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানভিক্ষু **যোগবার্ত্তিক** রচনা করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পণ্ডিতাগ্রগণ্য নাগেশভট্ট **ছায়া** নামক যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শন।

ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের অতি নিকট সম্বন্ধ। এই উভয় দর্শন পরস্পর এরূপ অনুরূপ যে অনেক গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন মিশ্রভাবে কথিত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের অপর নাম "আন্বীক্ষিকী"। অন্বীক্ষণ শব্দের অর্থ অনু=পশ্চাৎ, ঈক্ষণ=দর্শন, অর্থাৎ পূর্ব পদার্থের জ্ঞান দ্বারা পশ্চাৎ অর্থাৎ অন্য প্রকার জ্ঞান লাভ করা (inference)। ন্যায়দর্শনে প্রমাণদ্বারা পদার্থ পরীক্ষা করিবার প্রণালী আছে। "প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ"। সংক্ষেপে ইহাকে প্রমাণশাস্ত্র (Logic) বলা যাইতে পারে।

অক্ষপাদ বা গৌতমমুনি ন্যায়শাস্ত্রের রচয়িতা। তাঁহার অপর নাম মেধাতিথি* ইহা মহাভারতের শান্তিপর্বের মোক্ষধর্মের ২৬৫।১৪ শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়। কাহারও মতে তাঁহার নাম গোতম, কাহারও মতে তাঁহার নাম গৌতম। স্কন্দপুরাণের মতে ইনিই অহল্যাপতি গৌতম।

"অক্ষপাদো মহাযোগী গৌতমাখ্যোঽভবন্ মুনিঃ।
গোদাবরীসমানেতা অহল্যায়াঃ পতিঃ প্রভুঃ॥"

স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ড কুমারিকাখণ্ড ৫৫।৫ শ্লোক। রামায়ণে দৃষ্ট হয় গৌতমমুনির আশ্রম মিথিলার উপবনে অবস্থিত ছিল। তথায় রামচন্দ্র অহল্যাকে শাপমুক্ত করিয়াছিলেন। রামায়ণ বালকাণ্ড ৪৮ অধ্যায়। মহা-মহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন গৌতম ও অক্ষপাদ পৃথক্ ব্যক্তি; ন্যায়-সূত্রের প্রাচীন অংশ, অনুমান ৫৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে গৌতম রচনা করিয়াছিলেন এবং ন্যায়সূত্রের নূতন অংশ অনুমান ১৫০ খৃষ্টাব্দে অক্ষপাদ রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক দাসগুপ্ত ঐ মত সমীচীন মনে করেন না। গোল্ডষ্টুকর বলেন পতঞ্জলি (১৪০ পূঃ খৃঃ) ও কাত্যায়ন (৪০০ পূঃ খৃঃ) উভয়েই ন্যায়সূত্র জানিতেন। বাদরায়ণ বৈশেষিকসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু ন্যায়সূত্রের উল্লেখ করেন নাই, ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন বাদরায়ণের সময়ে ন্যায়সূত্র রচিত হয় নাই।†

ন্যায়সূত্রে ৫টি অধ্যায়, ১০টি আহ্নিক ও ৮৪টি প্রকরণ ও মোট ৫২৮টি সূত্র আছে। শাস্ত্রের একবিষয়াত্মক সূত্রগুলি একই প্রকরণে নিবদ্ধ হয়।

শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ॥

কয়েকটি প্রকরণ লইয়া একটি আহ্নিক। দুই বা ততোধিক আহ্নিকে

* ভাসের প্রতিমানাটকের ৫ম অঙ্কে রাবণ মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছে।

† ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ বৈশেষিক সূত্রেরও উল্লেখ করেন নাই, ন্যায়-সূত্রেরও উল্লেখ করেন নাই। তিনি যে বৈশেষিকমতের খণ্ডন করিয়াছেন উহা ন্যায়দর্শনেরও মত। পরন্তু তিনি ন্যায়সূত্রকার গৌতমের শিষ্য। তাঁহার পূর্বেই ন্যায়সূত্র রচিত হইয়াছে।

একটি অধ্যায় গঠিত হইয়া থাকে। ন্যায়দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব আছে। ঐ সকল বিষয় অভ্রান্তরূপে পরিজ্ঞাত হইলেই নিঃশ্রেয়স বা পরমমঙ্গল লাভ হয়। ঐ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। প্রমাণ চতুর্বিধ (১) প্রত্যক্ষ (Direct perception), (২) অনুমান (Inference), (৩) উপমান (Analogy) ও (৪) শাব্দ (Verbal testimony).

ন্যায়দর্শনের মতে মানুষ মোহের আচ্ছন্নতায় বা অনুরাগের বশবর্তী হইয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য করে। বাসনাময় কর্মসমূহের সংস্কার দ্বারা "অদৃষ্ট" গঠিত হয়। ঐ অদৃষ্টের বলে পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই এই জন্মশৃঙ্খলের ছেদন হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধিত হয়। ন্যায়দর্শনের মতে আত্মা বহু।

ন্যায়দর্শনের সূত্রসংখ্যা লইয়া বিবাদ আছে। মতান্তরে ১০ আহ্নিক, ৮০ প্রকরণ, ৫২১ সূত্র। উদ্দ্যোতকরের সময়েও সূত্রসংখ্যা লইয়া তর্ক ছিল। সম্ভবতঃ কোনও কোনও বার্তিক সূত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনের সূত্রসংখ্যা ও শব্দসংখ্যার কোনও পরিবর্তন আর না ঘটিতে পারে তজ্জন্য বাচস্পতিমিশ্র "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" প্রণয়ন করিয়াছেন।

বাৎস্যায়নভাষ্য ন্যায়দর্শনের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ন্যায়ভাষ্যকার এই বাৎস্যায়ন মুনিরই অপর নাম পক্ষিলস্বামী। এতদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস এই যে অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যই ন্যায়ভাষ্যকার। হেমচন্দ্রের অভিধানের মর্ত্যকাণ্ডে লিখিত আছে—

"বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রমিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥"

চাণক্য বা কৌটিল্য ও বাৎস্যায়ন যদি অভিন্ন ব্যক্তিই হন্ তাহা হইলে তিনি যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল (৩২১—২৯৭ পূঃখৃঃ) খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু উক্ত মত এখন অনেকেই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বাৎস্যায়নভাষ্য নাগার্জুনের মাধ্যমিকবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। বাৎস্যায়ন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একটি শ্লোক উদ্ধৃত

করিয়াছেন।* পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বাৎস্যায়নভাষ্য খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হওয়া অনুমান করেন। বসুবন্ধু ও অসঙ্গ সম্ভবতঃ খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। বাৎস্যায়নভাষ্য বসুবন্ধু ও অসঙ্গের পূর্ববর্তী বলিয়া বিবেচিত হয়।

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধন্যায়ের প্রভাবে হিন্দু ন্যায়দর্শন মেঘাবৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্নাগের (৩৬৫—৪২৫ খৃঃ) মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে উদ্দ্যোতকর **ন্যায়বার্ত্তিক** প্রণয়ন করেন। উদ্দ্যোতকরের ঐ ন্যায়বার্তিক ষষ্ঠ শতাব্দীতে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে সুবন্ধুর বাসবদত্তাকে "ন্যায়স্থিতিমিবোদ্দ্যোতকরস্বরূপাম্" বাক্যদ্বারা অন্যপ্রসঙ্গেও উদ্দ্যোতকরের গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। ৮ম শতাব্দীতে শান্তরক্ষিত তাঁহার তত্ত্বসংগ্রহে (৭০৫ হইতে ৭৬২ খৃঃ) পুনঃ পুনঃ উদ্দ্যোতকরের উল্লেখ করিয়াছেন। শান্ত-রক্ষিত ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বত গমন করেন এবং ৭৬২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ৯ম শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের বার্তিক সম্বন্ধে "দুস্তরকুনিবন্ধপঙ্কমগ্নানাম্", "অতিজরতীনাম্", "উদ্দ্যোতকরগবীনাম্", প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি অতিপ্রাচীন-গবীসদৃশ উদ্দ্যোত-করের বার্তিকগুলিকে কালপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া ধর্মকার্যই করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাও উদ্দ্যোতকরের বার্তিকের প্রাচীনত্বই সূচিত হয়। দিঙ্নাগের পরবর্তী ও সুবন্ধুর বাসবদত্তার পূর্ববর্তী হওয়ায় উদ্দ্যোতকরকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। উদ্দ্যোতকরের পরেও কিছুকাল বৌদ্ধ ন্যায়ের প্রভাব ছিল কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নের আবির্ভাবের পূর্বেই বৌদ্ধন্যায়ের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাবেই বৌদ্ধন্যায় চিরকালের তরে অধঃপতিত হইল। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্নাগ, ধর্মকীর্তি, প্রজ্ঞাকর, সুভূতি প্রভৃতি সকলেই বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইলেন। শূন্যবাদের স্থলে আত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং নিরীশ্বরতার স্থানে সেশ্বরবাদ স্থাপিত হইল।

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত ন্যায়দর্শনের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

Gaekwad's Oriental Series, No. xxx তত্ত্বসংগ্রহ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

উদ্দ্যোতকরের পরে ও বাচস্পতির পূর্বে **ভাসর্বজ্ঞ** তাঁহার **ন্যায়সার ও গণকারিকা** প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থদ্বয় কাশ্মীরপ্রদেশে রচিত হয়। ইহার মতে প্রমাণ তিন প্রকার (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান (৩) আগম। ইনি উপমান প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। প্রত্যক্ষলক্ষণের সংজ্ঞাতে "যোগিপ্রত্যক্ষ" গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু গোতমের যোগিপ্রত্যক্ষের অর্থে গ্রহণ করেন নাই। ভাসর্বজ্ঞ যোগদর্শনের মতের সঙ্গে ভক্তিবাদও গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়েই বাচস্পতি মিশ্রের অধ্যাপক ত্রিলোচন জন্মগ্রহণ করেন। বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকায় ত্রিলোচনকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তিকালেও উদয়নাচার্য এবং বর্দ্ধমান ত্রিলোচনকে বাচস্পতি মিশ্রের গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ন্যায়সারের টীকা "ন্যায়সার পদপঞ্জিকা" বাসুদেব রচিত।)

বাচস্পতি মিশ্র। বাচস্পতি মিশ্র সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ছিলেন। তিনি ত্রিলোচনের শিষ্য। তিনি সকল দর্শনের টীকাতেই অসাধারণ গভীর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বাচস্পতি মিশ্রকে দ্বাদশশতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ঐ মত ভ্রমাত্মক। বাচস্পতি-মিশ্র তাঁহার "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" উহার প্রণয়নকাল নির্দেশ করিয়াছেন।

"ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদা।
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসুবৎসরে॥"

বসু-অঙ্ক-বসু=৮৯৮। বস্বঙ্কবসু এই অঙ্ক সংবৎ কি শকাব্দ তাহা বাচস্পতি উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু "বৎসর" শব্দ দ্বারা সংবৎ গ্রহণ করিবার রীতি আছে। বিশেষতঃ বাচস্পতি উদয়নাচার্যের সমসাময়িক নহেন, পরন্তু অনেক প্রাচীন; উদয়নাচার্যের সময় তাঁহার লক্ষণাবলীর শেষভাগে আছে। উদয়ন ৯০৬ শকে লক্ষণাবলী রচনা করেন।

"তর্কাম্বরাঙ্কপ্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষুদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্॥"

৯০৬ শক...৯৮৪ খৃষ্টাব্দ। এরূপ অবস্থায় বাচস্পতিকে ৮৯৮ সংবতে স্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত। ৮৯৮ সংবৎ=৮৪১ খৃষ্টাব্দ। উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে বাচস্পতি মিশ্র নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইহা অবধারণ করা যায়।

বাচস্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের বার্তিকের উপর **ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য** নামক প্রসিদ্ধ টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তিনি **ন্যায়সূচীনিবন্ধ** নামক গ্রন্থে ন্যায়সূত্রের সূত্রসংখ্যা, শব্দসংখ্যা ও অক্ষরসংখ্যা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই বাচস্পতি মিশ্র স্মৃতিনিবন্ধকার বাচস্পতি মিশ্র হইতে পৃথক্। তিনি বহু পরবর্তী লোক।

কিছুকাল পরেই (৮৮০ খৃঃ) জয়ন্ত ভট্ট **ন্যায়মঞ্জরী** রচনা করেন। জয়ন্ত ভট্ট কাশ্মীরাধিপতি শঙ্করবর্মার আদেশক্রমে অশব্দগুহাতে আবদ্ধ থাকিয়া ন্যায়মঞ্জরী রচনা করেন। "রাজ্ঞা তু গহ্বরেঽস্মিন অশব্দকে বন্ধনে বিনিহিতোঽহং গ্রন্থরচনাবিনোদাদিহ ময়া বাসরাগ মিতা।" তাঁহার প্রপিতামহ শক্তিস্বামী মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের মন্ত্রী ছিলেন। ললিতাদিত্যের রাজত্ব ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। এই জয়ন্তের পুত্র অভিনন্দ "কাদম্বরী কথাসার" ৯০০ খৃষ্টে রচনা করেন। এই স্থলেই জয়ন্ত ভট্টের অন্যতর গ্রন্থ "**ন্যায়কলিকা**" উল্লেখ করা কর্তব্য। উহা ন্যায়সূত্রের লঘুবৃত্তি। অভিনন্দ তাঁহার পিতাকে "বৃত্তিকার" বলিয়াছেন।

"বৃত্তিকার ইতি ব্যক্তং দ্বিতীয়ং নাম বিভ্রতঃ।
জয়ন্তনাম্নঃ সুধিয়ঃ সাধুসাহিত্যতত্ত্ববিৎ॥"

জয়ন্তকে গঙ্গেশোপাধ্যায় "জরন্নৈয়ায়িক" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। জয়ন্ত ভামতীর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এই বিশ্বাসে তাঁহাকে বাচস্পতি মিশ্রের ভামতীর পরবর্তী বলিয়া বিবেচনা করা হয় কিন্তু ঐ শ্লোকটি ভামতীকারের স্বকীয় শ্লোক নহে। ঐ শ্লোকের পূর্বেই "তদুক্তম্" কথা আছে। বাচস্পতি মিশ্র মণ্ডনমিশ্রকৃত "বিধিবিবেক" গ্রন্থের টীকা "ন্যায়-কণিকার" মঙ্গলাচরণ শ্লোকে "ন্যায়মঞ্জরীং প্রসবিত্রে ....বিদ্যাতরবে নমো গুরবে" এই নমস্কারবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের "ন্যায়মঞ্জরী" ব্যতীত অন্য কোনও ন্যায়মঞ্জরী দৃষ্ট হয় না। ইহাতে জয়ন্ত ভট্ট বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ববর্তী সাব্যস্ত হয়েন।

উদয়নাচার্য্য

জয়ন্তের কিছুকাল পরেই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক **উদয়নাচার্য্য** জন্মগ্রহণ

করেন। উদয়নাচার্য্য খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক তাহা ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকার উপর **ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি** নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।* উদয়নাচার্যের **ন্যায়কুসুমাঞ্জলি** অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। মাধবাচার্য সর্ব-দর্শনসংগ্রহে (১৩৮০ খৃঃ) কুসুমাঞ্জলির উল্লেখ করিয়াছেন।

বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্যই মিথিলাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন এবং বহু শতাব্দী পর্যন্ত মিথিলাই ন্যায়দর্শনের আবাসভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। উদয়নাচার্যের পর **বরদরাজমিশ্রের** নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি উদয়নাচার্যের কুসুমাঞ্জলির উপর **কুসুমাঞ্জলিবোধনী** নামক টীকা ও কিরণাবলীর উপর "তর্ককারিকা" নামক টীকা রচনা করেন। "**তার্কিকরক্ষা**" তাঁহার অপর একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ। অধ্যাপক ভিনিস তাঁহার কাল ১০৫০—১৩০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বেনারস কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ কুসুমাঞ্জলিবোধনীর মুখবন্ধে তাঁহাকে একাদশ শতাব্দীতেই নিঃসন্দেহরূপে স্থাপন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার **মল্লিনাথ** তার্কিকরক্ষার "**নিষ্কণ্টকা**" নামে টীকা রচনা করিয়াছেন।†

গঙ্গেশোপাধ্যায় মৈথিল গগনের নির্মল ভাস্কর। এই গঙ্গেশকেই নব্য ন্যায়ের প্রবর্তক বলা হয়। ইঁহার কাল সূক্ষ্মরূপে নির্দেশ করা যায় না কিন্তু খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার কাল ধরিলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়; অধ্যাপক দাসগুপ্ত তাঁহাকে ১২০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করেন এবং তাঁহার পুত্র বৰ্দ্ধমানকে ১২২৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু কোনও কারণ নির্দেশ করেন নাই। গঙ্গেশ শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ ১১৬৯ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে জীবিত ছিলেন। মাননীয় রাজেন্দ্রলাল ঘোষ মহাশয় নব্যন্যায় ব্যাপ্তিপঞ্চক গ্রন্থের ভূমিকায় গঙ্গেশের কাল ১১৭৮

---

* ঐ ন্যায়বর্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধির উপর বৰ্দ্ধমান "ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ" এবং ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশের উপর পদ্মনাভ "বৰ্দ্ধমানেন্দু" রচনা করিয়াছেন ও বৰ্দ্ধমানেন্দুর উপর "ন্যায়তাৎপর্যমণ্ডল" নামক টীকা দৃষ্ট হয়।

† কুসুমাঞ্জলির বৰ্দ্ধমানকৃত "কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ" ও তদুপরি রুচিদত্তকৃত "মকরন্দ" নামক প্রসিদ্ধ টীকা আছে।

খৃষ্টাব্দ অবধারণ করিয়াছেন। মাধবাচার্যের (১৩৮০ খৃঃ) সর্বদর্শনসংগ্রহে বৰ্দ্ধমানের নামোল্লেখ থাকা তাঁহার ঐ মতের একতম কারণ। কিন্তু সর্বদর্শনসংগ্রহে যে বৰ্দ্ধমানের উল্লেখ আছে তিনি "গণরত্নমহোদধি" প্রণেতা; ঐ গ্রন্থ ১১৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

গঙ্গেশোপাধ্যায়ের **তত্ত্বচিন্তামণি** ন্যায়দর্শনকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। তত্ত্বচিন্তামণিতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দপ্রমাণ ও অনুমানখণ্ডে ঈশ্বরানুমান বিবেচিত হইয়াছে। তিনি গৌতমের "সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা" এই সূত্রোক্ত প্রতিজ্ঞালক্ষণের দোষ দেখাইয়া গৌতমের প্রাচীন ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া নূতন মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই গ্রন্থই নব্যন্যায়ের মূল ভিত্তি। গঙ্গেশের পরবর্তী নৈয়ায়িক আচার্যগণ কেবল ব্যাপ্তিবাদ ও অনুমান খণ্ড লইয়াই বিব্রত রহিলেন কিন্তু "ঈশ্বর" ও "আত্মা" ও উভয়ের সম্বন্ধ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া নামমাত্রে পর্যবসিত হইল। কুসুমাঞ্জলির সেশ্বর ন্যায়শাস্ত্র কেবলমাত্র শুষ্ক তর্কশাস্ত্রে পরিণত হইল। পক্ষধর মিশ্র তত্ত্বচিন্তামণির উপর "**আলোক**" টীকা রচনা করিয়াছেন এবং শঙ্কর মিশ্র "**ময়ূখ**" টীকা রচনা করিয়াছেন। শঙ্কর মিশ্রের কাল খৃঃ ১৫ শতাব্দীর শেষার্ধ।

গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র **বৰ্দ্ধমানোপাধ্যায়** গৌতমের ন্যায়সূত্রের "**অন্বীক্ষানয়-তত্ত্ববোধ**" নামক টীকা ও কুসুমাঞ্জলিপ্রকরণের টীকা **কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ** ও কিরণাবলীর টীকা **কিরণাবলী-প্রকাশ**, তত্ত্বচিন্তামণির **তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ** এবং উদয়নাচার্যকৃত "ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধি"র টীকা, **ন্যায়-নিবন্ধপ্রকাশ** প্রভৃতি বহু টীকা রচনা করেন।

পক্ষধর মিশ্র। একজন প্রসিদ্ধ মৈথিল নৈয়ায়িক। তাঁহার অপর নাম জয়দেব মিশ্র। তাঁহার নিকটই নবদ্বীপের বাসুদেব সার্বভৌম ও পরে তাঁহার ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায় শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি বিষ্ণুপুরাণের হস্তলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহার লিপিকাল ৩৪৬ লং সং বলিয়া উল্লেখ আছে। লং সং = লক্ষ্মণ সংবৎ; উহার সহিত ১১১৯ যোগ করিলেই খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনুসারে ঐ বিষ্ণুপুরাণখানি ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে বুঝা যায়, তাহা হইলে পক্ষধর মিশ্রের কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ বলা যাইতে পারে। পক্ষধর মিশ্র

গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির উপর **চিন্তামণ্যালোক** প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনিই প্রসন্নরাঘব চন্দ্রালোক প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন এরূপ জনশ্রুতি আছে। কিন্তু ঐ মত ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কারণ এই জয়দেব বা পীযূষবর্ষ ১২শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং ১৪শ শতাব্দীতে শিঙ্গভূপাল রচিত রসার্ণবসুধাকরে এই জয়দেবরচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

মৈথিল নৈয়ায়িকগণের নাম উল্লেখ করিতে **দ্বিতীয় বাচস্পতি** মিশ্রের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য; যদিও ইনি নৈয়ায়িক ছিলেন তথাপি ইনি স্মৃতি-নিবন্ধকার বলিয়াই বিশেষভাবে খ্যাত। ইঁহার **বিবাদচিন্তামণি** ও **ব্যবহারচিন্তামণি** মিথিলার ব্যবহারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ন্যায়াধিকারে তিনি গৌতমসূত্রের **ন্যায়তত্ত্বালোক** নামক টীকা ও ন্যায়সূচীনিবন্ধের অনুকরণে **ন্যায়সূত্রোদ্ধার** নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ন্যায়পক্ষ সমর্থন করিয়া শ্রীহর্ষের খণ্ডন গ্রন্থের বিরুদ্ধে "খণ্ডনোদ্ধার" নামক গ্রন্থ রচনা করিাছেন। ইনি মৈথিলরাজ ভৈরবচন্দ্রের সভাপতি ছিলেন এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

নবদ্বীপ।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মৈথিল ন্যায়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সর্ব-প্রদেশের ছাত্রগণ মিথিলাতে ন্যায় অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। মৈথিল নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে ন্যায়শাস্ত্রের কোন গ্রন্থ মিথিলার নৈয়ায়িকগণের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে দিতেন না। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবদ্বীপে **বাসুদেব সার্বভৌম** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ। বাসুদেব ন্যায়শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তির জন্য মিথিলায় গমন করিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মিথিলায় তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য দেখিয়া বহু ছাত্র ও মৈথিলগণ ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। তৎকালে "শলাকাসিদ্ধি" পরীক্ষা হইত। কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের হস্তলিপি একটি তীক্ষ্ণ সূচী দ্বারা বিদ্ধ করা হইত। যে পত্রে শেষ সূচীচিহ্ন দৃষ্ট হইত সেই পত্রে লিখিত বিষয়ের প্রশ্ন হইত। ঐরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহই উপাধি পাইতেন না। বাসুদেব সার্বভৌম ঐ প্রকার শত শলাকাসিদ্ধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বাসুদেব সার্বভৌম গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির উপর **সারাবলী** নামক টীকা ও **সার্বভৌমনিরুক্তি** নামক ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন। বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্রগণ মধ্যে **রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ** যুগপ্রবর্তকস্বরূপে যশোলাভ করিয়াছিলেন। কুসুমাঞ্জলির টীকাকার হরিদাসও তাঁহার ছাত্র ছিলেন। কেহ কেহ বলেন বাসুদেব সার্বভৌম শেষ জীবনে পুরীধামে বাস করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছিলেন এবং চৈতন্যদেব তাঁহাকে ভক্তিপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে চৈতন্যদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন এরূপ বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। চৈতন্যদেব সার্বভৌমের ছাত্র হইলে তাঁহার নানাপ্রকার পরিচয় ইত্যাদি সার্বভৌমের জিজ্ঞাসা করা সম্ভবপর নহে। ঐ বাসুদেব চৈতন্যদেবের অধ্যাপক হইলে চৈতন্যদেবের সমকালীন কোনও গ্রন্থে নিশ্চয়ই ঐ বিষয়ের উল্লেখ থাকিত। কিন্তু অধ্যাপক গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার ঘোষ ঐ সার্বভৌমকেই চৈতন্যদেবের অধ্যাপক নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

বাসুদেব সার্বভৌমের প্রধান ছাত্র **রঘুনাথ শিরোমণি**। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। জননী অতি দুঃখে তাঁহাকে লালন পালন করেন। ইনি একচক্ষুহীন ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম কাণ ভট্টশিরোমণি। তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে মিথিলায় পরমগুরু বৃদ্ধ পক্ষধর মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন সমাপ্তি করেন। রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের সামান্যলক্ষণার ও গঙ্গেশের মতের দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবশেষে পক্ষধর মিশ্রকে তর্কে নিরস্ত ও অনুরক্ত করায় পক্ষধর রঘুনাথকে উপাধি প্রদান করেন। তদবধি নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি দিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্বে মিথিলা ব্যতীত কাহারও ন্যায়ের উপাধি দিবার অধিকার ছিল না। রঘুনাথ নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্রকে স্বীয় প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষ ও অনুমান খণ্ডের উপর **তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি** প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রতিভা কেবল প্রাচীন ক্ষুণ্ণবর্ত্মেই নিবদ্ধ ছিল না। তিনি স্বাধীনভাবে ও নির্ভীকচিত্তে নূতন নূতন মতের অবতারণা করিয়াছেন ও গৌতমের ও কণাদের মত-

বিরুদ্ধ অনেক মত সমর্থন করিয়া **পদার্থতত্ত্বনিরূপণ** বা **পদার্থখণ্ডন** গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং অসম্পূর্ণ প্রাচীন মতের পূর্ণতা ও গলিত প্রাচীন মতের নিরসন করিয়াছেন। তিনি টীকাকার হইয়াও নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন। রঘুনাথের দীধিতি রচনার পরেই মিথিলার ন্যায়ের একাধিপত্য ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে আরম্ভ হয়। রঘুনাথ, বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের কিরণাবলীপ্রকাশ ও লীলাবতীপ্রকাশের টীকা ও বৈশেষিকদর্শন সম্বন্ধে **পদার্থখণ্ডন** রচনা করেন। রঘুনাথ শিরোমণির সময় হইতেই নবদ্বীপ সরস্বতীপীঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তদবধি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মিথিলা পঞ্চনদ প্রভৃতি স্থানের ছাত্রগণ নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। ঐ সময় হইতে নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন করিলেন।

হরিদাসও বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র। রঘুনাথের ন্যায় অসামান্য প্রতিভার অধিকারী না হইলেও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।। তিনি উদয়নাচার্যের ন্যায়কুসুমাঞ্জলির কারিকা অংশের **কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা** প্রণয়ন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ কুসুমাঞ্জলির গদ্যাংশ তৎকালে নবদ্বীপে আনীত হয় নাই। ঐ টীকা "হরিদাসী টীকা" নামে প্রসিদ্ধ। অধ্যাপক কাউএল ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাহায্যে ঐ টীকাসহ ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ টীকা ব্যতীতও পক্ষধর মিশ্রের চিন্তামণ্যালোকের টীকা তিনি রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত **অনুমানালোক, শব্দালোক** ও **প্রত্যক্ষালোক** নামক তিনখানি গ্রন্থ হরিদাস রচনা করেন। ঐ সকল গ্রন্থের কন্দর্প রায় নামক এক ব্যক্তির হস্তলিখিত পুস্তক পুরী শঙ্করমঠে বিদ্যমান আছে। উহার লিপিকাল ১৫২১—১৫২৩ শকাব্দ=১৫৯৯—১৬০১ খৃষ্টাব্দ।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ। (১৫৮০ খৃঃ) মথুরানাথ শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের পুত্র, রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র। তিনি প্রথমে চিন্তামণিদীধিতির টীকা প্রণয়ন আরম্ভ করেন। পরে পিতৃআজ্ঞাক্রমে মূল চিন্তামণিগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। শিরোমণি গঙ্গেশের চিন্তামণির কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান খণ্ডের দীধিতি রচনা করিয়াছিলেন, মথুরানাথ চিন্তামণির প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ ৪ খণ্ডেরই "রহস্য" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত

পক্ষধর মিশ্রের চিন্তামণ্যালোকের ও বর্দ্ধমানের গুণকিরণাবলীপ্রকাশের ও বল্লভাচার্যের ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশের টীকা রচনা করেন। যদিও প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যে তিনি শিরোমণি অপেক্ষা হীন তথাপি তাঁহার টীকার প্রাঞ্জলতা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার টীকাগুলির প্রকৃত নাম "রহস্য" কিন্তু তাঁহার টীকাগুলি ন্যায়চর্চাকারীদের নিকট "মাথুরী" নামে প্রসিদ্ধ। মথুরানাথের কাল ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ। ভবানন্দ মথুরানাথের শিষ্য ছিলেন। ভবানন্দের কাল ষোড়শ শতাব্দীর অন্ত্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ বলা যাইতে পারে। তিনি পক্ষধরমিশ্রের চিন্তামণ্যালোক গ্রন্থের **সারমঞ্জরী** নামক টীকা ও রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির **চিন্তামণিদীধিতিগূঢ়ার্থ-প্রকাশিকা** নামক ভাষ্য রচনা করেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৫৯০ খৃঃ)। জগদীশ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র। জনশ্রুতি আছে ইনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুষ্ট ছিলেন। ঘটনাক্রমে মতির পরিবর্তন হওয়ায় অধিক বয়সে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি শিরোমণির দীধিতির টিপ্পনি ও গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের অনুমানময়ূখের ভাষ্য রচনা করেন। প্রশস্তপাদভাষ্যের উপরেও তাঁহার "সূক্তি" নামে টীকা আছে। এই সকল টীকায় তিনি অদ্ভুত বিচারশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। শব্দখণ্ডে তাঁহার **শব্দশক্তিপ্রকাশিকা** অতুলনীয় মৌলিক গ্রন্থ। তাঁহার পৌত্র রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ শব্দশক্তিপ্রকাশিকার "সুবোধিনী" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। জগদীশের টীকার নাম "জাগদীশী" বলিয়া খ্যাত। জগদীশের কাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া ধরা যায়।

গদাধর ভট্টাচার্য। (১৬৫০ খৃঃ)। জগদীশের জীবনের শেষভাগে গদাধরের অভ্যুদয়। গদাধরের পিতার নাম জীবাচার্য। তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বর্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড় তাঁহার পূর্বনিবাস ছিল। গদাধর হরিরাম তর্কবাগীশের টোলে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্তির পূর্বেই হরিরাম পরলোক গমন করেন। হরিরামের আজ্ঞাক্রমে গদাধরই হরিরামের টোলে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

গদাধরের উপাধি না থাকায় ও তিনি অধ্যাপকবংশীয় নহেন এজন্য টোলের ছাত্রগণ সকলেই টোল পরিত্যাগ করিল। গদাধর একাকী বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া পড়াইতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিভাজ্যোতি দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইল। জগদীশও তাঁহার প্রশংসা করিলেন। গদাধর দীধিতির টীকা চিন্তামণ্যালোকের টীকা এবং ন্যায়শাস্ত্রের বহুপ্রকার বাদের টীকা রচনা করেন। ঐ সকল টীকায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য প্রকাশ পাইয়াছে। গদাধরের টীকাগুলি "গাদাধরী টীকা" অথবা "গাদাধরী পাতড়া" নামে প্রসিদ্ধ। গদাধরের টীকাতেই সম্ভবতঃ নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্রের মৌলিক গবেষণার চরমোৎকর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। কথিত আছে তিনি তাঁহাব পৌত্রের ন্যায়-শিক্ষার সৌকর্যে **ভাষাপরিচ্ছেদ** রচনা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ঐ কারিকাগুলির "ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন (১৭শ শতাব্দী)। ন্যায়ের প্রথম পাঠার্থীরা ভাষাপবিচ্ছেদ সযত্নে পাঠ করিয়া থাকেন। ঐ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপবে "দিনকবী" ও তদুপরি "রামরুদ্রী" নামক টীকা আছে। "দীনকরী"র অপব নাম "মুক্তাবলী-প্রকাশ।" উহা ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বচিত হয়। এই স্থলে অন্নম্ভট্টের **তর্কসংগ্রহের** উল্লেখ কবা কর্তব্য। ইহাও ন্যায়েব প্রথম পাঠার্থীদিগের পঠিতব্য গ্রন্থ। অন্নম্ভট স্বয়ং উহার ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। কেশব মিশ্রের "**তর্কভাষা**" ও মাধবদেবের "**ন্যায়সার**" ন্যায়শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখযোগ্য।

বৈশেষিক দর্শন।

ন্যায় ও বৈশেষিক সমশ্রেণীব দর্শন। বৈশেষিক দর্শনের অপর নাম ঔলুক্য দর্শন। "বিশেষ" নামক পদার্থ এই দর্শন স্বীকার করায় ইহাকে বৈশেষিক দর্শন বলে। কণাদমুনি এই দর্শনের দ্রষ্টা। তাঁহার মতে নিত্যদ্রব্যে অর্থাৎ আত্মা, আকাশ, কাল, দিক, মনঃ ও চতুর্বিধ পরমাণুর প্রত্যেকটিতে আত্যন্তিক ব্যাবৃত্তিসাধক একটি ধর্ম বিদ্যমান আছে। ইহাবই পারিভাষিক নাম "বিশেষ"। বৈশেষিক দর্শন আরম্ভবাদী। কণাদের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ। ঈশ্বরতত্ত্ব দ্বারাই দুঃখ নিবৃত্তি হয়।

প্রজ্ঞা উদিত হইলেই ঈশ্বরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। এই দর্শন সাতটি পদার্থ স্বীকার করে :—দ্রব্য, গুণ, কর্ম (ক্রিয়া), সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। কণাদের **বৈশেষিকসূত্র** এই দর্শনের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ১০টি অধ্যায়, ২০টি আহ্নিক ও ১০০টি সূত্র আছে।

বৈশেষিক দর্শনের প্রাচীন কোনও ভাষ্য বিদ্যমান নাই। রাবণকৃত অতি প্রাচীন ভাষ্য ছিল তাহা কালক্রমে তিরোহিত হইয়াছে। **প্রশস্ত-পাদাচার্যের পদার্থধর্মসংগ্রহ** ভাষ্যস্থানীয়। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ঐ গ্রন্থকে ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। তিনি স্বয়ং কণাদসূত্রের এক অভিনব ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণিপ্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রশস্তপাদাচার্যকৃত ভাষ্যকে ভাষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঐ ভাষ্য (পদার্থধর্মসংগ্রহ) খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া প্রতীতি হয়। বাচস্পতি মিশ্র ঐ গ্রন্থের কোনও টীকা করেন নাই।

বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে প্রশস্তপাদাচার্যের পরই **ব্যোমশিবাচার্যের** নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর দার্শনিক। অধ্যাপক দাসগুপ্ত তাঁহাকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন।

উদয়নাচার্য (১০ম শতাব্দী) সম্ভবতঃ "আচার্য" শব্দ দ্বারা ব্যোম-শিবাচার্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীধরাচার্যও তাঁহার ন্যায়কন্দলী রচনায় ব্যোমশিবাচার্যের নিকট বহুলভাবে ঋণী এবং রাজশেখর (দ্বাদশ শতাব্দী) তাঁহার ন্যায়কন্দলীর টীকা ন্যায়কন্দলীপঞ্জিকাতে ব্যোমশিবাচার্যকৃত প্রশস্তপাদাচার্যের উপর টীকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ টীকার নাম **ব্যোমবতী**। ১২শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্য তাহার "ন্যায়লীলাবতী"তেও ব্যোমাচার্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যোমবতী কিছুদিন পূর্বে কাশী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

দশম শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ **উদয়নাচার্যই** বৈশেষিক দর্শনের সর্বপ্রধান ব্যাখ্যাতা। তাঁহার **কিরণাবলী** ঐ দর্শনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বর্দ্ধমানোপাধ্যায় ঐ কিরণাবলীর **কিরণাবলীপ্রকাশ** নামক টীকা রচনা করেন। ঐ প্রকাশের উপর পদ্মনাভের "বর্দ্ধমানেন্দু" নামক টীকা আছে। ১৬শ শতাব্দীতে পদ্মনাভ মিশ্র **কিরণাবলীভাস্কর** নামক টীকা রচনা করেন।

পদ্মনাভকৃত প্রশস্তপাদাচার্যের "সেতু" নাম্নী টীকা বিদ্যমান আছে। ১০ম শতাব্দীতে রচিত শিবাদিত্যের **সপ্তপদার্থী** উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীধরাচার্যও উদয়নাচার্যের সমসাময়িক। উভয়ে উভয়ের মত পরস্পর খণ্ডন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উভয়েই শেষ জীবনে নিজ নিজ গ্রন্থের পুনর্বার নব কলেবর প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীধর "ত্র্যধিকদশোত্তরনবশতশকাব্দে" ৯১৩+৭৮=৯৯১ খৃষ্টাব্দে) প্রশস্তপাদাচার্যের উপর **ন্যায়কন্দলী** রচনা করেন। ইনি বঙ্গদেশীয় আচার্য। ১২শ শতাব্দীতে রাজশেখর এই গ্রন্থের **ন্যায়কন্দলীপঞ্জিকা** নামে টীকা রচনা করিয়াছেন।

একাদশ শতাব্দীতে বরদরাজ মিশ্র ও ১২শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্যের "**ন্যায়লীলাবতী**" উল্লেখযোগ্য।

আমরা ইতিপূর্বেই বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত "কিরণাবলীপ্রকাশের" উল্লেখ করিয়াছি। বর্দ্ধমানের পরেই **শঙ্কর মিশ্র** একজন প্রধান দার্শনিক, তাঁহার পিতার নাম ভবনাথ ও মাতার নাম ভবানী। ইনি শৈব ছিলেন, ইনি কণাদের বৈশেষিক সূত্রের উপর **উপস্কার** রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত **কণাদরহস্যম্** ও **বাদিবিনোদ** উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

বৈশেষিক দর্শন ও ন্যায়দর্শনের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকায় কয়েকখানি গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মিশ্রভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বরদরাজমিশ্রকৃত (১১শ শতাব্দী) **তার্কিকরক্ষা** ও কেশবমিশ্রকৃত (১২শ শতাব্দী) **তর্কভাষা** এই উভয় গ্রন্থেই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মিশ্রভাবে উক্ত হইয়াছে।

নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চার সহিত বৈশেষিক দর্শনেরও চর্চা হইত। রঘুনাথ শিরোমণির "পদার্থখণ্ডন"। রামভদ্র সার্বভৌম উহার টীকা "পদার্থ-খণ্ডনবিবেচনপ্রকাশ" এবং কিরণাবলীর রহস্য প্রণয়ন করেন। মথুরানাথ কিরণাবলীপ্রকাশের ভাষ্য ও ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশের ভাষ্য ও হরিরাম-তর্কবাগীশ শিবাদিত্যকৃত **সপ্তপদার্থী** গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রশস্তপাদাচার্যের গ্রন্থের "সূক্তি" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন।

পূর্বমীমাংসা বা জৈমিনীয় দর্শন।

বেদের দুইটি অংশ আছে—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপাসনা কর্মকাণ্ডেরই

অন্তর্গত। কর্মকাণ্ডের দর্শনই **মীমাংসা-দর্শন** বা কর্মমীমাংসা। উহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত জন্য উহাকে কেহ কেহ "**দ্বাদশলক্ষণী**" ও বলে। ব্যাসশিষ্য জৈমিনি উহা রচনা করেন। জৈমিনির এই কর্মমীমাংসার পরিশিষ্ট সংকর্ষণ-কাণ্ড। উহাতে উপাসনার বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে।

জৈমিনীয়দর্শন বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে (সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-মহাভারত-ধর্মাচার্যঃ ৩।৪।৪) জৈমিনি, বৈশম্পায়ন প্রভৃতির উল্লেখ আছে। পুরাণগুলির মতে বেদব্যাস কর্তৃক বেদবিভাগকালে জৈমিনি সামবেদের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈমিনীর ৬।৭।৫ সূত্রে ধর্মসূত্রের ও ১২।৪।৪২ সূত্রে স্মৃতি শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। জৈমিনীয়সূত্রে বৌদ্ধধর্মের অথবা বৌদ্ধদর্শনের উল্লেখ নাই। শবর-স্বামীর মতে জৈমিনীয়সূত্র কল্পসূত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে। জৈমিনি ১।১।৫, ৫।২।১৯, ৬।১।১৮ ও ১০।৮।৪৪ সূত্রে বাদরায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন। কালক্রমে প্রাচীন জৈমিনীয় সূত্রগুলির কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এরূপ বোধ হয়। বর্তমানাকারের সূত্রগুলি যে ২০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে বিদ্যমান ছিল তাহা অনুমান করা যায়। পঞ্চতন্ত্রে উল্লিখিত আছে জৈমিনিকে হস্তী পেষণ করিয়া নিহত করিয়াছিল (২।৩৪)।

পূর্বমীমাংসায় ১২টি অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায় সাধারণতঃ ৪ পাদে বিভক্ত কিন্তু ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১০ম অধ্যায়ে ৮টি করিয়া পাদ আছে। সূত্র সংখ্যা মোটামুটি ২৭০০। এই সূত্রগুলি ১০০০ অধিকরণে বিভক্ত। শঙ্কর ভট্ট ১০০০ অধিকরণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু মাধবাচার্য প্রভৃতি উহা অপেক্ষা অধিক নূতন অধিকরণ স্বীকার করেন।

"ধর্ম" কি তাহার তত্ত্ব নির্ণয়ই পূর্বমীমাংসার উদ্দেশ্য। এই তত্ত্বনির্ণয়ে যে ন্যায়মালার অবতারণা হইয়াছে তাহাই পূর্বমীমাংসার দর্শনভিত্তি। মীমাংসাশাস্ত্রে "ধর্ম" শব্দের অর্থ কি তাহা জানা আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষায় "ধর্ম" কথাটি বেশী ব্যাপক (অর্থাৎ religion) অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু মীমাংসাশাস্ত্রে উহা বেদবিহিত করণীয়, আচরণীয় বা "কর্তব্যকর্ম" অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই দর্শনের ১ম সূত্রই হইতেছে "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" ১।১।১। ধর্মতত্ত্বনিরূপণ এই দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ করিতে

জৈমিনি বলিয়াছেন "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ"। প্রবর্তক বাক্য অর্থাৎ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি জ্ঞাপক শ্রেয়স্কর ক্রিয়াকলাপই ধর্মের লক্ষণ। তজ্জন্য বেদোক্ত বিধি, নিয়ম, নিষেধ ও ক্রতুপ্রণালী প্রভৃতির বিচারই এই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বেদের কোন্ অংশ মন্ত্র, ঋক্, যজুঃ, সামন্, কোন্ অংশ বিধি, কোনটি প্রতিষেধ, কোন্টি অর্থবাদ, কোন্টি নামধেয় ইহা নির্ণয় করা ও বিধির বিশেষ বিশেষ শ্রেণীবিভাগ অবধারণ করা পূর্বমীমাংসার প্রধান বিষয়। প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ "মীমাংসা" ন্যায় নামে অভিহিত হইত। মীমাংসা সূত্রাকার ধারণ করিবার পূর্বে ঐ সম্বন্ধে এক বিপুল সাহিত্য বিদ্যমান ছিল। সম্ভবতঃ সূত্রগুলি তাহারই সার মর্ম। দর্শনগুলির মধ্যে **মীমাংসাসূত্র**গুলিই সর্ব প্রাচীন বলিয়া প্রতীতি হয়; কিন্তু কালক্রমে উহার কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছে।

শবরস্বামী। শবরস্বামীর ভাষ্যই মীমাংসাদর্শনের সবপ্রাচীন ব্যাখ্যা; কিন্তু শবরের পূর্বেও মীমাংসাসূত্রের ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল। শবরস্বামীর সময়েই মীমাংসাসূত্রের পাঠের পার্থক্য ছিল। কুমারিলের তন্ত্রবার্তিকে উল্লেখ আছে শবর কয়েকটি সূত্র বাদ দিয়াছেন "যে তু একর্মাৎ ইতিসূত্রং পঠন্তি" শবর ১১।১।১৪-১৫।

"অত্রান্তরে ভাষ্যকারস্য সূত্রং প্রভ্রষ্টং বাক্যাসময়াদিতি"

তন্ত্রবার্তিক ৩।৪।৯।

শবর পুনঃ পুনঃ বৃত্তিকারের উল্লেখ করিয়াছেন। "অত্র ভবান্" বা "ভগবান্ আচার্য" এই বিশেষণ দ্বারা তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। কোনও কোনও স্থানে বৃত্তিকারের মতের প্রতিকূলে এবং কোনও স্থলে তাঁহার মত সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন। আনন্দগিরি ও অধ্যাপক গঙ্গানাথ ঝা এই বৃত্তিকারের নাম **উপবর্ষ** বলিয়াছেন। শবর উপবর্ষ হইতেও উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ১।১।৩-৫ সূত্রে বৃত্তিকারেরও উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্কর উপবর্ষের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি পূর্ব ও উত্তরমীমাংসার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তন্ত্রবার্তিক উপবর্ষকে মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন। পূর্ব-মীমাংসার প্রাচীন গ্রন্থকারের মধ্যে কুমারিলভট্ট, ভবদাসের নাম এবং

ন্যায়রত্নাকর, ভর্তৃমিত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। গঙ্গানাথ ঝা শবরকে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর লোক মনে করেন। শবরস্বামী পাণিনীয় শিক্ষা, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, পিঙ্গল, বৌধায়ন ধর্মসূত্র ও আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, মনুস্মৃতি, মহাভারত ও পুরাণাদির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বৌদ্ধগণের শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ অবগত ছিলেন; একস্থানে মাধ্যমিকগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে স্থাপন করা সঙ্গত বোধ হয় না। তিনি খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। শবরস্বামীর পূর্বনাম আদিত্যদেব। দীপ্তস্বামীর পুত্র শবরস্বামী পাণিনীয় লিঙ্গানুশাসনের টীকা করিয়াছিলেন। তিনিই ভাষ্যকার শবর কিনা তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ।

কুমারিলভট্ট। শবর ও কুমারিলের মধ্যে বহু ব্যবধান—সম্ভবত কয়েক শতাব্দী অতীত হইয়াছিল। কুমারিলভট্ট ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ের মত খণ্ডন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত হইয়াছিল। কুমারিল ধর্মকীর্তির মতও সমালোচনা করিয়াছেন। উদ্যোতকর ও কুমারিলের মত আলোচনা করিয়াই শান্তরক্ষিত তাঁহার তত্ত্বসংগ্রহ ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে রচনা করিয়াছেন। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের সহিত কুমারিলের সাক্ষাত হওয়ার উল্লেখ আছে। শঙ্করাচার্যের কাল ৭৮৮—৮২০ খৃষ্টাব্দ।* মণ্ডন মিশ্র শঙ্করাচার্যের শিষ্য এরূপ জনশ্রুতি আছে।

বাচস্পতি মিশ্র মণ্ডন মিশ্রের বিধি-বিবেকের টীকা করিয়াছেন এবং কুমারিলমতের তত্ত্ববিন্দু নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি ৮৪১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা ৮৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। এরূপ স্থলে কুমারিলভট্ট ৭ম শতাব্দীর শেষ হইতে ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৬৭৫—৭২৫ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন এরূপ অবধারণ করা যাইতে পারে। কুমারিল সম্ভবত তামিল

---

* গঙ্গাধর তিলকের মতে শঙ্করাচার্যের কাল আরও প্রাচীন। তিনি বলেন মহানুভবপন্থার দর্শনপ্রকাশ গ্রন্থে শঙ্কর "যুগ্মপয়োধিরসান্বিত" শাকে গুহাপ্রবেশ করেন। তদনুসারে শঙ্করের কাল ৬৮০—৭২০ খৃঃ হওয়া সঙ্গত।

দেশের মলয়মপ্রদেশবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে ঐ প্রদেশীয় ভাষার অনেক শব্দ আছে। তিনি সৌরাষ্ট্রীয় লাটভাষাও জানিতেন। কুমারিলভট্ট "ভট্টপাদ" নামে অভিহিত। প্রাচীন মনুস্মৃতির টীকাকারও তাঁহাকে ভট্টপাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিলভট্ট জৈমিনীয় ১।১ পাদের উপর **শ্লোকবার্তিক** ও ১।২ পাদ ও তৃতীয় অধ্যায়ের উপর **তন্ত্রবার্তিক** এবং অবশিষ্ট অধ্যায় ও পাদগুলির উপর **টুপ্‌টীকা** প্রণয়ন করিয়াছেন। কুমারিল-ভট্ট শবর ব্যতীতও ভাষ্যরত্নাকরের এবং প্রাচীন বার্তিককার ব্যতীতও অপর একজন বার্তিককারের উল্লেখ করিয়াছেন ও তদনুসারেই তাঁহার টীকাকে শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক আখ্যা দিয়াছেন।

প্রভাকর বা গুরুপ্রভাকর। প্রভাকর কুমারিলভট্টের ছাত্র ছিলেন এরূপ একটি মত আছে। শঙ্করাচার্য নামধেয় কোনও পণ্ডিতকৃত সর্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহেও ঐ জনশ্রুতি আছে। উহাও একখানি প্রাচীন গ্রন্থ।

"মীমাংসাবার্তিকং ভাট্টং ভট্টাচার্যকৃতং হি তৎ॥
তচ্ছিষ্যোঽল্পভেদেন শবরস্য মতান্তরম্।
প্রভাকরগুরুশ্চক্রে তদ্ধি প্রাভাকরং মতম্॥"

কিন্তু ঐ গ্রন্থ শঙ্করাচার্যকৃত নহে। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা বলেন প্রভাকর কুমারিলের পূর্ববর্তী। উভয়ে সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব নহে। প্রভাকরমতাবলম্বী শালিকনাথ কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন। ন্যায়রত্নাকরের মতে কুমারিল প্রভাকরকে উল্লেখ করিয়াছেন। মিতাক্ষরায় (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১১৪) গুরুপ্রভাকরের মতের উল্লেখ আছে। প্রভাকর তাঁহার মতের প্রথম প্রবর্তক নহেন। প্রভাকর তাঁহার মত পূর্ব এক বার্তিককারের মতের উপর স্থাপন করিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে (১১শ শতাব্দী) গুরু প্রভাকর, কুমারিল ও শালিকনাথ (শারিক) এবং বাচস্পতি মিশ্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

"নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতম্ ন বিদিতং তৌতাতিকং দর্শনম্।
তত্ত্বজ্ঞানমহো ন শারিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা॥"

প্রভাকর শবরভাষ্যের উপর দুইখানি টীকা রচনা করেন। "বৃহতী" ও "লঘ্বী"। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটিতে বৃহতীর একখণ্ড হস্তলিপি আছে।

উহার ভণিতায় প্রভাকর নাম আছে। প্রভাকরের উপাধি "গুরু" হইল কেন, তাহা লইয়া মতান্তর আছে। পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা বলেন যে প্রভাকরের টীকা অধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুদীর্ঘ হওয়াতে শ্লেষপূর্ণ "গুরু" উপাধি হইয়াছে। মতান্তরে শালিকনাথ তাঁহার গ্রন্থসমূহে গুরুনামদ্বারা অভিহিত করাতেই ঐ "গুরু" উপাধি হইয়াছে। কুমারিলভট্টের সহিত প্রভাকরের মতের স্থানে স্থানে বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রভাকরমত তৎকালে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে কুমারিলভট্টের নির্মল জ্যোতিতে প্রভাকরমত প্রভাহীন হইয়াছে। মীমাংসক সম্প্রদায় ভাট্ট (কুমারিল) ও গুরু (প্রভাকর) দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কিম্বদন্তী আছে প্রভাকর কুমারিলের শিষ্য ছিলেন। কুমারিল কিছুতেই প্রভাকরকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া মৃত্যুর ভান করিয়াছিলেন। তাঁহার সৎকার কুমারিলমতে হইবে কি প্রভাকরমতে হইবে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় প্রভাকর তাঁহার স্বীয় মত ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন এবং কুমারিলমতে সৎকার করা অবধারণ করেন। কুমারিল তাহা শুনিয়া সহর্ষে উঠিয়া বসেন।

ভাট্টমত।

মণ্ডন মিশ্র প্রথমে মীমাংসক ছিলেন, পরে শঙ্করাচার্যের নিকট পরাজিত হইয়া বেদান্তমত অবলম্বন করেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া সুরেশ্বর নাম গ্রহণ করেন। মণ্ডন মিশ্র মীমাংসাদর্শনের "ভাবনাবিবেক", "বিধিবিবেক" ও "মীমাংসানুক্রমণী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পূর্বে কুমারিলের শিষ্য ছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে। ঐ গ্রন্থদ্বয় ভাট্টমতের বিবৃতি। বাচস্পতি মিশ্র বিধিবিবেকের "ন্যায়কণিকা" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় বিধিবিবেক ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে বা ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হওয়া সম্ভব। পার্থসারথি মিশ্র ভাট্টমতের একজন প্রধান গ্রন্থকার। তাঁহার কাল ৯ম শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়া অনুমান করা যায়। তিনি "শাস্ত্রদীপিকা", "তন্ত্ররত্ন" ও "ন্যায়রত্নমালা" নামক মীমাংসাগ্রন্থত্রয় রচনা করেন এবং শ্লোকবার্তিকের "ন্যায়রত্নাকর" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। নারায়ণভট্ট পার্থসারথি মিশ্রের শাস্ত্রদীপিকার টীকা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র শঙ্করভট্ট ঐ টীকা সমাপ্ত করিয়াছেন। ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে সায়ণাচার্যের

জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাধবাচার্য সুপ্রসিদ্ধ **"জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর"** গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সোমেশ্বরভট্ট ১৫শ শতাব্দীতে তন্ত্রবার্তিকের "ন্যায়সুধা" বা "রাণক" নামক টীকা রচনা করেন। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে অপ্পয্যদীক্ষিত "বিধিরসায়ন" নামক মীমাংসাগ্রন্থ ও তাহার "সুখোপয়োজিনী" নামক টীকা স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। সমসাময়িক গোপালভট্ট "মীমাংসাবিধিভূষণ" ও শঙ্করভট্ট "বিধিরসায়নদূষণ" প্রণয়ন করিয়া অপ্পয্যদীক্ষিতের মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আপদেব "মীমাংসা-ন্যায়প্রকাশ" রচনা করেন। লৌগাক্ষিভাস্কর (১৭শ শতাব্দী) মীমাংসাশাস্ত্রে প্রবেশার্থীর জন্য "অর্থসংগ্রহ" প্রণয়ন করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরভট্ট বা গাগাভট্ট ১৭শ শতাব্দীর সর্বপ্রধান মীমাংসক ছিলেন। তিনি শিবাজির অভিষেককালে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার রচিত 'ভাট্টচিন্তামণি" প্রসিদ্ধ মীমাংসাগ্রন্থ। ১৭ শতাব্দীতে খণ্ডদেব "ভাট্টদীপিকা", "মীমাংসাকৌস্তভ" ও "ভাট্টরহস্য" প্রণয়ন করেন। সুচরিত মিশ্রের শ্লোকবার্তিকের টীকা "কাশিকা" কৃষ্ণ দীক্ষিতের "মীমাংসাপরিভাষা", রঘুনাথকৃত "মীমাংসারত্ন" নারায়ণ তীর্থকৃত "ভাট্টভাষা", রামকৃষ্ণ উদীচ্য রচিত "অধিকরণকৌমুদী" ও বল্লভাচার্যকৃত "পূর্বমীমাংসাকারিকা" উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য "মীমাংসাপাদুকা" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

প্রভাকর মত।

শালিকনাথ প্রভাকর মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার কাল ১০ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ নির্দেশ করা যাইতে পারে। তিনি প্রভাকর মতকে "গুরুমত" বা "প্রাভাকরমত" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রভাকর মতের প্রধান ব্যাখ্যাতা শালিকনাথ। তিনি গৌড়দেশবাসী পণ্ডিত ছিলেন। "প্রকরণ-পঞ্চিকা" তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁহার বেদজ্ঞান সম্বন্ধে বরদরাজ মিশ্র অতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। "গৌড়ো মীমাংসকঃ পঞ্চিকাকার."। "গৌড়ো হি বেদাধ্যয়নাভাবাদ্ বেদত্বং ন জানাতীতি গৌড়মীমাংসক ইত্যুক্তম্".। শালিকনাথ প্রকরণপঞ্চিকা ব্যতীত প্রভাকরের "বৃহতী" ও "লঘ্বীর" উপর "ঋজুবিমলা" ও "দীপশিখা" নামক টীকা রচনা করেন। অধ্যাপক কীথ শালিকনাথকে কুমারিলভট্টের পূর্বে স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু ঐ মত ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়।

ভবনাথ। শালিকনাথের পর প্রভাকরমতে ভবনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি "ন্যায়বিবেক" গ্রন্থে শালিকনাথের প্রকরণপঞ্চিকার মর্ম ও মত প্রস্ফুট-ভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ন্যায়বিবেক শালিকনাথের মীমাংসাসূত্রের ব্যাখ্যা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

রামানুজ। রামানুজ প্রভাকর মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার "তন্ত্ররহস্য" প্রভাকর মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কালক্রমে প্রভাকরমত দুর্বল হওয়ায় ভট্টমতই পুনর্জীবিত হইয়াছে এবং মীমাংসাশাস্ত্রে ভাট্টমতের গ্রন্থই ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত হইয়াছে।

বেদান্ত দর্শন।

বেদান্ত দর্শনের অপর নাম উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসা। এই মীমাংসাকে শারীরকমীমাংসাও বলে। বেদের পূর্বভাগ মন্ত্র, ঋক্, যজুঃ ও সামন্। ঐ পূর্বভাগের দর্শন পূর্বমীমাংসা। বেদের ব্রাহ্মণভাগই পূর্বমীমাংসার ভিত্তি। ব্রাহ্মণের শেষভাগ আরণ্যক ও আরণ্যকের শেষভাগ উপনিষৎ। উপনিষদ্ ভাগকে বেদান্ত বলে। উহাতে বেদের শেষ বা চরমবস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয় আছে বলিয়াই উহাকে বেদান্ত বলে। ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্মনির্ণয়মূলক যে সকল গভীর চিন্তা আছে তাহাদের সমন্বয় বা একবাক্যতা স্থাপন করাই উত্তরমীমাংসার উদ্দেশ্য। জীবব্রহ্মনিরূপণাত্মক সূত্রই ব্রহ্মসূত্র। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা। এই "ব্রহ্মসূত্র" মহাভারতের পূর্বকালের গ্রন্থ। মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্‌গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—

"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।" ১৩।৪

"বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্।" ১৫।১৫

কিন্তু প্রচলিত ব্রহ্মসূত্র কোন যুগে রচিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার। তিনি উপবর্ষকৃত ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। উপবর্ষ পাণিনির গুরু ছিলেন। পাণিনি অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীর লোক, ভিন্‌সেণ্টস্মিথ্ তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা হইতে সহজেই অনুমান হয় ব্রহ্মসূত্র খৃষ্টপূর্ব অষ্টম কি নবম শতাব্দীর গ্রন্থ। ব্রহ্মসূত্রে বাদরি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি,

ঔড়ুলোমী প্রভৃতি ঋষির উল্লেখ আছে। পাণিনিতে "পারাশর্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটয়োঃ ৪।৩।১১০" এই সূত্র আছে। পারাশর্য ভিক্ষুসূত্রদ্বারা বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্রই অভিপ্রেত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

ব্রহ্মসূত্রে ৪টি অধ্যায়, ১৬টি পাদ ও ৫৫৫টি সূত্র আছে। তন্মধ্যে ১৯২টি অধিকরণসূত্র ও ৩৬৩টি গৌণসূত্র। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন শঙ্করমতানুসারে বিবর্তবাদী। ব্রহ্মসূত্রে মুখ্যতঃ সাংখ্যমতই খণ্ডিত হইয়াছে। ঐ সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মতও দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক মতভেদে এই ব্রহ্মসূত্রের বহু প্রকার ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে অদ্বৈত ও দ্বৈত মতই প্রধান। অদ্বৈত ও দ্বৈতমতেরও অনেক শাখা আছে।

নির্বিশেষাদ্বৈতমত। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। উহাকে বেদান্তভাষ্য বা শারীরকভাষ্য বলে। "নিধিনাগেহবহ্ন্যব্দে" বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করাচার্যের কাল ৭৮৮—৮২০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ম্যাক্সমূলার ও কৃষ্ণস্বামী আয়ার শঙ্করের কাল ৭৮৮—৮২০ খৃষ্টাব্দ অনুমান করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য, শান্তরক্ষিত ও ভবভূতির পূর্ববর্তী। শ্রীকণ্ঠপণ্ডিত তাঁহার "যোগপ্রকাশ" গ্রন্থে শঙ্করের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের কাল ৬৯০ শকাব্দ। বাল গঙ্গাধর তিলক শঙ্করাচার্যের কাল ৬৮৮—৭২০ খৃঃ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। কেরলপ্রদেশে কালাড়ি নামক স্থানে শঙ্করের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। নর্মদাতীরে গৌড়পাদাচার্যের শিষ্য গোবিন্দপাদের নিকট দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাশেষান্তে তিনি বারাণসী, বদরিকাশ্রম, মাহিষ্মতী, দ্বারাবতী, পুরী ও শৃঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। এই নর্মদাতীরে মাহিষ্মতীতেই তিনি বিচারে মণ্ডনমিশ্রকে পরাজিত করেন এবং এই বিচারেই মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী বিদুষী ভারতীদেবী মধ্যস্থতা করিয়া ভারতীয় নারীর পাণ্ডিত্যগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর শাখা তুঙ্গভদ্রাতীরে শৃঙ্গেরীমঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধনমঠ, বদরিকাতে জোষীমঠ ও দ্বারাবতীতে সারদামঠ স্থাপন করেন।

শঙ্করাচার্য শুদ্ধ অদ্বৈত মতের প্রধান আচার্য। তাঁহার শারীরকভাষ্য দার্শনিক জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। শঙ্করাচার্যই যে এই অদ্বৈত মতের প্রবর্তক তাহা নহে। তাঁহার পূর্বে ঐ মতের বহু আচার্য ছিলেন।

তাঁহাদের নাম, বিশেষতঃ ভগবান্ উপবর্ষের নাম, শঙ্কর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদের গুরু গৌড়পাদাচার্য মাণ্ডূক্যোপনিষদের কারিকাতে ঐ মত সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন এবং শঙ্করাচার্য তাঁহার শারীরকভাষ্যে ঐ মতই বিশদীকৃত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য এক অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজ প্রতিভার বলে বৌদ্ধ ও জৈন মত খণ্ডন করিয়া বেদানুমোদিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃ প্রবর্তিত করেন।

তাঁহার মতে এই পরিদৃশ্যমান নানাত্বপূর্ণ জগৎ, লৌকিক ও অলৌকিক যাবতীয় কার্যই এক অখণ্ড নিত্য শুদ্ধ পরমব্রহ্মের বিবর্ত। মায়াপ্রভাবে জীবের ইন্দ্রিয় সমক্ষে সেই পরমব্রহ্মের নানাত্ব অবভাসিত হয়। জগতের পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর বোধ ভ্রান্তি মাত্র, সকল বস্তুই পরমব্রহ্মের বিবর্ত, ব্রহ্মস্বরূপ কূটস্থ চৈতন্যাত্মক বলিয়া তাহাতে কোনও পরিণাম সম্ভবপর হয় না। শঙ্করাচার্যের প্রতিভার অমিতদ্যুতিতে এই অদ্বৈতবাদ ভারতের সর্বপ্রধান দর্শনমত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শঙ্কর "প্রস্থানত্রয়ী"র অর্থাৎ উপনিষৎ, বেদান্তসূত্র ও ভগবদ্গীতার ভাষ্যে এই মতানুযায়িনী ব্যাখ্যাই প্রচার করিয়াছেন এবং পরমত নিরসনপূর্বক ইহাকে স্থাপনা করিয়াছেন। "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ" এই মতানুসারে তিনি প্রত্যেক যুক্তির সঙ্গেই আপ্তপ্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। বিপক্ষের মত সাধারণতঃ তিনি এরূপ স্থির ধীর ও সংযতভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং উদারভাবে কোনও প্রকার শ্লেষ বা কটাক্ষ না করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্যের গম্ভীরতা অতুলনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহার "প্রসন্নগম্ভীরবচঃ" প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর শিরও আনত করে। তিনি জীব ও ব্রহ্মে প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য স্বীকার করেন না। **তত্ত্বমসি** এই মহাবাক্যের অভেদপক্ষে ব্যাখ্যা করায় তাঁহার মত **অদ্বৈতবাদ** নামে অভিহিত।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে "সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র" **বাচস্পতি মিশ্র** ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের **ভামতী** নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। শঙ্করভাষ্যের প্রসন্ন-গম্ভীর বাক্যের নিগূঢ় অর্থ ভামতী প্রকাশ করিয়াছে। "ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে"। পরবর্তী টীকাকার অমলানন্দ (১৩শ শতাব্দী) বাচস্পতিমিশ্রকে "ভামতীপতি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার

মতে বাচস্পতি মিশ্র নিজ সহধর্মিণীর নামানুসারে "ভামতী", নাম রাখিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে অন্য কোনও স্বাধীন প্রমাণ নাই। ভামতীর শেষ শ্লোকে বাচস্পতি মিশ্র "নৃগ" নামক মহীপতির রাজত্বকালে ভামতী-রচনাব সময় নির্দেশ করিয়াছেন।

'তস্মিন্ মহীপে মহনীয়কীর্তৌ
শ্রীমন্ নৃগেঽকারি ময়া প্রবন্ধঃ'।

ঐ "নৃগ" কে তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন নৃগ চৌহানবংশীয় রাজা, তিনি দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু ঐ কালের সহিত বাচস্পতি মিশ্রের কালের (৮৪১ খৃঃ) ঐক্য হয় না।

চিৎসুখ মুনিব পশিষ্য অমলানন্দ সরস্বতী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে "**বেদান্তকল্পতরু**" নামক ভামতীব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অপ্পয্য দীক্ষিত কল্পতরুর উপর **পরিমল** নামক টীকা এবং ১৮শ শতাব্দীতে লক্ষ্মীনৃসিংহ "**আভোগ**" নামে পরিমলটীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অমলানন্দের "**শাস্ত্র-দর্পণ**" ব্রহ্মসূত্রেব উপব স্বতন্ত্র সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। দেবগিবিব রাজা সিংঘনেব পৌত্র কৃষ্ণরাজের সময় (১২৪৭—১২৬০ খৃঃ) অমলানন্দ **বেদান্তকল্পতরু** পণয়ন করেন।

গোপালসবস্বতীর শিষ্য গোবিন্দানন্দ শঙ্করভাষ্যেব "**রত্নপ্রভা**" নামক টীকা এবং শুদ্ধানন্দশিষ্য আনন্দজ্ঞান এবং আনন্দগিরি "**ভাষ্যন্যায়নির্ণয়**" নামক টীকা ১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রণয়ন করিয়াছেন। "ভামতী",, "রত্নপ্রভা" ও "ন্যায়নির্ণয়" একত্রে বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্যেব মুখ্যশিষ্য পদ্মপাদকৃত "**পঞ্চপাদিকা**" শঙ্করভাষ্যের অসম্পূর্ণ টীকা। তিনি ৪র্থ সূত্র পর্যন্ত লিখিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। পদ্মপাদের অপর নাম সনন্দন। প্রকাশাত্মন্ (১২০০ খৃঃ) ঐ পঞ্চপাদিকার উপর "**পঞ্চপাদিকা-বিবরণ**" নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। প্রকাশাত্মন্ "**শাব্দনির্ণয়**" নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রণযন করিয়ছেন। পঞ্চপাদিকা বিববণের উপর বিদ্যারণ্য স্বামীর "**বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ**" নামক টীকা আছে ঃ এই গ্রন্থ বেদান্তের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত পঞ্চপাদিকার অন্যান্য কয়েকখানি ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে।

অদ্বৈতমতের যে সকল প্রকরণগ্রন্থ আছে তন্মধ্যে সুরেশ্বরাচার্যের "**নৈষ্কর্ম্য-**

সিদ্ধি" সর্বপ্রাচীন। মণ্ডনমিশ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সুরেশ্বর নাম গ্রহণ করেন এইরূপ প্রবাদ আছে। কিন্তু চিৎসুখ মুনি (১২শ শতাব্দী) মণ্ডন মিশ্র ও সুরেশ্বরকে পৃথক গ্রন্থকার জ্ঞানে তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মণ্ডন মিশ্র মীমাংসক ছিলেন। শঙ্করাচার্য তাঁহাকে বেদান্ত মতে আনয়ন করেন। ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে উহা রচিত হওয়া সম্ভব। কারণ তিনি বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ববর্তী।

সুরেশ্বরের শিষ্য **সর্বজ্ঞাত্মা** (৯০০ খৃঃ) শারীরকভাষ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম **সংক্ষেপশারীরক** গ্রন্থে পদ্যাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন।* সংক্ষেপশারীরকের শেষ শ্লোক দুইটি এই :—

"শ্রীদেবেশ্বর-পাদপঙ্কজরজঃ সম্পর্ক-পূতাশয়ঃ
সর্বজ্ঞাত্মগিরাঙ্কিতো মুনিবরঃ সংক্ষেপশারীরকম্।
চক্রে সজ্জনবুদ্ধিবর্দ্ধনমিদং রাজন্যবংশে নৃপে
শ্রীমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি ॥ ৪।৬২
ভুজঙ্গমাঙ্গশায়িনে বিহঙ্গমাঙ্গগামিনে
তুরঙ্গমাঙ্গভেদিনে নমঃ রথাঙ্গধারণে ॥" ৪।৬৩

১ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে বলিয়াছেন—"জয়ন্তি দেবেশ্বর-পাদরেণবঃ"। উহার ব্যাখ্যায় মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ গুরুনামাগ্রহণায়, "গুরোর্নাম ন গৃহ্ণীয়াদীতি" সুরপদস্থানে দেব-পদ-প্রয়োগঃ।" সর্বজ্ঞাত্মা সুরেশ্বরের শিষ্য। কণৌজরাজ বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের রাজত্বকালে **শ্রীহর্ষ** (১১৯০ খৃঃ) **খণ্ডনখণ্ডখাদ্য** নামে প্রসিদ্ধ বেদান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। **চিৎসুখ** ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের উপর একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। চিৎসুখপ্রণীত **প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা** একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের আরও অনেকগুলি টীকা আছে। শঙ্কর মিশ্র, বিদ্যাসাগর, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির টীকা এতৎ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **বিদ্যারণ্য** ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে **পঞ্চদশী**, **বিবরণ**

* সংক্ষেপশারীরকের উপর কয়েকখানি সুললিত টীকা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে পাণ্ডিত্য ও ব্যাখ্যা কৌশলে শ্রীমধুসূদনসরস্বতীর টীকাই সর্বপ্রধান। ঐ টীকার নাম "সারসংগ্রহ"।

প্রমেয় সংগ্রহ, জীবন্মুক্তিবিবেক ও **অনুভূতিপ্রকাশ** প্রভৃতি বেদান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।*

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে **"বেদান্তপরিভাষা"** নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র **রামকৃষ্ণাধ্বরীন্দ্র** বেদান্ত-পরিভাষার "শিখামণি" ও অমরদাস "মণিপ্রভা" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। **মধুসূদন সরস্বতী**-রচিত (১৫শ শতাব্দী) **অদ্বৈতসিদ্ধি** বেদান্তাধিকারে এক অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসতীর্থ-স্বামীর "ন্যায়ামৃত" নামক একখানি গ্রন্থের প্রতিবাদস্বরূপ। অদ্বৈতসিদ্ধির "গৌড়ব্রহ্মানন্দী", "বিঠ্‌ঠলেশাপাধ্যায়ী" ও "সিদ্ধিব্যাখ্যা" নামক তিনটি টীকা আছে। **সদানন্দ যোগীন্দ্র** অদ্বৈতসিদ্ধির "অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার" নামক এক সংক্ষিপ্তসার ও **বেদান্তসার** নামক একখানি সংক্ষিপ্ত কারিকা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহা ১৫শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী। বেদান্তসার প্রথম শিক্ষার্থীরা সযত্নে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বেদান্তসারের নৃসিংহ সরস্বতী-কৃত "সুবোধিনী" ও রামতীর্থকৃত "বিদ্বামনোরঞ্জিনী" নামক দুইখানি টীকা আছে। প্রকাশানন্দের (১৬শ শতাব্দী) **"বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী"** উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। অপ্পয়দীক্ষিত ঐ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

মধুসূদন সরস্বতী। মধুসূদন সরস্বতীর জন্মস্থান বঙ্গদেশ। তিনি সম্ভবতঃ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্য বলভদ্রের জন্য "সিদ্ধান্তবিন্দু" নবাগ্নিবাণেন্দুমিতে রচনা করেন। শঙ্কর মিশ্রের ভেদরত্নের প্রতিবাদ স্বরূপে "অদ্বৈতরত্নরক্ষণ" প্রণয়ন করেন। "অদ্বৈতসিদ্ধি" দ্বারা ব্যাসরায়ের ন্যায়ামৃত খণ্ডন করেন। ভগবদ্গীতার উপর তাঁহার ব্যাখ্যা আছে।

* মাধবাচার্যই "বিদ্যারণ্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মতান্তরে সায়ণাচার্যই বিদ্যারণ্য উপাধি ধারণ করিয়া শৃঙ্গেরী মঠাধিপতি হইয়াছিলেন। জীবন্মুক্তিবিবেকে পারাসর স্মৃতি "অস্মাভিঃ" কথা দ্বারা মাধবাচার্যই বিদ্যারণ্য উপাধি গ্রহণ প্রমাণিত হয়। কুন্তনপাচার্য ও নরসিংহাচার্য (১৩৫০—১৪৪৫ খৃঃ) প্রায় তুল্যকালিক গ্রন্থকারও তাহাই বলিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

যামুনাচার্য। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের অন্যূন ২০০ বৎসর পরে দাক্ষিণাত্যের মাত্তরাতে যামুনাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঈশ্বরমুনি ও পিতামহের নাম নাথমুনি। যামুনাচার্য খৃষ্টীয় ৯৫৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার "**সিদ্ধিত্রয়**" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি শঙ্করাচার্যের মত খণ্ডন করিতে প্রযত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ পার্থক্য আছে।

রামানুজ। রামানুজ দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যরাজ্যে ১০১৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ অভিধানকার যাদবপ্রকাশের ছাত্র। তিনিই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সর্বপ্রধান আচার্য। তিনি বেদান্তসূত্রের "**শ্রীভাষ্য**" নামে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব পৃথক হইলেও জীব ও জগৎ এক ঈশ্বরেরই শরীর। জীব অণু, ভগবান্ বিভু; জীব অঙ্গ ও আশ্রিত, ভগবান্ অঙ্গী ও আশ্রয়। তিনি ভাগবত-ধর্মাবলম্বী থাকা প্রযুক্ত ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি পাঞ্চরাত্র মত গ্রহণ করিয়াছেন।

রামানুজ তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে "**বেদার্থ-সংগ্রহ**", "**বেদান্তপ্রদীপ**" ও "**গদ্যত্রয়**" প্রণয়ন করেন। "বেদান্ত-তত্ত্বসার" নামক গ্রন্থও রামানুজের নামে প্রচলিত, কিন্তু কেহ কেহ বিশ্বাস করেন পরবর্তী কোনও গ্রন্থকার রামানুজের নাম সংযোগে ঐ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক রামানুজ নহেন। বহুকাল হইতেই ঐ দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল। রামানুজ তাঁহার পূর্বাচার্যগণের মধ্যে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দী ও যামুনাচার্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং বোধায়নভাষ্যই বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন।

রামানুজের শ্রীভাষ্যের উপর সুদর্শন "শ্রুতপ্রকাশিকা" নামক এক টীকা রচনা করিয়াছেন। রামানুজের শিষ্য বরদবিষ্ণুর পৌত্র বরদাচার্যের **তত্ত্বসার** নামক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এই সম্প্রদায়ভুক্ত গৌড় পূর্ণানন্দকবি-চক্রবর্তী চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে তত্ত্বমুক্তাবলী রচনা করেন। মাধবাচার্যের

সর্বদর্শনসংগ্রহে তত্ত্বমুক্তাবলীর উল্লেখ আছে। পিলই লোকাচার্য ও বেঙ্কটনাথ বেদান্তচার্য এই দর্শনের বহু পুষ্টি সাধন করেন। বেঙ্কটনাথ বিদ্যারণ্যস্বামীর সমসাময়িক ছিলেন (১৪ শতাব্দী)। তিনি **শতদূষণী** ও শ্রীভাষ্যের টীকা **তত্ত্বটীকা** প্রণয়ন করিয়াছেন। অপ্পয্যদীক্ষিত (১৫৫২—১৬২৪ খৃঃ) বহুসংখ্যক গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতের বেঙ্কটনাথকৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীকণ্ঠমত। শ্রীকণ্ঠমতে ঈশ্বর, জীব এবং জড় তিনটি পদার্থ। পশুপতি, পশু ও শৃঙ্খলের সহিত তাহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীকণ্ঠাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈত শৈবসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য। তিনি শ্বেতাচার্যকে নমস্কার করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠ শঙ্করাচার্যের পরবর্তী ও ভোজরাজের পূর্ববর্তী। তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভোজরাজের শৈবমত সর্বদর্শনসংগ্রহে উল্লিখিত হইয়াছে। ১১শ শতাব্দীতে অভিনবগুপ্তাচার্য শৈবমতের প্রত্যভিজ্ঞাবাদ প্রপঞ্চিত করেন। তিনি তাঁহার পূর্বাচার্য ভট্টকল্লটের মত উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠাচার্যের ভাষ্যের **শিবার্কমণিদীপিকা** নামক টীকা অপ্পয্যদীক্ষিত (১৫৫২—১৬২৪ খৃঃ) রচনা করিয়াছেন। (তন্ত্রসাহিত্য দ্রষ্টব্য)।

ভেদাভেদবাদ।

ভাস্করাচার্য ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য। তাঁহার বহুপূর্বে প্রাচীন ঔড়ুলোমি আচার্য এই মতাবলম্বী ছিলেন। ঔড়ুলোমি বদ্ধাবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং মুক্তাবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করেন। ব্রহ্মসূত্রেও আচার্য ঔড়ুলোমির মতের উল্লেখ আছে। বৈদান্তিক ভাস্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভেদাভেদ ব্যাখ্যা করেন। খৃঃ নবম-শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি ভোজরাজ মিহিরের সময় বিদ্যাপতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্যের পূর্ববর্তী। বাচস্পতিমিশ্র ৩।৩।২৮ সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাস্করমত খণ্ডন করিয়াছেন। উদয়নাচার্যও ভাস্করের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে উপহাস করিয়া লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মপরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে।"

সেখানে টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য এই বৈদান্তিক ভাস্করাচার্যের ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন। "ভাস্করস্ত্রিদণ্ডিমত-ভাষ্যকারঃ"।

১১শ শতাব্দীতে **নিম্বার্ক** বা নিয়মানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। নিম্বার্কের পিতার নাম আরুণি ও মাতার নাম জয়ন্তী। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদমতে ব্রহ্মসূত্রের বিষ্ণুপর ভাষ্য রচনা করেন। ঐ ভাষ্যের নাম **বেদান্তপারিজাত-সৌরভ** বা নিম্বার্কভাষ্য। নিম্বার্ক তাঁহার মত সমর্থনের জন্য নারদ ও সনৎকুমারের মত উল্লেখ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্যের মতে বদ্ধাবস্থায় ভেদ ও মুক্ত অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নিম্বার্ক স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ স্বাভাবিক, সুতরাং উহা বদ্ধাবস্থাতে ও মুক্তাবস্থাতেও একই ভাবে বিদ্যমান থাকে।

নিম্বার্কের শিষ্য শ্রীনিবাস বেদান্তপারিজাতসৌরভের উপর **"বেদান্ত-কৌস্তুভ"** নামক টীকা রচনা করেন। কাশ্মীরদেশীয় কেশবভট্ট বা মুকুন্দ বেদান্তকৌস্তুভের "কৌস্তুভপ্রভা" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। দেবাচার্য গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রীনিবাসের অধস্তন। তিনি **সিদ্ধান্তজাহ্নবী** নামক ব্রহ্ম-সূত্রব্যাখ্যা রচনা করেন। সুন্দরভট্ট সিদ্ধান্তজাহ্নবীর উপর "সেতু" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

বল্লভাচার্য। বল্লভাচার্য ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রামানুজ ও মধ্বাচার্যের ন্যায় ইনি বৈষ্ণবপন্থী। ওডুলোমিমুনির ন্যায় ইনি মায়াবিরহিত শুদ্ধ ও মুক্ত জীব ও ব্রহ্ম একই প্রকৃতির এরূপ স্বীকার করেন। কিন্তু শঙ্করাচার্যের ন্যায় জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন এরূপ স্বীকার করেন না। ইনি বলেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নির ন্যায় জীব ব্রহ্মের একাংশ মাত্র। ভগবদ্‌ভক্তিই মোক্ষের মুখ্যসাধন। তাঁহার রচিত ভাষ্যের নাম "অনুভাষ্য"।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ এই মতই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ। ইনি বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য। তিনি "গোবিন্দভাষ্য" নামে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

দ্বৈতবাদ বা শুদ্ধদ্বৈতবাদ।

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতমত দ্বৈতাভাসহীন, মধ্বাচার্য অদ্বৈতাভাসবর্জিত বা

শুদ্ধদ্বৈতমতের প্রবর্তক। মধ্বাচার্যের পিতৃদত্ত নাম বাসুদেব, কিন্তু তিনি বিদ্বৎসমাজে আনন্দতীর্থ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ নামেও পরিচিত। তিনি ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ কানাড়ায় উদীপী জেলার বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের মতে তিনি ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন! তিনি ২৫ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসে দীক্ষিত হইয়া "পূর্ণপ্রজ্ঞ" নাম ধারণ করেন। মধ্বাচার্য স্বকীয়মতে **তত্ত্ববিবেক** নামক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। তদ্ব্যতীত "অনুব্যাখ্যান" নামক শ্লোকবদ্ধ ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য ত্রিবিক্রম ঐ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের **তত্ত্বপ্রদীপিকা** নামক টীকা এবং অপর শিষ্য পদ্মনাভ অনুব্যাখ্যানের উপর **সন্ন্যাস-রত্নাবলী** নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন। ত্রিবিক্রমের পুত্র নারায়ণ "মাণমঞ্জরী" ও "মধ্ববিজয়" নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

স্ফোটবাদ ও পাণিনীয় দর্শন।

মীমাংসকেরা বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, তজ্জন্য তাঁহারা শব্দেরও নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন। এই শব্দের নিত্যত্ববাদ পাণিনীয় ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। তজ্জন্য মাধবাচার্য তাঁহার সবদর্শনসংগ্রহে এই দর্শনকে পাণিনীয়দর্শন নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈয়াকরণ মতে নিত্য ও অনিত্য ভেদে শব্দ বিবিধ। সর্বত্র পরিচিত ক্রম বিভাগাদিবিশিষ্ট ধ্বন্যাত্মক শব্দ অনিত্য। আর স্ফোটনামক অর্থ-প্রতীতিজনক নিরবয়ব উৎপত্তি-বিনাশ-বিরহিত শব্দ নিত্য। ধ্বনি স্ফোটের অভিব্যঞ্জক সুতরাং ধ্বনির সহিত স্ফোটের সম্বন্ধ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। স্ফোট অভিব্যক্ত হইয়া স্বভাবতই বাচ্যার্থের প্রকাশ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে সাধারণতঃ এই স্ফোটাখ্য শব্দই শব্দব্রহ্মরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিত্য শব্দের সহিত অর্থের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ। বৈয়াকরণ মতে সর্বত্র অনুস্যূত নিত্য অখণ্ড সত্ত্বই যাবতীয় শব্দের বাচ্যার্থ। শব্দব্রহ্ম হইতেই ইহার উৎপত্তি, উহা নিত্য ও শাশ্বত। কেহ কেহ বলেন স্ফোটায়ন মুনিই এই মতের প্রবর্তক ঋষি, তজ্জন্যই তাঁহার নাম স্ফোটায়ন হইয়াছে। স্ফোটায়ন পাণিনির পূর্ববর্তী। স্ফোট নানা প্রকার। তন্মধ্যে বাক্যস্ফোটই মুখ্য। উহা দ্বারাই অর্থসমাপ্তি হয়। ন্যায়-ভাষ্যকারও তাহা অঙ্গীকার করেন। "পদসমূহো বাক্যম্

অর্থসমাপ্তৌ"। শব্দস্ফোট দ্বারা দ্রব্য, গুণ, কর্মাদির প্রতীতি জন্মে। বর্ণস্ফোট শব্দের অংশের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ধাতু ও প্রত্যয় প্রভৃতিতে উহার উপলব্ধি হয়। তজ্জন্যই প্রাচীন মহর্ষিগণের মধ্যে এই তর্ক উপস্থিত হইয়াছে "সকল নামগুলিই ধাতুজ কিনা ?" নিরুক্তকার যাস্কাচার্য, প্রথমে বৈয়াকরণ শাকটায়ন ও নিরুক্তকারগণের মত উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সকল নামই আখ্যাত হইতে উৎপন্ন। "তত্র নামান্যাখ্যাতজাতানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ॥" মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন "নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্"। কিন্তু গার্গ্য ও অন্যান্য বৈয়াকরণেরা সব নামই যে ধাতুজ, ইহা স্বীকার করেন নাই।

যাস্ক বলিয়াছেন—

"ন সর্বাণীতি গার্গ্যো বৈয়াকরণনাঞ্চৈকে।"

গার্গ্য ও কয়েকজন বৈয়াকরণ বলেন সকল নাম ধাতুজাত নহে। এই তর্কের মীমাংসা কোন কালেই সমাপ্ত হয় নাই। কিন্তু নিরুক্তকার ও বৈয়াকরণেরা স্ফোটবাদ স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনি স্ফোটবাদ অঙ্গীকার করেন। পাণিনিদর্শন বাক্যপদীয় গ্রন্থে ভর্তৃহরি, ভর্তৃহরির ব্যাখ্যাতা পুণ্যরাজ ও হেলারাজ, বৈয়াকরণকেশরী কৈয়ট ও গণরত্নমহোদধিরচয়িতা বর্দ্ধমান সকলেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন। মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহে স্ফোটবাদ ও পাণিনীয়দর্শনের মত আলোচনা করিয়াছেন।

ভগবদ্গীতা।

'ভগবদ্গীতা' মুখ্য দর্শন বলিয়া পরিগণিত না হইলেও উহা দর্শনকল্প। ভগবদ্গীতায় ষড়্দর্শনের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিবার চেষ্টা আছে। ভগবদ্-গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত ১৮টি অধ্যায় মাত্র। ভগবদ্গীতার রচনাকাল লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারতরচনার কালের উপর নির্ভর করে। (মহাভারত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তেলঙ্গ গীতাকে আপস্তম্বের পূর্ববর্তী বলিয়া নির্দেশ করেন। ভাণ্ডারকরও ঐ মত সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক গার্বে বলেন গীতা খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে এবং খৃষ্টীয় ১-২ শতাব্দীতে সংশোধিত হইয়াছে। গার্বে "যোগো নষ্টঃ পরন্তপ" এই বাক্যে "যোগ" "পাতঞ্জলযোগ" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বালগঙ্গাধর তিলক বলেন "যোগ"

"কর্মযোগ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যবদ্বীপে আবিষ্কৃত মহাভারতে গীতার বহু শ্লোক আছে কিন্তু তাহাতে গীতার ১২, ১৫, ১৬, ১৭ অধ্যায়ের কোনও শ্লোক দৃষ্ট হয় না। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে উক্ত আছে :—

"তদাহ ভগবান

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।"

বৌধায়ন আপস্তম্বের ২।১ শত বৎসর পূর্ববর্তী। তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে গীতা বৌধায়নের পরিজ্ঞাত থাকা ও উহার শ্লোক ধর্মকার্যে ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হয়। তিলক মনে করেন গীতা অন্ততঃপক্ষে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল কিন্তু কালক্রমে উহাতে অতিরিক্ত শ্লোক নিবেশিত হইয়াছে। গীতা প্রপত্তিমার্গের গ্রন্থ। উহার আদিতে, অন্তে ও মধ্যে এই প্রপত্তিই উক্ত হইয়াছে। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। গীতার অনুকরণে আরও বহু গীতা রচিত হইয়াছে। শিবগীতা, শম্ভুগীতা, গুরুগীতা, হংসগীতা, অবধূত গীতা, ব্রহ্মগীতা, উত্তরগীতা, পরাশর গীতা, জীবন্মুক্তি গীতা, দেবীগীতা, শান্তিগীতা ইত্যাদি।

হিন্দুশাস্ত্রে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা "প্রস্থানত্রয়ী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ভারতের বহু সম্প্রদায়ই ঐ প্রস্থানত্রয়ীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তজ্জন্য গীতার ব্যাখ্যার ইয়ত্তা নাই। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্যের গীতাভাষ্য (৮ম শতাব্দী) ও আনন্দগিরির ঐ ভাষ্যটীকা, অভিনবগুপ্তের "গীতার্থসংগ্রহ" (১০ম শতাব্দী), শ্রীধরস্বামীর "সুবোধিনী" (১৪শ শতাব্দী), আচার্য রামানুজের ভাষ্য (১১শ শতাব্দী), ধনপতির "গীতা-ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা", নীলকণ্ঠরচিত "ভারতভাবদীপ" (১৬শ শতাব্দী) ও মধুসূদনসরস্বতার (১৬শ শতাব্দী) "গূঢ়ার্থদীপিকা" বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঐ সকল ভাষ্য ও টীকা সাম্প্রদায়িক মতানুসারে রচিত হইয়াছে। সবশেষে লোকমান্য তিলক ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে "গীতারহস্য" নামক একখানি উপাদেয় ব্যাখ্যা মারাঠী ভাষায় রচনা করিয়াছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়াছেন।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও কৌরবগণ যুদ্ধার্থে সমবেত হইলে অর্জুন কৌরবপক্ষে আপন আত্মীয়গণকে দেখিয়া ঐ সকল আত্মীয়ের বিনিময়ে রুধিরপ্রদিগ্ধ মেদিনী ভোগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া রণে বিমুখ হইয়াছিলেন।

ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধকার্যে ব্রতী করিবার জন্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাই গীতার ১৮ অধ্যায়ে নিবদ্ধ হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্বোপনিষৎ দোহন করিয়া ঐ দুগ্ধ পার্থকে দিয়াছিলেন। ভগবান্ জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের এবং বিভিন্ন দর্শনের মতের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকল দর্শনেই সত্যের প্রতিষ্ঠা আছে, কিন্তু ঐ সকল সত্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত এবং উহা জীবনের পৃথক্ পৃথক্ অধিকারে ব্যবস্থিত। ফললিপ্সাই কর্মের দোষাবহ অংশ। কর্মফলাসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্বক নিরাশী, নির্মম ও বিগতজ্বর হইয়া কর্তব্যবোধে "কর্ম কর"—তাহাতে কোনও প্রত্যবায় হইবে না। গীতায় যে উদার ধর্মমত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। গীতার ভাষার নির্মলতা ও ভাবের গাম্ভীর্য এবং যুক্তির প্রসন্নতা গীতাকে জগতের সাহিত্যে এক অতুলনীয় গ্রন্থপদবী প্রদান করিয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড

(লৌকিক)

প্রথম অধ্যায়

স্মৃতি (ধর্ম্মশাস্ত্র) ও নিবন্ধ

ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতি) ও নিবন্ধ

আমরা ইতিপূর্বে বেদাঙ্গ অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে কল্পসূত্রের একাংশ ধর্মসূত্র। ঐ ধর্মসূত্রগুলি সূত্রাকারে গদ্যে রচিত। সূত্রযুগের লক্ষণানুসারে ইহাই অনুমান হয় যে ঐ ধর্মসূত্রগুলি রচিত হইবার পূর্বে ঐ সূত্রের বিষয়গুলি বিস্তীর্ণ আকারে বিদ্যমান ছিল এবং তাহারই মর্ম সূত্রে সংক্ষিপ্তাকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু সূত্রযুগের পূর্বে কি আকারে উহা বিদ্যমান ছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ মনে করেন সূত্রের পূর্বে বহু শ্লোক-বিশিষ্ট বিস্তীর্ণ স্মৃতি গ্রন্থ ছিল কিন্তু উহা অনুমান ব্যতীত কিছুই নহে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ধর্মশাস্ত্রকারগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।৪—৫

ঐ শ্লোকদ্বয়োক্ত ঋষিগণই কেবল ধর্মশাস্ত্র প্রয়োজক নহেন; উহা দিগ্‌দর্শন মাত্র। বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণের গ্রন্থাদিও ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত। ধর্মসূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বেদাঙ্গ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্মশাস্ত্রগুলি ঐগুলির পরবর্তী যুগের ছন্দোবদ্ধ সংস্করণ বলিয়া পরিগণিত। ধর্মশাস্ত্রগুলি "স্মৃতি" বা "সংহিতা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মনুসংহিতা

স্মৃতিগুলির মধ্যে "মনুসংহিতা" বা মানবীয় ধর্মশাস্ত্র"* সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ; শ্রুতির পরেই মনুসংহিতার স্থান। এই সংহিতায় প্রাচীন বৈদিক দেবগণের ও যজ্ঞের উল্লেখ আছে কিন্তু পৌরাণিক ত্রিমূর্তিব উল্লেখ নাই। মনুর নাম ঋগ্বেদে ও ব্রাহ্মণাদিতে দৃষ্ট হয়। প্রাচীনকালে "মানবধর্মসূত্র" নামে এক খানি ধর্মসূত্র ছিল। সম্ভবতঃ ঐ ধর্মসূত্রখানি যজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয়শাখার সহিত সম্বদ্ধ ছিল। কিন্তু কালক্রমে বিশ্বতোমুখ হওয়ায় ঐ ধর্মসূত্র সার্বজনীন রূপে গৃহীত হইয়াছিল এবং বশিষ্ঠ, গৌতম প্রভৃতি প্রাচীন সূত্রকারেরাও তাঁহার মত সসম্মানে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ মানবধর্মসূত্রের উপরই মনুসংহিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। মনুসংহিতার কালনির্দেশ-বিষয়ে গুরুতর মতভেদ আছে। সার উইলিয়ম জোন্স মনুসংহিতা খৃঃ পূঃ ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। শ্লেগেল উহার কাল খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দী বলেন এবং এলফিনষ্টোন মনুসংহিতাকে খৃঃ পূঃ ৯ম শতাব্দীতে স্থাপন করেন। কিন্তু ম্যাক্সমুলার অনুমান করেন যথাপ্রাপ্ত সংস্করণ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। নারদ স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে মনুস্মৃতিতে ১০০০ অধ্যায় ও ১০,০০০ শ্লোক ছিল ; নারদ ঋষি উহা হইতে ১২,০০০ শ্লোক সংগ্রহ করেন। পরে সুমতি উহা হইতে ৪০০০ শ্লোক চয়ন করেন। বর্তমানে মনুস্মৃতিতে ২৬৮৫ শ্লোক আছে। ইহাকে "লঘু মনুসংহিতা" বলে। সম্ভবতঃ সুমতির পরবর্তী যুগেও মনুস্মৃতি পুনরায় আরও একটি সংক্ষিপ্ত নবীন আকার ধারণ করিয়াছে। মনুস্মৃতিতে ও অন্যান্য স্মৃতিতে "বৃদ্ধমনু" ও "বৃহন্মনুর" উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারতেও মনুস্মৃতির উল্লেখ আছে। বর্তমান মনুস্মৃতির প্রায় শতকরা ১০টি শ্লোক অবিকৃত অবস্থায় মহাভারতে দৃষ্ট হয়।

মনুসংহিতার বহু টীকা আছে তন্মধ্যে বীরস্বামীভট্টের পুত্র **মেধাতিথির** টীকাই প্রাচীনতম। মেধাতিথি কুমারিলভট্ট হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভোজরাজ ও বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ববর্তী। সম্ভবতঃ ঐ টীকা

* ভাসরচিত প্রতিমা নাটকের ৫ম অঙ্কে অধীতশাস্ত্রমধ্যে রাবণ মানবীয়-ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছে।

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পর ৯ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। ঐ টীকার সম্পূর্ণ অংশ বিদ্যমান নাই। **গোবিন্দরাজের** মন্বাশয়ানুসারিণী টীকা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে রচিত হওয়া সম্ভব, কারণ গোবিন্দরাজ ভোজরাজের পরবর্তী এবং জীমূতবাহন ও শূলপাণির পূর্ববর্তী। অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁহার হারলতাতে গোবিন্দরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। হারলতা ১১৬০ খৃষ্টাব্দে রচিত। ধরণীধররচিত টীকা ও "কামধেনু" এবং রাঘবানন্দকৃত "মন্বর্থচন্দ্রিকা" নামক টীকা পূর্বে প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু কুল্লূকভট্টের টীকা সকল টীকাগুলিকে মেঘাবৃত করিয়াছে। **কুল্লূকভট্ট** খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে বারাণসীধামে প্রসিদ্ধ **মন্বর্থমুক্তাবলী** নামক টীকা রচনা করিয়াছেন; কারণ তিনি ভোজদেব, গোবিন্দরাজ, কল্পতরু ও হলায়ুধকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং চণ্ডেশ্বরের "রাজনীতিরত্নাকর" কুল্লূককে উল্লেখ করিয়াছেন। চণ্ডেশ্বর নেপালে বাগ্মতীতীরে "রসগুণভুজচন্দ্রে সম্মিতশাকবর্ষে" (১৩১৪ খৃঃ) তুলা পুরুষ মহাদান ব্রত সম্পাদন করেন। ঐ টীকা গোবিন্দরাজের টীকার নিকট বহুলভাবে ঋণী। কুল্লূকভট্ট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান গৌড়জনপদান্তর্গত নন্দনবাসী গ্রামে ছিল।* ঐ স্থান বর্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। নারায়ণ-সর্বজ্ঞ কৃত "মন্বর্থবিবৃতি" ১৪শ শতাব্দীর পরবর্তী নহে, কারণ রায়-মুকুট (১৪৩১ খৃঃ) উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। মনুসংহিতার পরেই যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাকে স্থাপন করা যায়। এই যাজ্ঞবল্ক্যই বিদেহরাজ জনকের পুরোহিত ছিলেন। ইনিই শুক্লযজুর্বেদ নামে যজুর্বেদের শাখান্তর প্রবর্তন করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা বর্তমান আকার ধারণ করিবার পূর্বে সূত্রাকারে ছিল কিনা ঠিক তাহা জানা যায় না। বর্তমান যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ বিপ্লবের পরে

* "গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যো বরেন্দ্র্যাং কুলে শ্রীমদ্‌ ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ।" ভট্টনারায়ণের বংশধর মৌনভট্টকে বল্লালসেন শ্রোত্রিয় আখ্যা প্রদান করেন। এই মৌনভট্টের বংশে কুল্লূকভট্ট জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ বংশের দৌহিত্রবংশ বর্তমান তাহেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদারগণ।

১০০ খৃঃ পূঃ হইতে ১০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে, কারণ ইহাতে বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের উল্লেখ আছে।* এই নবীন সংগ্রহের মধ্যে সম্ভবতঃ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রাচীনাংশও আছে কারণ পাণিনির বৃত্তিকার কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। মাণ্ডলিক বলেন এই সংহিতা মনু, বশিষ্ঠ, গৌতম লিখিত ও হারীত অপেক্ষা অর্বাচীন, বিষ্ণুসংহিতার সমকালীন ও পরাশরসংহিতা অপেক্ষা প্রাচীন। জলি বলেন ইহা শুক্ল-যজুর্বেদীয় পারস্কর গৃহসূত্রের মতানুযায়ী স্মৃতিগ্রন্থ। তাঁহার মতে যাজ্ঞবল্ক্য মনু হইতে অর্বাচীন, কিন্তু অন্যান্য সকল সংহিতা হইতে প্রাচীন।

এই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাই পরবর্তীকালে মনুসংহিতা অপেক্ষাও অধিক গৌরব লাভ করিয়াছে। ইহার শ্লোক সংখ্যা ১০০৯; মনুস্মৃতিতে শ্লোকসংখ্যা ২৬৮৫। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির প্রবর্তিত শুক্লযজুর্বেদ যেরূপ দিগন্তবিশ্রুত যশ লাভ করিয়াছিল তেমনি তাঁহার স্মৃতিসংহিতাও সমস্ত ভারতে একছত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। ধরিতে গেলে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতাই সমস্ত ভারতের ধর্মাধিকরণে একাধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কেবল বঙ্গদেশে মাত্র দায়াধিকারে জীমূতবাহনের মত প্রবল হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার সর্বপ্রাচীন টীকা যাহা বিদ্যমান আছে তাহা **বিশ্বরূপ**-রচিত। ঐ টীকার নাম "বালক্রীড়া"। বিশ্বরূপ শবরস্বামী ও কুমারিলকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন সুরেশ্বরের অপর নাম বিশ্বরূপ। উহা প্রকৃত হইলে বিশ্বরূপের কাল ৮ম কি ৯ম শতাব্দী হইতে পারে। ঐ বালক্রীড়ার উপর (১) বিভাবনা যতীশ্বর বেদান্ত রচিত, (২) অমৃতস্যন্দিনী সোমযাজী কৃত ও (৩) বচনমালা তিনটি টীকা বর্তমান আছে। বিজ্ঞানেশ্বর ঐ টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বরূপের ঐ টীকা বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা টীকা অপেক্ষা অন্ততঃপক্ষে ২০০ বৎসর প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার উপর দেববোধকৃত টীকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বিজ্ঞানেশ্বরের **মিতাক্ষরা** টীকাই সবভারতে প্রসিদ্ধ এবং উহা সর্বত্র মান্য। বৃটিশ রাজাধিকরণে সমস্ত ভারতে উহা একাধিপত্য লাভ করিয়াছে।

---

* ২য় অধ্যায় ২৯৬ শ্লোক।

কেবল বঙ্গদেশে দায়াধিকরণে জীমূতবাহনের দায়ভাগ মিতাক্ষরা অপেক্ষা অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উহা ব্যতীত বঙ্গদেশে ও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্রই মিতাক্ষরার আধিপত্য অপ্রতিহতভাবে বিদ্যমান আছে। **বিজ্ঞানেশ্বর** কল্যাণের বিক্রমদেবের (১০৭৬—১১২৭ খৃঃ) যশঃ কীর্তন করিয়াছেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ঐ টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার টীকার নাম "ঋজুমিতাক্ষরা"। ঐ টীকা সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"প্রমিতাক্ষরাপি বিপুলার্থবতী পরিষিঞ্চতি শ্রবণয়োবমৃতম্।
গম্ভীবাভিঃ প্রসন্নাভির্বাগ্ভির্ন্যস্তা মিতাক্ষবা॥"

তাঁহার এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহাকে কেহ কেহ "বিজ্ঞানযোগী" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ঋজুমিতাক্ষরায় তাঁহাব পবিচয় সম্বন্ধে জানা যায় "ইতিশ্রীভারদ্বাজপদ্মনাথ ভট্টাচার্যোপাধ্যায়াত্মজস্য শ্রীমৎ পবমহংসপরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারকস্য কৃতৌ ঋজুমিতাক্ষরায়াম্"। এতদ্ব্যতীত তাঁহাব জীবনেব অন্য কোনও বিষয় অবগত হওয়া যায় না। মিতাক্ষরার বিশ্বেশ্বরভট্টকৃত **সুবোধিনী** (১৩৫০—১৩৬০ খৃঃ) ও লক্ষ্মীদেবীকৃত **বালমভট্টি** নামক প্রসিদ্ধ দুইখানি টীকা আছে। এই বালমভট্ট নাগেশভট্টের ছাত্র ছিলেন।

বিজ্ঞানেশ্বরেব কিছুকাল পরেই কোঙ্কনরাজ **অপরার্ক** যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাব একখানি টীকা রচনা কবেন, উহা "অপরার্ক" বলিয়া প্রসিদ্ধ। অপরার্কের কাল ১১৪৩—১১৪৬ খৃষ্টাব্দ। এই টীকাখানি উড়িষ্যা ও কাশ্মীরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। **শূলপাণি** যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার **দীপকলিকা** নামক টীকা রচনা কবিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন শূলপাণি জীমূতবাহনের পূর্ববর্তী; কিন্তু ঐ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। শূলপাণি তাঁহার **দুর্গোৎসববিবেকে** জীমূতবাহনের কালবিবেকের এবং জীমূতবাহনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। শূলপাণি সম্ভবতঃ একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন কারণ শবণদেব তাঁহার রচিত দুর্ঘটবৃত্তিতে (১১৭২ খৃঃ) শূলপাণির নামোল্লেখ কবিয়াছেন এবং তাঁহার শ্লোক উদ্ধৃত কবিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিবিবেক ১১৫০ খৃঃ রচিত।

নারদ ধর্মশাস্ত্র বা **নারদসংহিতা**। নারদস্মৃতি অতি বিস্তীর্ণ ধর্মশাস্ত্র।

ইহার শ্লোকসংখ্যা ১২,০০০। সম্ভবতঃ প্রাচীন লক্ষশ্লোকাত্মক মনুস্মৃতি হইতে নারদ এই ১২,০০০ শ্লোক সংগ্রহ করেন। নারদস্মৃতি সর্বত্রই মনুস্মৃতি অনুসরণ করিয়াছেন। নারদস্মৃতির অসহায় বিরচিত একখানি অতি প্রাচীন টীকা বিদ্যমান আছে। ডাঃ জলী বৃদ্ধ নারদের কতকাংশ আবিষ্কার করিয়াছেন।

বিষ্ণুসংহিতা বা **বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র**। প্রাচীন যজুর্বেদের কাঠকশাখার যে ধর্মসূত্র ছিল তাহাই অবলম্বনে বিষ্ণুসংহিতা রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ঐ সংহিতার কোনও কোনও অংশ অতি প্রাচীন এবং কোনও কোনও অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। ঐ সংহিতায় ম্লেচ্ছগণের ও আধুনিক তীর্থ স্থানের উল্লেখ আছে। নন্দপণ্ডিত বিষ্ণুসংহিতার উপর "বৈজয়ন্তী" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন।

পরাশরসংহিতা বা **পরাশরস্মৃতি**। কথিত আছে কৃতযুগে মনুস্মৃতি, ত্রেতাযুগে গৌতমস্মৃতি, দ্বাপরযুগে শঙ্খলিখিত সংহিতা এবং কলিযুগে পরাশর-সংহিতা ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত। সম্ভবতঃ পরাশরসংহিতাই সর্বাপেক্ষা নবীন স্মৃতি। উহাতে কলিযুগের উপযোগী বহু ব্যবস্থা আছে। পরাশর-সংহিতার উপর মাধবাচার্য **পরাশরমাধবীয়** নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। **মাধবাচার্য** ঐ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ও নিজ পূর্বাশ্রম পরিচয়ে বলিয়াছেন :—

"পরাশর-স্মৃতিঃ পূর্বৈর্ন ব্যাখ্যাতা নিবন্ধভিঃ।
ময়াতো মাধবাচার্যেন তদ্‌ব্যাখ্যায়াং প্রযত্যতে॥
শ্রীমতী জননীর্যস্য সুকীর্তিমায়ণঃ পিতা।
সায়ণো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদরৌ॥
যস্যং বৌধায়নং সূত্রং শাখা যস্য চ যজুষী।
ভারদ্বাজং কুলং যস্য সর্বজ্ঞঃ সহি মাধবঃ॥"

তিনি (১) ব্যবহারমাধব, (২) কালমাধবীয়, (৩) কালনির্ণয়, (৪) জৈমিনীয় "ন্যায়মালাবিস্তর" রচনা করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "বিদ্যারণ্য" উপাধি গ্রহণ করিয়া "জীবন্মুক্তিবিবেক" রচনা করিয়াছিলেন। উহার টীকাকার অচ্যুত রায় তাহাই বলিয়াছেন। বিদ্যারণ্যও তাহাই প্রকাশ

করিয়াছেন। "এতেষাং তু সমাচারাঃ প্রোক্তাঃ পারাশর-স্মৃতৌ ব্যাখ্যানে-হস্মাভিরত্রায়ং পরহংসো বিবিচ্য॥ কৌণ্ডণ নপাচার্য নরসিংহ (১৩৬০—১৪৪৫ খৃঃ) কালমাধবীয়কে বিদ্যারণ্যকৃত বলিয়াছেন। তিনি প্রায় সমসাময়িক লোক।

উপরোক্ত কয়েকখানি সংহিতা ব্যতীত শ্লোকদ্বয়োক্ত ধর্মশাস্ত্রকারগণের নামসংযুক্ত কতকগুলি সংহিতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐ সংহিতাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে তত্তৎধর্মশাস্ত্রপ্রয়োজককৃত সংহিতা কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। ঐগুলির ভাষা অতি আধুনিক। সম্ভবতঃ মুসলমান আক্রমণের পর ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় স্মৃতিশাস্ত্র।

জীমূতবাহন বঙ্গদেশীয় মতের প্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত। জীমূতবাহন-রচিত **ধর্মরত্নগ্রন্থের** অন্তর্গত **দায়ভাগ** ঐ নামে বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। দায়াধিকারে বঙ্গীয় মত ও মিতাক্ষরার মধ্যে গুরুতর মূলগত পার্থক্য আছে। জীমূতবাহনের কাল লইয়া বিবাদ আছে। তিনি শ্রীকরের পরবর্তী এবং শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীকর বিজ্ঞানেশ্বরেরও পূর্ববর্তী কারণ মিতাক্ষরায় শ্রীকরের উল্লেখ আছে। এই শ্রীকরের **দায়নির্ণয়** নামে একখানি নিবন্ধআছে। শূলপাণিও(১১শ শতাব্দী) জীমূতবাহনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে তাঁহাকে ১১শ হইতে ১২শ শতাব্দী মধ্যে স্থাপন করা যাইতে পারে। এড়ুমিশ্রের" কুল-কারিকা" গ্রন্থে জীমূতবাহন ভট্টনারায়ণের অধস্তন ৭ম পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ভট্টনারায়ণ ৯৯৯ সম্বতে=৯৪২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। জীমূতবাহন বিশ্বক্সেনের মন্ত্রী ছিলেন। জীমূতবাহনের **কাল-বিবেক** গ্রন্থে যে বৎসরের দিনপঞ্জিকার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে ঐ বৎসর ১০১৪ শক—১০৯২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা যায়। ঐ সময়ের সহিত কুলকারিকার সময়েরও সামঞ্জস্য হয়। জীমূতবাহন নিজ পরিচয় দিতে লিখিয়াছেন :—

"পারিভদ্রকুলোদ্ভূতঃ শ্রীমান্ জীমূতবাহনঃ।
দায়ভাগং চকারেমং বিদুষাং সংশয়চ্ছিদে॥"

এই পারিগ্রাম বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ও অজয়নদের তীরবর্তী। কালবিবেকেও রাঢ়দেশের কালমান গৃহীত হইয়াছে। এডুমিশ্রের কুলকারিকার বিবরণের সহিত উহার সম্পূর্ণ ঐক্য হয়। উপরোক্ত অবস্থায় জীমূতবাহনকে একাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিরাপদে স্থাপন করা যাইতে পারে। গোবিন্দরাজের টীকা জীমূতবাহন উদ্ধৃত করায় কোনও অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না* কারণ গোবিন্দরাজের নাম বল্লালসেনের গুরুদেব অনিরুদ্ধভট্ট উল্লেখ করিয়াছেন এবং গোবিন্দরাজ ১১শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এরূপ নির্ধারণ করিবার বহু কারণ আছে।

জীমূতবাহনের দায়ভাগের কয়েকখানি প্রসিদ্ধ টীকা আছে। তন্মধ্যে শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণির **চূড়ামণি** নামক টীকা সর্বপ্রাচীন ও মান্য গ্রন্থ। চূড়ামণির পরেই অচ্যুত চক্রবর্তীর টীকা রচিত হইয়াছিল। অচ্যুত চক্রবর্তী **"শ্রাদ্ধবিবেক"** নামে একখানি নিবন্ধও রচনা করিয়াছেন। অচ্যুত চক্রবর্তীর পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার দায়ভাগের **দায়ভাগ-সুবোধিনী** নামক টীকা রচনা করেন। উহা অতি মান্য গ্রন্থ। তিনি দায়ভাগের মতানুসারে দায়ক্রমনির্ণয় পূর্বক **দায়ক্রমসংগ্রহ** নামক একখানি পৃথক্ গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। মহেশ্বর পণ্ডিত দায়ভাগের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও মহেশ্বর পণ্ডিত সমসাময়িক হইতে পারেন। তাঁহারা উভয়েই ১৮শ শতাব্দীর লোক।

অনিরুদ্ধ ভট্ট। অনিরুদ্ধ ভট্ট বল্লালসেনের গুরু ও মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে (১০৯১ শক) **হারলতা** প্রণয়ন করেন। তিনি ভোজদেব, গোবিন্দরাজ ও কামধেনুর নামোল্লেখ করিয়াছেন। রুদ্রধর তাঁহার শুদ্ধিবিবেকে হারলতার উল্লেখ করিয়াছেন।

গোবিন্দানন্দ। পিতার নাম গণপতি ভট্ট। বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী। তিনি রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী, কারণ তাঁহার মত রঘুনন্দন উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থ ৫ খণ্ডে বিভক্ত।

১। বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, ২। দানক্রিয়াকৌমুদী ৩। শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, ৪। শুদ্ধিকৌমুদী, ৫। ক্রিয়াকৌমুদী। তিনি মদনপারিজাত, রুদ্রধর ও বাচস্পতি মিশ্রকে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কাল ১৪৯০—১৫৪০ খৃঃ।

* Vide XXVI Calcutta Law Journal notes 17_n — 31_n

রঘুনন্দন। হরিহর ভট্টাচার্যের পুত্র স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য নবদ্বীপে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগেও ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তাঁহার স্মার্তমত পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া থাকে। তিনি **অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব** রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে **দায়তত্ত্ব** বঙ্গীয় রাজাধিকরণে মান্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। রঘুনন্দন সর্বত্রই জীমূতবাহনকে অনুসরণ করিয়াছেন; জীমূতবাহনের গ্রন্থে যাহা অনুক্ত ছিল এবং যাহা অসম্পূর্ণ ছিল তাহা তিনি পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার দায়তত্ত্বের উপর কাশীরাম বাচস্পতি একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন।

দক্ষিণভারতীয় স্মৃতিগ্রন্থ।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মিতাক্ষরাটীকা দক্ষিণভারতেও মান্য গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত দেবন্নভট্ট বিরচিত **স্মৃতিচন্দ্রিকা** (১২ শতাব্দী) তিনি অপরার্ক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং হেমাদ্রি দেবন্নভট্টের উল্লেখ করিয়াছেন ও উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রদেবকৃত **সরস্বতীবিলাস** (১৬শ শতাব্দী) দাক্ষিণাত্যে মান্য গ্রন্থ। দাক্ষিণাত্যের দেবগিরির (দৌলতাবাদের) রাজা মহাদেবের রাজত্বকালে **হেমাদ্রি** তাঁহার ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বৎসগোত্রীয়। পিতার নাম কামদেব, পিতামহের নাম বাসুদেব, প্রপিতামহের নাম বামন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থনপূর্বক ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে **চতুর্বর্গচিন্তামণি** নামক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি **অপরার্ক** ও **স্মৃতিচন্দ্রিকা** গ্রন্থের পরবর্তী কারণ উভয় গ্রন্থেরই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। হেমাদ্রি ও বোপদেব সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন এবং উভয়েই দেবগিরি রাজসভায় বাস করিতেন। ১৪শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য বিজয়নগরে মাধবীয়-**দায়বিভাগ** ও **পরাশর-মাধবীয়** নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বরদরাজকৃত **ব্যবহারনির্ণয়** ১৬শ শতাব্দীর গ্রন্থ।

পশ্চিমভারতের স্মৃতিগ্রন্থ। নীলকণ্ঠরচিত **ব্যবহারময়ূখ** (১৬শ শতাব্দী) পশ্চিমভারত ও বোম্বাই প্রদেশে সম্মানিত গ্রন্থ। এই **নীলকণ্ঠ** কমলাকরভট্টের পিতৃব্যপুত্র। কমলাকরভট্টের **নির্ণয়সিন্ধু** দত্তক সম্বন্ধে

নিবন্ধ গ্রন্থ। মিত্রমিশ্ররচিত (১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) **বীরমিত্রোদয়** পশ্চিমপ্রদেশে ও বোম্বাইপ্রদেশে ব্যবহৃত হয়।

মিথিলার স্মৃতিগ্রন্থ। চণ্ডেশ্বরঠকুরকৃত **"বিবাদরত্নাকর"** ও মিসরুমিশ্রকৃত **"বিবাদচন্দ্র"** (১৫শ শতাব্দী) মিথিলায় প্রচলিত আছে। চণ্ডেশ্বর মৈথিলরাজ হরসিংহের তুলাব্রত ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে উদ্যাপন করিয়াছিলেন। বীরেশ্বরভট্টরচিত **"মদনপারিজাত"** (১৪শ শতাব্দী) মিথিলায় সমাদৃত হইয়া থাকে। স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ মিথিলাপ্রদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ইনি ১৫শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং মহাদার্শনিক বাচস্পতিমিশ্র হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। স্মার্ত্ত বাচস্পতির পুত্র লক্ষ্মীদাস ১৫০১ খৃষ্টাব্দে **গণিততত্ত্বচিন্তামণি** রচনা করেন। হরসিংহের পৌত্র হরিনারায়ণের রাজত্বকালে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্রের **বিবাদচিন্তামণি** ও **ব্যবহারচিন্তামণি** মিথিলায় বিশেষ আধিপত্য লাভ করিয়াছে।

দত্তকনিবন্ধ।

দত্তক সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থ রাজাধিকরণে সমাদৃত হয়। তন্মধ্যে **দত্তকচন্দ্রিকা** নামক নিবন্ধ গ্রন্থ ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে ইংরাজীতে অনূদিত হওয়ায় উহার প্রাধান্য ঘটিয়াছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থখানি রঘুমণিনামক কোনও বঙ্গীয় পণ্ডিত বঙ্গের কোনও ভূস্বামীর উপকারার্থ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ৺অধ্যাপক গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ঐ বিষয়ের নিঃসন্দেহ প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।* নন্দপণ্ডিতবিরচিত **দত্তকমীমাংসা** ১৬ শতাব্দীর গ্রন্থ। কমলাকরভট্ট **"নির্ণয়সিন্ধু"** নামক নিবন্ধ ১৬১২ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ বোম্বাই প্রদেশে সমাদৃত হইয়া থাকে।

* Golap Shastri, Hindu Law, 5th Edition pp. 194—178.

তৃতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাকরণ

বৈদিককাল হইতেই প্রভূতভাবে ব্যাকরণের চর্চা হইয়া আসিতেছিল। বেদের ব্রাহ্মণভাগে ও কোনও কোনও উপনিষদে ব্যাকরণের অনেক বিষয়ের এরূপ বিশদ চর্চা আছে তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ঐ সময়ে ব্যাকরণ-নামক বেদাঙ্গ প্রচলিত ছিল। যাস্ক মহর্ষি পাণিনির পূর্ববর্তী। শাকল্য, গালব, গার্গ্য ও শাকটায়ন প্রভৃতি যাস্কের পূর্ববর্তী। যাস্কাচার্য বেদাঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি পাণিনির পূর্বে বহু বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে বহু পূর্বাচার্যের নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে কাশ্যপ, আপিশলি, গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্মণ, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক ও স্ফোটায়নের নাম সসম্মানে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল প্রাচীন বৈয়াকরণের গ্রন্থ কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। কেবল পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী পচলিত আছে। পাণিনির কাল লইয়া পণ্ডিত সমাজে বিপুল মতভেদ আছে। ওয়েবার্ ও ম্যাক্সমূলর, পাণিনিকে ৩৫০ খৃষ্ট পূর্বে স্থাপন করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছেন। কথাসরিৎসাগরে যে গল্প আছে তাহাতে পাণিনি নন্দবংশীয় মহানন্দের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন এবং কাত্যায়নও তাঁহার সমসাময়িক। গোল্ডষ্টুকর পাণিনিকে খৃঃ পূর্ব সপ্তম শতাব্দীরও পূর্ব স্থাপন করেন। তাঁহারা সকলেই বলেন পাণিনি ও কাত্যায়নের কালের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান থাকা সম্ভব। ভিনসেন্ট্ স্মিথ তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে পাণিনির কাল খৃঃ পূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পরে নহে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। অধ্যাপক বেল্‌ভেল্‌কার্ ও বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে "সঙ্কলাদিভ্যশ্চ ৪।২।৭৫" সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে "সাঙ্কল" নগর "সঙ্কল" নাম হইতে উৎপন্ন, সংকলকর্তৃক নির্মিত হওয়ায় উহার নাম সাঙ্কল হইয়াছে। আলেকজান্দর সাঙ্কলনগর ভূমিসাৎ করেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে পাণিনি আলেকজান্দরের আক্রমণের বহু পূর্ববর্তী। তাঁহাদের মতেও পাণিনি অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর লোক।

পাণিনির জীবনবৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী। মহাভাষ্যকার তাঁহাকে "দাক্ষীপুত্র" নামে অভিহিত করিয়াছেন। "সংগ্রহ"কার ব্যাড়ি তাঁহার ভাগিনেয় ছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। পাণিনিকে "শালাতুরীয়" বলে। শালাতুর তাঁহার "অভিজন" অর্থাৎ পূর্বপুরুষের বাসস্থান। উহা ভারতের পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে এটকের নিকটবর্তী স্থান। অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাচ্য বৈয়াকরণদিগের উল্লেখ আছে; তাহাতেও অনুমান হয় তিনি প্রতীচ্যদেশবাসী ছিলেন। ত্রয়োদশী তিথিতে সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন এরূপ উক্তি পঞ্চতন্ত্রে আছে। "সিংহো ব্যাকরণস্য কর্তুরহরৎ প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণিনেঃ।" তিনি বর্ষমুনির ছাত্র ও কৌৎসের অধ্যাপক ছিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। "কৌৎসঃ পাণিনিং উপসেদিবান্"।* পাণিনীয় ব্যাকরণকে অষ্টাধ্যায়ী সূত্র বলে। ইহাতে ৮টি অধ্যায় ও প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টি পাদ আছে। সর্বশুদ্ধ ৩৯৯৬টি সূত্র। ইহার মধ্যে ৫টি সূত্র পাণিনিরচিত কি বার্তিককার কাত্যায়নরচিত তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সূত্রগুলি ন্যায়ানুমোদিত প্রক্রিয়াতে গ্রথিত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে সংজ্ঞাগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার পর প্রথমে ব্যাপক সাধারণসূত্র বা "উৎসর্গঃ", পরে অতিব্যাপ্তিনিবারক "প্রতিষেধক সূত্র" বা অনুবাদ, সর্বশেষে প্রতিষেধের অতিব্যাপ্তিনিবারক "প্রতিপ্রসবসূত্র" স্থাপিত হইয়াছে। সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত অসংদিগ্ধ ও বিশ্বতোমুখ। সূত্রগুলির সংক্ষেপ কত স্পৃহনীয় তৎসম্বন্ধে কথিত আছে:—

"অর্দ্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ।"

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সর্বোতোমুখ ও সর্বদেশদর্শী হওয়াতেই বিশেষভাবে আদরণীয় হইয়াছে, তজ্জন্যই সম্ভবতঃ পূর্বাচার্যগণের গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে।

কাত্যায়ন।

বররুচি কাত্যায়ন অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। কথাসরিৎসাগরের মতে তিনি পাণিনির সমসাময়িক। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা সমীচীন মনে করেন না। তাঁহারা বলেন

* পাতঞ্জল মহাভাষ্য; ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ ৩।২।১০৮ সূত্রের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য;

পাণিনি ও কাত্যায়নের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ব্যবধান ছিল। পাণিনি যে সকল আচার্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তদতিরিক্ত ব্যাড়ি,, বাজপায়ন ও পৌষ্করসাদির নাম কাত্যায়ন উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহাতেও অনুমান হয় পাণিনি ও কাত্যায়নের মধ্যে ব্যবধান ছিল। এই কাত্যায়নই বাজসনেয়-সংহিতার প্রাতিশাখ্য রচনা করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থ শেষ করিবার পরেই অষ্টাধ্যায়ী সূত্র পাঠের বৃত্তি রচনা করেন। কাত্যায়ন পাণিনির সকল সূত্রের উপর বৃত্তি রচনা করেন নাই। তিনি ১২৪৫টী সূত্রের উপর বৃত্তি রচনা করিয়াছেন এবং প্রায় ৫০০০ বার্তিকসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।* পাণিনি সূত্রে যাহা ছিল না বা অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছিল, বার্তিকসূত্রে তাহাই কথিত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা উহাদ্বারাই পাণিনির ও কাত্যায়নের কালের ভাষার পার্থক্য ও পৌর্বাপর্য নির্ণয় করেন। কাত্যায়নের বার্তিকসূত্রগুলির প্রকৃতি বিবেচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে কাত্যায়ন স্থানে স্থানে পাণিনিসূত্রের ভ্রম, অতিব্যাপ্তি ও অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। কালক্রমে কাত্যায়নের বার্তিকগুলি অষ্টাধ্যায়ীর পূর্ণতা ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

পতঞ্জলি।

পতঞ্জলি পাণিনীয় মহাভাষ্য রচয়িতা। তিনিই যোগসূত্র রচয়িতা ও চরকের প্রতিসংস্কর্তা এরূপ প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। গোণিকা পুত্র ও গোনর্দীয় তাঁহার নামান্তর বলিয়া কথিত হয়। গোণিকা পুত্র মাতার নাম অনুসারে এবং গোনর্দীয় বাসস্থানের নামানুসারে হইয়াছে, এরূপ অনুমান হয়। কিন্তু কামসূত্র রচয়িতা বাৎসায়ন গোণিকাপুত্র গোনর্দিয়কে পৃথক-ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ বরিয়াছেন। এই বাৎস্যায়ন পতঞ্জলির পূর্ববর্তী। বাৎস্যায়নের মতানুসারে গোণিকাপুত্র ও গোনর্দীয় পতঞ্জলির পূর্বাচার্য। পতঞ্জলি শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। তিনি মহাভাষ্যে বর্তমান কালের প্রয়োগে "পুষ্যমিত্রং যাজয়াম" এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং চন্দ্রগুপ্ত ও মৌর্যরাজগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

* "সূত্রে অনুক্তদুরুক্তচিন্তাকরত্বং বার্তিকত্বম্" নাগেশভট্ট। কাত্যায়নের বার্তিক সংখ্যা ৫০৩২।

পতঞ্জলির কাল ১৮৪—১৪৮ পূর্বখৃষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে। তাঁহার পাণিনীয় মহাভাষ্য অতুলনীয় গ্রন্থ। পতঞ্জলির বৃত্তিকার কাত্যায়নের বৃত্তির বার্তিক-সূত্রগুলির সমালোচনা করিয়াছেন এবং কোনও কোনও স্থলে বৃত্তিকারকে খণ্ডন ও কোনও স্থলে বৃত্তিকারকে সমর্থন করিয়াছেন। মহাভাষ্যের ভাষা অতি প্রাঞ্জল। সংস্কৃত ভাষায় ঐরূপ সরল গদ্য অতি বিরল। কিন্তু উহাতে যে সকল গভীর জটিল বিষয়ের মীমাংসা আছে তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। রাজতরঙ্গিণী ও বাক্যপদীয়ের উক্তি অনুসারে ইহাই উপলব্ধি হয় যে কাশ্মীর-রাজ অভিমন্যুর সময়ে উত্তরভারতে মহাভাষ্য প্রচলিত ছিল না, দাক্ষিণাত্য হইতে উহা বহু চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৬৫০ অব্দের পূর্বে ভর্তৃহরি মহাভাষ্যের মহাভাষ্যদীপিকা নামক একখানি ব্যাখ্যা ও ভাষ্যতাৎপর্য অবলম্বনপূর্বক বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বাক্যপদীয়কে পাণিনীয় ব্যাকরণের দর্শনাংশ বলা যাইতে পারে। কাশ্মীরদেশীয় পামাপুর নিবাসী বৈয়াকরণকেশরী কৈয়ট খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে **মহাভাষ্যপ্রদীপ** নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য কৈয়টের উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরানন্দ ভাষ্যপ্রদীপের **ভাষ্য-প্রদীপবিবরণ** নামক একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈয়াকরণ-কেশরী নাগেশভট্ট মহাভাষ্যপ্রদীপের "মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত" নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন নাগেশভট্টের শিষ্য বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড তাহার উপর "ছায়া" নামক টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন।

কাত্যায়নের পরের কয়েকখানি বৃত্তি রচিত হইয়াছিল। কাশিকা ন্যাসে কুনি, ভট্টি ও নল্লরু প্রভৃতির বৃত্তির উল্লেখ আছে। ভর্তৃহরি প্রণীত বৃত্তির নাম ভাগবৃত্তি। দ্বাদশ শতাব্দিতে পুরুষোত্তমদেব তাঁহার ভাষাবৃত্তিতে ("কাশিকাভাগবৃত্তিস্তু") এবং ১৭শ শতাব্দীতে সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিত ঐ ভাগবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

কাশিকা

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বামন ও জয়াদিত্য নামক দুই বৌদ্ধ বৈয়াকরণ বিপ্রকীর্ণ পাণিনীয় শাস্ত্রের সারসংগ্রহপূর্বক অষ্টাধ্যায়ীর **কাশিকাবৃত্তি** নামক একখানি অতি প্রাঞ্জল বৃত্তি রচনা করেন। ঐ বৃত্তিখানি সম্পূর্ণ অষ্টাধ্যায়ীর বৃত্তি। কাশিকাবৃত্তি ভর্তৃহরীর বাক্যপদীয়ের পরবর্তী ও ন্যাসগ্রন্থের পূর্ববর্তী।

কাশিকা বাক্যপদীয়ের পরবর্তী গ্রন্থ, কারণ কাশিকাতে "বাক্যপদীয়" নাম উল্লেখ আছে (৪।৩।৮৮)। কাশিকা সপ্তম শতাব্দির মধ্যভাগে রচিত হইয়াছে। উদাহরণের প্রাচুর্য ও ভাষার সরলতায় ঐ বৃত্তি অতি মনোরম। অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রক্রমানুসারেই ঐ বৃত্তি গ্রথিত। ঐ বৃত্তির কোন্ অংশ বামন রচনা করিয়াছেন ও কোন্ অংশ জয়াদিত্য রচনা করিয়াছেন, তাহা লইয়া সন্দেহ আছে। মুদ্রিত কাশিকার প্রত্যেক পাদান্তে যে উক্তি আছে তাহার সহিত মনোরমার ও শব্দরত্ন মনোরমার হরিদীক্ষিতের উক্তির সামঞ্জস্য নাই। কেহ কেহ বলেন প্রথম ৫টি অধ্যায় বামনরচিত শেষ ৩টি অধ্যায় জয়াদিত্য রচিত রামচন্দ্রের প্রক্রিয়াকৌমুদী প্রচারিত হইবার পূর্বে সমগ্র ভারতে এই বৃত্তিই সাদরে ব্যবহৃত হইত। ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে জিনেন্দ্র বুদ্ধিপাদ কাশিকাবৃত্তির উপর **কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা** বা **ন্যাস** নামক টীকা রচনা করেন। উহাতে পাণিনীয়শাস্ত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ ন্যাস অতি মান্য গ্রন্থ। এই জিনেন্দ্র বুদ্ধিপাদও বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি জৈনেন্দ্রব্যাকরণকর্তা হইতে পৃথক ব্যক্তি। কাশিকার **পদমঞ্জরী** নামক অপর এক খানি মান্য ব্যাখ্যা আছে। হরদত্তমিশ্র ঐ ব্যাখ্যার রচয়িতা। তাঁহার অপর নাম সুদর্শন। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যকালে বৌদ্ধাচার্যগণই তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের জন্য প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন এবং কাশিকা ও ন্যাস বৌদ্ধাচার্যগণের রচিত গ্রন্থ। অষ্টম শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পর হিন্দু আচার্যগণের পুনরায় অভ্যুদয় হয়। হরদত্ত হিন্দু বৈয়াকরণ। হরদত্ত তাঁহার পদমঞ্জরীতে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি পদ্মকুমারের (রুদ্রকুমারের) পুত্র ও অগ্নিকুমারের সহোদর ছিলেন। "কুক্ষিমর্ক্ষী" কথার প্রয়োগে বোধ হয় তিনি দাক্ষিণাত্যের তেলেগু প্রদেশবাসী ছিলেন। পদমঞ্জরীতে ভট্টি, ন্যাস, মাঘ ও কিরাতার্জুনীয়ের উল্লেখ আছে এবং ১৪শ শতাব্দীতে মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ও মল্লিনাথের টীকায় পদমঞ্জরীর উল্লেখ আছে। পদমঞ্জরী কৈয়টের ভাষ্যপ্রদীপের নিকট বিশেষভাবে ঋণী বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু দুর্ঘটবৃত্তিতে হরদত্তের পদমঞ্জরীর উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ কৈয়টেরমহা-ভাষ্যপ্রদীপের কিছু পরেই (১১০০ খৃঃ) পদমঞ্জরী রচিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় হরদত্তকে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করা যায়।

ভাষাবৃত্তি ।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পুরুষোত্তমদেব পাণিনীয় সূত্র ক্রমানুসারে কেবল লৌকিক সূত্রগুলির উপর "**ভাষাবৃত্তি**"-নামক প্রাঞ্জল বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। ঐ বৃত্তিতে বহু উদাহরণ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে গৃহীত হওয়ায় শিক্ষার্থীর পক্ষে সুগম হইয়াছে। ঐ বৃত্তির উপর সৃষ্টিধরকৃত "**ভাষা-বৃত্ত্যর্থবিবৃতি**" নামক একখানি টীকা আছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত দুর্ঘটবৃত্তিতে ভাষা-বৃত্তির উল্লেখ আছে। শরণদেবের "**দুর্ঘটবৃত্তি**" ১০৯৫ শক = ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে রচিত। উহাতে পাণিনির দুরূহ সূত্রগুলির ব্যাখ্যা আছে। উহাতে পুরুষোত্তমদেবের ভাষাবৃত্তির উল্লেখ আছে। এই শরণদেব লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন।

পাণিনীয় প্রক্রিয়াগ্রন্থ।

কাশিকাবৃত্তি অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের ক্রমানুসারে রচিত হওয়ায় ব্যাকরণ শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ প্রণালী রুচিকর বোধ হইত না। সম্পূর্ণ অষ্টাধ্যায়ী আয়ত্ত না হইলে একটি ধাতু বা শব্দের রূপ করা যাইত না। তজ্জন্য প্রক্রিয়া অনুসারে পাণিনি সূত্রের সন্নিবেশ হইতে আরম্ভ হইল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে বিমলসরস্বতী "**রূপমালা**" নামক প্রক্রিয়া-গ্রন্থ রচনা করেন। বিমলসরস্বতীই এই পাণিনীয় প্রক্রিয়াপ্রণালীর প্রথম প্রবর্তক এবং সিদ্ধান্তকৌমুদীতে এই প্রক্রিয়াপ্রণালী চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ঐ শতাব্দীতেই মাধবাচার্য "**মাধবীয়-ধাতুবৃত্তি**" রচনা করিয়াছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে "**রামচন্দ্র**" ঐ প্রণালীতে "**প্রক্রিয়া-কৌমুদী**" রচনা করেন। রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যবাসী কৃষ্ণাচার্যের পুত্র ও সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন। বিঠ্ঠলাচার্য প্রক্রিয়াকৌমুদীর "**প্রসাদ**" নামক টীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থ ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত। বিঠ্ঠলাচার্য রামকৃষ্ণাচার্যের পৌত্র এবং নৃসিংহাচার্যের পুত্র। ভট্টোজি দীক্ষিত অনেক স্থলে বিঠ্ঠলাচার্যকে দোষারোপ ও কটাক্ষ করিয়াছেন। জয়ন্তচন্দ্র প্রক্রিয়াকৌমুদীর "**তত্ত্বচন্দ্র**" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। প্রক্রিয়াকৌমুদীর "**প্রক্রিয়াপ্রকাশ**" নামক অপর একখানি টীকা শেষনৃসিংহসূরির পুত্র শেষকৃষ্ণ প্রণয়ন করেন। শেষকৃষ্ণকে ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে নির্দেশ করা যায়। তাঁহার ছাত্র

ভট্টোজিদীক্ষিতই সিদ্ধান্তকৌমুদীর রচয়িতা। রামচন্দ্রের প্রক্রিয়াকৌমুদী ও তদুপরি শেষকৃষ্ণের প্রক্রিয়াপ্রকাশের নিকট ভট্টোজিদীক্ষিত বহুলভাবে ঋণী।

সিদ্ধান্তকৌমুদী।

পাণিনীয় প্রক্রিয়াগ্রন্থমধ্যে সিদ্ধান্তকৌমুদীই সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে উণাদিসূত্র, ফিটসূত্র ও লিঙ্গানুশাসন থাকায় গ্রন্থখানি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থ সর্বভারতে প্রচলিত হইবার পরই প্রাচীন বৃত্তিগুলি ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং শিক্ষার্থীসম্প্রদায়মধ্যে ইহাই আদরণীয় হইয়াছে। ধরিতে গেলে এই গ্রন্থের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভট্টোজিদীক্ষিত ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই সিদ্ধান্তকৌমুদী রচনা করেন। তিনি বালকদিগের বোধসৌকার্যে ইহার একখানি সরল **"বালমনোরমা"** নামক টীকা ও **"প্রৌঢ়মনোরমা"** নামক একখানি বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করেন। তিনি কাশিকাবৃত্তির প্রণালী অনুসারে **"শব্দকৌস্তুভ"** নামে টীকাও আরম্ভ করেন কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভট্টোজিদীক্ষিতের পুত্র ভানুজিদীক্ষিত বা রামাশ্রম। ভানুজির পুত্র হরিদীক্ষিত **"প্রৌঢ়মনোরমা"**র উপর **"শব্দরত্নমনোরমা"** নামক টীকা রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন হরিদীক্ষিতের ছাত্র বৈয়াকরণকেশরী নাগেশভট্ট স্বীয় অধ্যাপকের নাম দিয়া ঐ টীকা রচনা করিয়াছেন। বামনেন্দ্র সরস্বতীর ছাত্র জ্ঞানেন্দ্র ভিক্ষু (সরস্বতী) সিদ্ধান্তকৌমুদীর লৌকিক অংশের **"তত্ত্ববোধিনী"** নামক প্রাঞ্জল বিস্তীর্ণ টীকা প্রণয়ণ করেন এবং তাঁহার ছাত্র ও শেষকৃষ্ণের পুত্র বীরেশ্বরের ছাত্র কবি জগন্নাথপণ্ডিত প্রৌঢ়মনোরমার উপর **"কুচমর্দিনী"** নামক টীকা রচনা করেন। তত্ত্ববোধিনীর সম্পূর্ণতা সাধন জন্য পরিশিষ্টস্বরূপ রঘুনাথ ভট্টের পুত্র জয়কৃষ্ণ সিদ্ধান্তকৌমুদীর স্বর ও বৈদিক প্রক্রিয়ার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

হরিদীক্ষিতের ছাত্র নাগেশ ভট্ট বা নাগোজি ভট্ট মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শিব ভট্ট ও জননীর নাম সতী দেবী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁহার ন্যায় সর্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত আর কেহই ছিলেন না। তিনি সিদ্ধান্তকৌমুদীর উপর **"শব্দেন্দুশেখর"** ও **"বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর"** নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনি কৈয়টের মহাভাষ্যপ্রদীপের উপর **"মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত"** নামক টীকা এবং পাণিনীয় শাস্ত্রের পরিভাষাগুলি

একত্রিত করিয়া "**পরিভাষেন্দুশেখর**" নামক একখানি পরিভাষাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। নাগেশভট্টের প্রসিদ্ধ ছাত্র বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড বা বালমভট্ট পরিভাষেন্দুশেখরের উপর "**গদা**" এবং ভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতের উপর "**ছায়া**" এবং শব্দকৌস্তুভের উপর **প্রভা** ও শব্দরত্নমনোরমার উপর "**ভাবপ্রকাশিকা**" নামক টীপ্পনী রচনা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ ও তাহাদের টীকা-টিপ্পনীতে সিদ্ধান্তকৌমুদী পাণিনীয়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পদবী লাভ করিয়াছে এবং প্রাচীন বৃত্তি ও ভাষ্যাদির স্থল, সিদ্ধান্তকৌমুদী ও তাহার ব্যাখ্যাদি অধিকার করিয়াছে। ভট্টোজিদীক্ষিতের ছাত্র বরদরাজদীক্ষিত সিদ্ধান্তকৌমুদী হইতে প্রথম শিক্ষার্থীর ব্যবহার্য সূত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া ও সিদ্ধান্তকৌমুদীর বৃত্তি যথাসাধ্য গ্রহণ করিয়া "**লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী**" বা "**লঘুকৌমুদী**" প্রণয়ন করিয়াছেন। সর্বত্রই উহা প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বরদরাজদীক্ষিত লঘুকৌমুদী অপেক্ষা বৃহৎ ও সিদ্ধান্তকৌমুদী অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকারের "**মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী**" ও "**সারসিদ্ধান্তকৌমুদী**" নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পাণিনীয় ধাতুপাঠ।

কাশ্মীরীয় পণ্ডিত ক্ষীরস্বামী পাণিনীয় গণের গণবৃত্তি ও ধাতুপাঠের উপর টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের শিক্ষক ছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে। কিন্তু উহা ভ্রমাত্মক। ক্ষীরস্বামী ভোজরাজের অবর্বাক্তন কারণ তিনি ভোজরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষীরস্বামীর কাল একাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করা যায় কারণ বর্দ্ধমান গণরত্নমহোদধিতে ক্ষীর স্বামিপ্রণীত গণবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান ১১৪০ খৃষ্টাব্দে গণরত্নমহোদধি প্রণয়ণ করেন।

গণপাঠ।

ক্ষীরস্বামী গণবৃত্তি রচনা করেন কিন্তু ঐ গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্দ্ধমান শ্লোকাকারে **গণরত্নমহোদধি** ১১৪০ খৃষ্টাব্দে প্রণয়ন করিয়াছেন। গণসম্বন্ধে উহা মান্য গ্রন্থ। সর্বদর্শনসংগ্রহে বর্দ্ধমানের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। •এই বর্দ্ধমান গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

উণাদি।

উণাদি সূত্রগুলি প্রাচীন শাকটায়ন-প্রণীত বলিয়া কথিত। নিরুক্ত ও মহাভাষ্যের উক্তিতে শাকটায়নের উণাদি মত দৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্তমান সূত্রগুলি পাণিনির পরবর্তীকালের রচিত বলিয়া অনুমান হয়। দৌর্গসিংহ উণাদি সূত্রগুলি বররুচি কাত্যায়নকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উজ্জ্বলদত্ত উণাদিবৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি পুরুষোত্তমদেবের পরবর্তী কিন্তু দুর্ঘটবৃত্তির পূর্ববর্তী এরূপ অবস্থায় উজ্জ্বলদত্তকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করা যায়।

কাতন্ত্র বা কলাপব্যাকরণ।

ইহাকে কৌমারব্যাকরণও বলে। জনশ্রুতি আছে আন্ধ্রনৃপতি শাতবাহনের আদেশক্রমে সহজে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য সববর্মণ উহা প্রণয়ন করেন। কথিত আছে জলকেলিকালে রাণী পরিশ্রান্ত হইয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন "মোদকং দেহি" (মা+উদকং দেহি)। রাজা বুঝিয়াছিলেন "মোদকং"। রাজা লজ্জিত হইয়া সংস্কৃত শিক্ষার সহজ ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়নের আদেশ দিলে সববর্মণ এই কাতন্ত্রব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি কার্তিকেয়ের অনুগ্রহেই জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া এই শাস্ত্র "**কাতন্ত্র**" বা "**কৌমার**" নামে অভিহিত হয়। ইহা সন্ধি, নাম, আখ্যাত, ও কৃত চারি পদে বিভক্ত। পাণিনীয় প্রত্যাহার ইহাতে গৃহীত হয় নাই। কৃৎপ্রকরণ সম্ভবতঃ পরে শাকটায়ণ ব্যাকরণ হইতে সংযোজিত হইয়াছে। কাহারও মতে উহা বররুচি হইতে গৃহীত। দ্বিতীয় পাদের তদ্ধিতাংশও পরে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয়।

দৌর্গসিংহীয় বৃত্তি।

দৌর্গসিংহীয় "**কাতন্ত্রবৃত্তিই**" মান্য সর্বপ্রাচীন বৃত্তি। দৌর্গসিংহ চান্দ্র-ধাতু পাঠের উল্লেখ করিয়াছেন এবং দৌর্গসিংহকে হেমচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় তাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে স্থাপন করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। তিনি দুর্গাত্মা ও দুর্গাচার্য হইতে পৃথক ব্যক্তি। বর্দ্ধমান দৌর্গসিংহীয়বৃত্তির উপর "**কাতন্ত্রবিস্তর**" নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন। এই বর্দ্ধমানই সম্ভবতঃ গণরত্নমহোদধিরচয়িতা। বর্দ্ধমান বোপদেবের

পূর্ববর্তী। মহামহোপাধ্যায় পৃথ্বীধর বৰ্দ্ধমানের কাতন্ত্রবিস্তরের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ত্রিলোচন দাসের "**কাতন্ত্র-বৃত্তি-পঞ্জিকা**" অতি প্রাচীন গ্রন্থ। তিনিও বোপদেবের পূর্ববর্তী। (কাতন্ত্রপরিশিষ্ট রচয়িতা অপর ত্রিলোচনদাস ইহার পরবর্তী)। কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকার উপর জিনপ্রভাসুরি, কুশল ও রামচন্দ্র টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আরও আধুনিক কয়েকখানি টীকা আছে।

কাতন্ত্রবৃত্তির "ঢুণ্টিকা" নামক একখানি টীকা আছে, তাহার বহুল প্রচার নাই।

বঙ্গদেশ।

ত্রিলোচনদাস বঙ্গীয় কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই সম্ভবতঃ কাতন্ত্রব্যাকরণ বঙ্গদেশে বহুলভাবে প্রচলিত হয়। কবিরাজ, হরিরাম, গোপীনাথ, কুলচন্দ্র, রামচন্দ্র সকলেই পঞ্জিকার টীকাকার।

শ্রীপতি "**কাতন্ত্রপরিশিষ্ট**" রচনা করিয়াছেন। গোপীনাথ, রামচন্দ্র, শিবরাম ও পুণ্ডরীকাক্ষ ঐ পরিশিষ্টের টীকা করিয়াছেন। নবীন ত্রিলোচনদাস কাতন্ত্রপরিশিষ্টের "**উত্তর-পরিশিষ্ট**" রচনা করিয়াছেন।

কাতন্ত্র এখন পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলাতে ও কাশ্মীরে পঠিত হয়।

কাশ্মীর।

কাশ্মীরদেশীয় কাতন্ত্রসূত্রপাঠ ও বঙ্গীয় সূত্রপাঠে বহু পার্থক্য আছে। সম্ভবতঃ পরে কাশ্মীরদেশ দৌর্গসিংহীয়বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। কাশ্মীরদেশে ভট্ট জগদ্ধরকৃত "**বালবোধিনী**" নামক ব্যাখ্যা ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। বালবোধিনীর উপর উগ্রভূতি "**ন্যাস**" নামক টীকা রচনা করেন। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক। কাশ্মীরে চিচ্ছু ভট্টকৃত "**লঘুবৃত্তি**" নামক বৃত্তি প্রসিদ্ধ।

চান্দ্র ব্যাকরণ।

ভর্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয় গ্রন্থে চান্দ্র ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। কাশিকাবৃত্তিতেও চান্দ্র ব্যাকরণের অনেক সূত্র গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু চন্দ্রের নাম উল্লিখিত হয় নাই। তিনিই স্বয়ং ইহার বৃত্তিকার। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। নেপাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তিব্বতীয় ভাষা হইতে ব্রুণোলিবিক ঐ ব্যাকরণ উদ্ধার করিয়াছেন। চান্দ্রবৃত্তিতে হূনদিগের

বিজয়ের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের হুনবিজয়ের **কথা উল্লিখিত হইয়াছে।** ভর্তৃহরির গুরু বসুরাত চন্দ্রাচার্যকে গুরু বলিয়া **মান্য করিয়াছেন,** এরূপ অবস্থায় চন্দ্রাচার্যকে ৫ম শতাব্দীতে স্থাপন করা সঙ্গত বোধ হয়। তিনি পাণিনীয় শাস্ত্রের পরবর্তীকালে ভাষায় যে কিছু পবিবর্তন হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সূত্রগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি সূত্রগুলির অনেক সংক্ষেপ করিয়াছেন। চান্দ্রবৃত্তির সাবাংশ ধর্মদাস তাঁহাব টীকায় সন্নিবেশ করিয়াছেন। ধর্মদাসের টীকার হস্তলিপি নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে এই গ্রন্থ নেপাল, তিব্বত ও সিংহলদ্বীপে প্রচাবিত হইয়াছিল। তিব্বত ও সিংহলে উহাব বহুল প্রচার ছিল।

তিব্বতীয় পণ্ডিত স্থিবমতি (১০০০ খৃষ্টাব্দ) উহা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। সিংহলে কাশ্যপকৃত (দ্বাদশ শতাব্দী) **"বালকবোধ"** নামে চান্দ্রব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে।

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ।

জৈনেন্দ্র ব্যাকবণ জিন অর্থাৎ শেষ তীর্থঙ্কব মহাবীব বচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইন্দ্র জিনকে বাল্যকালে ব্যাকরণের বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তজ্জন্য (জিন-ইন্দ্র) জৈনেন্দ্র নাম হয়। কিন্তু হস্তলিখিত অধিকাংশ গ্রন্থেই দেবানন্দীকৃত বলিয়া উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র ও বোপদেবও দেবানন্দীকৃত বলিয়াছেন। দেবানন্দীর অপর নাম পূজ্যপাদ। জৈনেন্দ্র ব্যাকবণ চান্দ্রব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন। জৈনেন্দ্রসূত্রে অগ্নিশর্মায়ন বার্যগণ্যেব উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বার্যগণ্যকেই সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। কাশিকাকার জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ জানিতেন। জৈনেন্দ্রকে আপাততঃ পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে স্থাপন করিলে কোনও বিরোধ হয় না। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণে দুই প্রকাব পাঠ প্রচলিত আছে। ৩০০০ সূত্রের সংক্ষিপ্ত পাঠ **"অভয়ানন্দী বৃত্তি"** সহিত প্রচলিত এবং প্রায় ৩৭০০ সূত্রসম্বলিত সোমদেবসূরিকৃত **"শব্দার্ণবচন্দ্রিকা"** রচনা কবিয়াছেন। অভয়ানন্দীবৃত্তি সোমদেবের পরবর্তী। জৈনসম্প্রদায়ে এই গ্রন্থের প্রচার ছিল। কালক্রমে সাম্প্রদায়িক ভাবের বিলোপে ইহার ব্যবহারও ক্রমশঃ বিরল হইয়াছে। অদ্যাপি দিগম্বরজৈনসম্প্রদায়ে দুই একটি ছাত্র এই ব্যাকরণ পাঠ করিয়া থাকে।

অভিনব শাকটায়ন ব্যাকরণ।

এই শাকটায়ন পাণিনিসূত্র উল্লিখিত শাকটায়ন নহেন। তজ্জন্যই ইহাকে অভিনব শাকটায়ন বলে। এই শাকটায়ন প্রণীত ব্যাকরণ শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ে প্রচলিত গ্রন্থ। হেমচন্দ্র, গণরত্নমহোদধি, মাধবীয়ধাতুবৃত্তি, বোপদেব প্রভৃতি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই শাকটায়ন রাষ্ট্রকুট-নৃপতি ১ম অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে **"অমোঘবৃত্তি"** নামক বৃত্তি রচনা করেন। অমোঘবর্ষের রাজত্বকাল ৮১৭—৮৭৭ খৃষ্টাব্দ নির্দেশ করা যায়। শাকটায়ন চন্দ্রগোমী হইতে বহু সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাকরণে ৪টি অধ্যায় ও প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টী পাদ আছে। ইহা প্রক্রিয়া প্রণালীতে রচিত। অমোঘবৃত্তির উপর **"ন্যাস"** নামক ব্যাখ্যা আছে। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে উহার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ প্রভাচন্দ্রাচার্যকৃত ব্যাখ্যাই "ন্যাস" নামে প্রচলিত ছিল। যক্ষ-বর্মকৃত **"চিন্তামণি"** নামক অপর একখানি ব্যাখ্যা আছে। চিন্তামণির উপর অজিতসেনাচার্য **"মণিপ্রকাশিকা"** ও মঙ্গরস **"চিন্তামণিপ্রদীপ"** নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন। হেমচন্দ্রের শব্দানুসারে প্রচলনে শাকটায়ন ব্যাকরণের প্রচার বিরল হইয়াছিল। শাকটায়নের অভয়চন্দ্রাচার্য কৃত সংক্ষিপ্ত **"প্রক্রিয়াসংগ্রহ"** নামক প্রক্রিয়া গ্রন্থ আছে। এই অভয়চন্দ্র খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইহাতে অনাবশ্যকীয় সূত্রগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

দয়াপালকৃত **"রূপসিদ্ধি"** শাকটায়ন ব্যাকরণের আরও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। ইহা বরদরাজকৃত লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীর ন্যায় গ্রন্থ। সম্ভবতঃ দয়াপাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

হৈম ব্যাকরণ।

হেমচন্দ্র ১০৮৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের আমেদাবাদ জেলায় ধুন্দুক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চচিগ ও মাতার নাম পাহিনী। হেমচন্দ্রের পূর্বনাম চাচিদেব। তিনি পরে বহু জৈন সম্প্রদায়ের মঠাধিপতি হইয়াছিলেন এবং অনিহিলবড়পত্তনের রাজা জয়সিংহকে তর্কে পরাজিত করিয়া জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ৮৪ বৎসর বয়সে কুমার পালের রাজত্বকালে পরলোক গমন করেন। জয়সিংহের অনুরোধে

"শব্দানুশাসন" ও কুমারপালের আদেশে যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেন। হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের সম্পূর্ণ নাম "**সিদ্ধহেমচন্দ্রাভিধস্বোপজ্ঞশব্দানুশাসন**"। ইহাতে ৮টি অধ্যায় ও প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টি পাদ আছে। মোট সূত্র সংখ্যা ৪৫০০। অষ্টম অধ্যায়ের সূত্রগুলি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণের। প্রত্যেক পাদের শেষেই রাজপ্রশংসাসূচক একটি করিয়া প্রশস্তি আছে। হেমচন্দ্র তাঁহার সূত্রের শব্দানুশাসন বৃহদ্বৃত্তি নামক বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এই বৃহদ্বৃত্তির উপর "ন্যাস" নামক টীকা আছে। তাহাতে হেমচন্দ্রের উল্লিখিত পূর্বাচার্যগণের নামোল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র সম্ভবতঃ কৈয়টকে উপাধ্যায় শব্দদ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। বিনয়বিজয়গণিকৃত "**হৈমলঘুপ্রক্রিয়া**" হৈমব্যাকরণের প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। উহা ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত। গ্রন্থকার "**হৈমপ্রকাশ**" নামে উহার একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। মেঘবিজয় ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে "হৈমকৌমুদী" বা "চন্দ্রপ্রভা" নামক প্রক্রিয়াগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন ইহাই সিদ্ধান্তকৌমুদীর আদর্শ।

সারস্বত ব্যাকরণ।

অনুভূতি স্বরূপাচার্য এই সারস্বতবৃত্তির প্রণেতা। হেমচন্দ্র ও বোপদেব অনুভূতিস্বরূপাচার্যের উল্লেখ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে স্থাপন করা যায় না। সারস্বতের বহু প্রাদেশিক টীকা আছে, কিন্তু কোনওখানিই পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত নহে। সারস্বতের বিশিষ্টতা এই যে, সাত শত অপেক্ষাও কম সূত্রে লৌকিক ব্যাকরণের মূল বিষয়গুলি উল্লিখিত হইয়াছে। তজ্জন্যই উহা বহু প্রদেশে ব্যবহৃত হইত। ইহা স্বল্পায়াসে ব্যাকরণের অবশ্য জ্ঞাতব্যগুলি শিক্ষা করিবার অতি সুগম পন্থা। তজ্জন্যই কাতন্ত্রের ন্যায় ইহা বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। কাতন্ত্র যে স্থলে ১৪০০ সূত্র ব্যবহার করিয়াছে সারস্বতে সেই স্থলে ৭০০ অপেক্ষা কম সূত্র আছে। অনুভূতিস্বরূপের কোনও বৃত্তান্ত জানা যায় না। কোনও কোনও টীকাকার "সারস্বত" নরেন্দ্রাচার্য প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ নরেন্দ্রাচার্যই বার্তিককার।

সর্বপ্রদেশেই সারস্বতের টীকাকার আছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকখানির পরিচয় প্রদত্ত হইল। পুঞ্জরাজ—তিনি গায়াসুদ্দিন খিলিজির মন্ত্রী ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

অমৃতভারতী। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অমৃতভারতী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তাঁহার টীকা রচনা করেন। তিনি অমল সরস্বতীর শিষ্য ; সম্ভবতঃ ইহা ১৫শ শতাব্দীতে রচিত।

চন্দ্রকীর্তির দীপিকা বা সুবোধিকা, বাসুদেব ভট্টের সারস্বত প্রসাদ, মেঘরত্নের সারস্বত ব্যাকরণ ঢুণ্টিকা, জগন্নাথের সারপ্রদীপিকা, কাশীনাথের সারস্বতভাষ্য, সহজকীর্তির সারস্বতপ্রক্রিয়াবর্তিকা, হংসবিজয়গণির শব্দার্থ-চন্দ্রিকা এবং রামভট্টের বিদ্বৎপ্রবোধিনী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহা ব্যতীত আরও বহু টীকা আছে।

সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা।

সারস্বতসূত্রের সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা নামক একখানি বৃত্তি আছে। ইহার গ্রন্থকার রামাশ্রম। অনেকের বিশ্বাস সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভট্টোজি দীক্ষিতের পুত্র ভানুজী দীক্ষিত বা রামাশ্রমই এই গ্রন্থকর্তা। তিনি পতঞ্জলির মতানুসারে বাণীপ্রণীত সূত্রের "সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা" ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার উপর লোকেশ্বরের ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে (চন্দ্রবেদহয়ভূমি-সংযুতে) "তত্ত্বদীপিকা" এবং সদানন্দ "সুবোধিনী" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। ভট্টোজি দীক্ষিতের ছাত্র রঘুনাথ সারস্বতব্যাকরণের লঘুভাষ্য নামক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

সুপদ্ম ব্যাকরণ।

মৈথিল ব্রাহ্মণ শ্রীদত্তের পৌত্র ও দামোদর দত্তের পুত্র পদ্মনাভ দত্ত সুপদ্মব্যাকরণ রচয়িতা। তিনি হলায়ুধের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি কেবল লৌকিক ব্যাকরণই বলিয়াছেন। নমস্কার-বাক্যে বলিয়াছেন "পদ্মনাভঃ স্ফুটং পূর্ণং ভাষায়মাহ লক্ষণম্"। তিনি অধিকাংশ স্থলেই পাণিনীয় পরিভাষা ও পাণিনীয় প্রত্যাহারের "খয়", "জশ্" প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। সুপদ্মপাঠীর পাণিনীয় শাস্ত্রের অধ্যায়নে কোনও অসুবিধা হয় না। পদ্মনাভ তাঁহার ভূরিপ্রয়োগ নামক অভিধানে উজ্জ্বলদত্তের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে উজ্জ্বল দত্তের অব্যবহিত পরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই ব্যাকরণশাস্ত্রের পৃষোদরাদি বৃত্তিকার অপর পুরুষোত্তম দত্ত ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুপদ্ম ব্যাকরণের

৭টি অধ্যায় :—সংজ্ঞা, সন্ধি, কারক, আখ্যাত, কৃৎ ও উণাদি এবং তদ্ধিত। পদ্মনাভ স্বয়ং বৃত্তি এবং "সুপদ্মপঞ্জিকা" নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। বিষ্ণুমিশ্র "সুপদ্মমকরন্দ" নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। ইহাও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত কন্দর্পসিদ্ধান্ত, কাশীশ্বর ও শ্রীধর চক্রবর্তী এবং রামচন্দ্রের টীকা আছে। পদ্মনাভ স্বয়ং উণাদি, ধাতুবৃত্তি ও পরিভাষাবৃত্তি রচনা করিয়াছেন। উণাদিবৃত্তিতে তিনি উজ্জ্বলদত্তের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়াছেন। বর্তমানে সুপদ্মব্যাকরণ, যশোহর, খুলনা ও চব্বিশ পরগণার ভাটপাড়া ও বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে পঠিত হয়।

কাশীশ্বর সুপদ্মের গণপাঠ রচনা করিয়াছেন এবং রামাকান্ত তাহার ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ।

বাদীন্দ্রচক্রচূড়ামণী ক্রমদীশ্বর এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ব্যাকরণখানি প্রক্রিয়াকৌমুদীর পূর্ববর্তী। সম্ভবতঃ মুগ্ধবোধেরও পূর্ববর্তী। কোলব্রুক তাহাকে বোপদেবের অব্যবহিত পরে, কিন্তু অফ্রেক্‌ট্ বোপদেবের পূর্বে স্থাপন করেন। ক্রমদীশ্বর ভর্তৃহরির মহাভাষ্যদীপিকার মতানুসারে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। তিনি পাণিনীয় শাস্ত্রের মত সংক্ষেপে বলিয়াছেন বলিয়াই উহার নাম "সংক্ষিপ্তসার" দিয়াছেন। ইহাতে ৮টি অধ্যায় আছে; ১ম সাত অধ্যায়ে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ ও ৮ম অধ্যায়ে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ বলিয়াছেন; ৮ম অধ্যায় পরে সংযোগ করিয়াছেন। এই ব্যাকরণে ক্রমদীশ্বর তাঁহার বিদ্যাবিত্তা ও ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। সংক্ষিপ্তসারের বৃত্তিকার জুমুরনন্দী।

জুমুরনন্দী সংক্ষিপ্তসারকে প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন। উহাতে যে অসম্পূর্ণতা ছিল জুমুরনন্দী তাহার সম্পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। জুমুরনন্দীর উপাধি "মহারাজাধিরাজ" দৃষ্ট হয়। সংক্ষিপ্তসারের বিদ্বেষিগণ বলেন, জুমুরনন্দী তন্তুবায় ছিলেন, "মহারাজাধিরাজ" উপাধি বিদ্রূপাত্মক। কিন্তু ঐ কথার কোনও ভিত্তি নাই। জুমুরনন্দীকৃত বৃত্তির নাম "রসবতী"।

রসবতীর পরেই গোয়ীচন্দ্রের ব্যাখ্যা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ঐ ব্যাখ্যার উপর অভিরামবিদ্যালঙ্কার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। গোয়ীচন্দ্রের ব্যাখ্যার অনেক

টীকা আছে। তন্মধ্যে বিদ্যাবিনোদপুত্র ন্যায়পঞ্চাননকৃত (১৭ শতাব্দী) ও কেশবদেব তর্কপঞ্চাননকৃত, বংশীবদনকৃত ও হরিরামকৃত টীকা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান বিভাগে এই ব্যাকরণের বহুল প্রচার আছে।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ।

বোপদেব গোস্বামী মুগ্ধবোধরচয়িতা। তিনি ভিষক্কর কেশবের পুত্র ও ধনেশের শিষ্য। "বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্কেশবসূনুনা" এই বাক্য মুক্তাফলে দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ হেমাদ্রি তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেবগিরির যাদববংশীয় মহাদেবের রাজত্বকালে (১২৬০-১২৭১ খৃঃ) বোপদেব বিদ্যমান ছিলেন। বর্তমান বেবার রাজ্যের মধ্যে বরদানদীর তীরে সার্থনামক স্থানে তাঁহার জন্মভূমি ছিল। বোপদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন, কি বৈদ্য ছিলেন তাহা লইয়া বিবাদ আছে। অধিকাংশেরই মত তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে **"মুগ্ধবোধ"** **"কবিকল্পদ্রুম"** ও তাহার **"কামধেনু"** নামক টীকা এবং **"মুক্তাফল** ও **"হরিলীলাবিবরণ"** প্রসিদ্ধ।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে বোপদেব সংক্ষিপ্তাকারে সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সংক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি পাণিনীয় পরিভাষাকে অক্ষরে পরিণত করিয়াছেন। র্ণ—সবর্ণ, র্ঘ=দীর্ঘ, প্রী=প্রথমা, ব্রি=বৃদ্ধি, শ্রি=সর্বনাম ইত্যাদি। বর্ণ লাঘব করিতে গিয়া কর্কশতা ও দুর্বোধ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য মুগ্ধবোধ সর্বপ্রদেশে প্রচলিত হয় নাই। এককালে বোপদেবের মত যে বিশেষ মান্য হইয়াছিল তাহা সিদ্ধান্তকৌমুদীর মনোরমা-টীকায় দৃষ্ট হয়ঃ—

"বোপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ।"
কীর্তিরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ।

মুগ্ধবোধ বর্তমানকালে নবদ্বীপ ও মধ্যবঙ্গে বহুলভাবে পঠিত হয়। মুগ্ধবোধ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় উহাতে বহু বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। নন্দকিশোর ভট্ট (১৩৯৮ খৃঃ), কাশীশ্বর ও রামতর্কবাগীশ উহার পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। রাম তর্কবাগীশ মুগ্ধবোধের প্রসিদ্ধ টীকাকার। তিনি পাণিনীয় প্রভৃতি বহু ব্যাকরণে পণ্ডিত ও নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার টীকা মুগ্ধবোধকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। রামানন্দ, দেবীদাস ও কাশীশ্বরও মুগ্ধবোধের টীকা

করিয়াছেন। দুর্গাদাস তাঁহার টীকায় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে কবিকল্পদ্রুমের "ধাতুদীপিকা" নামক টীকা রচনা করেন। দুর্গাদাসের পরে বিদ্যাবাগীশ, ভোলানাথ ও রামভদ্রন্যায়ালঙ্কার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত মুগ্ধবোধের আরও টীকা আছে।*

প্রয়োগরত্নমালা।

ইহা পুরুষোত্তমকৃত। তিনি ভাষাবৃত্তিরচয়িতা পুরুষোত্তম হইতে পৃথক্। তিনি কুচবিহার রাজা মল্লদেবের রাজত্বকালে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যাকরণ।

রূপগোস্বামীকৃত—হরিনামামৃত ব্যাকরণ। বৈষ্ণব, ১৬ শতাব্দী)
বলরামপঞ্চাননকৃত—প্রবোধপ্রকাশ (শৈব)
বিজ্জলভূপতিকৃত—প্রবোধচন্দ্রিকা
বিনয়সুন্দরকৃত—ভোজব্যাকরণ
ভট্টবিনায়ককৃত—ভাবসিংহপ্রক্রিয়া
চিদ্রূপাশ্রমকৃত—দীপব্যাকরণ
ভট্টাচার্য চক্রবর্তীকৃত—কারিকাবলী
নরহরিকৃত—বালবোধ
গোবিন্দনাথকৃত—গোবিন্দনামামৃত
তারানাথ তর্কবাচস্পতিবিরচিত—আশুবোধ।

---

* রামপ্রসাদতর্কবাগীশ, শ্রীবল্লভাচার্য, দয়ারামবাচস্পতি, কার্তিকসিদ্ধান্ত, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, গোবিন্দরাম প্রভৃতির টীকা উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদ্যকশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্র

আয়ুর্বেদ অথর্ববেদীয় উপাঙ্গ। আয়ুর্বেদের মূল অথর্ববেদে নিহিত আছে। অশ্বিযুগলের চিকিৎসানৈপুণ্যের বহু প্রশংসা ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় এবং ওষধিগণের রোগনিবারণ শক্তির অনেক প্রশংসা ও স্তুতি বেদে আছে। ঋগ্বেদে অশ্বি-যুগলের চিকিৎসা নৈপুণ্যের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা বিশ্পলার এক খানি পদ যুদ্ধে ছিন্ন হওয়ায় তৎপরিবর্তে একখানি লৌহময় পদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা ঘোষাকে কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত করেন। ঋজাশ্ব ও পরাবৃজের দৃষ্টিশক্তি পুনরানয়ন করেন এবং কক্ষিবানকে নব দৃষ্টিশক্তি দান করেন। তাঁহারা বন্ধ্যাগণকে সন্তানবতী করিতেন এবং বামদেবকে মাতৃ-কুক্ষি হইতে প্রসব করাইয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণেও সুশ্রুত শাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত। শল্য (শস্ত্রচিকিৎসা) শালাক্য (শিরোরোগ চিকিৎসা), কায় চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য (শিশুরোগ চিকিৎসা), অগদতন্ত্র, বিষচিকিৎসা, রসায়ন ও বাজীকরণ। সুশ্রুতে শস্ত্র চিকিৎসা ও বিষ-চিকিৎসার প্রাধান্য। আর চরকে কায়চিকিৎসার প্রাধান্য। চরক আত্রেয় সম্প্রদায় এবং সুশ্রুত ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ভুক্ত।

চরক।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ যাহা বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে চরকই সর্ব-প্রাচীন। উহা শাস্ত্রবিধি অনুসারে গ্রথিত এবং ন্যায়ানুমোদিত। চরকে রোগতত্ত্ব বা নিদান, রোগনির্ণয়, ভোগের কাল, পরিণাম ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং চিকিৎসাভাগও অতি বিস্তীর্ণভাবে লিখিত আছে। চরক অথর্ববেদের বহু পরবর্তী যুগের গ্রন্থ। চরকে যে সাংখ্যমত আছে তাহা ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যমত হইতে বিভিন্ন এবং তাহা ঈশ্বরকৃষ্ণের মত অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

বর্তমানে চরকের যে সংস্করণ পাওয়া যায় তাহা অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থ। চবকের সময়ে অগ্নিবেশ, ভেল (ভেড়), জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষীরপাণি এই ছয়খানি তন্ত্র বিদ্যমান ছিল। চবক অগ্নিবেশতন্ত্রেবই প্রতি-সংস্কৃত গ্রন্থ। চরক প্রাচীন অগ্নিবেশতন্ত্রকে নবীভূত করিয়াছেন।

অতস্তন্ত্রোত্তমমিদং চরকেণাতিবুদ্ধিনা।
সংস্কৃতং তৎ তু সংসৃষ্টং বিভাগেনোপলক্ষ্যতে॥

* * *

বিস্তারয়তি লেশোক্তং সংক্ষিপত্যতিবিস্তরম্।
সংস্কর্তা কুরুতে তন্ত্রং পুবাণঞ্চ পুনর্নবম্॥

চবকেব বর্তমান সংস্কবণেব শেষ ৪১টি অধ্যায় কপিলবলেব পুত্র দৃঢবল সংযোগ কবিয়াছেন তাহা চবকের শেষভাগে উল্লিখিত আছে।

অখণ্ডার্থং দৃঢবলো জাতঃ পঞ্চনদে পুবে॥
কৃত্বা বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যো বিশেষাচ্চ বলোচ্চযং।
সপ্তদশাধ্যায়সিদ্ধিকল্পৈবপূবয়ৎ॥

অগ্নিবেশতন্ত্র কত প্রাচীন তাহা নির্ণয় কবিবাব উপায় নাহ। চরকেব সময়ও স্থিরভাবে নির্ণীত হয় নাই। চরক ঋষিব নাম অতি প্রাচীন। তিনি যজুর্বেদের চরকশাখার দ্রষ্টাঋষিব বংশধব হইতে পারেন। চরক বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব। মহর্ষি পতঞ্জলি চরকের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। "আপ্তোনামানুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্নেন নিশ্চয়বান্ রাগাদিবশাদপি নাণ্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ" নাগেশভট্টকৃত লঘুমঞ্জুষা। পতঞ্জলিব কাল ১৮০—১৪০ খৃঃ পূঃ এরূপ নির্ণীত হইয়াছে। চক্রপাণিদত্ত ভোজবাজ বলেন পতঞ্জলিই চরকের প্রতিসংস্কর্তা।

"পাতঞ্জলমহাভাষ্যচরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ।
মনোবাক্কায়দোষাণাং হন্ত্রেঽহিপতয়ে নমঃ॥"

পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে "বৈদ্যকশাস্ত্রেব" উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক লেভি বলেন ভিষগ্রাজ চবক রাজা কণিষ্কের সময় বিদ্যমান ছিলেন, চীন-দেশীয় ত্রিপিটক গ্রন্থে এরূপ সুস্পষ্ট লিখিত আছে। যদি ঐ মত সত্য হয় তাহা হইলে খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। পঞ্চনদদেশেই

দৃঢ়বলও বিদ্যমান ছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় চরকও পঞ্চনদ দেশেই কনিষ্কের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। চরকের বহু টীকা বিদ্যমান ছিল। বৃন্দের টীকা ব্যাখ্যাকুসুমাবলীতে শ্রীকণ্ঠ চরকের বহু টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জেজ্জট, হরিচন্দ্র, চক্রপাণিদত্ত, শিবদাসের টীকা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভিষক্‌প্রবর গঙ্গাধর "জল্পকল্পতরু" নামক একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন।

সুশ্রুত।

সুশ্রুত চরকের পরবর্তী গ্রন্থ। যে প্রণালীতে সুশ্রুতগ্রন্থ লিখিত তদ্দৃষ্টে বোধ হয় ঐ কালে বিষয়বিভাগ আরও সূক্ষ্মভাবে সম্পাদিত ও লক্ষিত হইয়াছে। মহাভারতে সুশ্রুত বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর কাত্যায়নের বার্তিক সূত্রে সুশ্রুতের নামোল্লেখ আছে। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বৃদ্ধসুশ্রুত নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। সুশ্রুত ধন্বন্তরির শিষ্য। ধন্বন্তরির শিষ্য মধ্যে গার্গ্য ও গালবের নামও দৃষ্ট হয়। গার্গ্য ও গালব পাণিনির পূর্ববর্তী। সুশ্রুত নিশ্চয়ই বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ববর্তী। বৌদ্ধ তান্ত্রিক নাগার্জুনই প্রাচীন সুশ্রুতের সংস্কর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনিই উহার উত্তরতন্ত্রাংশ যোগ করেন। নাগার্জুন দৃঢ়বলের পূর্ববর্তী। ডল্বণ বলেন "যত্র যত্র পরোক্ষে নিয়োগস্তত্র তত্রৈব প্রতিসংস্কৃতসূত্রং জ্ঞাতব্যম্। প্রতিসংস্কর্তাপি ইহ নাগার্জুন এব॥" সুশ্রুতের নাম বৌদ্ধগ্রন্থ "মহাবগ্‌গে" উল্লিখিত আছে।

(খৃঃ ১০৬০) চক্রপাণিদত্তের "ভানুমতী" নামক সুশ্রুতের আংশিক টীকা বিদ্যমান আছে। মথুরার নিকটবর্তী সহনপালদেবের রাজত্বকালে ডল্বণ "নিবন্ধসংগ্রহ" নামক টীকা রচনা করেন। ঐ টীকাতে প্রাচীন টীকাকার জেজ্জট, গয়দাস, ভাস্কর ও মাধবের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। ডল্বণ চক্রপাণিদত্তের পূর্ববর্তী, কারণ চক্রপাণি ডল্বণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। জেজ্জটের পূর্বেই সুশ্রুতের পাঠ স্থির হইয়া গিয়াছিল। ডল্বণ বলিয়াছেন

"অনার্ষোঽয়ং যোগঃ জেজ্জটাচার্যেণ নোক্তবান্ তস্মান্নপঠনীয়ম্।"

চিকিৎসাস্থান ৭।৩।

ভেল, হারীত।

বাগ্‌ভটের সময় ভেল ও হারীতের গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে ঐ দুই গ্রন্থের প্রচার নাই। ভেলসংহিতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

নাগার্জুন।

নাগার্জুন তান্ত্রিকযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রসপ্রয়োগতন্ত্রকর্তা। চরক ও সুশ্রুতে উদ্ভিজ্জ ঔষধের প্রয়োগই (কষায় প্রয়োগ) প্রধান, দুই একটি ধাতুদ্রব্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। নাগার্জুন রসায়নশাস্ত্রের প্রবর্তক। নাগার্জুন বৌদ্ধ ছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টের প্রথম শতাব্দী তাঁহার কাল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; নাগার্জুনের "রসরত্নাকর" নামক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। এই তান্ত্রিকযুগেই পারদ, লৌহ প্রভৃতির প্রয়োগ প্রবর্তিত হইয়াছে। নাগার্জুনই প্রথম কজ্জলী প্রবর্তিত করেন (black sulphide of mercury)।

বাগ্‌ভট।

ইনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং সম্ভবতঃ বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়কেই অথবা অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহকেই অষ্টবিভাগযুক্ত চিকিৎসাশাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোম্বাই মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক মোরেশ্বরকুণ্টে তাঁহাকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করেন। তিনি ঐ প্রাচীন সময়ে বিদ্যমান না থাকিলেও তিনি খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন এরূপ বোধ হয়। কহ্লন তাঁহাকে বহু পরে স্থাপন করেন কিন্তু ঐ মত নিতান্ত ভ্রান্ত। বাগ্‌ভট তাঁহার অষ্টাঙ্গসংগ্রহের উত্তরতন্ত্রের শেষভাগে পরিচয় রাখিয়াছেন:—

"ভিষগ্‌বরো বাগ্‌ভট ইত্যভূন্‌ মে পিতামহো নামধরোস্মি যস্য।
সুতোঽভবন্‌ তস্য চ সিংহগুপ্তস্তাস্যাপ্যহং সিন্ধুষু জাতজন্মা॥'

বাগ্‌ভট প্রথমে "অষ্টাঙ্গসংগ্রহ" রচনা করেন, পরে "অষ্টাঙ্গহৃদয়" রচনা করেন। অষ্টাঙ্গহৃদয় রচনায় তাঁহার কৃতিত্বের পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হয়। বাগ্‌ভট চরক, দৃঢ়বল ও সুশ্রুতের পরবর্তী। বাগ্‌ভট তাঁহার অষ্টাঙ্গহৃদয়গ্রন্থে

চরক ও সুশ্রুতগ্রন্থের সারাংশ সংকলন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে চরক ও সুশ্রুত পঠিত না হইয়া তৎপরিবর্তে অষ্টাঙ্গহৃদয়ই পঠিত হয়। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের অরুণ দত্তকৃত টীকা আছে। সূত্রস্থানের হেমাদ্রিকৃত টীকা বিদ্যমান আছে। ইনি "রসরত্নসমুচ্চয়" নামক দ্বিতীয় বাগ্‌ভট্ট গ্রন্থকর্তা হইতে পৃথক্। তিনি ১৩শ কি ১৪শ শতাব্দীর লোক।

মাধবকর।

মাধবকরের **"রুগ্‌বিনিশ্চয়"** বা **"নিদানসংগ্রহ"** অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অদ্যাপিও উহা সযত্নে পঠিত হইয়া থাকে। তিনি চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট হইতে বহু পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবকরকে সপ্তম শতাব্দীর শেষে বা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থাপন করা যাইতে পারে। তাঁহার গ্রন্থ অষ্টম শতাব্দীতে আরবদেশে অনূদিত হইয়াছিল। ইঁহার নিদানই সর্বপ্রাচীন। "নানামুনীনাং বচনৈরিদানীম্" বাক্য হইতেও তাহাই প্রতীয়মান হয়। বিজয় রক্ষিত তাঁহার টীকায় ঐ বাক্যের "ইদানীম্ অস্মাভিরেব প্রাথম্যেন" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজয় রক্ষিত মাধবনিদানের অশ্মরীরোগ পর্যন্ত "ব্যাখ্যা-মধুকোষ" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। প্রমেহ হইতে শেষ পর্যন্ত অংশের টীকা তাঁহার শিষ্য শ্রীকণ্ঠদত্ত প্রণয়ন করিয়াছেন। বিজয় ভাবমিশ্রের পূর্ববর্তী কারণ ভাবমিশ্রের ভাবমিশ্রব্যাখ্যামধুকোষ হইতে বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। বৃন্দ তাঁহার সিদ্ধযোগে "গদবিনিশ্চয়জক্রমেণ" বাক্যদ্বারা মাধবকরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি "রসকৌমুদী" গ্রন্থের রচয়িতা মাধব হইতে পৃথক ব্যক্তি। "রসকৌমুদী" ১৫শ শতাব্দীর গ্রন্থ।

একটি প্রচলিত শ্লোক আছে ঃ—

"নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ সূত্রস্থানে তু বাগ্‌ভটঃ।
শারীরে সুশ্রুতঃ প্রোক্তশ্চরকস্তু চিকিৎসিতে।"

বৃন্দ। ইনি চক্রপাণিদত্তের পূর্ববর্তী ও মাধবকরের পরবর্তী। ইনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি মাধবকরকে অনুসরণ করিয়াছেন। বৃন্দের **"সিদ্ধযোগ"** নামক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। চক্রপাণিদত্ত ঐ সিদ্ধযোগের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃন্দটিপ্পনী নামে সিদ্ধযোগের এক টীকা বিদ্যমান ছিল। তাহা বার্তিকসূত্রের ন্যায় সিদ্ধযোগের অঙ্গীভূত

হইয়া গিয়াছে। ঐ বৃন্দটিপ্পনী চক্রপাণি দত্তের পূর্ববর্তী। কেহ কেহ বলেন বৃন্দটিপ্পনী বৃন্দের স্বরচিত মন্তব্যমাত্র। বৃন্দের সিদ্ধযোগের শ্রীকণ্ঠকৃত "ব্যাখ্যাকুসুমাবলী" নামক টীকা আছে। শ্রীকণ্ঠ বহু আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকার ও টীকাকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বহুশ্রুত টীকাকার দৃষ্ট হয় না। শ্রীকণ্ঠ শিবদাসের পূর্ববর্তী।

চক্রপাণি দত্ত। ইনি খৃষ্টীয় ১০৬০ সালে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি চরক ও সুশ্রুতের টীকাকার এবং প্রসিদ্ধ **চক্রদত্ত** গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি নাগার্জুন ও বৃন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; চরক ও সুশ্রুতকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু তান্ত্রিকমত ও তান্ত্রিক ঔষধও গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি প্রাচীন আয়ুর্বেদ ও তন্ত্রমতের সন্ধিস্থল। চক্রপাণির পিতার নাম নারায়ণ। তিনি গৌড়াধিপ মহীপালের উত্তরাধিকারী নয়পালের পাকশালাধ্যক্ষ ছিলেন। চক্রপাণির অনুজের নাম ভানুদত্ত। চক্রদত্তের জন্মভূমি বীরভূম জেলা। তথায় এখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চক্রপাণীশ্বর শিব বিদ্যমান আছেন। ইনি গৌড়রাজের সভাসদ্ ছিলেন। নিজ পরিচয়ে বলিয়াছেন :—

গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারিপাত্র-
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনুপ্রথিতলোধ্রবলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী॥

তাঁহার "চক্রসংগ্রহ" বৃন্দের সিদ্ধযোগের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৃন্দের পরিবর্তে বঙ্গে চক্রসংগ্রহ ব্যবহৃত হইত। শিবদাস চক্রদত্তের টীকাকার। তিনি শ্রীকণ্ঠ হইতে অর্বাচীন। শিবদাসের পিতার নাম অনন্ত সেন। ইনি গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে তিনি পাবনা জেলার অন্তর্গত মালঞ্চী গ্রামবাসী ছিলেন।

পরবর্তী তান্ত্রিক বৈদ্যক গ্রন্থ

রসহৃদয়—গোবিন্দভাগবতকৃত ১১শ শতাব্দী। কিরাতরাজ্যের (বর্তমান (ভোটান) অধীশ্বরের আদেশে লিখিত। ইনি বৌদ্ধ ছিলেন।

রসরত্নাকর—নিত্যনাথকৃত। ইনি চক্রপাণিদত্ত ও রসেন্দ্রচূড়ামণি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ খৃঃ ১৪শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

রসেন্দ্রচূড়ামণি—সোমদেবকৃত।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—গোপালকৃষ্ণকৃত প্রাচীন রসগ্রন্থ। বঙ্গদেশে এই গ্রন্থ বিশেষ আদৃত।

রসসার—গোবিন্দাচার্যকৃত।

রসরত্নসমুচ্চয়—সোমদেব কৃত। রসেন্দ্রচূড়ামণি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ। ইহা বাগ্‌ভট্টকৃত। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের গ্রন্থকর্তা বাগ্‌ভট্ট হইতে পৃথক্। গ্রন্থকার কিন্তু অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের গ্রন্থকার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে পূব পূব যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম করিয়াছেন তদ্দ্বারা সহজেই অনুমান হয় যে তিনি অষ্টাঙ্গহৃদয়প্রণেতা বাগ্‌ভট্ট হইতে বহু অবাচীন। নিজ গ্রন্থ বাগ্‌ভটের নামসংযোগে চিরস্মরণীয় করিবাব উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন।

"রসরত্নসমুচ্চয়" নাগার্জুনের "বসরত্নাকর" নামক গ্রন্থের ন্যায় কেবল মাত্র রাসায়নিক গ্রন্থ নহে। উহাতে রসায়নশাস্ত্র ও তন্মূলক চিকিৎসাশাস্ত্র এই উভয়ের সমাবেশ আছে। রসায়নদর্শন ও চিকিৎসাতন্ত্র একত্র সমাবেশিত হওয়ায় উহা অতি মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়।

রসেন্দ্রচূড়ামণি—প্রসিদ্ধ রসগ্রন্থ। ভাবসিদ্ধের পূর্ববর্তী। শার্ঙ্গধর ইহা হইতে অনেক ঔষধ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শার্ঙ্গধর—ইনি দামোদরের পুত্র ও রাঘবদেবের পৌত্র। ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বৈদ্যকশাস্ত্র ব্যতীতও শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি নামে একখানি কবিতাসংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন।

বঙ্গসেন—চিকিৎসাসারসংগ্রহের বচয়িতা। বঙ্গদেশবাসী। এই গ্রন্থ অগস্ত্যসংহিতার প্রতিসংস্কারমূলক। তিনি প্রত্যেক রোগের নিদান ও চিকিৎসা লিখিয়াছেন। ভাবমিশ্র বঙ্গসেনের মতোদ্ধার করিয়াছেন।

ভাবপ্রকাশ—ভাবমিশ্র সম্পাদিত। ইনি বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। এই গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগের ও বহু যাবনিক শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে ফিরঙ্গরোগ প্রথমতঃ পতুর্গীজগণের দ্বারা ভারতবর্ষে সংক্রামিত হইয়াছিল।

নিঘণ্টু গ্রন্থ

১। **ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু**—কাশীরাজ ধন্বন্তরি ইহার বক্তা। ধন্বন্তরি-সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও পরবর্তী রচয়িতা ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। নিঘণ্টু মধ্যে উহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ক্ষীরস্বামী ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকে অমরসিংহ অপেক্ষাও প্রাচীন মনে করেন। ষষ্ঠবর্গের শেষভাগে লিখিত আছে—

দ্রব্যাবলিঃ সমাদিষ্টা ধন্বন্তরিমুখোদ্গতা।"

২। **মদনবিনোদ নিঘণ্টু**—রাজা মদনপাল কর্তৃক রচিত অথবা তাঁহার কোনও সভাসদ ভিষক্ কর্তৃক বিরচিত। মদনপাল সহজপালের পুত্র কচ্ছ দেশের রাজা ছিলেন। রচনাকাল ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দ।

৩। **রাজনিঘণ্টু বা অভিধানচূড়ামণি**—"কাশ্মীররাজবংশাচার্য-পরম্পরান্বয়" নবহরি কর্তৃক রচিত। তিনি দ্রব্যের পরিচয় কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র ভাষায় দিয়াছেন—

"ব্যক্তিঃ কৃতাত্র কর্ণাটমহারাষ্ট্র ভাষয়া।
আন্ধ্রলাটাদিভাষাস্তু জ্ঞাতব্যা স্বদ্বয়াশ্রয়াঃ॥"

৪। **দ্রব্যগুণসংগ্রহ**। এই গ্রন্থ চক্রপাণি দত্তকৃত। ইহাতে বিবিধ খাদ্যৌষধ ও কৃতান্নবর্গ প্রভৃতির গুণ সংগৃহীত হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন ভেষজ-দ্রব্যের গুণ ইহাতে বর্ণিত নাই। রাজা যে খাদ্যদ্রব্যের গুণ জিজ্ঞাসা করিতেন তাহারই গুণ সংগ্রহ।

"প্রায়ঃ পৃচ্ছন্তি যত্রেশা তদ্দ্রব্যগুণসংগ্রহঃ।
ধারণস্মরণসুখো যথা স্যাল্লিখ্যতে তথা॥



তৃতীয় খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়

সঙ্গীত শাস্ত্র।

সংস্কৃতে "গীত" শব্দ দ্বারা গান বুঝায় এবং "সঙ্গীত" শব্দ দ্বারা গান, বাদ্য ও নৃত্য বুঝায়।

"গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।"

বৈদিককাল হইতেই গীত, বাদ্য ও নৃত্যের চর্চা আরম্ভ হইয়া উহা বিজ্ঞান-সম্মত শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। কণ্ঠধ্বনি, বর্ণোৎপত্তি, স্বর প্রভৃতির বিভাগ, স্বরগ্রাম, মূর্চ্ছনা ইত্যাদি বৈদিককালেই প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক ওয়েবর বিশ্বাস করেন হিন্দুদিগের ষ, ঋ, গা, ম, প, ধৈ, নি এই সপ্তস্বর ও "গ্রাম" ইউরোপে প্রবর্তিত হইয়াছে। তাল ও লয় যোগে উদাত্তাদি স্বর ক্রমে সামবেদ গীত হইত। সামের অরণ্যগীতিঝঙ্কারে প্রাচীন ভারতের পবিত্র বনস্থলী ও আশ্রম মুখরিত করিত। সামবেদের গেয় অংশের স্বরচিহ্নাদি দ্বারা গীতিশাস্ত্রের পূর্ণতা দৃষ্ট হয়। সামবেদের পাতিশাখ্যে ও নারদীয় শিক্ষায় গেয় গানগুলির স্বরসঞ্চার সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ আছে। সামবেদের সূক্তগুলি ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত হইলেও উহা হৃদয়মুগ্ধকারি তান-লয়-যোগে গীত হইত বলিয়াই উহার প্রাধান্য ভগবদ্‌গীতায় কীর্তিত হইয়াছেঃ "বেদানাং সামবেদোঽস্মি"! বাদ্য ৪ প্রকার। তত, সুষির, অবনদ্ধ, ও ঘন। বেদে তিন শ্রেণীর যন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ঋগ্‌বেদে অবনদ্ধ ও ঘনকে একই শ্রেণী (ঘাতযন্ত্র) ভুক্ত করা হইয়াছে। (১) "তত" অর্থাৎ তন্তু প্রভৃতি নির্মিত তন্ত্রী (তার) বিশিষ্ট বীণা প্রভৃতি যন্ত্র। (২) সুষির, বাঁশ প্রভৃতি বায়ু দ্বারা নিনাদিত যন্ত্র। (৩) চর্মাবনদ্ধ দুন্দুভি প্রভৃতি ঘাতযন্ত্র অর্থাৎ আঘাতদ্বারা যাহার ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘন অর্থাৎ কাংস্য বা লৌহময় বাদ্যযন্ত্র যেমন, ঘণ্টা, নূপুর, করতাল ইত্যাদি। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ২৯ অধ্যায়ে—

"ততং চৈবাবনদ্ধং চ ঘনং সুষিরমেব চ।
চতুর্বিধং তু বিজ্ঞেয়ম্ আতোদ্যং লক্ষণান্বিতং ॥

ততং তন্ত্রীকৃতং জ্ঞেয়ম্ অবনদ্ধং তু পৌষ্করম্।
ঘনং তালস্তু বিজ্ঞেয়ং সুষিরো বংশ এব চ॥

ঐ সকল যন্ত্রাদি যাহারা ব্যবহার করিত তাহাদিগের ব্যবসা পৃথক্ পৃথক্ নামে আখ্যাত হইত। যজুর্বেদে বীণাবাদক, দুন্দুভিবাদক, শঙ্খবাদক (বৈণিক, পাণবিক, দার্দ্দুরিক) প্রভৃতি বিভিন্ন বাদকের ব্যবসার নাম উল্লিখিত আছে। যজুর্বেদে উল্লেখ আছে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শততন্ত্র সংযুক্ত বীণা সৃজন করিয়াছিলেন।

বেদ হইতেই উপবেদের উৎপত্তি। গান্ধর্ববেদই সঙ্গীতের মূলশাস্ত্র "গান্ধর্ববেদশাস্ত্রং ভগবতা ভরতেন প্রণীতম্। তন্ত্রগীতবাদ্যনৃত্যভেদেন বহুবিধোঽর্থঃ"। ঐ গান্ধর্ববেদ অধুনা দুষ্প্রাপ্য। গন্ধর্বেরা ইন্দ্রের অমরাবতী সভায় গায়ক ও বাদক ছিল ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিত। নাট্যগুরু ভরতাচার্যই সর্বপ্রথমে নরলোকে নৃত্যগীতসমন্বিত নাট্যশাস্ত্র প্রচার করেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার প্রচারিত মত বিদ্যমান আছে। সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রধানতঃ চারিটি মত বিদ্যমান ছিল: ঈশ্বর, ভরত, হনূমৎ ও কল্লিনাথ। সোমেশ্বর তাঁহার "রাগবিবোধ" গ্রন্থে চারিটি মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি হনুমন্মতেরই প্রাধান্য কীর্তন করিয়াছেন। উহাই এখন প্রচলিত মত বলিয়া সঙ্গীতাচার্যেরা মনে করেন। হনূমৎকৃত গ্রন্থ সপ্তাধ্যায়ে বিভক্ত ছিল।

সঙ্গীতাচার্যগণের মতে ব্রহ্মা ও সরস্বতীই সঙ্গীত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দেবগণ ও দেবীরাই সম্মিলিত হইয়া সঙ্গীতকলা প্রতিষ্ঠা করেন তাহার ফলে দেবগণ 'রাগ'গুলি ও দেবীগণ "রাগিণী'গুলি নির্ণয় করেন। রাগিণীগুলি রাগগুলির পত্নী অর্থাৎ রাগানুসারিণী। ঐ রাগগুলি শ্রোতার হৃদয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাব ও রসের সৃষ্টি করে। দেশ ও কালভেদে ঐগুলির সম্যক্ বিকাশ হইয়া থাকে। ভরত ও হনুমতের মতে রাগ ছয়টি:— ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ ও মেঘ।

গীতিকাব্যগুলি তানলয়যোগে গীত হইত। বিশেষতঃ রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীনকালে গীত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া লবকুশ দ্বারা অযোধ্যা রাজসভায় গান করাইয়াছিলেন এবং কথিত আছে ভরতাচার্যই উহা সুরলয় সংযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কি সুরলয়ে উহা গীত হইত তাহা জানিবার উপায় নাই। মেঘদূত,

মোহমুদ্গর প্রভৃতি গীতিকাব্য অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীর "গীতগোবিন্দ" সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব গীতিকাব্য। গ্রন্থকার তাহার গীতগুলির তান লয় ও রাগ রাগিণীর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল রাগরাগিণী এখনও বিশুদ্ধভাবে বিদ্যমান আছে কিনা সন্দেহ।

নৃত্য সাধারণতঃ দুই প্রকার। তাণ্ডব ও লাস্য। "তাণ্ডবঞ্চ তথা লাস্যং দ্বিবিধং নৃত্যমুচ্যতে"।

"স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমাখ্যাতং পুংনৃত্যং তাণ্ডবং স্মৃতম্॥

ঐ উভয়বিধ নৃত্যের বহুধা বিভাগ ও প্রকার আছে তাহা উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

সংগীতশাস্ত্রে নারদকৃত **সঙ্গীতমকরন্দ**, **সঙ্গীতসুদর্শন**, কল্লিনাথকৃত **সঙ্গীতরত্নাকর** (১৩শ শতাব্দী) সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কল্লিনাথ লক্ষ্মণাচার্যের পুত্র। সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রন্থ মধ্যে সোমনাথের "**রাগবিবোধ**" ও শার্ঙ্গধরদেবের "**সঙ্গীতরত্নাকর**" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত শুভঙ্করকৃত "**সঙ্গীতদামোদর**" বীরনারায়ণকৃত "**সঙ্গীতনির্ণয়**", পুরুষোত্তমকৃত "**সঙ্গীতনারায়ণ**", শিহ্লনকৃত "**রাগসর্বস্বসার**" ও দামোদরকৃত "**সঙ্গীতদর্পণ**" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে দামোদরকৃত "সঙ্গীতদর্পণ" অতি প্রাঞ্জল গ্রন্থ ও বহু গ্রন্থের সারাংশ অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থকার বলিয়াছেন :—

"সঙ্গীতশাস্ত্রসংক্ষেপঃ সারতোঽয়ং ময়োচ্যতে।
ভরতাদিমতং সর্বমালোড্যাতিপ্রযত্নতঃ॥
শ্রীমদ্দামোদরাখ্যেন সজ্জনানন্দহেতুনা।"

সঙ্গীতচূড়ামণি। চালুক্যবংশীয় নৃপতি প্রতাপচক্রবর্তী জগদেকমল্ল-রচিত। তিনি কল্যাণে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার কাল (১১৩৮—১১৫০ খৃঃ)।

সঙ্গীত রত্নাকর। দেবগিরির রাজা জৌতুগির পুত্র সিংঘনের রাজত্ব-কালে (১২১০—১২৪৭ খৃঃ) সোঢলের পুত্র শার্ঙ্গধরদেব সঙ্গীতরত্নাকর প্রণয়ন করেন।

তৃতীয় খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্র।

বৈদিক যাগযজ্ঞের কাল অবধারণের জন্য বৈদিকযুগ হইতেই জ্যোতিষের এবং যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্য জ্যামিতির চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। গণিত ও বীজগণিত স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে চর্চা হইত না; উহা জ্যোতিষের আনুষঙ্গিক বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রত্যেক বিষয়েরই সিদ্ধান্তগুলি স্বল্পাক্ষর সূত্রে নিবদ্ধ হইত; তাহার প্রমাণ বা ব্যুৎপাদন হইত না। ঐগুলি গুরূপদেশগম্য ছিল। জ্যামিতির সিদ্ধান্তগুলি শুল্বসূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দু জ্যোতিষ, গণিত ও বীজগণিত ও জ্যামিতি স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। গণিত শাস্ত্রে দশমিক এবং শততমিক প্রণালী (একক, দশক, শতক, সহস্রক্রমে পরিগণনা) হিন্দুরাই প্রথমে আবিষ্কার করেন। হিন্দুগণের নিকট হইতে আরবে ও আরব হইতে ইউরোপ খণ্ডে উহা প্রচারিত হয়।

যে শুল্বসূত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ তাহা খৃঃ পূঃ ১০ম হইতে ৮ম শতাব্দীতে রচিত এবং গ্রীকদেশীয় জ্যামিতির পূর্ববর্তী।

ঋগ্‌বেদীয় জ্যোতিষের হস্তলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা অন্ততঃপক্ষে খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া বোধ হয়। তৈত্তিরীয়সংহিতা ও তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে রাশিচক্রের ২৭টি নক্ষত্র ও নক্ষত্রেব নামানুসারে দ্বাদশ মাসের নাম দৃষ্ট হয়। ঋগ্‌বেদেও দ্বাদশমাস ও কোনও কোনও বৎসরে মলমাস (মলিম্লুচ) থাকা দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয়সংহিতা ও তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের ঐ উল্লেখ অন্ততঃপক্ষে খৃঃ পূঃ ২২ হইতে ১৮ শতাব্দীর মধ্যে হওয়া সম্ভবপর। জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনযুগের সিদ্ধান্ত, সংহিতা ও তন্ত্রগুলি লোপ পাইয়াছে। কেবলমাত্র **সূর্যসিদ্ধান্ত** নামক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর পূর্ববর্তী। ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়াই বরাহমিহির পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচনা করিয়াছিলেন।

আর্যভট্ট। আর্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাটলীপুত্রে

অবস্থান করিতেন। পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তন করে এই সত্য তিনিই সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন। তাঁহার কিয়ৎকাল পরেই (৪৮৮ খৃঃ) লল্লাচার্য ঐ মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। আর্যভট্ট যে জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন তাহার নাম **আর্যভটীয়**। উহার তৃতীয় অধ্যায়ে গণিতশাস্ত্রের সূত্রগুলি আছে। তিনি সর্বপ্রথমে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করেন।

বরাহমিহির। কাম্পিল্য অর্থাৎ বর্তমান জলন্ধর জেলার কাল্পী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উজ্জয়িনীতে বাস করিতেন। তিনি **পঞ্চসিদ্ধান্তিকা**, (সিদ্ধান্তজ্যোতিষ) বৃহৎসংহিতা, **বৃহজ্জাতক** এবং **লঘুজাতক** নামক তিনখানি ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার কাল ৫০৫ হইতে ৫৮৭ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার অমররাজ বলেন "বরাহমিহিরাচার্যো নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে (৫০৯) দিবং গতঃ"। তদনুসারে তাঁহার মৃত্যু ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে হয়।

ব্রহ্মগুপ্ত। বর্তমান মুলতান জেলার অন্তঃপাতি ভিল্লমল গ্রামে ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি **ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত** গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থের ১২শ ও ১৩শ অধ্যায়ে গণিতশাস্ত্রের চর্চা আছে। অমররাজ ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীধরাচার্য। ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে **গণিতসার** নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার বীজগণিতের প্রণালীবিশেষ অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুঞ্জল ৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার **"লঘুমানস"** রচনা করিয়াছেন। ১১শ শতাব্দীতে ভোজরাজ **রাজমার্তণ্ড** নামক গ্রন্থ এবং পদ্মনাভ বীজগণিতের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পদ্মনাভের এই গ্রন্থের উল্লেখ ভাস্করাচার্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণিতে করিয়াছেন ;

ভাস্করাচার্য। খৃষ্টীয় ১১১৪ অব্দে বিজাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু-গণিতের মৌলিক গবেষণায় ইনিই শেষ পণ্ডিত। পাশ্চাত্য গণিতের **calculus** নামক প্রণালীর বীজ ইনি স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অভাবের পর ঐ সূক্ষ্মপ্রণালী কেহই অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তিনি ১১৫০ খৃষ্টাব্দে **সিদ্ধান্তশিরোমণি** নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার "লীলাবতী" ও "বীজগণিত" অধ্যায়ে গণিত ও বীজগণিত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি আছে। তিনি নিজেই ঐ গ্রন্থের **বাসনা**

নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। ভাস্করাচার্যের পর জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। ১৩শ শতাব্দী হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত কয়েক খানি প্রক্রিয়া ও সারণী গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কেবল তাহার সাহায্যে জ্যোতিষগণনাদি কার্য হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রক্রিয়াপ্রণালীর ও সারণীর বীজ সুদীর্ঘকাল সংশোধিত না হওয়ায় সিদ্ধান্তজ্যোতিষের গণনা শুদ্ধ হয় না।

১। কবি কালিদাসের নামসংযোগে **জ্যোতির্বিদাভরণ** নামে একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। ঐ গ্রন্থ যদিও কবি কালিদাসের রচনা বলিয়া উল্লেখ আছে তথাপি উহাতে গ্রহাদির সঞ্চারদৃষ্টে বোধ হয় ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই। সম্ভবতঃ অন্য কোনও ব্যক্তি কালিদাসের নাম সংযোগে নিজ গ্রন্থ চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

২। মকরন্দ ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে **মকরন্দ** নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৩। মানরাজ ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে **সিদ্ধান্তসুন্দর** নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৪। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে গণেশ **গ্রহলাঘব** নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৫। রাঘবানন্দ ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে **সিদ্ধান্তরহস্য** নামক সারণী প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাই সিদ্ধান্তজ্যোতিষের শেষ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত।

তৃতীয় খণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

কোশ, অভিধান

বৈদিকযুগে নিঘণ্টু নামক কোশ বিদ্যমান ছিল। উহাতে বৈদিক শব্দগুলির প্রতিশব্দ এবং দুরূহ শব্দগুলির ব্যাখ্যা ছিল। ঐ সকল নিঘণ্টু বিদ্যমান নাই, কেবল যাস্কাচার্যের নিরুক্ত বিদ্যমান আছে। উহার নিঘণ্টুকাণ্ডে একার্থবোধক শব্দগুলির সন্নিবেশ আছে এবং নৈগমকাণ্ডে বৈদিক দুরূহ শব্দগুলির ব্যাখ্যা আছে। কেশব তাঁহার কল্পদ্রুমে প্রাচীন কোশকারগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"কাত্যবাচস্পতি-ব্যাড়িভাগুরামরমঙ্গশাঃ।
সাহসাঙ্কমহেশাদ্যা বিজয়ন্তে জিনান্তিমাঃ॥

কোশগুলির নাম পরিগণনের কয়েকটি শ্লোক আছে। তাহাতে ২৬টি কোশের নাম আছে।

"মেদিন্যমরমালা চ ত্রিকাণ্ডরত্নমালিকা।
রন্তিদেবো ভাগুরিশ্চ ব্যাড়িঃ শব্দার্ণবস্তথা॥
বিরূপশ্চ কলিঙ্গশ্চ রভসঃ পুরুষোত্তমঃ।
দুর্গোঽভিধানমালা চ সংসারবর্ত্ত-শাশ্বতৌ॥
বিশ্বো বোপালিতশ্চৈব বাচস্পতিহলায়ুধৌ।
হারাবলী সাহসাঙ্কো বিক্রমাদিত্য এব চ॥
হেমচন্দ্রশ্চ রুদ্রশ্চাপ্যমরোঽয়ং সনাতনঃ।
এতে কোশাঃ সমাখ্যাতাঃ সংখ্যাঃ ষড়্‌বিংশতিঃ স্মৃতাঃ॥"

লৌকিককোশ মধ্যে শাশ্বতের "অনেকার্থসমুচ্চয়" অমরকোশ অপেক্ষা অর্বাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অমরসিংহ তাঁহার অমরকোশের প্রারম্ভে "সমাহৃত্যান্যতন্ত্রাণি" বাক্যদ্বারা প্রাচীন কোশের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু অমরকোশের কোনও টীকাকার ঐ তন্ত্রগুলির মধ্যে অনেকার্থসমুচ্চয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ শাশ্বতের "অনেকার্থসমুচ্চয়" খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ

শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। অমরকোশ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

ব্যাকরণশাস্ত্রে পাণিনীয় ব্যাকরণের পদবীর ন্যায় কোশগ্রন্থমধ্যে অমরসিংহের "অমরকোশ" শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যসভার একতম রত্ন ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়াছেন। কালিদাসের ন্যায় অমরসিংহের কাল লইয়া গুরুতর বিবাদ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অমরসিংহকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে স্থাপন কবিতে ইচ্ছা করেন। দ্বাদশশতাব্দীতে পুরুষোত্তমদেব অমরকোশের "ত্রিকাণ্ডশেষ" নামে একখানি পবিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন।

অমরকোশ-টীকা।

অমরকোশের প্রচলিত টীকার মধ্যে ক্ষীরস্বামীব টীকাই সর্বপ্রাচীন। এই ক্ষীরস্বামী সম্ভবতঃ ১১শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ক্ষীরস্বামী ভোজরাজ হইতে অবাক্তন। কাবণ তিনি ভোজরাজের সবস্বতীকণ্ঠাভরণ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ গণরত্নমহোদধিরচয়িতা বর্ধমান অপেক্ষা প্রাচীন। গণরত্নমহোদধি ১১৪০ খৃষ্টাব্দে বচিত হইয়াছে। অপর এক শব্দবিদ্য ক্ষীরস্বামীর উল্লেখ রাজতবঙ্গিণীতে আছে। তিনি কাশ্মীববাজ জয়াপীড়ের রাজত্বকালে (৭৭৯-৮১৩) রাজসভায় পণ্ডিত ছিলেন।

"ক্ষীরাভিধাচ্ছব্দবিদ্যোপাধ্যায়াৎ সংভৃতশ্রুতঃ।
বুধৈঃ সহ যযৌ বৃদ্ধিং স জয়াপীড়ঃ পণ্ডিতঃ"

রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৮৮।

পদচন্দ্রিকা। রায়মুকুটমণি বা বৃহস্পতি পদচন্দ্রিকা নামক সুপ্রসিদ্ধ অমরকোশ টীকা ১৩৫৩ শকে অর্থাৎ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। তাঁহার টীকাতে ক্ষীরস্বামী, সুভূতি, হড্ডচন্দ্র, কলিঙ্গ, কোঙ্কট, সর্বধর, ব্যাখ্যামৃত, টীকাসর্বস্ব, মাধবী, মধুমাধবী, সর্বানন্দ, অভিনন্দ, রাজদেব, গোবর্দ্ধন, দ্রবিড়, ভোজরাজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই টীকাতে পাণিনীয় মতানুসারে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ধাতুপ্রত্যয়াদি প্রদত্ত হইয়াছে। রায়মুকুটের পিতার নাম গোবিন্দ, মাতার নাম নীলামুখায়ী। রায়মুকুট গৌড়দেশবাসী ছিলেন এবং

গৌড়রাজ রাজা গণেশের (যদু বা জালালুদ্দিনের) নিকট "বৃহস্পতি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন :—

"পুণ্যাং পণ্ডিতসার্বভৌমপদবীং গৌডাবনীপার্থিবাদ্।
যঃ প্রাপ্তঃ প্রথিতো বৃহস্পতিরিতি ক্ষ্মালোকবাচস্পতিঃ ॥"

ইহা ছাড়াও অন্যান্য টীকা—

(ক) ভট্টক্ষীরস্বামী (একাদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশে)। তিনি রাজশেখরের (৮৮০—৯২০ খৃষ্টাব্দ) উল্লেখ করেন। ভোজরাজকে তিনি (১০১৮—১০৬০ খৃ.) স্মরণ করেন। বর্দ্ধমান গণরত্নমহোদধিতে ভট্ট ক্ষীরস্বামীর উল্লেখ করেন (১১৪০ খৃঃ)। অষ্টম শতাব্দীর ক্ষীরস্বামী হইতে ইনি পৃথক ব্যক্তি। ক্ষীরস্বামী যে পাঠের টীকা করিয়াছেন তাঁহার শ্লোকসংখ্যা অনেক কম।

(খ) সর্বানন্দ বন্দ্যঘটীয় কৃত **টীকাসর্বস্ব** (১১৫৯ খৃঃ)। পিতার নাম আর্তিহরবন্দ্য, মাতা নীলসুখায়ী। ইনি ভাষাবৃত্তির উল্লেখ করেন। পূর্ববর্তী বহু আচার্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

(গ) সুভূতিকৃত **কামধেনু**। সুভূতি বৌদ্ধ ছিলেন। কামধেনু তীব্বতীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে। কামধেনুর নাম দুর্ঘটবৃত্তিতে আছে (১১৭৩ খৃঃ)।

(ঘ) পুরুষোত্তমদেব ভাষাবৃত্তির গ্রন্থকার বৌদ্ধ ছিলেন। সর্বানন্দ ভাষাবৃত্তির উল্লেখ করেন (১১৫৯ খৃঃ)। পুরুষোত্তমদেব অমরকোশের "**ত্রিকাণ্ডশেষ**", "**হারাবলী**", "**বর্ণদেশনা**" রচনা করিয়াছেন।

(ঙ) রায়মুকুট বা বৃহস্পতির "**পদচন্দ্রিকা**" (১৪৩১ খৃঃ) পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পিতার নাম গোবিন্দ, মাতার নাম নীলা সুখায়ী।

(চ) '**ব্যাখ্যাসুধা**" (রামাশ্রমী) ভানুজিদীক্ষিত রচিত। (ভানুজী-দীক্ষিত ভট্টোজিদীক্ষিতের পুত্র)। বাঘেলরাজ কীর্তিসিংহের আদেশমত (সপ্তদশ শতাব্দী) "ব্যাখ্যাসুধা" রচনা করেন। "বাঘেল" বর্তমানে মহীশূর রাজ্য।

(ছ) নারায়ণশর্মন্ (১৬১৯ খৃঃ) "**অমরকোশপঞ্জিকা**" বা "**পদার্থ-কৌমুদী**" রচনা করেন।

(জ) রমানাথবিদ্যাবাচস্পতি (১৬৩৩খৃঃ ?) "**ত্রিকাণ্ডবিবেক**" রচনা করেন।

(ঝ) ভরত মল্লিক—পিতার নাম গৌরাঙ্গ মল্লিক। বোপদেব মতে সপ্তদশ শতাব্দীতে মুগ্ধবোধিনী নামে টীকা রচনা করেন। দুর্গাদাস বহুবার ভরতমল্লিককে স্মরণ করিয়াছেন। দুর্গাদাস (১৬৩৯ খৃঃ) **"কবিকল্পদ্রুম"** রচনা করিয়াছেন। অমরকোশের মহেশ্বরকৃত একখানি টীকা আছে; তাহার নাম "**অমরবিবেক**" (১২শ শতাব্দী)।

(ঞ) মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার (পিতা শিবরাম চক্রবর্তী ও মাতা পার্বতী) ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে "**সারসুন্দরী**" রচনা করেন। সুপদ্ম ব্যাকরণমতে ঐ টীকা রচিত হইয়াছে।

(ট) রাম তর্কবাগীশ কলাপ মতে অমরকোশের টীকা রচনা করেন।

অন্যান্য কোশ।

(১) **শাশ্বত কোশ**—শাশ্বতের "**অনেকার্থসমুচ্চয়**" প্রসিদ্ধ কোশগ্রন্থ। কাল নির্দিষ্টরূপে স্থির হয় নাই। গ্রন্থে বরাহমিহিরের উল্লেখ আছে। তিনি জ্যোতিষী হইলে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্থান পাইতে পারেন। ক্ষীরস্বামী তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে (অমরকোশ প্রসিদ্ধি লাভ করায়) চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় শাশ্বত অমরের পরবর্তী বলিয়া বোধ হয়।

(২) **হলায়ুধ**—ভট্ট হলায়ুধ "**অভিধান-রত্নমালা** রচনা করেন। তিনি দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর। তিনিই '**কবিরহস্য**' তৃতীয় কৃষ্ণরাজের সময়ে রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তিনজন হলায়ুধ আছেন। ইনিই সর্বপ্রাচীন।

(৩) **বৈজয়ন্তী**—যাদবপ্রকাশ (রামানুজের গুরু) দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈজয়ন্তী রচনা করেন। তিনি প্রথমে শঙ্করপন্থী ছিলেন। পরে রামানুজ-মত গ্রহণ করেন। ইহা "ইতি যাদব" নামে উদ্ধৃত হয়।

(৪) **বিশ্বপ্রকাশ**—মহেশ্বর (১১১১ খৃঃ) "বিশ্বপ্রকাশ" রচনা করেন। ইহা "ইতি বিশ্ব" নামে উদ্ধৃত হয়। পিতার নাম শ্রীব্রহ্ম, পিতামহ কৃষ্ণ। সর্বানন্দের কালে বিশ্বপ্রকাশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সর্বানন্দ ও হেমচন্দ্র (১০৮৮—১১৭০ খৃঃ) বিশ্বপ্রকাশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৫) **হেমচন্দ্র** (জৈন ১০৮৮—১১৭৫ খৃঃ)

(১) **অভিধানচিন্তামণি**, (২) **অনেকার্থসংগ্রহ**, (৩) **নিঘণ্টুশেষ**, (৪) **দেশীনামমালা** রচনা করেন।

(৬) **মংখদাস**—মংখ দ্বাদশ শতাব্দীতে "**অনেকার্থকোশ**" রচনা করেন। ইনিই "শ্রীকণ্ঠ চরিত" রচয়িতা। রাজা জয়সিংহের কালে (১১২৮—১১৫০ খৃঃ) তিনি বিদ্যমান ছিলেন। "অনেকার্থ বলিয়া উদ্ধৃত হয়েন।

(৭) **কেশবস্বামী** (দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী)

ইনিই **নানার্থার্ণবসংক্ষেপ**" রচনা করেন। মল্লিনাথ ও অরুণাচল ইতি কেশব" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৮) **মেদিনীকর**—পিতার নাম প্রাণকর (১২০০—১৩০০ খৃঃ) "**নানার্থ-শব্দকোশ**" রচনা করেন। 'ইতি মেদিনী" কথার দ্বারা তাঁহার অভিধান উদ্ধৃত হয়। মেদিনীকে সর্বানন্দ (১১৫৯ খৃঃ) উল্লেখ করিযাছেন। পদ্মনাভ দত্ত (১৩৭৫ খৃঃ) "প্রষাদরাদি বৃত্তিকার" ও গণবৃত্তিকার মেদিনীকে উল্লেখ করিযাছেন। মল্লিনাথও উল্লেখ করিয়াছেন। মংখের টীকাকার মেদিনীর উল্লেখ করেন।

(৯) **পদ্মনাভ দত্ত**—"**ভূরিপ্রয়োগ**" রচয়িতা। তিনিও প্ৰষোদরাদি-বৃত্তি রচয়িতা (১৩৭৫ খৃঃ)

(১০) **কেশব**—(অন্যতর কেশব) "**কল্পদ্রুমকোশ**' রচনা করিয়াছেন (১৬৬০ খৃঃ)।

(১১) **মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার**—(১৬৬৬ খৃঃ) "**শব্দরত্নাবলী**" রচনা করিয়াছেন।

তৃতীয় খণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

শিল্পশাস্ত্র ।

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই প্রতিমাদি নির্মাণ ও প্রতিমাপূজা প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়, কারণ বুদ্ধদেব তাঁহার মূর্তিনির্মাণ ও মূর্তিপূজা নিষেধ করিয়াছিলেন। ঐ নিষেধের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রথমাভ্যুত্থানকালে বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রভৃতি গঠিত হইয়াছিল না। কিন্তু গান্ধারপ্রদেশে গ্রীকদিগের শিল্পকলা প্রচারিত হইবার পর বুদ্ধদেবের ধ্যানস্তিমিত প্রসন্নকান্তিই গান্ধার শিল্পিদিগের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরন্তু বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে মানবহৃদয়ে যে এক বিপুল ভাববন্যা আসিয়াছিল তাহা বুদ্ধদেবের নিষেধক্রমে নাট্যাকারে পরিণত হইতে না পারায়* শিল্পাকারে উহা পরিণত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের জননীর গর্ভসঞ্চারের সময় হইতে বুদ্ধদেবের সমস্ত জীবনী নাটকের দৃশ্যপটে অঙ্কিত না হইয়া মর্মর, কৃষ্ণমর্মর ও অন্যান্য প্রস্তরে ক্ষোদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার ফলে বৌদ্ধশিল্পবিদ্যা ভারতে ও ভারতের সন্নিকটস্থ দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বুদ্ধের মূর্তিতে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বুদ্ধমূর্তির প্রসন্নতা, গম্ভীরতা ও আলোকময় রাজ্যের অস্ফুট-কিরণচ্ছটা জগতের শিল্পকলায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

গুপ্তরাজত্বকালেই ঐ শিল্পবিদ্যার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। সারনাথের, সাঁচির শিল্পকুশলতা ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের চরমোৎকর্ষ প্রমাণ করিতেছে। ঐ কালের শিল্পিগণ কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মের বশীভূত ছিল না। তাহারা হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল তাহাই পাষাণে ফুটাইয়া উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। গুপ্তরাজত্বের অবসানেই ঐ শিল্পের নবীনত্ব তিরোহিত হইয়াছিল এবং প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর অভাব হইয়াছিল। তাহার ফলে শিল্পশাস্ত্র শিল্পপ্রতিভার স্থান অধিকার করিতেছিল। অধিকাংশ শিল্প-শাস্ত্রই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে রচিত। সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের নিয়মানুসারেই ঐ সকল শিল্পশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল।

* বুদ্ধদেব নাট্যাভিনয় নিষেধ করিয়াছিলেন

শিল্পশাস্ত্রকে মুখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; (১) বাস্তুশাস্ত্র (২) শিল্পশাস্ত্র বা মূর্তিগঠন (৩) চিত্রশাস্ত্র।

বাস্তুশাস্ত্র (Architecture)

১। **বাস্তুবিদ্যা**—১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে মুদ্রিত করেন। ঐ শাস্ত্রে বিশ্বকর্মাই শিল্পিগণের দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

২। **মনুষ্যালয়চন্দ্রিকা**—এই গ্রন্থখানিও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় মুদ্রিত করেন। ইহাতে ৭টি অধ্যায় আছে।

৩। **ময়মতম্**—ইহা ময়বিরচিত। গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথমে মুদ্রিত করেন। ইহাতে ৩৪টি অধ্যায় আছে। গ্রাম, নগর, গোপুর মণ্ডল, রাজপ্রাসাদ, লিঙ্গপীঠ ইত্যাদি নির্মাণপ্রণালী ইহাতে আছে।

৪। **শিল্পরত্নম্**—গণপতি শাস্ত্রী প্রকাশিত ১৯২২ খৃঃ। ইহা ২ খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে ৪৬ অধ্যায়ে স্থপতিবিদ্যা ও ২য় খণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ে প্রতিমানির্মাণাদি আছে।

৫। **যুক্তিকল্পতরু**—ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী প্রকাশিত ১৯১৭ খৃঃ। ইহাতে ২৩ অধ্যায়ে বাস্তুনির্মাণাদি আছে।

৬। **বৃহৎসংহিতা**—বরাহমিহির রচিত, ১৩১৭ সালে মুদ্রিত। ইহার ৫৩ অধ্যায়ে বাস্তুবিদ্যা ও ৫৬ অধ্যায়ে প্রাসাদলক্ষণ আছে।

৭। **সমরাঙ্গনসূত্রধার**—ভোজরাজকৃত, গণপতি শাস্ত্রী মুদ্রিত ১৯২৮ খৃঃ। ইহাতে পূর্বাচার্যগণের মতের সারসংগ্রহ আছে। স্থপতিবিদ্যা ও শিল্প শাস্ত্রের যন্ত্রাদি নির্মাণপ্রণালী ইহাতে বর্ণিত আছে।

৮। **বিশ্বকর্মপ্রকাশ**—১৯১৩ খৃঃ বম্বে হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

৯। মৎস্যপুরাণের ২৫২—২৫৭ অধ্যায়ে, অগ্নিপুরাণের ১০৪—১০৬ অধ্যায়ে, গরুড়পুরাণের ৪৬—৪৭ অধ্যায়ে, ভবিষ্যপুরাণে বাস্তুবিদ্যা ও শিল্প-শাস্ত্রের চর্চা আছে।

শিল্পশাস্ত্র

১। **বৃহৎসংহিতা**, ৫৮ অধ্যায়ে প্রতিমালক্ষণ আছে।

২। **শুক্রনীতি**, ৪র্থ অধ্যায়ে প্রতিমার পরিমাপাদি আছে।

৩। **বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ**, ৩য় খণ্ডে বিশেষ বিশেষ দেবমূর্তির বিবরণ আছে।

৪। **মৎস্যপুরাণ**, ২৫৯ অধ্যায়ে দেবমূর্তির বিবরণ আছে।

৫। **অগ্নিপুরাণ**, ৪৯ অধ্যায়ে প্রতিমালক্ষণ আছে।

৬। **কাশ্যপসংহিতা**, প্রতিমালক্ষণ ইহার একটি অংশ।

৭। **ময়বাস্তু**, '১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তেলেগু অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত হয়; প্রকৃতপক্ষে উহার চতুর্থ অধ্যায় বাস্তুশাস্ত্র নহে। উহাতে প্রতিমালক্ষণাদি আছে।

৮। **প্রতিমালক্ষণ**, আত্রেয় রচিত।

চিত্রবিদ্যা।

১। **চিত্রলক্ষণ**, তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ আছে।

২। **বিষ্ণুধর্মোত্তর**, ইহার একটি অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যা আছে; উহার নাম "চিত্রসূত্র"।

৩। শিল্পরত্নের শেষ অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যা আছে।

তৃতীয় খণ্ড

অষ্টম অধ্যায়

ছন্দঃশাস্ত্র।

বৈদিক সাহিত্যে ছন্দেরই প্রাধান্য ছিল। প্রাতিশাখ্যাদিতে ছন্দের বিচার আছে। ছন্দঃসম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে: (১) বৈদিক; (২) লৌকিক।

(ক) বৈদিক ছন্দঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থে বিবৃত আছে।

(১) ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্য, (২) শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র,

(৩) সামবেদীয় নিদানসূত্র, (৪) কাত্যায়নের অনুক্রমণী,

(৫) পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র। ইহার উপর হলায়ুধ একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন।

পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রে বৈদিক ও লৌকিক উভয় ছন্দেরই বিচার আছে। তজ্জন্য অনেকে মনে করেন যে ঐ ছন্দঃসূত্র বৈদিক যুগের অবসানে রচিত হইয়াছে।

(খ) লৌকিক ছন্দঃশাস্ত্র।

(১) কালিদাসকৃত শ্রুতবোধ, (২) ক্ষেমেন্দ্রের সুবৃত্তিতিলক,

(৩) দামোদর মিশ্রকৃত বাণীভূষণ, (৪) গঙ্গাদাসকৃত ছন্দোমঞ্জরী,

(৫) কেদার ভট্টকৃত বৃত্তরত্নাকর, (৬) রামচরণকৃত বৃত্তপ্রত্যয়কৌমুদী,

(৭) রামদয়ালকৃত বৃত্তচন্দ্রিকা।

ছন্দোমঞ্জরী। এই গ্রন্থ গঙ্গাদাসকৃত। তাঁহার পিতার নাম গোপালদাস। মাতার নাম সন্তোষা।* অমরকোশের টীকাকার ক্ষীরস্বামী (১১শ শতাব্দী) ছন্দোমঞ্জরী হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। দিবাকর তাহার বৃত্তরত্নাকরাদর্শে ছন্দোমঞ্জরীর উল্লেখ করিয়াছেন। মল্লিনাথ মাঘকাব্যের সর্বংকষা টীকায় "বৃত্তরত্নাকরটীকায়াং দিবাকরঃ" উল্লেখ করিয়াছেন। জয়দেবের (১৩০০খৃঃ) চন্দ্রালোকে ছন্দোমঞ্জরীর উল্লেখ আছে।

* দেবং প্রণম্য গোপালং বৈদ্যগোপাল দাসজঃ।
সন্তোষাতনয়শ্ছন্দো গঙ্গাদাসস্তনোত্যদঃ॥

তৃতীয় খণ্ড

নবম অধ্যায়

ইতিহাস।

ব্যক্তিগত ইতিহাস সম্বন্ধে হিন্দুগণ চিরকালই উদাসীন ছিলেন। ব্যক্তিগত ইতিহাস না থাকিলেও প্রাচীনকালে ইতিহাস বিদ্যমান ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাস ও পুরাণ দুইটি পৃথক্ অধীতব্য বিদ্যা ছিল। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস সম্ভবতঃ লুপ্ত হইয়াছে। উহার কতকাংশ পুরাণে গৃহীত হওয়া সম্ভব। (পুরাণ দ্রষ্টব্য)।

বর্তমান কালে আমরা ইতিহাস অর্থে যাহা বুঝি সেরূপ ইতিহাস কিয়দংশ পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। রাজবংশ বর্ণন পুরাণের একতম উদ্দেশ্য। প্রচলিত পুরাণগুলিব রাজবংশের বিবরণ তুলনা করিয়া দেখিলে বহু ঐতিহাসিক সত্য নির্ণীত হইতে পারে। কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ পার্জিটার তাঁহাব Dynastics of Kali Age গ্রন্থে কলিযুগের ভবিষ্য বাজগণের বংশাবলী ঐরূপ তুলনামূলক আলোচনায় নির্ণয় করিয়াছেন।

নীলমতপুরাণে বহু রাজবংশের ইতিহাস কীর্তিত হইয়াছে। সোড্ঢল (একাদশ শতাব্দী) তাঁহার উদয়সুন্দরীকথায় কায়স্থশ্রেণীর গঠন সম্বন্ধে ইতিহাস বলিয়াছেন। তিনি অষ্টম শতাব্দী হইতে কায়স্থ শ্রেণীর গঠন প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ক্ষত্রিয় কায়স্থ ছিলেন।

নীলমতপুরাণ রাজতরঙ্গিণী অপেক্ষা বহু প্রাচীন গ্রন্থ। কাশ্মীরদেশে মুসলমান আধিপত্যকালে রাজতরঙ্গিণী রচিত হয়। ব্যক্তিগত ইতিহাস প্রণয়ন মুসলমানদিগের একটি জাতীয় বিশিষ্টতা। মুসলমান রাজগণের সভায় ঐতিহাসিক থাকিতেন। ঐ ঐতিহাসিক রোজনামচার ন্যায় ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতেন। ঐগুলি হইতে মুসলমান রাজত্বকালের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশ্মীরে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে (১১৪৮ হইতে ১১৪৯) শাসনকর্তা জয়নাল আবিদিনের

পৃষ্ঠপোষকতায় কল্‌হন কবি রাজতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে কাশ্মীরের ইতিহাস আছে। উহাতে কাশ্মীরের অতি প্রাচীন রাজবংশের যে বিবরণ আছে তাহা আনুমানিক ও অতিরঞ্জিত। কিন্তু গ্রন্থকার যতই আধুনিক-কালের ইতিহাসে আসিয়াছেন ততই তিনি সত্যের দিকে চলিয়াছেন। জোনরাজ কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণীর সম্পূরক রাজাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি কাশ্মীর বাস্তব্য এবং জয়নাল আবিদিনের কালে বিদ্যমান ছিলেন।

পরিশিষ্ট

(ক) মুসলমান রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা।

১) অমৃতদত্ত সাহাবুদ্দিন ঘোরীর রাজকবি ছিলেন। (১২শ শতাব্দী) নাদির শাহ্ (১২৮২—১৩২০)।

২। ভানুকর শেবশাহ ও নিজামশাহেব সভাপণ্ডিত ছিলেন।

৩। পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল বুল্বন্ খাঁর খান্দেশে রাজত্বকালে "রাগমালা" রচনা করেন (১৬শ শতাব্দী)

৪। হবিনারায়ণ মিশ্র সাজাহানের রাজত্বকালে সভাপণ্ডিত ছিলেন।

৫। সায়েস্তাখাঁর বাজকবি চতুর্ভুজ "রসকল্পদ্রুম" বচনা কবেন (১৬৪৯ খৃঃ)।

৬। চতুর্ভুজ সায়েস্তাখাঁর রাজকবি ১৬৪৯ খৃঃ বসকল্পদ্রুম রচনা করেন।

(খ) সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর কৃতিত্ব

বৈদিক নারী ঋষিগণ অনেক সূক্ত দর্শন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, জুহু, অদিতি, ইন্দ্রাণী, সবমা, বোমশা, লোপামুদ্রা, উর্বশী, যমী, শাশ্বতী, শ্রী, সর্পবাজ্ঞী, বাচ্, মেধা, শ্রদ্ধা, সূর্য্যা, সাবিত্রী, বিশেষ প্রসিদ্ধ।

উপনিষদ্ যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গী, বিশেষ প্রসিদ্ধ। জনৈকা স্ত্রীকবি বাকাটক্ সম্রাটের রাজসভায় "কৌমুদীমহোৎসব"-নামক নাটক রচনা করেন। উহার কাল ৩৪০ খৃঃ বলিয়া অনুমিত হয়। তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যযুগে শীলাভট্টারিকা, বিজ্জলা (বিজ্জা) মারুলা (মৌরিল্যা) মৌরিকা, সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ স্থান পাইয়াছিলেন। শীলাভট্টারিকা ভোজরাজের সমসাময়িকা। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে একটি শ্লোক আছে, তাহাতে স্ত্রীকবিগণের নাম দৃষ্ট হয়।

শীলা বিজ্জা মারুলা মৌরিকাদ্যাঃ
কাব্যং কর্ত্তুং সন্তি বিজ্ঞাঃ স্ত্রিয়োঽপি।

বিদ্যাং বেত্তুং বাদিনো নির্বিজেতুং
বিশ্বং বক্তুং যঃ প্রবীণঃ স বন্দ্যঃ ॥

শাঙ্গর্ধর পদ্ধতি—

'তন্মধ্যে বিজ্জলা শ্যামবর্ণা ছিলেন। তিনি একটি শ্লোকে তাহা গর্বের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

"নীলোৎপলদল-শ্যামাং বিজ্জলাং মাম্ অজানতা।
বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং সর্বশুক্লা সরস্বতী ॥"

ইহাতে মনে হয় ইনি দণ্ডীর পরবর্তী। তাঁহাদের সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। চয়নিকাতে তাঁহাদের রচিত শ্লোক দৃষ্ট হয়।

আধুনিক যুগে বীণা বাই "দ্বারকাপট্টল" রচনা করিয়াছেন। বিশ্বাস দেবী "গঙ্গাবাক্যাবলী", লক্ষ্মী দেবী পায়গুণ্ডা "কালমাধবলক্ষ্মী" (স্মৃতিগ্রন্থ) ও "বালমভট্টি" ব্যাকরণ টীকা, প্রাণমঞ্জরী দেবী "সুদর্শনতন্ত্র" রচনা করিয়াছেন।

তৃতীয় খণ্ড

দশম অধ্যায়

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য

গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর

বৈদিক যাগযজ্ঞের অতিবৃদ্ধিতে ও জীবহত্যায় লোকসাধারণের হৃদয় অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় এবং লোকসাধারণের কোন ধর্মাচরণ প্রচলিত না থাকায় মগধরাজ্যে রাজা বিম্বিসারের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব ও মহাবীর স্বতন্ত্রভাবে লোকসাধারণের জন্য নবীন ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। উভয়ের ধর্মেরই মগধরাজ্যে প্রায় সমসাময়িককালে সূচনা হয়। বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এই উভয় প্রচারকের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। যদিও বৌদ্ধেরা এবং জৈনেরা বুদ্ধদেবকে ও মহাবীরকে আদি প্রচারক বলিয়া স্বীকার করেন না এবং ইতিপূর্বেও বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম প্রচলিত থাকা অঙ্গীকার করেন, তথাপি গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম ও মহাবীর প্রচারিত জৈনধর্ম যে এই যুগেই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় যে গৌতম বুদ্ধের পূর্বে প্রচলিত ছিল তাহা শ্রেষ্ঠীতনয়া বিশাখার ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। বিশাখার বিবাহ দিগম্বর সম্প্রদায়ে নির্গ্রন্থ শাখায় হইয়াছিল! উলঙ্গ জৈন সন্ন্যাসীগণকে উপেক্ষা করায় দণ্ডিতা হয়েন। এই বিশাখা গৌতম বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী স্বকর্ণে শ্রাবস্তীতে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উপকারার্থে তাঁহার বহুমূল্য হীরকহার দান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মহাবীর মগধের অন্তর্গত কুণ্ডপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে পাবাপুরীতে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পরেশনাথ কাশীর রাজা অশ্বসেনের পুত্র ছিলেন। ইনি পরেশনাথ পাহাড়ে দেহ রক্ষা করেন।

গৌতম বুদ্ধ নেপালের পাদদেশে কপিলাবস্তুতে ৬১৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়ায় নিরঞ্জনা নদীতীরে বোধিদ্রুমমূলে তপশ্চরণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং অশীতি বৎসর বয়সে ৫৪৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে

গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কুশীনগর গ্রামে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। উভয় ধর্মই বেদবিরোধীতার জন্য নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হয়। ঈশ্বর অস্বীকার করিলে নাস্তিক হয় না কিন্তু বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিলেই নাস্তিক হয়। তজ্জন্যই বৈদিক ধর্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের শাশ্বতিক বিরোধ। "হস্তিনা পীড্যমানোঽপি ন গচ্ছেদ্ জৈনমন্দিরম্"। এই উভয় ধর্মই নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য ন্যায়শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন ও হিন্দু ন্যায়কে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের ও মহাবীরের নির্বাণকাল অবলম্বন করিয়া পরবর্তী মহাসভার কাল ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের ও মহাবীরের নির্বাণকাল লইয়াই মতপার্থক্য আছে। একথা সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থকারেরা কালনির্দেশপূর্বক গ্রন্থ রচনা করিতেন না। ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ ও আলোকবর্তিকাগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের ও মহাবীরের নির্বাণকাল, কণিষ্কের রাজত্বকাল ও শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবকাল লইয়াই বহু মতভেদ আছে। এ প্রবন্ধে যে কালনির্দেশ করা হইল তাহা আনুমানিক ও আপেক্ষিকমাত্র।

গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের কোনও গ্রন্থ বুদ্ধদেব স্বয়ং রচনা করেন নাই। বুদ্ধদেবের মেধাবী শিষ্যগণ তাঁহার বাণী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর ক্রমাগত তিনটি বৌদ্ধ মহাসভা (সঙ্গীতি) আহূত হয়। এই তিন সভায় বুদ্ধের বাণী, বুদ্ধের মত ও বুদ্ধের আচার ব্যবহার এবং বুদ্ধদর্শন সংগৃহীত হয়। নির্বাণের পরপরই রাজগৃহে বুদ্ধের বাণীসমূহ ত্রিপিটক (১) সুত্তপিটক (২) বিনয়পিটক, (৩) অভিধর্মপিটক নামে সংগৃহীত হয়। পরবর্তী দুইটি মহাসভায় ঐগুলির জঞ্জাল দূরীকৃত ও উহা পরিশোধিত হয়। মূল পিটকগুলি বুদ্ধকথিত মগধের পালিভাষায় রচিত হয়।

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত হয়। (১) হীনযান ও (২) মহাযান। মহাযান সম্ভবতঃ রাজা কণিষ্কের সময় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রাদেশিক হইতে ক্রমশঃ সার্বভৌমিক হওয়ায় শাস্ত্রগ্রন্থাদি পরে সংস্কৃতে রচিত হইতে থাকে এবং তিব্বতের ও চীনদেশের ভাষায় ঐ সকল গ্রন্থের এরূপ আক্ষরিক অনুবাদ হয় যে তাহা হইতে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ সহজেই পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে।

সিংহল হইতে বর্মা, মালয় প্রভৃতি স্থানে ইহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থই প্রধান। ইহা ব্যতীত কাব্য, ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দঃ, কথা, কাহিনী, জাতক, অবদান ইত্যাদি বৌদ্ধমত পুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে রচিত হইয়াছে। তাহাও বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

হীনযান।

প্রাচীন বৌদ্ধপন্থীগণের মত। ত্রিরত্ন অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এবং শীলতা তাহাদিগেব মূল অবলম্বন। শীলতার দ্বারাই ক্রমে অর্হত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। "বোধিচিত্তোৎপাদ", "পাপদেশন", "পুণ্যানুমোদনা, ষট্‌পারমিতা (অর্থাৎ বিশুদ্ধতা) এগুলি অবলম্বন করিলে নিৰাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাযান।

পরবর্তী যুগেব নবীন ভিক্ষুরা "মহাসাংঘিকগণ" শীলতাব উপর তত জোর দেন নাই। বুদ্ধদেবের নির্দেশগুলির সঙ্কীর্ণতা তাঁহাবা সম্পূর্ণরূপে মানিতে চাহেন না। শৃঙ্গের মধ্যে লবণবক্ষণ, মধ্যাহ্নের পব ভোজন, ইত্যাদি নিতান্ত বাধ্যকর নহে। বুদ্ধদেব নিৰাণ লাভ করিলেও এই বিশ্বে তাঁহার শক্তিপুঞ্জ অলক্ষিত ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া কোটী কোটী লোকের হৃদয়ে তাঁহাব মতবাদ কার্য করিতেছে। ইহাই তাঁহার "পবম করুণা"। মহাযানীরা বুদ্ধেব মূর্তি স্থাপন করিয়া তাঁহাব পূজা, সেবা ইত্যাদি করিতে লাগিলেন। তাঁহার "দশভূমির' উপর বৌদ্ধমূর্তি স্থাপন করিলেন। "মহাবস্তুঅবদান" গ্রন্থে এই "দশভূমি"র উল্লেখ আছে। মহাযানীবা কেবল তাঁহাদের নিজের নিৰাণ লাভ চেষ্টা কবিতেন না। সকলেব নিৰাণ বা মুক্তি চাহিতেন। তাঁহারা নিবৃত্তি মার্গ অপেক্ষা কার্য মার্গ প্রবল মনে করিতেন। শুভকার্যে ব্রতী হইলে পাপমার্গ নিজেই নিবৃত্ত হয়। "লঙ্কাবতার সূত্রে" স্থূলভাবে এবং "সৌন্দরানন্দে" বিকশিতভাবে এই মত প্রচারিত হইয়াছে। মহাযানে পূর্বোক্ত "করুণা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "জ্ঞানই" মূল শক্তি, "প্রজ্ঞাপারমিতাই" উন্নতির চরম সীমায় পৌছায়। হীনযানে ভূমিচতুষ্টয়, মহাযানে দশভূমি। মহাযানে পবমার্থ সত্য (শূন্যতা) লাভ করা

আবশ্যক। হীনযানে বিশ্বতত্ত্বের কোন দর্শন নাই। মহাযানে তাহা বহুল পরিমাণে আছে। "তন্‌হা" (তৃষ্ণা) নিবারণই নির্বাণের সেতু। এই তৃষ্ণা নিবারণের দ্বারাই যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই "তৃষ্ণাশূন্যভাব" বা "শূন্যতা"। উহাই শান্ত ও শিব ভাব।

দক্ষিণ ভারতে সিংহল পর্যন্ত হীনযান বৌদ্ধমত বিস্তৃত হইলে সিংহলে তদ্‌দেশীয় ভাষায় গ্রন্থসকল অনুবাদিত হয়।

পরবর্তী বৌদ্ধধর্মে চারিটি মত প্রবল : (১) সৌত্রান্তিক, (২) বৈভাষিক, (৩) মাধ্যমিক, (৪) যোগাচার।

(১) **সৌত্রান্তিক মত**—সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বুদ্ধদেবের প্রচারিত মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত মত। আর্য-স্থবির এই মতের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। কণিষ্কের রাজ্যকালে কাশ্মীর প্রদেশে ধর্মোত্ত নামক স্থবির এই মতের সমর্থক ও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। হিউয়েনসাঙ্‌ বলেন, কুমার-লব্ধ তক্ষশিলায় এই মত প্রথম সংগঠন করেন।

(২) **বৈভাষিক মত**—বিভাষা শব্দের অর্থ বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। বিস্তৃত ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত মতই বৈভাষিক মত। সর্বাস্তিবাদের পরবর্তী নাম "বৈভাষিক"। এই মতে বিশ্বের বহিরাবরণ ও আন্তর সত্তা উভয়ই সত্য।

(৩) **মাধ্যমিকবাদ**—মাধ্যমিক শব্দ "মধ্যম" শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দুইটি মতের মাঝামাঝি অর্থাৎ মধ্যমপন্থা। দুইটি মত (১) বাহ্য বা ব্যবহারিক জগতের আদৌ কোন অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ মনঃকল্পিত। (২) বাহ্য জগৎই মাত্র আছে। আন্তর জগৎ মনঃকল্পিত। এই মতে উভয় জগৎই বিদ্যমান। আর্য নাগার্জুনই এই মতের প্রতিষ্ঠাতা। ("সদ্‌-অসদ্ভ্যাং অনির্বচনীয়ত্বাৎ")।

(৪) **যোগাচার মত**—যোগের আচার অর্থাৎ যোগ-আচরণ দ্বারা, অভ্যাস দ্বারা আত্মশুদ্ধি বা ভূমিলাভ বা উত্তরোত্তর অগ্রগতি। লঙ্কাবতার সূত্রই ইহার প্রধান গ্রন্থ।

বৌদ্ধ ন্যায় ও ধর্মগ্রন্থ

আর্য বসুমিত্র (১ম শতাব্দী)—ইনি রাজা কণিষ্কের আহূত বৌদ্ধ সভায় প্রধান অর্হৎ ছিলেন। বসুমিত্রের গ্রন্থের নাম—

(১) অভিধর্মপ্রকরণপাদ, (২) অভিধর্মধাতুকায়পাদ,
(৩) অষ্টাদশ নিকায়শাস্ত্র, (৪) বোধিসত্ত্ব সঙ্গতি শাস্ত্র।

ভদন্ত ঘোষক (১৫০ খৃঃ)—একই কাল অবিশ্রান্ত আকারে চলিতেছে এই মত তিনি প্রবর্তন করেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রমাগত বীজ বহন করে। অতীতের বীজ বর্তমান, ও বর্তমানের বীজ ভবিষ্যতে চলিয়াছে।

লঙ্কাবতার সূত্র—ইহা নব ধর্মযুগের রচিত মূল্যবান্ সূত্রগ্রন্থ। ইহা তিব্বতীয় ভাষায়, চীন ভাষায় এবং সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যমান আছে। ৪৪৩ খৃষ্টাব্দে চীন ভাষায় গুণভদ্র কর্তৃক অনূদিত হয়। নাগার্জুনের প্রধান শিষ্য আর্যদেব এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে প্রতীতি হয় উহা নাগার্জুনেরও পূর্ববর্তী। লঙ্কাবতার সূত্রই প্রথম বিজ্ঞানবাদের গ্রন্থ। লঙ্কাধিপতি রাবণের সহিত বুদ্ধদেবের ধর্ম ও অধর্মের আলোচনা হয়, সেইজন্য ইহার নাম লঙ্কাবতার সূত্র। সংগ্রহগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। সুবিন্যস্ত নহে।

আর্য নাগার্জুন—মাধ্যমিকবাদের ব্যাখ্যাতা। তিনি বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের ৪০০ বৎসর পর বিদ্যমান থাকা কথিত হয়। তিনি মহাকোশলের অন্তর্গত বিদর্ভে (বর্তমান বেরার) ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণা নদীর তীরে শ্রীপর্বতের গুহাতে বহুদিন তপস্যা করেন। ঐ গুহা নাগার্জুন গুহা নামে প্রসিদ্ধ। অশোকের পৌত্র রাজা দশরথের সময় নাগার্জুন গুহাতে ২টি লিপি ক্ষোদিত হইয়াছিল। তিনি "শরহ" দেবের শিষ্য ছিলেন। এই নাগার্জুনই কবিরাজী শাস্ত্রে "রস" প্রয়োগের প্রবর্তক এবং নালন্দা বিদ্যালয়ের জনৈক পথিকৃৎ। আর্যদেব তাঁহার প্রধান শিষ্য। তিনি মহা-ঐন্দ্রজালিক ছিলেন। তিনি "সাতবাহন" নৃপতিকে লক্ষ্য করিয়া "সুহৃল্লেখা" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু "সাতবাহন" কোনও বিশেষ নৃপতির নাম নহে, উহা অন্ধ্র ভৃত্য রাজবংশের নাম। একাধিক সাতবাহন নৃপতি একই বংশে দক্ষিণ ভারতের প্রতিষ্ঠান পুরীতে বিদ্যমান ছিলেন। হিউয়েনসাঙ্ বলেন অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, আর্যদেব এবং কুমারলব্ধ সমকালীন ছিলেন। কলহন বলেন কাশ্মীর রাজ্যে হুষ্ক, জুষ্ক ও কণিষ্কের কালে নাগার্জুনের মত কাশ্মীর রাজ্যে প্রবল হইয়াছিল। হুষ্ক কণিষ্কের পৌত্র ছিলেন। নাগার্জুনের জীবনী ও আর্যদেবের জীবনী (৪০৫ খৃঃ) কুমারজীব চীন ভাষায় অনুবাদ

করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতে (৭ম শতাব্দী) বাণভট্ট নাগার্জুনের "নাগহার" প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার মাধ্যমিক কারিকার "অকুতোভয়া" নামক টীকা স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। তিনি "মহাযান বিংশ", "যুক্তি-ষষ্টিকা" ও "শূন্যতা-সপ্ততি" রচনা করিয়াছিলেন।

আর্যদেব বা কর্ণরিপ বা নীলনেত্র, দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন ও নাগার্জুনের প্রধান শিষ্য ছিলেন। উত্তর ভারতে বহু প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং নালন্দে অধ্যাপক ছিলেন। তিনি "শতক শাস্ত্র", "চতুঃশতক" ও "ভ্রমপ্রমথনযুক্তিহেতুসিদ্ধি" রচনা করিয়াছিলেন। তিনি লঙ্কাবতার সূত্রের উল্লেখ করেন। কুমারজীব তাঁহার জীবনী চতুর্থ শতাব্দীতে চীনভাষায় অনুবাদ করেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার জীবনকাল তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে অবসান হওয়াই অনুমান করা সঙ্গত।

আর্য অসঙ্গ (৫ম শতাব্দী)

তিনি গান্ধার পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ার) কৌশিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে বৈভাষিক মতাবলম্বী ছিলেন, পরে মহাযান মতে যোগাচারী হইয়াছিলেন। কিছুদিন নালন্দে অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত "মহাযান সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র" ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তিনি কৌশাম্বী, অযোধ্যা সঙ্ঘারামে কতিপয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। হুয়েনসাঙ্ কৌশাম্বীতে ও অযোধ্যায় সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন।

বসুবন্ধু (৫ম শতাব্দী)

বসুবন্ধু পূর্বোক্ত গান্ধার প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৌশিক। আর্য অসঙ্গ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথমে বৈশেষিক মতে ছিলেন, পরে অসঙ্গ তাঁহাকে মহাযানের যোগাচার মতাবলম্বী করিয়াছিলেন। তিনি বহুদিন শঙ্কল, কৌশাম্বী, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার "তর্কশাস্ত্র" প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র গ্রন্থ। সংঘভদ্র তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন।

আচার্য দিঙ্নাগ (৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী)

দিঙ্নাগ দক্ষিণাপথে কাঞ্চীর নিকট সিংহবক্ত্র নামক স্থানে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে নাগদত্ত কর্তৃক হীনযানে দীক্ষিত হন। পরে আচার্য বসুবন্ধু তাঁহাকে মহাযান পথে আনয়ন করেন। দিঙ্নাগ নালন্দা,

উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন এবং প্রবল তর্কশক্তিতে অপরাজেয় হওয়ায় "তর্কপুঙ্গব" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার অন্তর্ধানেও পরবর্তী হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তাঁহার মত খণ্ডন করিতে বহু আয়াস করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর, কুমারিল ভট্ট, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণ তাঁহার মত নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দিঙ্‌নাগের "প্রমাণসমুচ্চয়" কারিকাগুলি বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ। তিনি হিন্দুর ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে সমালোচনা করিয়াছেন। "ন্যায়প্রবেশ" তাঁহার অপর গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ সংস্কৃতে বিদ্যমান আছে। তাঁহার গ্রন্থগুলি পরমার্থ (৪৯৯-৫৪৯ খৃষ্টাব্দে) চীন ভাষায় অনুবাদ করেন।

দিঙ্‌নাগ তর্কপাদকে পাঁচ অংশ হইতে তিন অংশে পরিণত করেন "উপমান" ও "শাস্ত্র" এই দুইটি প্রমাণ নহে বলেন।

আচার্য শীলভদ্র (ষষ্ঠ শতাব্দী)

শীলভদ্র সমতটে (দক্ষিণবঙ্গে) ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মপালের পর শীলভদ্র নালন্দায় অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ইনিই চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্ এর অধ্যাপক (৬৩৫ খ্রীঃ) এবং একজন নৈয়ায়িক।

ধর্মকীর্তি (৬১৫—৬৫০ খ্রীঃ)

ধর্মকীর্তি দক্ষিণ ভারতে চূড়ামণিতে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ চূড়ামণি বর্তমানে ত্রিমলয়ম্ প্রদেশে অবস্থিত। তাঁহার পিতার নাম পরিব্রাজক করুণন্দ। বাল্যকালে হিন্দুশাস্ত্রাদিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। পরে বৌদ্ধ উপাসক হইয়া জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। উত্তরদেশ অর্থাৎ মগধ দেশে আসিয়া নালন্দায় ধর্মপালের সংঘে প্রবেশ করেন এবং ত্রিপিটকে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। প্রবাদ আছে ধর্মকীর্তি পরে দক্ষিণাপথে দীনবেশে ফিরিয়া গিয়া কুমারিল ভট্টের দাসগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া গোপনে কুমারিলের জ্ঞানভাণ্ডার আত্মসাৎ করেন। কুমারিলের জ্ঞান লাভ করিয়া কুমারিল ভট্টের সহিত তর্কযুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। ধর্মকীর্তি নির্গ্রন্থদিগকে (জৈনাচার্য) তর্কে পরাজিত করিয়া দক্ষিণদেশে স্বীয় মত প্রবর্তন করেন। শেষ জীবনে তিনি কলিঙ্গ প্রদেশে মঠ স্থাপন করিয়া তথায় নির্জনে বাস করেন।

হুয়েন্‌-সাঙ্‌ ধর্মকীর্তির নাম উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ তখনও ধর্মকীর্তি প্রতিপত্তি লাভ করেন নাই। কিন্তু ফাহিয়ান তাঁহাকে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বলিয়াছেন (৬৭১—৬৯৫ খৃঃ)। ধর্মকীর্তি হিন্দু নৈয়ায়িক উদ্যোতকরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি দিঙ্‌নাগের মত পরিপুষ্ট করিয়াছেন। মীমাংসক সুরেশ্বরাচার্য ও দিগম্বর জৈনাচার্য বিদ্যানন্দ ধর্মকীর্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণের সংজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

ধর্মকীর্তি রচিত বহু গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে "প্রমাণবার্তিককারিকা", "ন্যায়-বিন্দু" ও "বাদন্যায়" বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রমাণবার্তিকের মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, তিব্বতীয় অনুবাদ আছে। ন্যায়বিন্দুর সংস্কৃত মূল গ্রন্থ বর্তমান আছে। ধর্মকীর্তি রচিত "বৌদ্ধসঙ্গত্যালঙ্কার"ঃ এর উল্লেখ বাসবদত্তায় আছে।

বিনীতদেব (৭ম শতাব্দী)

বিনীতদেব রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্রের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এবং ধর্মকীর্তির গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়বিন্দুর টীকা, হেতুবিন্দু টীকা ও বাদন্যায় ব্যাখ্যা সন্তানার সিদ্ধি টীকা রচনা করেন। ইনিই দিঙ্‌নাগের আলম্বন পরীক্ষার উপরও টীকা রচনা করেন।

চন্দ্রগোমী (৭ম শতাব্দী)

বরেন্দ্রভূমিতে (রাজসাহী জেলা) ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হন। আচার্য স্থিরমতির নিকট অভিধান পিটক অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাধর আচার্য অশোকের নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। রাজা নালেন্দ্রের অবাধ্য হওয়ায় তাঁহাকে সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ভাসিতে ভাসিতে বঙ্গোপসাগর উপকূলে বর্তমান চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। তথায় তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারামূর্তি স্থাপন করেন। তথা হইতে তিনি সিংহলে যান। দক্ষিণভারত হইয়া উত্তরভারতে আসিতে পাণিনি ব্যাকরণের ছায়া চান্দ্রব্যাকরণ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। জৈনাচার্য হেমচন্দ্র চন্দ্রগোমীর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু জয়াদিত্য কাশিকাতে চন্দ্রগোমীর উল্লেখ করেন নাই (৬৬১-৬৬২ খ্রীঃ)। উহাতে বোধ হয় যে চন্দ্রগোমী কাশিকার পরবর্তী। চন্দ্রগোমী "ন্যায়লোকসিদ্ধি" রচনা করিয়াছিলেন।

শান্তরক্ষিত (৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত)

শান্তরক্ষিত বা শান্তিরক্ষিত বঙ্গদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার (জুহোর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোপালের রাজত্বকালে তাঁহার জন্ম হয় (৭০৫ খৃঃ)। তিনি স্বতন্ত্র মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি তিব্বতে গমন করেন এবং তথাতয় দেহরক্ষা করেন। তিব্বতের রাজার আনুকূল্যে (৭৪৯ খৃঃ) ওদন্তপুরের আদর্শে তিব্বতস্থ সমহয়ে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার ছাত্র কমলশীলকে তথায় আহ্বান করেন কিন্তু কমলশীল পৌঁছিবার পূর্বেই ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

তিনি ধর্মকীর্তির বাদন্যায়ের বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "তত্ত্ব-সংগ্রহ" কারিকা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ঐ কারিকাগুলিতে অন্যান্য ধর্ম বা দার্শনিক মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ছাত্র ও টীকাকার কমলশীল ঐ সকল প্রতিপক্ষের ও তর্কিত উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের দর্শনের উল্লেখ নাই। শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার উল্লেখ না থাকায় শঙ্করাচার্য তাঁহার পরবর্তী অর্থাৎ ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই সমর্থিত হয়।

কমলশীল (অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ)

কমলশীল শান্তরক্ষিতের শিষ্য। ইনি নালন্দের অধ্যাপক ছিলেন। "তত্ত্ব-সংগ্রহের" ব্যাখ্যা "তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা" প্রণয়ন করেন। শান্তরক্ষিত যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম করেন নাই এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর মূল গ্রন্থ হইতে তর্কিত অংশ উদ্ধৃত করেন নাই সেখানে কমলশীল প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম ও তর্কিত অংশগুলির উল্লেখ করিয়া বিষয়টির পূর্ণাবয়ব দিয়াছেন। শান্তরক্ষিত তিব্বতে সমইয় নামক স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া তথায় কমলশীলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু কমলশীল তিব্বতে (৭৬৪ খৃঃ) পৌঁছিবার পূর্বেই শান্তরক্ষিত পরলোকগমন করেন। (৭৬২ খৃঃ)

আচার্য জেতারি (৯৩০—৯৯০ খৃঃ)

জাতিতে ব্রাহ্মণ। পিতার নাম গর্ভপাদ। বারেন্দ্রভূমির রাজা সনাতনের কালে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন ও বিক্রমশীলা হইতে "পণ্ডিত" উপাধি প্রাপ্ত হন। দীপঙ্কর শৈশবে তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

দীপঙ্কর ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "হেতুতত্ত্ব উপদেশ" "ধর্ম-ধর্মীবিনিশ্চয়" ও "বালাবতার তর্ক" প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন।

শংকরানন্দ (১০৫০ খৃঃ)

ইনি কাশ্মীরে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্তিকের উপর টীকা রচনা করেন। তাঁহার "অপোহসিদ্ধি" অপোহবাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অপোহবাদ অঙ্গীকার করে যে আমরা কোনো বস্তু বা শ্রেণী বুঝিতে তাহা অন্য কিছু হইতে পৃথক্ ইহা বুঝিয়া থাকি। উপনিষদেব "নেতি", "নেতি" বাদের ছায়া।

সুত্তপিটক

সুত্তপিটক পাঁচ অংশে বিভক্ত।

(১) দীঘনিকায় (২) মজ্ঝমনিকায় (৩) সম্যুত্তানিকায় (৪) অঙ্গুত্তরনিকায় (৫) খুদ্দকনিকায় (শীল)।

সুমঙ্গলবিলাসিনী দীর্ঘনিকায়ের ব্যাখ্যা বুদ্ধঘোষ রচিত।

বৈপুল্যসুত্র

বৈপুল্যসূত্র নানা অংশে বিভক্ত।

(১) অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। (২) সদ্ধর্মপুণ্ডরীকা।
(৩) ললিতবিস্তর। (৪) লঙ্কাবতার সূত্র।
(৫) সুবর্ণপ্রভাস। (৬) গণ্ডব্যূহ।
(৭) তথাগতব্যূহ। (৮) দশভূমীশ্বব।

নিম্নে প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির বিববণ প্রদত্ত হইল।

(১) **মহাবস্তু বা মহাবস্তুঅবদান।**

ইহা হীনযান সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থ। বুদ্ধের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। অদ্ভুত ও আশ্চর্য ঘটনাগুলি পরিত্যক্ত হয়। বুদ্ধেব গৃহত্যাগ, মারের ("কন্দর্পের") সহিত যুদ্ধ, জয়লাভ ও পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্তি ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। জাতক উপাদান ইহাতে নিহিত আছে। জাতকগুলিতে কিছু কিছু উপাদান আছে। পালিভাষার গ্রন্থতে নাই এরূপ বিষয়ও এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। হিন্দুপুরাণও স্থানে স্থানে অবলম্বিত হইয়াছে। থেরাবাদীদের হীনযান মতের পোষক হইলেও মহাযান মতের সমর্থন আছে। এই গ্রন্থের রচনাকাল

নির্ণয় করা কঠিন। ভাষার প্রাচীনতা দৃষ্টে অনুমান হয় ইহাতে প্রাচীন অংশ আছে ও নূতন অংশ সংযোজিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হওয়া সম্ভব। পরে কিছু কিছু সংযোজিত হইয়াছে।

(২) **ললিতবিস্তর।**

মহাযান মার্গের বুদ্ধজীবনীর প্রধান গ্রন্থ। ইহাকে "বৈপুল্য সূত্র" বলিয়া অভিহিত করা হয়। মূলে বোধ হয় হীনযান মতাবলম্বী সর্বাস্তিবাদীগণের মত গৃহীত হইয়াছিল কিন্তু পরে উহা মহাযান মতেরও মুখ্য গ্রন্থ হইয়াছে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব একটি মহৎ "ললিত" অর্থাৎ লীলা। ললিতবিস্তর বুদ্ধদেবের ললিতগুলির সংগ্রহ। বুদ্ধে বিশ্বাস ও ভক্তি বৌদ্ধ ধর্মের-অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমান ললিতবিস্তরের প্রাচীন তিব্বতীয় বা চৈনিক অনুবাদ দৃষ্ট হয় না। বিশ্বস্ত অনুবাদ নবম শতকে হইয়াছিল। অন্য অনুবাদ বর্তমান ললিতবিস্তরের সংস্করণের নহে। গ্রীক ও ভারতীয় বৌদ্ধ স্থাপত্যে যে বুদ্ধলীলা ক্ষোদিত হইয়াছে সেগুলি ভাস্করেরা নিজ নিজ বুদ্ধমূর্তি ও কৌলিক জ্ঞান অনুসারে ও প্রচলিত বৌদ্ধমত অনুসারে করিয়াছে, তদ্বারা তাহাদের ললিতবিস্তরের জ্ঞান প্রকাশ পায় না। বুদ্ধদেব স্বয়ং আদেশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনী নাট্যাকারে পরিণত করা না হয়। ঐ নিষেধের ফলে হৃদয়ের আবেগ প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় প্রস্তরমূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া তাহার বিকাশ হইয়াছে। মূলগ্রন্থের অংশগুলি প্রাচীন কিন্তু তাহার সহিত নূতন অংশ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়াছে।

লঙ্কাবতারসূত্র পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

(৩) **অবদান।**

"জাতকমালা"গুলিকে "বোধিসত্ত্বাবদান মালা" বা "বোধিসত্ত্বাবদান" বলে। বৌদ্ধ আখ্যায়িকাগুলি কতক হীনযান সম্প্রদায় অভিমুখী ও কতকগুলি মহাযান সম্প্রদায় অভিমুখী করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রাচীনগুলি হীনযান ও পরবর্তীগুলি মহাযান সম্প্রদায়ের অভিমুখী। আর্য্যশূরকৃত "জাতকমালা" খ্রীষ্ট চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত এরূপ অনুমান হয়। "অবদান" শব্দের অর্থ "বীরত্বপূর্ণ কার্য" "মহৎ আত্মত্যাগ" বা "আত্মোৎসর্গ"। ঐরূপ কার্যের বিবৃতিকেও অবদান বলে। আত্মোৎসর্গের আখ্যানগুলি অবদান। মানুষকে

আত্মোৎসর্গে প্ররোচিত করিবার জন্য অবদানগুলি রচিত হইয়াছিল। অবদানের নায়ক কোনোও অতীত 'বোধিসত্ত্ব' হইলে তাহাকে "জাতক" বলে।

'অবদান শতক'।

উহা চীনাভাষায় ৩য় শতাব্দীতে অনূদিত হইয়াছিল। অন্ততঃ তাহার একশত বৎসর পূর্বে উহা রচিত হওয়া সম্ভব। সর্বাস্তিগণের অবদানগুলি হীনযান মতের পরিপোষক। বুদ্ধের প্রতি ভক্তি ঐ অবদানগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। উহাতে "বোধিসত্ত্বের" উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অবদান শতকে দশটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে দশটি অবদান আছে। ঐ অবদান-গুলির মূল বিনয়পিটকে অথবা সূত্রপিটকে অঙ্কুররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

দিব্যাবদান।

ইহা অবদান শতকের পরবর্তী গ্রন্থ। মূলে ইহাও হীনযানের সংগঠন। মহাযানের মুখোশ বা আচ্ছাদন দেওয়া হইয়াছে। সরল সুখবোধ সংস্কৃত ভাষায় গল্পগুলি কথিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে গাথাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষা ও ছন্দঃ কাব্যোচিত। দিব্যাবদানের অংশগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত হওয়া সম্ভব। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই অবদানগুলি রচিত হইয়াছে এরূপ অনুমান করা সঙ্গত। ইহার "শার্দূলকর্ণাবদান" ২৬৫ খৃষ্টাব্দে চীন-ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

অবদান কল্পলতা।

কাশ্মীরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র (১০৫২ খৃষ্টাব্দে) "অবদানকল্পলতা" রচনা করিয়াছিলেন। তিনি আরও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সোমেন্দ্র একটি অবদান (১০৮) সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

(৪) **সদ্ধর্মপুণ্ডরীক** (সদ্ধর্মরূপ বিমল পদ্ম)

ইহা মহাযান গ্রন্থ। মহাযান জানিতে হইলে সম্পূর্ণ সদ্ধর্মপুণ্ডরীক অধ্যয়ন করা আবশ্যক। "হীনযান" ক্ষুদ্রযান বা ডিঙ্গিনৌকা একজন দুইজনকে পার করিতে পারে। "মহাযান" বৃহৎযান বা অর্ণবপোত বহুলোক পার করিতে পারে। মহাযানের মূলসূত্র হইতেছে যে বহু লোকের অর্থাৎ জনসমাজের জীব প্রবাহের উদ্ধার করার পথ। কেবল নিজের নির্বাণ লইয়া ব্যস্ত নহে।

জনকল্যাণের দিকে প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানাকারেব মহাযান "সদ্ধর্মপুণ্ডরীক" কোন সময়ে রচিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। গদ্যগুলি অতি সরল বিশুদ্ধ সংস্কৃতে গ্রথিত। গাথাগুলি পালিতে রচিত এবং তাহাও প্রাচীন পালিতে। খোটানে প্রাপ্ত পাঠ হইতে নেপালী পাঠের পার্থক্য আছে। মহাযান মত পূর্ণভাবে পঠিত হইবার পর এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে চীনভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। নাগার্জুন সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের উল্লেখ কবিয়াছেন। তাহাতে ইহা তাঁহাব পূর্বকালের গ্রন্থ। ফাহিয়ানের কালে ইহা অতি সমাদৃত গ্রন্থ। প্রথম শতাব্দীতে কিম্বা তৎপূর্বে রচিত হওয়া সম্ভব।

কারণ্ডব্যূহ।

কারণ্ডব্যূহে "বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বব" মূর্তিমৎ হইয়াছে ও তাঁহাব স্তুতি প্রবল হইয়াছে। অবলোকিতেশ্বব করুণাব সাগর সকল পাপীদেব উদ্ধাবকর্তা। মহাযান মতেব পূর্ণ বিকাশ।

সুখাবতীব্যূহ।

সুখাবতীব্যূহে অমিতাভ মূর্তি পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

(৫) **প্রজ্ঞাপারমিতা** অষ্টসহস্রিকা অর্থাৎ সর্বোচ্চ জ্ঞান প্রজ্ঞাপারমিতা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া লক্ষ শ্লোকাত্মক হইয়াছিল। তাহা পরে সংকুচিত হইয়া অষ্টসহস্র হইয়াছে, এরূপ কেহ কেহ অনুমান কবেন।

বৌদ্ধকাব্য।

অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধচবিত ও সৌন্দবানন্দ কাব্য দ্রষ্টব্য।

অলঙ্কার—বৌদ্ধসঙ্গত্যলঙ্কার দ্রষ্টব্য।

ব্যাকরণ—কাশিকা বৃত্তি ও "কাশিকা ন্যাস" ও "ভাষাবৃত্তি" ব্যাকরণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধশব্দকোশ। "অমবকোশ" দ্রষ্টব্য। "কামধেনু" সুভূতি কৃত। অভিধান দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় খণ্ড

একাদশ অধ্যায়

জৈন সংস্কৃত সাহিত্য

জৈনসাহিত্য, ন্যায় ও আগম

জৈন আচার্যগণ বলেন যে জৈনধর্ম চিরন্তন। কালস্রোতে বহু তীর্থঙ্কর আসিয়াছেন এবং ঐ ধর্মমত উজ্জীবিত করিয়াছেন। মহাবীরের ২৫০ বৎসর পূর্বে পার্শ্বদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাবীর বা বর্দ্ধমান বৈশালীর অন্তর্গত কুণ্ড গ্রামে ৫৯৯ পুঃ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমান মজঃফরপুর জেলায় "ধসাড়" নামক স্থানে প্রাচীন "বৈশালী" নগর অবস্থিত ছিল। বৈশালীর মহানায়ক চেটকের ভগিনী ত্রিশলার গর্ভে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ৫২৭ পুঃ খৃষ্টাব্দে পাবাপুরিতে দেহরক্ষা করেন। তিনি বুদ্ধদেবের সমকালীন ছিলেন এবং উভয়ের সাধনের স্থান একই প্রদেশে। কালক্রমে জৈনধর্মের কঠোরতায় ও বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতাপে জৈনধর্ম ক্রমে সংকুচিত হইয়া বিহারের স্থানে স্থানে, পশ্চিম রাজপুতানায় এবং গুর্জরপ্রদেশে আবদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত ভারতে জৈনচিহ্ন ইত্যাদি বিদ্যমান আছে। জৈনধর্ম কতকাংশে হিন্দুধর্মের সহিত সমত্ব রাখিয়াছে। জাতিভেদ ও হিন্দু আচার-ব্যবহার যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। পুরাণগুলি আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছে। গণেশাদি দেবতার অর্চনা করিয়া থাকে।

জৈনদিগের দুই শাখা: (১) শ্বেতাম্বর (২) দিগম্বর।

শ্বেতাম্বরগণ দিগম্বরগণ হইতে প্রাচীন। সম্ভবতঃ দিগম্বরগণ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দৃঢ় আকারে আবির্ভূত হইয়াছে। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈন উভয় সম্প্রদায়েরই মূল ধর্মসূত্রগুলি একই রূপ। সিদ্ধান্ত বা আগমশাস্ত্র এবং বারটি অঙ্গ। (১) আচারাঙ্গসূত্র (২) সৌত্রকৃতাঙ্গ (৩) স্থানাঙ্গ (৪) সমবায়াঙ্গ (৫) ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি (৬) জ্ঞানধর্মকথা (৭) উপাসকদশা (৮) অন্তকৃদ্দশা (৯) অনুত্তর উপাধিদশা (১০) প্রশ্নব্যাকরণানি (১১) বিপাক-শ্রুতম্ (১২) দৃষ্টিবাদ।

ইহা ব্যতীত কতকগুলি উপাঙ্গ আছে। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম উপাঙ্গগুলি গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা। এই অঙ্গগুলির প্রাচীন ভাষা আর্য বা অর্ধমাগধী। মহাবীর এই মাগধী ভাষাতেই ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবীরের অন্তর্ধানের দুইশত বৎসর পর মগধে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হওয়ায় ও ঐ দুর্ভিক্ষ বার বৎসর চলায় মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময় থেরা ভদ্রবাহু তাঁহার জৈনসম্প্রদায়ের কতক শিষ্যগণকে লইয়া কর্ণাটে গমন করেন। যাঁহাবা মগধে রহিয়া গেলেন তাঁহারা স্থূলভদ্রের পরিচালনায় থাকিলেন। ক্রমশঃ উভয় মতেব পার্থক্য দাঁড়াইল। পাটলীপুত্র নগবে এক মহাসভা আহূত হইয়াছিল। তাহাতে ১১টি অঙ্গ পুনরায় স্থিরীকৃত হইল এবং দ্বাদশ অঙ্গ "চৌদ্দ পূর্ব" দ্বাবা গঠিত হইল। ভদ্রবাহু মগধে ফিরিয়া আসিলে যাঁহারা পূর্বমতেই শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন তাঁহারা শ্বেতাম্বর নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন ও যাঁহাবা উলঙ্গ থাকিতেন এবং স্ত্রী পরিগ্রহ করিতেন না তাঁহারা দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। এই মতপার্থক্য দূরীভূত করিবার জন্য ৫ম শতাব্দীতে গুজরাটের অন্তর্গত বল্লভীপুবে এক মহাসভা আহূত হয়। দ্বাদশঅঙ্গ যাহা পুবে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল। দেবর্দ্ধিক্ষমাশ্রমণ বল্লভীপুরের সভায় সভাপতি ছিলেন। ঐ সভায় যে এগার অঙ্গ গৃহীত হইল তাহাই এক্ষণে প্রচলিত আছে।

ইন্দ্রভূতি গৌতম (৬০৭—৫১৫ পূঃ খৃঃ)

ইনি মহাবীরের জনৈক মুখ্য শিষ্য। তিনি জৈনধর্মেব মূল বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি মগধ রাজ্যের অন্তর্গত গোব্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাব পিতার নাম বসুভূতি ও মাতার নাম পৃথ্বী। বাজগৃহের গুণাভা গ্রামে দেহত্যাগ করেন। ইন্দ্রভূতিব কাল ৬০৭ হইতে ৫১৫ পূঃ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। "দৃষ্টিবাদ" জৈনধর্মের প্রাচীন আগম বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। সম্ভবতঃ ইহাতে ৫টি অধ্যায় ছিল। তাহার প্রথম অধ্যায়ে "ন্যায়" বিষয়ক বিচার ছিল। আচার্য স্থূলভদ্রের কাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। পট্টাবলীর উক্তি অনুসারে তিনি নবম নন্দের মৃত্যুকাল সময় (৩২৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে "দৃষ্টিবাদ" বিলুপ্ত হয়। তজ্জন্যই হিন্দুশাস্ত্র জৈনধর্মকে "নির্গ্রন্থ" বলে।

ভদ্রবাহু (৪৩৩ হইতে ৩৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দ)

শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মতে ভদ্রবাহু ৪৩৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৫৭ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠানপুরে (বর্তমান পৈঠান) বাস করিতেন। কিংবদন্তি আছে তিনি বরাহমিহিরের ভ্রাতা ছিলেন। ভদ্রবাহু "দশ বৈকালিক সূত্র" এর উপর "দশ বৈকালিকনির্যুক্তি" নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। "নির্যুক্তি" অর্থাৎ বিশদ ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। তিনি জৈন "শ্রুতকেবলী" অর্থাৎ দৃষ্টিবাদের "চতুর্দশ পূর্বের" তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি "আবশ্যক সূত্র", "উত্তরধ্যায়নসূত্র" "আচাবাঙ্গসূত্র,' ও "কল্পসূত্রের" ব্যাখ্যা বচনা কবিয়াছিলেন। তিনি জৈন "স্যাদ্বাদের" ব্যাখ্যা তাঁহার "সূত্রকৃতাঙ্গনির্যুক্তি"তে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

উমাস্বামিন্ বা উমাপতি (১ম শতাব্দী)

তাঁহার অপর নাম "বাচকশ্রবণ"। "সর্বদর্শনসংগ্রহ" তাঁহাকে "উমাস্বাতি বাচকাচার্য" বলিয়াছেন। ইনি সাতটি স্কন্ধ বা বিষয় অঙ্গীকার করেন। (১) জীব, (২) অজীব, (৩) আশ্রব, (৪) বন্ধ্য, (৫) সম্বর, (৬) ধ্বংস ও (৭) মোক্ষ। তিনি ন্যগ্রোধিকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম স্বাতি এবং মাতার নাম উমা। তিনি কৌভিসানি গোত্রীয় ও শ্বেতাম্বর জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি ৮৫ খৃষ্টাব্দে নির্বাণ লাভ করেন। তিনি কুসুমপুব বা পাটলীপুত্র নগরে তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রের ব্যাখ্যা রচনা করেন।

সিদ্ধসেন দিবাকর (১ম শতাব্দী খৃষ্টপূর্ব)

জৈনগণ বিশ্বাস করেন সিদ্ধসেন প্রথম শতাব্দী পূব খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্য রাজাকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ বিক্রমাদিত্য ৫ম শতাব্দীতে বর্তমান থাকা সম্ভব। তিনি শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন। সিদ্ধসেন দিবাকর জৈন ন্যায়শাস্ত্রের পূর্ণাবয়ব দিয়াছেন। তাঁহার "ন্যায়াবতার" ৩৬টি কারিকায় ন্যায়গ্রন্থ। তাঁহার "সম্মতিতর্কসূত্র" ন্যায়শাস্ত্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থ। তিনি জীবকে জ্ঞাতা ও প্রকাশক (আত্মন্ ও অনাত্মন্ এর প্রকাশক) অবধারণ করিয়াছেন।

দেবার্দ্ধিগণি

তিনি সর্বপ্রথমে জৈন সম্প্রদায়েব মূল সূত্রগুলি ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের বল্লভীপুবীতে লিপিবদ্ধ কবেন।

সিদ্ধসেন গণি (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

তিনি ভাস্বামীব শিষ্য। ভাস্বামী সিংহসূবির শিষ্য। কথিত আছে সিদ্ধসেনগণি দেবার্দ্ধিগণির সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি মহাবীবেব নির্বাণের ৯৮০ বৎসব পব জীবিত ছিলেন। তিনি উমাস্বাতিব তত্ত্বার্থাভিগম গ্রন্থের টীকা "তত্ত্বার্থ টীকা" বচনা কবিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধসেনদিবাকবকে উল্লেখ কবিয়াছেন।

সামন্তভদ্র (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

সামন্তভদ্র দিগম্বব জৈন সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্য জৈন। উমাস্বাতিব তত্ত্বার্থাভিগম সূত্রেব "গন্ধহস্তীমহাভাষ্য" বচনা কবিয়াছিলেন। ঐ ভাষ্যের সূচনাংশকে "আত্মমীমাংসা" বলে। বাচস্পতি মিশ্র স্যাদ্‌বাদেব আলোচনায় উহা হইতে উদ্ধৃত কবিয়াছেন। সামন্তভদ্রেব টীকা বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র লিখিয়াছেন। কুমাবিলভট্ট তাঁহাব উল্লেখ কবিয়াছেন। কুমাবিল ও ধর্মকীর্তি সমসাময়িক মনে কবিবাব যথেষ্ট কাবণ আছে।

অকলঙ্কদেব কবি (৭ম শতাব্দী)

ইনি দিগম্বব জৈন সামন্তভদ্রেব আপ্তমীমাংসার উপব "অষ্টাশতী" নামক ব্যাখ্যা বচনা কবেন। অকলঙ্কদেবেব অন্য গ্রন্থ "ন্যায়বিনিশ্চয়"। বাষ্ট্রকূট নৃপতি কৃষ্ণবাজেব বাজত্বকালে অকলঙ্কদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাব কাল ৭ম শতাব্দী অনুমিত হয়। মীমাংসক কুমাবিলভট্ট জৈন ধর্মকে ও বৌদ্ধ ধর্মকে, সামন্তভদ্রকে ও অকলঙ্কদেবকে আক্রমণ কবিলে প্রভাচন্দ্র ও বিদ্যানন্দ ঐ আক্রমণ প্রতিবোধ কবেন।

বিদ্যানন্দ (৮ম শতাব্দী)

তিনি পাটলীপুত্রে দিগম্বব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি "পাত্রকেশরীস্বামী" নামেও অভিহিত হন। ইনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনমতের প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও অভিমত আলোচনা করিয়াছেন। "আপ্তমীমাংসা"র "আপ্তমীমাংসালংকৃতি" বা "অষ্টসাহস্রী" নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত

"প্রমাণপরীক্ষা" নামক অন্য একটি ন্যায়গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ববর্তী বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করায় হর্ষচরিতের ন্যায় পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কাল নির্দেশ করা যায়। সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, মীমাংসা, অদ্বৈতবাদ, সৌগত, তথাগত (বৌদ্ধ), দিঙ্‌নাগ, উদ্দ্যোতকর, ধর্মকীর্তি, প্রজ্ঞাকর, ভর্তৃহরি, শবরস্বামী, প্রভাকর ও কুমারিলভট্ট প্রভৃতির নাম করিয়াছেন।

মাণিক্যনন্দী (৭৫০ হইতে ৮০০ খৃঃ)

ইনি দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত। "পরীক্ষামুখসূত্র" নামক ন্যায়গ্রন্থের রচয়িতা। অকলঙ্কদেবের গ্রন্থের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার পরবর্তী। ইহার কাল ৭৫০ হইতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে।

কবি প্রভাচন্দ্র—কবি প্রভাচন্দ্র ভগবান্ উপবর্ষ, ভর্তৃহরি, বাণ শবরস্বামী, প্রভাকর, উদ্দ্যোতকর ও ধর্মকীর্তি প্রভৃতিকে উল্লেখ করিয়াছেন। "পরীক্ষামুখসূত্রের" সর্বপ্রাচীন ব্যাখ্যা "প্রমেয়কমলমার্তণ্ড" কবি প্রভাচন্দ্র লিখিয়াছেন। প্রভাচন্দ্রের কাল ৮০০ হইতে ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা যাইতে পারে।

অভয়দেবসূরি (১০ম শতাব্দী)

ইনি শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন এবং প্রদ্যুম্নসূরির শিষ্য। "বিবাদমহার্ণব" ন্যায় গ্রন্থ রচয়িতা। এতদ্ব্যতিরিক্ত "তত্ত্বার্থবোধবিধায়িনী" নামক "সন্মতিতকসূত্রের" উপর ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। ইনি শান্তিসূরির শিক্ষক ছিলেন। শান্তিসূরি ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

অনন্তবীর্য (একাদশ শতাব্দী)

ইনি দিগম্বর জৈন ছিলেন। মাণিক্যনন্দীর পরীক্ষামুখের উপর "পরীক্ষামুখপঞ্জিকা" বা "প্রমেয়রত্নমালা" রচনা করেন। সর্বদর্শনসংগ্রহে (১৪ শতাব্দী) অনন্তবীর্যের নাম উল্লেখ আছে।

দেবসূরি (একাদশ, দ্বাদশ শতাব্দী)

দেবসূরি শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন। তাঁহার উপাধি "বাদিপ্রবর" ছিল। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের "প্রমাণ-নয়তত্ত্বাবলোকালঙ্কার" ও তাহার উপর স্বীয়

টীকা "সদ্বাদরত্নাকর" রচনা করিযাছিলেন। দিগম্বর জৈনদিগকে তর্কশাস্ত্রে পরাস্ত করিয়া গুজরাটের অনিহিল-বাড়াপত্তনে তাহাদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন (১১২৪ খৃষ্টাব্দ)।

হেমচন্দ্রসূরি (১০৮৮—১১৭২ খৃঃ)

ইহার উপাধি "কলিকালসর্বজ্ঞ" ছিল। আহমদাবাদের অন্তর্গত ধন্ধুক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। দেবচন্দ্রের শিষ্য। চালুক্যরাজ জয়চন্দ্রের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন ও তৎপুত্র মহারাজ কুমারপালের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

(১) কাব্যানুশাসনবৃত্তি,

(২) ছন্দোনুশাসনবৃত্তি,

(৩) অভিধানচিন্তামণি ও নিঘণ্টুশেষ (দেশীনামমালা)

(৪) দ্ব্যাশ্রয় মহাকাব্য,

(৫) প্রমাণ পরীক্ষা,

(৬) পরিশিষ্ট পর্ব।

ইঁহার গ্রন্থ "হৈম" নামে পরিচিত।

হরিভদ্রসূরি (দ্বাদশ শতাব্দী কিন্তু উইনটারনিজের মতে অষ্টম শতাব্দী)

ইনি আনন্দসূরির ছাত্র ও "কলিকাল গৌতম" নামে আখ্যাত। তিনি চিত্রকূটে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই চিত্রকূট চিতোরের সন্নিকটে। তথায় বহু জৈন মন্দিরের চিহ্ন অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়। তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈন ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি "ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়" ও "দশবৈকালিকনির্যুক্তি টীকা" রচনা করিয়াছেন। তিনি যে ষড়্‌দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা (১) বৌদ্ধদর্শন, (২) ন্যায়দর্শন, (৩) সাংখ্যদর্শন, (৪) জৈনদর্শন' (৫) বৈশেষিকদর্শন এবং (৬) জৈমিনীয়দর্শন। কিন্তু বেদান্তদর্শনের নাম দৃষ্ট হয় না।

জৈন কাব্য, মহাকাব্য ও পুরাণ

জৈনগণ হিন্দুশাস্ত্র কতক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং কতক কতক হিন্দুদের দেবদেবী স্বীকার করিয়াছেন। শান্তিসূরি (১০০০ খৃঃ) ও দেবেন্দ্রগণি তাঁহাদের টীকায় বহু হিন্দু কথাকাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন।

কখন কখন হিন্দুকাহিনী প্রায় অনুরূপভাবে গৃহীত হইয়াছে, কখন আবশ্যকমত পরিবর্তিত হইয়াছে। হরিভদ্র,সূরির টীকাতে (দ্বাদশ শতাব্দী) বহু হিন্দু-কাহিনী নিবদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণ, বাসুদেব, রামচন্দ্র ইত্যাদির কথা গৃহীত হইয়াছে। সকলেই শেষে জৈন ধর্ম অবলম্বন করে অর্থাৎ জৈনধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করে। বৌদ্ধধর্মও হিন্দুশাস্ত্র এবং পুরাণের কথাগুলি গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু নামগুলির বিকৃতি ও কোনো কোনো স্থলে সম্বন্ধেরও বিকৃতি এবং বিষয়েব বিকৃতি সম্পাদন করিয়াছে। সে তুলনায় জৈনধর্ম অধিকাংশ স্থলে হিন্দুধর্মেব কথাকাহিনী অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

জিনসেন (৮৮৩ খৃঃ)

হরিবংশপুরাণ ও আদিপুবাণ বচনা কবিয়াছিলেন। সকলকীর্তি ৩৯ অধ্যায়ে "হরিবংশ" রচনা কবিয়াছিলেন। মহাপুবাণ অর্থাৎ "ত্রিষষ্ঠিলক্ষণ মহাপুবাণ" জিনসেন ও গুণভদ্র বচনা করিয়াছেন। শুভচন্দ্র "পাণ্ডবপুবাণ" (জৈন মহাভারত ১০৫১ খৃষ্টাব্দে) বচনা করিয়াছিলেন।

দিগম্ববদিগেব পুরাণগুলির অনুকরণে শ্বেতাম্বরগণ অনেকগুলি "চবিত্র" রচনা কবিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ জিনগণেব চবিত্র তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রেব "৬৩ শলাকাপুরুষে" মহাপুরুষদের বর্ণনা আছে। (১১৬০-১১৭২খৃঃ) উহাব দশম অধ্যায় "মহাবীর চরিত্র" "পবিশিষ্ট" পর্বে স্থবিবাবলী হেমচন্দ্র রচনা কবিয়াছেন। তাহার শেষভাগ প্রদ্যুম্নসূবির বচিত। জিনসেন নবম শতাব্দীতে 'পার্শ্বাভ্যুদয়" রচনা করিয়াছেন। উহা পার্শ্বনাথের চরিত্র। ভবদেবসূরি (১২৫৫ খৃষ্টাব্দে) পার্শ্বনাথ চরিত্র বচনা করিয়াছেন। মেরুতুঙ্গ (১৩০৬ খৃঃ) তাহার প্রবন্ধচিন্তামণি ও রাজশেখর (১৩৪৯ খৃঃ) তাঁহার প্রবন্ধকোশ, বাগ্‌ভট "নেমিনির্বাণ" ১৫ সর্গে দ্বাদশ শতাব্দীতে বাজা জয়সিংহেব কালে মহাকাব্য বচনা কবিয়াছিলেন।

"পার্শ্বাভ্যুদয়" জিনসেনকৃত। কাব্যাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জৈনতীর্থ।

সৌরাষ্ট্রে নৃপতি শিলাদিত্যেব আদেশক্রমে ধনেশ্বর "শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য" বল্লভীতে রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে চৌদ্দটি সর্গ আছে এবং শত্রুঞ্জয়-

পর্বমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। জিনপ্রভাস্থরি (১৩২৬—১৩৩১ খৃঃ) "তীর্থকল্প" রচনা করিয়াছেন। উহাতে জৈন তীর্থস্থানগুলির বর্ণনা আছে।

নাটক।

(১) হেমচন্দ্রের শিষ্য রামচন্দ্র বহু নাটক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে "নির্ভয়-ভীমব্যায়োগ" বিশেষ প্রসিদ্ধ।

(২) সিদ্ধপালের পুত্র বিজয়পাল "দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর" রচনা করিয়াছেন।

(৩) হস্তিমল্ল দাক্ষিণাত্য প্রদেশে (১২৯০ খৃঃ) "বিক্রান্তকৌরব" এবং "মৈথিলকল্যাণ" রচনা করিয়াছেন।

(৪) যশশ্চন্দ্রের "মুদ্রিতকল্যাণ প্রকরণ" উল্লেখযোগ্য নাটক।

স্তব, স্তুতি ও স্তোত্র।

(১) ভদ্রবাহু রচিত "উপসর্গহরস্তোত্র" সর্বপ্রাচীন স্তোত্র। উহা পঞ্চম পূর্বখৃষ্ট শতাব্দীতে রচিত হওয়া সম্ভব। ইহা উভয় সম্প্রদায়ের সম্মানিত স্তোত্র।

(২) "ভক্তামরস্তোত্র" মানতুঙ্গ রচিত। উহা জিনঋষভের স্তুতি। সম্ভবতঃ খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত।

(৩) সিদ্ধসেনদিবাকর খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে "কল্যাণমন্দির স্তোত্র" রচনা করিয়াছেন। উহা পার্শ্বনাথের স্তোত্র। উহা সংস্কৃত ভাষায় অতি আদরণীয় স্তোত্র।

(৪) শোভন রচিত (নবম শতাব্দী) "শোভনস্তুতি" অলঙ্কার ও কাব্যাংশে অতি প্রশস্ত স্তুতি।

(৫) হেমচন্দ্র (১০৮৮—১১৭২ খৃঃ) "বীতরাগস্তোত্র" ও "মহাবীরস্তোত্র" রচনা করিয়াছেন।

সুভাষিতাবলি।

দিগম্বর কবি অমিতগতি "সুভাষিতরত্নসন্দোহ" (৯৯৪ খৃঃ) রচনা করিয়াছেন। তাহার "ধর্মপরীক্ষা" (১০১৪ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। তিনি "যোগসারে" হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ করিয়াছেন। সোমদেব (৯৫৯ খৃষ্টাব্দে) "যশস্তিলক" রচনা করিয়াছেন। উহা জৈন ধর্ম গ্রন্থ এবং জৈনমতের প্রশংসা উহাতে আছে। ধারাধিপতির কালে (৯৭০ খৃষ্টাব্দে) ধনপাল

"ঋষভপঞ্চশিকা" রচনা করিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীতে উদয়দেব বাদীভ-সিংহ "গদ্যচিন্তামণি" রচনা করিয়াছেন।

ধর্মকথা (Religious Novel)

(১) "তরঙ্গবতী" পদলিপ্তসূরি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে রচনা করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। খণ্ডিতভাবে অংশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

(২) "উপমিতি ভবপ্রপঞ্চকথা" ৯০৬ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধর্ষি রচনা করিয়াছেন।

(৩) "মলয়সুন্দরীকথা" এক অদ্ভুত কাহিনী। গ্রন্থকারের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ঘটনাসন্নিবেশ অতি চমৎকার। রাজপুত্র মহাবল ও রাজদুহিতা মলয়সুন্দরীর মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন, অবশেষে তাহাদিগের সন্ন্যাসগ্রহণ বর্ণিত আছে। জৈন সাহিত্যে এই কাহিনীটি খুব সমাদৃত।

তৃতীয় খণ্ড

দ্বাদশ অধ্যায়

সংস্কৃত-সাহিত্য (প্রাচ্যে প্রতীচ্যে)

আর্যসভ্যতা পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে ক্রমে পূর্বাভিমুখে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রাচীনকাল হইতেই গান্ধার ও হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর-পশ্চিম দিগস্থ প্রদেশ প্রাচীন ভারতের একাংশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ব্যাক্‌ট্রিয়া, সক্‌ডিয়ানা ও তাতার প্রদেশে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। খৃঃ পূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে ফিনিসিয়ান্‌ বা সেমেটীক্‌ জাতির সহিত যে ভারতের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সম্ভবতঃ এই সংশ্রবেই ভারতীয় একশ্রেণীর প্রাচীন লিপিতে ফিনিসিয়ান্‌দিগের কৌণিক লিপির চিহ্ন রহিয়া গিয়াছিল। ভারতীয় খরোষ্টি লিপি প্রাচীন ফিনিসিয়ানদিগেব কৌণিক লিপির ছায়া বহন করিত। উহা আরব্য প্রভৃতি ভাষাব ন্যায় দক্ষিণদিক্‌ হইতে বামদিকে লিখিত হইত।

ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তদেশের গিরিসঙ্কট (খাইবার পাস্‌) ভারতের প্রবেশদ্বার ছিল। ঐ গিরিবর্ত্ম দ্বারাই আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এবং বৈদেশিক আক্রমণগুলিও ঐ পথ দ্বারাই হইয়াছিল। পারস্যদেশ প্রাচীন ভারতের সংলগ্ন থাকায় সর্বপ্রথমেই পারস্যরাজগণের সহিত ভারতের সংঘর্ষ হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িককালে পারস্যরাজ দেরায়ুস ৫২২-৪৮৩ পূর্ব খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন। তাঁহার পুত্র জরাক্‌সিস ৪৮৬—৪৬৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করেন। এই উভয় আক্রমণকালে পারস্য সৈন্যবাহিনীতে গান্ধার ও ভারতীয় সৈন্য থাকা প্রমাণিত হয়। ঐ আক্রমণের ফলে উত্তরপশ্চিম প্রান্তের কতকাংশ পারস্যশাসনভুক্ত হয়। তাহার ফলে পারস্যের সহিত আদানপ্রদান সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ স্থায়ী ফল দৃষ্ট হয় না।

খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মহাবীর আলেকজাণ্ডার (৩৩৬—৩২৩ খৃঃ পূঃ) ভারত আক্রমণ করেন। ঐ আক্রমণের ফলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গ্রীক্‌রাজত্ব

প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং আলেকজাণ্ডারের অভাবের পরও গ্রীক্ সামন্তগণ ও গ্রীক রাজপ্রতিনিধি ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীস্‌দেশই ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি। গ্রীক আক্রমণের ফলে গ্রীসের সহিত ভারতীয় সভ্যতার বহু বিনিময় হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান. শুল্বসূত্র ও জ্যোতিষ গ্রীকৃগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীযুগে গ্রীক্‌দর্শন ও জ্যোতিষ যে উন্নতিসাধন করিয়াছিল তাহাও ভারত সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। গ্রীকৃগণের স্থপতিবিদ্যা ও ভাস্করশিল্প ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধযুগের মধ্যভাগে গ্রীক্ স্থপতিবিদ্যা ও কলানৈপুণ্যের সংমিশ্রণে ভারতীয় শিল্পবিদ্যা মনোহর কান্তি ধারণ করিয়াছিল।

বুদ্ধাবতারে যে নূতন ধর্মবন্যা ভারতে আসিয়াছিল তাহা ভারতের বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া সমস্ত এসিয়ায় বিস্তৃত হইয়াছিল। পশ্চিমে তাতার, খোটান, সকডিয়ানা, দক্ষিণে সিংহল, উত্তর-পূব দিকে চীন, মহাচীন (তিব্বত) ও পূর্বদিকে সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ এবং জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রায় ১০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রথম প্রচারিত হয়। কিন্তু রক্ষণশীল চীনগণ সহজেই এই নবীন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল না। উহার প্রায় ২০০ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই সময়েই কুশানবংশীয় রাজা কণিষ্ক তক্ষশীলার সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। ঐ কুশানগণ হুন ও সকডিয়ান জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছিল ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। কণিষ্কের উদারনীতি ও সহনশীলতায় ধর্মজগতে এক নবীনতার আবির্ভাব হইয়াছিল। হীনযানের স্থানে মহাযান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি শাস্ত্র পুনঃসংস্কৃত হইতেছিল। তৎকাল হইতেই ভারতীয় প্রচারকগণ চীনদেশে গমন করিতে আরম্ভ করেন এবং চীনদেশ হইতেই ধর্মপ্রাণ মহাত্মাগণ বুদ্ধদেবের লীলাভূমি পরিদর্শন করিতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল দেশপরিভ্রমণ ও বুদ্ধদেবের লীলাস্থল দেখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা ভারতে বহুদিন বাস করিয়া, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া তক্ষশীলা, নালন্দা, বলভী, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, ও বাকলাচন্দ্রদী প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট দর্শন ও বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদি নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরবর্তী পরিব্রাজকগণের মধ্যে ইৎসিং, হুয়েনসাঙ্,

ও ফাহিয়েনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল পরিব্রাজকগণ বহু ধর্মগ্রন্থ ও দর্শনগ্রন্থ চীনদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে ভারতীয় বৌদ্ধ-পরিব্রাজক ও শিক্ষকগণ চীনদেশে বহু গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুমারজীব, গুণধর্ম, গুণবৃদ্ধ ও অমোঘবর্ষের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৩০০০/৪০০০ সংস্কৃত ওপালিগ্রন্থ চীন ভাষায় বিশুদ্ধ রূপে অনূদিত হইয়াছিল। অদ্যাপি তাহার অধিকাংশ চীন ও তিব্বতে বিদ্যমান আছে। ঐ সকল মহামূল্য গ্রন্থের মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলি অধিকাংশই ভারতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু চীন ও তিব্বতে এরূপ বিশুদ্ধ অনুবাদ বিদ্যমান আছে যে উহা হইতে সংস্কৃতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তথায় বহু সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ নীত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি সিংহলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হইয়া থাকে।

ভারতের সহিত সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্য থাকায় আনাম, শ্রীবিজয়, কম্বোজ, চম্পা, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলিদ্বীপে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানে অদ্যাপি তাহার নিদর্শন ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি বিদ্যমান আছে। বহু সংস্কৃত শীলালিপি, হিন্দু মন্দির ও দেবতামূর্তি অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। পারস্য ও আরবজাতির অভ্যুত্থানকালে আরবদেশ, ভারত হইতে সংস্কৃত কাহিনী, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ গ্রহণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে খসরু, আনুশীর্বাণের আদেশে বারজোই সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলি পহ্লবীভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে ঐ পহ্লবী অনুবাদ হইতে আরব্য ভাষায় প্রচলিত হইয়াছিল এবং তাহা কালক্রমে অনুবাদ পরম্পরায় প্রায় সমস্ত ইউরোপে কোনও না কোনও আকারে প্রবেশ করিয়াছিল।

৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে আরবগণ হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল। পাটীগণিতের দশকক্রম প্রণালী ভারত হইতে আরব, ও আরব হইতে ইউরোপ গ্রহণ করিয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের খালিফাগণ চরক ও সুশ্রুত আরব্যভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং ১০ম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক আল্‌রাজী চরক ও সুশ্রুতকে চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রধান গ্রন্থ বলিয়া সসম্মানে উল্লেখ করিয়াছেন। এই চিকিৎসাশাস্ত্র ক্রমে আরব হইতে ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছিল।

মুসলমান রাজত্বকালেও বহু বাদশাহ ও সাহিত্যানুরাগী সহৃদয় মুসলমানগণ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চার সহায়তা করিয়াছেন। ১২শ শতাব্দীতে সাহাবুদ্দিন ঘোরীর রাজত্বকালে অমৃত দত্ত তাঁহার রাজকবি ছিলেন। মুসলমান শাসনকর্তা সুলতান জয়নাল আব্‌দিনের শাসনকালে কাশ্মীরে কল্‌হনকবি ঐ শাসনকর্তার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন এবং ঐ শাসনকালেই মহাভারতের কিয়দংশ পারস্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ঐ অনুবাদই আকবরের রাজত্বকালে সংশোধিত হইয়া পুনঃপ্রচারিত হয়।

ফেরোজশাহ তোগলক কাঙ্গরা উপত্যকা বিজয়ের পর জ্বালামুখীর পুস্তকাগারের বহু প্রামাণিক জ্যোতিষ গ্রন্থ মৌলানা আজিজ উদ্দিনের দ্বারা পারস্যভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের নাম "ফিরোজশাহী"।

লোদীবংশীয় লাটাখাঁর শাসনকালে কল্যাণমল্ল (১৪৮৮—১৫১৭ খৃঃ) লাটাখাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় "অনঙ্গরঙ্গ" নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

বঙ্গের শাসনকর্তা জালালউদ্দিন মহম্মদের শাসনকালে (১৪১৪—১৪৩১ খৃঃ) তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় রায়মুকুট (বৃহস্পতি) অমরকোষের বিখ্যাত "পদচন্দ্রিকা" নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ১৫শ শতাব্দীতে গায়সউদ্দিন খিলজির মন্ত্রী পুঞ্জরাজ সারস্বতব্যাকরণের টীকা প্রণয়ন করেন।

আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে তাঁহার আদেশে ফৈজী হিন্দু নাম ধারণ করতঃ সংস্কৃত ভাষায় ও হিন্দুশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁহার সাহায্যে আকবর বাদশাহ উপনিষৎ প্রভৃতি পারস্য ভাষায় অনুবাদিত করেন! ফৈজী ব্যতীত গোলাম আলী আজাদ ও আব্দুল জলীল প্রভৃতি আকবরের সভায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আকবরের আদেশক্রমে ফৈজী "লীলাবতী"র অনুবাদ করিয়াছেন এবং হিমামুদ্দীন রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদ করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের সভা-পণ্ডিত মোল্লামাসী বাদশাহের আদেশ অনুসারে রামায়ণ পারস্য ভাষায় অনূদিত করেন।

সাজাহান বাদশাহের সভায় প্রসিদ্ধ জগন্নাথকবি সভাসদ্‌ ছিলেন ও হরিনারায়ণ মিশ্র তাঁহার সভাপতি ছিলেন। জগন্নাথ কবি ঐ সভাতেই প্রথম জীবনে "ভামিনীবিলাস", "রসগঙ্গাধর" প্রভৃতি রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

সাজাহানের পুত্র দারাশিকো সংস্কৃত দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কথিত আছে তিনি হিন্দু দর্শনে অনুরক্ত হইয়া মুসলমান ধর্মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এজন্য রাজাজ্ঞাক্রমে তাঁহার শিরচ্ছেদ হইয়াছিল (১৬৫৯ খৃঃ)। শায়েস্তা খাঁর শাসনকালে চতুর্ভুজ রাজকবি ছিলেন। তিনিই ১৬৪৯ খৃঃ "রসকল্পদ্রুম" রচনা করেন।

ইংল্যাণ্ডের সহিত ভারতের সংশ্রবেই ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে মুখ্যভাবে ইউরোপে সংস্কৃতসাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয়। সার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬—১৭৯৪ খৃঃ) প্রথমে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া উহার বিস্তীর্ণতা ও মাহাত্ম্য সম্যক্ প্রণিধান করিয়া ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে এশিয়াটিক সোসাইটী স্থাপন করেন। চার্লস্ উইলকিন্স ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভগবদ্গীতার ও ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে হিতোপদেশের অনুবাদ করেন এবং সাব উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে শকুন্তলার ও পরে মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনিই সবপ্রথমে কালিদাসের ঋতু-সংহাব সংস্কৃত অক্ষরে (১৭৯২ খৃঃ) মুদ্রিত করেন।

ইঁহাদের সমসাময়িক সুপণ্ডিত টমাস কোলব্রুক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যকালে সংস্কৃতসাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বঙ্গদেশে বাসকালে সংস্কৃতভাষার চর্চাকল্পে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গভীর গবেষণা ছিল। তাঁহার প্রবন্ধগুলি এখনও সাহিত্যিকগণ সযত্নে পাঠ করিয়া থাকেন। তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ, বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ ও অমরকোষ অভিধান ইংরাজী টিপ্পনীসহ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়গণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে বেদ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রচার করেন।

এই সময়ে আলেকজেণ্ডার হ্যামিল্টন (১৭৬৫—১৮২৪ খৃঃ) ভারতবর্ষে অবস্থানকালে সংস্কৃতসাহিত্যে অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ভারত হইতে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তনকালে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত ছিল। উহাব ফলে তিনি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবরুদ্ধ হয়েন। সুদীর্ঘকাল তথায় অবরুদ্ধ থাকা কালে তিনি কতিপয় ফরাসী ছাত্র ও প্রসিদ্ধ জার্মাণ কবি ফ্রেডারিক শ্লেগেলকে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দেন।

ভগবানের প্রেরিত কোনও কোনও আকস্মিক দুঃখও ভবিষ্যদ্‌মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।* এই দুঃখময় কারাগারই ইউরোপে সংস্কৃতচর্চার বিদ্যাপীঠ হইয়াছিল। ঐ শিক্ষার ফলস্বরূপ শ্লেগেল ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার On the Language and Wisdom of the Indians প্রচার করেন। ঐ গ্রন্থ প্রচারের পর ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এক হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঞ্জ বপ্ প্রাচ্য ভাষাগুলির সহিত প্রতীচ্য ভাষাগুলির তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বগ্রন্থ প্রচার করেন। তাহার ফলে জার্মাণীতে সংস্কৃত-চর্চা প্রবলবেগে আরম্ভ হইল।

জার্মাণ-পণ্ডিত রোসেন ভারতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্‌বেদের প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে উহার প্রথম অষ্টক মুদ্রণ আরম্ভ করেন কিন্তু ঐ মুদ্রণকার্য শেষ হইবার পুর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার ঐ গ্রন্থ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়। ইহার পরই রোট্ (১৮২১—১৮৯৫ খৃঃ) ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ On the Literature and History of the Veda প্রচার করেন। তাহার ফলে জার্মাণীতে সংস্কৃতের বিপুল চর্চা আরম্ভ হয়। ইংল্যাণ্ডে ম্যাক্সমুলার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঋগ্‌বেদ ও ১৮৯০—৯২ খৃষ্টাব্দে সায়নভাষ্য সহিত সমগ্র ঋগ্‌বেদ মুদ্রিত করেন।

বৈদিক ও লৌকিক সম্পূর্ণ সংস্কৃত সাহিত্যের সকল বিষয়ের অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি বিশ্বকোষ রচনা বুলার আরম্ভ করেন। উহা সংগ্রহের ভার ইউরোপের প্রায় ৩০ জন পণ্ডিতের উপর ন্যস্ত হয়। ১৮৯৮ সালে বুলারের মৃত্যুর পর অধ্যাপক কীলহর্ণ তাহা প্রকাশ করিতেছেন।

বটলিঙ্ক, অফ্রেক্‌ট, ওয়েবার, পিশেল, গেল্ডনার, গ্র্যাসম্যান, ওয়ার্কেজ্রেল, বার্ণেল, কুন্ প্রভৃতি অধ্যাপকগণ সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষণায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ষ্টেন কনো, সিলভেন্ লেভি, জেকবি, ডয়সন্, উ ইণ্টারনিস্ প্রভৃতি অধ্যাপকগণ ঐ জ্ঞানতন্তু অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন।

* ভারতে বালগঙ্গাধর তিলক কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া তাঁহার Orion, Arctic Home ও "গীতারহস্য" লিখিয়াছেন এবং অটো শ্রেডার জার্মাণ যুদ্ধকালে আবদ্ধ হইয়া অহির্বুধ্ন্যসংহিতা প্রচার করিয়াছেন।

ইংল্যাণ্ডে ম্যাক্সমূলার, গোল্ডষ্টুকর, গ্রিফিথ, ব্যালেন্টাইন্, ম্যাক্‌ডোনেল, কীথ প্রভৃতির প্রচারকার্য সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা সুগম করিয়াছে। দেশীয় আচার্যগণের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভাণ্ডারকর, বালগঙ্গাধর তিলক, কুন্তে, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যব্রত সামশ্রমী, বেলভালকর, কানে, গঙ্গানাথ ঝা প্রভৃতির গবেষণা ও প্রচারকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ বিভাগের চর্চা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। তদ্দারা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস গঠনের বিশুদ্ধ উপাদান সংগৃহীত হইতেছে।

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

(এই গ্রন্থে যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে।)

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

Rapson, Ancient India, Combridge, 1914.

,, Cambridge History of India. Ancient India. Vol. I. 1922.

D. R. Bhandarkar, Lectures on Ancient History.

R. G. Bhandarkar, Early History of the Deccan.

Gopal Aiyar. Chronology of Ancient India.

V. A. Smith, Early History of India.

,, Oxford History of India.

Nandalal Dey. Civilisation in Ancient India, 1903.

R. C Dutt. A History of Civilisation in Ancient India. 1899.

Krishnaswami Ayangar, Ancient India. 1911.

Cunningham. Ancient Geography of India.

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।

A. A. Macdonell, Sanskrit Literature, 1900.

Maxmuller, History of Ancient Sanskrit Literature, 1860

,, India, what it can teach us.

Weber. Indian Literature. 1882.

Winternitz. Geschichteder Indischen Literature Vol. I.

,, Some Problems of Indian Literature.

A. B. Keith, Classical Sanskrit Literature.

,, ,, Sanskrlt Drama.

রমেশচন্দ্র দত্ত, হিন্দুশাস্ত্র ১ম খণ্ড।

Antiquities of India. L. D, Barnett.

Duff's Chronology of Ancient India.
Gaikwad Oriental Series No. XXVI Natya Sastra.
R. G. Bhandarkar. Report of Search of Sanskrit Manuscripts, 1883—1884
Mm. Haraprasad Shastri, Magadhan Literature.
,, A Bird's eye View of Sanskrit Literature
Mm. Kuppaswami Sastri, Introduction to Ascharyachudamini.
P. C. Roy. History of Hindu Chemistry
রামদাস সেন, ঐতিহাসিক রহস্য।
Sylvain Levi. The Theatre Indian, Paris. 1890

বৈদিক যুগ।

A. A. Macdonell, Vedic Mythology.
Macdonell and Keith, Vedic Index
H. Winkler, Boghazkoi Inscription.
P Mitra, Prehistoric India, Chapter XII
Oldenberg, Ancient India, 1898.
Bloomfield, Religion of the Veda.
Das, Rigvedic India.
Bala Gangadhar Tilak, The Orion.
,, ,, ,, Arctic Home.

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ।

H. H. Wilson, Vishnupurana.
Pargiter, Dynasties of Kali Age.
,, Ancient Indian Geographies and Chronology.
,, Geography of Rama's Exile
,, Markandeya Purana.
Fleet, Kaliyuga Era.

H. Sarma, Padmapurana and Kalidas.

ব্রহ্মানন্দভারতী পুরাণতত্ত্ব (কাশীধাম) ১৩২৯।

Jacobi, Das Ramayana.

Holtzman, Das Mahabharata.

দর্শন।

রমেশচন্দ্র দত্ত, হিন্দুশাস্ত্র ১ম খণ্ড।

Dasgupta, History of Indian Philosophy, Vol. I.

J. C. Chatterjee, Kasmir Shaivism.

Otto Schrader, Ahirbudhnya Samhita.

A. B. Kaith, Samkhya System,

,, ,, ,, Karma Mimansa.

,, ,, ,, Indian Logic and Atomism.

Saunders Gotama Buddha.

তিলক, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতারহস্য, (বঙ্গানুবাদ)।

Gopinath Kaviraja M. A. Some Aspects of Virashaiva Philosophy.

,, ,, ,, ,, Introduction to Jaymangala-tika.

প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী, বেদান্তদর্শনের ইতিহাস।

P. V. Kane, Purvamimansa System, Annals, Bhandarkar Institute, Vol. VI Pt I. pp 1—40.

অলঙ্কার।

P. V. Kane, Sahityadarpana.

S. K. De. History of Sanskrit Poetics.

Bhatta Vamanacharya, Kavyaprakasha, 1901.

অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র।

Arthashastra, Punjab Sanskrit Department.

,, ,, Shama Shastri.

Schmidt, Kamashastra

পঞ্চানন তর্করত্ন, বাৎস্যায়নের কামসূত্র।

ব্যাকরণ।

Belvelkar, Systems of Sanskrit Grammar

Nyasa or Kashika Vivarana, Varendra Research Society,

Goldstucker, Panini

শিল্পশাস্ত্র।

Phanindranath Basu M A. Principles of Shilpashastra.

যুগপঞ্জী।

বৈদিক যুগ।

৬০০০—৪০০০ পূঃ খৃঃ অদিতি যুগ,

৪০০০—২৫০০ পূঃ খৃঃ মৃগশিরা যুগ,

২৫০০—১৪০০ পূঃ খৃঃ কৃত্তিকা যুগ,

২৫০০—১২০০ পূঃ খৃঃ ব্রাহ্মণ যুগ,

২০০০—৮০০ পূঃ খৃঃ প্রাচীন উপনিষদ্ যুগ,

১৪০০ পূঃ খৃঃ বোঘাজকোই উৎকীর্ণ লিপি।

১০০০—৯০০ পূঃ খৃঃ মনুস্মৃতি।

৮৭৮—৬০০ পূঃ খৃঃ পার্শ্বনাথ জৈনতীর্থঙ্কর (৮৭৮—৭৭৮ পূঃ খৃঃ)

যাস্কাচার্য।

রামায়ণ,

মহাভারত, পাণিনি।

৬০০—৫২৮ পূঃ খৃঃ বর্দ্ধমান জ্ঞাতপুত্র বা মহাবীর।

৫৬৩—৪৯৩ পূঃ খৃঃ গৌতম বুদ্ধ।

৫২২—৪৮৬ পূঃ খৃঃ দেরায়ুস কর্তৃক ভারত আক্রমণ।

৪৮৬—৪৬৫ পূঃ খৃঃ জরাকৃসিস্ কর্তৃক ভারত আক্রমণ।

৩৪৩—৩২১ পূঃ খৃঃ নন্দ বংশ (মগধ রাজ্য)

কাত্যায়ন, অষ্টাধ্যায়ীর বৃত্তিকার।

৩৩৪—৩২৩ পূঃ খৃঃ আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণ।

৩২১—১৮৪ পূঃ খৃঃ মৌর্য বংশ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র।
অশোক ২৬১—২২৭ পূঃ খৃঃ।

১৮৪—৭২ পূঃ খৃঃ শুঙ্গ রাজবংশ।
পুষ্যমিত্র ১৮৪—১৪৮ পূঃ খৃঃ।
ভাস ? পতঞ্জলি, পাণিনীয় মহাভাষ্য।

৭৫ পূঃ খৃঃ—৫০ খৃঃ শক ও পহ্লব আধিপত্য।
৫৮ পূঃ খৃঃ বিক্রমাদিত্য কিম্বা ২য় আজেস—
কর্তৃক বিক্রমাব্দ বা সম্বৎ প্রতিষ্ঠিত হয়।
কালিদাস ?

৭৮ খৃঃ—২*০ খৃঃ কুশানবংশ (তক্ষশীলা)
কনিষ্ক ? শকাব্দ প্রতিষ্ঠা।
মাঠরভাষ্য।
চরকসংহিতা (পুনঃসংস্কৃত)
নাগার্জুন।
সুশ্রুত (পুনঃসংস্কৃত)
অশ্বঘোষ।
বাৎস্যায়নের কাম সূত্র ?

২০০ খৃঃ—৩০০ খৃঃ শবরস্বামী ও কামন্দকীয় নীতিসার
ভাস নাট্যকবি ?

৩১৯ খৃঃ—৪৭০ খৃঃ গুপ্ত রাজগণ।
৩৮০—৪১৪ ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।
কালিদাস ?
৩৯৯—৪১৩ ফাহিয়েনের ভারত ভ্রমণ।
৪১৩—৪৫৫ কুমারগুপ্ত।
৪৫৬—৪৭০ স্কন্দগুপ্ত।
৪৭০ আর্যভট্ট।

৪৭১ খৃঃ—৬০০ খৃঃ	ভট্টি দণ্ডাচার্য সুবন্ধু ভারবি	ইউরোপীয় অধ্যাপকগণ ইঁহাদিগকে আরও পরে স্থাপন করেন।
৬০৬ খৃঃ—৬৪৭ খৃঃ	হর্ষবর্দ্ধন স্থাণ্বীশ্বর রাজ। ভর্তৃহরি, ভাগবৃত্তি ও বাক্যপদীয়। ৬২৮—৬৪৫ হুয়েঙ্ সাঙের ভারত ভ্রমণ। কাশিকাবৃত্তি (বামনজয়াদিত্য প্রণীত) বাণভট্ট, হর্ষচরিত, কাদম্বরী। মহেন্দ্রবিক্রম, মত্তবিলাস।	
৬৫০—৭০০ খৃঃ	কুমারদাস, জানকীহরণ। ভীমকবি, রাবণার্জুনীয় ভবভূতি, মালতীমাধব, উত্তর রামচরিত গৌড়পাদ।	
৭০০ খৃঃ—৮০০ খৃঃ	ভামহ, অনঙ্গহর্ষ তাপসবৎসরাজ। মাঘ, শিশুপালবধ। কবিরাজ' রাঘবপাণ্ডবীয়। শঙ্করাচার্য, শারীরক ভাষ্য। কুমারিল ভট্ট। মাধবকর, নিদান।	
৮০০—৯০০ খৃঃ	রাজানক রত্নাকর। শিবস্বামী। জিনসেন। বাচস্পতিমিশ্র (৮৪১ খৃঃ)। অবন্তিবর্মন্ (৮৫৫—৮৮৩) আনন্দবর্দ্ধন বিশাখ দত্ত। রাজশেখর। বৃন্দ, সিদ্ধযোগ। সর্বজ্ঞাত্মা, সংক্ষেপশারীরক।	

৯০০—১০০০ খৃঃ ক্ষেমীশ্বর. চণ্ডকৌষিক।
ধনঞ্জয় দশরূপক ৯৭৭ খৃঃ
হলায়ুধ, কবিরহস্য
পদ্ম শ্রীজ্ঞান
উদয়নাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি।
যামুনাচার্য
অভিনবগুপ্তাচার্য।

১০০০—১১০০ খৃঃ রামানুজ শ্রীভাষ্য, ভোজরাজ (১০১৮—১০৬০ খৃঃ)
দামোদর মিশ্র,
ক্ষেমেন্দ্র,
নিম্বার্ক
সোমদেব ভট্ট
বিহ্লন কবি
চক্রপাণি দত্ত, ভানুমতী,
সন্ধ্যাকর নন্দী, রামচরিত,
বিজ্ঞানেশ্বর, মিতাক্ষরা।
কৃষ্ণ মিশ্র।
পুরুষোত্তমদেব, ভাষাবৃত্তি (১১০০ খৃঃ)
মম্মটভট্ট, কাব্যপ্রকাশ।

১১০০—১২০০ খৃঃ জীমূতবাহন, দায়ভাগ।
ধনঞ্জয় কবি
জয়দেব, গীতগোবিন্দ,
মংখদাস
শ্রীহর্ষ, নৈষধীয় কাব্য, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য,
ধোয়ী, পবনদূত,
শরণদেব, দুর্ঘটবৃত্তি,
বর্দ্ধমান, গণরত্নমহোদধি, ১১৪০ খৃঃ।

১২০০—১৩০০ খৃঃ গঙ্গেশোপাধ্যায়, তত্ত্বচিন্তামণি,
বেদান্তদেশিক, হংসসন্দেশ,

জয়দেব বা পীযূষবর্ষ (নৈয়ায়িক ও আলঙ্কারিক)
পদ্মনাভ, সুপদ্মব্যাকরণ।
হেমাদ্রি, চতুর্বর্গ চিন্তামণি।
বোপদেব, মুগ্ধবোধ।
ক্রমদীশ্বর, সংক্ষিপ্তসার।
বিদ্যাধর, একাবলী।

১৩০০—১৪০০ খৃঃ বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণ।
মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহ, ধাতুবৃত্তি ইত্যাদি।
সায়নাচার্য, বেদভাষ্যাদি।
মল্লিনাথ, টীকাকার।

১৪০০—১৫০০ খৃঃ পক্ষধরমিশ্র,
বাচস্পতি মিশ্র, স্মৃতিনিবন্ধকার।
বাসুদেব সার্বভৌম,
রঘুনাথ শিরোমণি,
চৈতন্যদেব।

১৫০০—১৬০০ খৃঃ সনাতন গোস্বামী,
রূপ গোস্বামী,
জীব গোস্বামী,
কবিকর্ণপূর,
বীর ভদ্রদেব,
অপ্পয্য দীক্ষিত।

১৬০০—১৭২৫ খৃঃ ভট্টোজি দীক্ষিত,
হরি দীক্ষিত,
জগন্নাথ কবি,
নাগেশ ভট্ট।

শব্দসূচী